

আহ্কামুল হাদীস

[সিহাহ সিন্তার আলোকে মাযহাবভিত্তিক শরীয়তের বিধান পর্যালোচনা]

লেখক

محمد اسد الحق

মাওলানা মোঃ কামরুল হাসান

পি.এইচ.ডি. (গবেষক)

বি.এ. অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.এ. (ইসলামিক স্টাডিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তাকমীল ১ম শ্রেণীতে ১ম

ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদক

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা

আহকামুল হাদীস

প্রকাশনায়ঃ

রিয়াদ প্রকাশনী

৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোনঃ ০১৯১৪৭৫৮১০৩, ০১৯১৬৭৪৭৮৯৮,

০১৯১৪১৬১৫২৬

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী, ২০০৬

তৃতীয় সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

কম্পোজঃ

মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ (রিয়াদ)

প্রচ্ছদঃ

মোঃ সারোয়ার জাহান

মুদ্রণেঃ

হেরা প্রিন্টার্স

৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

বঁধাইঃ

কোয়ালিটি বাইন্ডিং হাউস

৩১/২ শিরিস দাস লেন, ঢাকা

মূল্যঃ ৩৫০.০০ টাকা

(সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

"Ahkamul Hadith" compiled by MD. Kamrul Hasan, edited by Dr. M. Fazlur Rahman and published by Riyadh Prakashani, 34 North Brookhall Road, Banglabazar, Dhaka in September 2013 (3rd edition).

US\$ 15.00

বাংলা ভাষাভাষী
হাদীম ও ফিফ্ অধ্যয়নকারীদের জন্য
নিবেদিত

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। যিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর, যিনি ছিলেন এই পবিত্র কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যাদানকারী। দুআ ও মাগফেরাত কামনা করি ঐ সকল অভিজ্ঞ মহামনীষী মুজতাহিদগণের উপর, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের উপর গবেষণা করে শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল রচনা করে আমাদেরকে ইসলামী শরীয়তের উপর চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন।

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর স্থান। একজন মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই আল-কুরআনের পাশাপাশি হাদীস চর্চায়ও মনোযোগী হয়ে থাকেন। আর এই অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যম যদি হয় মাতৃভাষা, তাহলে তা খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই আরবী, উর্দু, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী সহ বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভাষা নেই, যে ভাষায় কুরআন-হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

কিছুকাল পূর্বেও বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের কুরআন চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষা। এর অন্যতম কারণ হল ভৌগোলিক অবস্থান। কেননা এতদঞ্চলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটেছে মূলত সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মহামনীষীদের মাধ্যমে। আর তাঁদের কারো না কারো মাতৃভাষা ছিল আরবী, ফার্সী অথবা উর্দু এবং তাঁদের রচিত সকল কিতাবও ছিল মাতৃভাষা আরবী, উর্দু অথবা ফার্সী ভাষায়।

আলহামদুলিল্লাহ, ইদানিং ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পবিত্র কুরআনের তরজমাসহ বিভিন্ন তাফসীরও বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, অনূদিত হয়েছে সিহাহ সিভাহ বা হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়খানি কিতাবসহ অনেক হাদীসগ্রন্থ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এতদঞ্চলে আজও বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার জন্য তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ নেই বললেই চলে। আর যা আছে তাও যৎসামান্য। অথচ কুরআন-হাদীসের শব্দার্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ, মাসআলার উত্তর প্রদানকারী সাহাবায়ে কিরামের কুরআন-হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানের তারতম্যের কারণে ও মাসআলা রচনায় নীতিগত পার্থক্যসহ বিভিন্ন কারণে হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অখতেলাফ রয়েছে, এর সঠিক ব্যাখ্যা না জেনে সরাসরি হাদীস অধ্যয়ন করলে সাধারণ শিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ আলিমও নিশ্চিত বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবেন। শুধু হাদীসের তরজমা পড়ে অনেকে তো রীতিমত গবেষক মুহাদ্দিস হয়ে গেছেন, মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন, আবার অনেকেরই হিতে বিপরীত হতেও দেখা গেছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিপক্ব হাদীস বিশারদগণ কর্তৃক বাংলা ভাষায় হাদীসের ব্যাপক খেদমত। আর এই খেদমতের জন্য কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে।

দাওয়ায়ে হাদীস পড়ার সময় দুটি বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। প্রথমত, আমাদের দেশে মাদ্রাসায় তাকলীমের বর্ষে সিহাহ সিত্তাহর কিতাবসমূহ যে পদ্ধতিতে পড়ানো হয়, এতে অধিকাংশ কিতাবের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের বছরের সিংহ ভাগই চলে যায় পবিত্রতা ও নামায অধ্যায়ের আলোচনায়। অতঃপর বছরের শেষে সময় ও সুযোগ না পাওয়ার কারণে যাকাত, হজ্জ, বিবাহ, তালাক ও রোযা অধ্যায়সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর আলোচনা করা সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ইলমই অজ্ঞাত থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, আজকাল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারণে আরবী ও উর্দুর ক্ষেত্রে পারদর্শী ও পূর্ণ মনোযোগী না হওয়ার কারণে হাদীসের কিতাবসমূহের সঠিক মর্মার্থ উদ্ঘাটন করতে অক্ষম। কেননা, হাদীসের অধিকাংশ অমূল্য ব্যাখ্যাগ্রন্থই আরবী ও উর্দুতে রচিত। তাই পরীক্ষার সময় বাজার থেকে সাল ভিত্তিক কিছু গাইড কিনে দায়সারাতাবে পরীক্ষা দিয়ে কোন মতে পাশ করার চিন্তায় মগ্ন থাকে। এতে পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হলেও এর দ্বারা হাদীস অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে তখনই ভেবেছিলাম, সহজ-সরল বাংলায় সিহাহ সিত্তাহর আলোকে রচিত মাযহাবভিত্তিক কোন গ্রন্থ থাকলে ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের জন্য খুবই উপকার হত।

আর এ ধরনের গ্রন্থ বাজারে আছে কিনা, তা দীর্ঘদিন খুঁজেও না পেয়ে আশাহত হয়েছি। তখনই ভাবলাম, এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিলে কেমন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনের মাঝে প্রশ্ন জাগে, আমি কে? আমার ইলমের দৌড়ই বা কত দূর? এ ধরনের কিতাব রচনার স্বপ্ন তো তাঁরাই দেখতে পারেন, যাঁরা ইলমী ও আমলী যোগ্যতায় শীর্ষে বিচরণ করছেন।

আমি আগেই বলেছি, কোন কাজ শুরু করার জন্য কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে। তাই নিজের শত অযোগ্যতা জানা সত্ত্বেও ভবিষ্যতের জন্য এই প্রয়াস খানিকটা ফলদায়ক হতে পারে ভেবে “আহ্‌কামুল হাদীস” নামে হাদীসের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনায় হাত দেই আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনার্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় ক্লাশ ও পরীক্ষা ছাড়া বাকি সবটুকু সময় নিজেকে এই খেদমতে জড়িত রাখার চেষ্টা করেছি।

সিহাহ সিত্তাহর উপর মাযহাব ভিত্তিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। এটি যেমন অনেক বড় হওয়ার কথা, তেমনি তথ্যবহুল হওয়াও উচিত। কিন্তু বিভিন্ন দিক চিন্তা করে এবং কিতাবটির কলেবর সীমিত রাখতে গিয়ে আপাতত আলোচিত অধ্যায়সমূহে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অনুচ্ছেদ শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের চাহিদা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সংযোজনের সদিচ্ছা রইল।

অত্র কিতাবটিতে পবিত্রতা, নামায, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ, তালাক ও রোযা মোট সাতটি অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুনান হিসেবে আবু দাউদ প্রথম খণ্ডকে ভিত্তি করে গ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছে। আর প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে আবু দাউদের মূল কিতাব অনুসারে পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পাঠকদের, বিশেষত গবেষকদের

সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের শেষে সাধ্যানুযায়ী সিহাহ সিভাহ গ্রন্থের (ভারতীয় সংস্করণ অনুযায়ী) অনুচ্ছেদ, খণ্ড ও পৃষ্ঠার বরাতও দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাদীসটি উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হুবহু অথবা শাস্কিক বা রাবীর পার্থক্য সহকারে, সংক্ষেপে, দীর্ঘ-আকারে অথবা আংশিকভাবে সংকলিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত হাদীসের আলোকে প্রাপ্ত মাসআলার ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত সূত্র ও দলীল সহকারে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর অধিকাংশ হাদীসের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবুবকর সিদ্দীক কর্তৃক অনূদিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আবু দাউদ হাদীস গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী-বাংলা অভিধান রচনার জগতের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, বহুগ্রন্থের প্রণেতা, আরবী ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ও সীরাতে বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপনা ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে অমূল্য সময় ব্যয় করে পূর্ণ কিতাবটির সম্পাদনা করে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন। ইসলামের আরো অধিক খেদমতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে বরকতময় হায়াত দান করুন। তাঁরই ছোট ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও প্রোগ্রামার রেদওয়ান ভাই কম্পোজের উপযোগী করে আরবী ও বাংলা সফটওয়্যার চমৎকারভাবে পুনর্বিন্যাস করে দিয়েছেন এবং বড় ছেলে রিয়াদ ভাই নিরলস পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ কিতাবটি কম্পোজ করে গ্রন্থটিকে সূর্যের মুখ দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। মূলত তাঁদের অকৃত্রিম প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া কিতাবটিকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হতো না। আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী। এছাড়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জামিআ ইসলামিয়া লালমাটিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক প্রথিতযশা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম (সোহাইল) সহ অসংখ্য ছাত্র ভাই ও গুণগ্রাহী এই কিতাবটি প্রণয়নে বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্বীপনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন!

সহৃদয় পাঠকের কাছে আমার বিনীত আবেদন, মুদ্রণ প্রমাদসহ এই কিতাবের কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে বা আমার ইলমী অযোগ্যতার কারণে কোথাও কোন অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে কেউ তা আমাকে জানালে তাঁর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সে সব ভুল-ত্রুটি ও অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করব।

বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে এই কিতাবটি সামান্যতম উপকারে এলেই দীর্ঘদিনের এই পরিশ্রম সার্থক হবে।

মাওলানা মোঃ কামরুল হাসান

০১/০১/২০০৬ ইং

আট
সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
পবিত্রতা অধ্যায়	১৭-১২৩
কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ	১৭
পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া	২২
অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির	২৩
পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন	২৪
দাঁড়িয়ে পেশাব করা	২৬
টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া	২৯
যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিজ্জা করা নিষেধ	৩০
পাথর দ্বারা ইস্তিজ্জা করা	৩২
মিসওয়াক করা	৩৫
অযু ফরয হওয়া	৩৮
যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়	৪০ ✓
কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা	৪৫
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ✓	৪৯
সাগরের পানি দ্বারা অযু করা	৫১
অযুর পরিপূর্ণতা	৫৮
অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা	৬২
নবী করীম (সাঃ)-এর অযুর বর্ণনা	৬৪ ✓
পাগড়ীর উপর মাসেহ করা	৬৮
মোজার উপর মাসেহ করা	৭০
মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা	৭২
মাসেহ করার পদ্ধতি	৭৫
(স্ত্রীকে) চুম্বনের পর অযু করা	৭৭
পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে অযু	৭৯
আঙুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর অযু না করা	৮২
রক্ত বের হলে অযু করা	৮৪
মযী (বীর্যরস) সম্পর্কে	৮৮
ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া	৯১
স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হলে	৯৫
অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ	৯৭
ইস্তেহাযাগ্রস্ত (রক্তপ্রদর) মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময়	
গোসল করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ	১০০
দুই তুহরের মধ্যবর্তী সময় গোসল	১০৩
তায়াম্মুম	১০৯
তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে	১১৪

জুমআর দিনে গোসল করা	১১৬
কাপড়ে বীর্ষ লাগলে	১১৯
শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে	১২৩
নামায অধ্যায়	১২৬-৩২১
নামাযের ওয়াক্তসমূহ	১২৬
যুহরের নামাযের ওয়াক্ত	১৩২
আসরের নামাযের ওয়াক্ত	১৩৫
যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পেল, সে যেন পুরো নামায পেল	১৩৯
মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত	১৪০
এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত	১৪২
ফজরের নামাযের ওয়াক্ত	১৪৫
আযানের সূচনা	১৪৯
আযানের নিয়ম	১৫২
যে আযান দিয়েছে, সেই ইকামত দিবে	১৫৮
আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ	১৬০
ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া	১৬৩
জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি	১৬৫
মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত	১৬৯
একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা	১৭২
ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি কে?	১৭৫
কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর ঐ নামাযে পুনরায় ইমামতি করা	১৭৯
নামাযের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সমাণ্ডি) জিনিসের বর্ণনা	১৮২
যে যে কারণে নামায নষ্ট হয়	১৮৬
রাফউল ইয়াদাইন বা নামাযে হস্তদ্বয় উত্তোলন	১৯০
উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না বলা	১৯৬
কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কিরাআত পাঠ ত্যাগ করলে	২০১
প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম	২১৪
দুই সিজদার মধ্যবর্তী উপবেশন পদ্ধতি	২১৫
নামাযরত অবস্থায় হাঁচির জবাব দেয়া (নামাযে কথা বলার হুকুম)	২১৭
ইমামের পিছনে আমীন বলা	২২৭
বসে নামায আদায় করা	২৩২
তাশাহহুদের বর্ণনা	২৩৪
তাশাহহুদের মধ্যে (আংগুল দ্বারা) ইশারা করা	২৩৭
সালাম সম্পর্কে	২৪১
যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দিহান হয়েছে	২৪৩
গ্রামাঞ্চলে জুমআর নামাযের বিধান	২৪৬

জুমআর নামাযের সময়	২৫৫
ইমামের খুতবা দেয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করলে	২৫৭
যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে এক রাকাত পায়	২৬২
দুই ঈদের নামায	২৬৪
ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা	২৬৬
ঈদের নামাযের পর অন্য নামায	২৭০
মুসাফির কখন নামায কসর পড়বে	২৭২
দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা	২৭৪
সফরে সুন্নত ও নফল নামায	২৭৯
মুসাফির কখন পুরা নামায আদায় করবে?	২৮০
ফজরের সুন্নত পড়ার পূর্বেই ইমাম জামাআতে দাঁড়িয়ে গেলে	২৮৮
যদি কারো ফজরের সুন্নত বাদ পড়ে তবে সে তা কখন পড়বে?	২৯১
রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত	২৯৩
কুরআন মজীদে সিজদায়ে তিলাওয়াত কয়টি?	৩০১
বিত্তিরের নামায সুন্নত	৩০৮
বিত্তিরের নামাযের রাকাত সংখ্যা কত	৩১২
বিত্তিরের নামাযে দুআ কুনূত	৩১৮
যাকাত অধ্যায়	৩২২-৩৭৩
যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয়	৩২২
বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত	৩২৯
গচ্ছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত	৩৩১
কৃষিজ ফসলের যাকাত	৩৩৪
মধুর যাকাত	৩৩৯
সদকাতুল ফিতর (ফিতরা)	৩৪২
সদকাতুল ফিতর প্রদানের সময়	৩৪২
কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে	৩৪৩
অগ্রিম যাকাত প্রদান করা	৩৫৮
এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া	৩৬০
যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়	৩৬৩
এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে	৩৬৯
অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা	৩৭১

হজ্জ অধ্যায়	৩৭৪-৪৩৯
হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা	৩৭৪
মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্জে গমন	৩৮০
আরেকটি অনুচ্ছেদ (অবিলম্বে হজ্জ সম্পন্ন করা)	৩৮২
অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ	৩৮৪
মীকাত সমূহের বর্ণনা	৩৮৮
হজ্জে ইফরাদ	৩৯২
যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে	৩৯৯
মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা	৪০৪
হজ্জ বা উমরা করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে	৪১০
আসরের পরে তাওয়াফ করা	৪১২
হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ	৪১৪
মাথার কেশ মুন্ডন ও কর্তন করা	৪১৭
উমরা	৪২০
ঋতুবতী মহিলা যদি তাওয়াফুল বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে	৪২৪
হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে	৪২৭
কাবা ঘরের মধ্যে নামায	৪২৯
মদীনায় আগমন	৪৩৪
কবর যিয়ারত	৪৩৪
বিবাহ অধ্যায়	৪৪০-৫১০
বিবাহে উৎসাহ প্রদান	৪৪০
বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান	৪৪৯
পাঁচবারের কম দুধপানে হুরমাত (হারাম) প্রতিষ্ঠিত হবে কি?	৪৫৩
মুতআ বা ভোগ বিবাহ	৪৫৯
তাহলীল বা হালাল করা	৪৬৭
বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা	৪৭০
ওলী বা অভিভাবক	৪৭২
স্বল্প পরিমাণ মহর	৪৮০
কুমারী স্ত্রীর সাথে অবস্থানকাল	৪৯২
সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস	৪৯৪
আযল সম্পর্কে (পরিবার পরিকল্পনা)	৪৯৯
তালাক অধ্যায়	৫১১-৫৮০
সুন্নত তরীকায় তালাক	৫১১
বিবাহের পূর্বে তালাক	৫১৮
রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া	৫২১
তিন তালাক প্রদানের পর, পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস	৫২৪

যিহার	৫৩১
খুলআ তালাক	৫৩৭
ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে	৫৪৩
লিআন	৫৪৫
নিদর্শন অনুসরণবিদ্যা	৫৫৩
সন্তানের অধিক হকদার কে?	৫৫৭
তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দত	৫৬০
তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ	৫৬৭
বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া	৫৭৪
যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া	৫৭৬
তালাকে বায়েন (তিন তালাক) প্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট	
ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে	৫৭৮

রোযা অধ্যায়

৫৮১-৬৫৬

“যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদয়া দিবে”

আল্লাহ তাআলার এ বাণী মানসূখ (রহিত) হওয়া

৫৮১

যদি রমযানের ঊনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে

তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে

৫৯০

যদি কোন অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়

৫৯২

সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরুহ

৫৯৯

শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু’ব্যক্তির সাক্ষ্যদান

৬০২

(সাহরীর) খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনে পেল

৬০৫

সাওমে বিসাল

৬০৭

রোযাদার ব্যক্তির মিসওয়াক করা

৬১২

রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো

৬১৪

রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

৬১৮

রোযাদার ব্যক্তির চুম্বন করা

৬১৯

রমযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

৬২০

যে ব্যক্তি রমযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার কাফফারা

৬২৩

যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকি থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে

৬৩২

সফরে রোযা রাখা

৬৩৫

রোযার নিয়ত

৬৪০

ইতিকাফ

৬৪৬

ইতিকাফ কোথায় করতে হয়?

৬৫১

প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ

৬৫২

ইতিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

৬৫৪

ইলমে হাদীসের কয়েকটি পরিভাষা

সাহাবীঃ যিনি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপর ইত্তিকাল করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী বলা হয়।

তাবেঈঃ যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং মুসলমান হিসাবে ওফাত লাভ করেছেন, তাঁকে তাবেঈ বলা হয়।

মুহাদ্দিসঃ যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খাইনঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রাঃ)-কে একত্রে ‘শায়খাইন’ বলা হয়; কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-কে একত্রে ‘শায়খাইন’ বলা হয়।

রাবীঃ হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ায়েতঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলে। কখনো কখনো মূল হাদীসকেও রেওয়ায়েত বলা হয়।

সনদঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সুসজ্জিত থাকে।

মতনঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

মারফুঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মারফু হাদীস বলে।

মাওকুফঃ যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্র ঊর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার।

মাকতুঃ যে হাদীসের সনদ তাবেঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদীস বলে।

মুদাল্লাসঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত গুণ্ডাদের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সে হাদীস শুনেনি, এমন হাদীসকে মুদাল্লাস বলে। এরূপ করাকে তাদলীস বলে। আর যিনি এরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। এক কথায় বলা যায়, যে হাদীসের সনদে দোষ লুকানো হয়েছে কিন্তু বাহ্যিক দিক সুন্দর করে তোলা হয়েছে, তাকে মুদাল্লাস বলে।

মুযতারিবঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গরমিল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারিব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয় বা প্রাধান্য দেয়া না যায়, সে পর্যন্ত এই হাদীসের ব্যাপারে তাওয়াকুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। এ ধরনের রেওয়ায়েত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

মুত্তাসিলঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতিঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা।

মুরসালঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবেঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

মারুফ ও মুনকারঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারুফ বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত (স্মৃতিশক্তি) গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষক্রটি মুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসানঃ যে হাদীসের কোন রাবীর স্মৃতিশক্তি গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলে। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফঃ যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল (যঈফ) বলা হয়, অন্যথায় মহানবী (সাঃ)-এর কোন বাণীই যঈফ নয়।

মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসটিকে মাওযু হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহামঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতিরঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রেওয়ায়েত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদঃ প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিন জন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহেদ বা আখবারুল আহাদ বলে। এই হাদীস তিন প্রকারঃ-

মাশহুরঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলে।

আযীযঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলে।

গারীবঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসীঃ যে হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন আল্লাহ নবী করীম (সাঃ)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, আর নবী করীম (সাঃ) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে কুদসী বা হাদীসে ইলাহী বা হাদীসে রব্বানী বলা হয়।

আহ্কামুল হাদীস প্রণয়নে সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। বুখারী
- ২। মুসলিম
- ৩। তিরমিযী
- ৪। আবু দাউদ
- ৫। নাসায়ী
- ৬। ইবন মাজাহ
- ৭। দরসে তিরমিযী (উর্দু)
- ৮। দরসে মিশকাত
- ৯। তানযীমুল আশতাত
- ১০। আল বাহরুর রায়িক
- ১১। ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াহ
- ১২। ফয়যুল বারী
- ১৩। বজলুল মাজহুদ
- ১৪। আল উরফুশ্ শাযী
- ১৫। মুসতাদরাকে হাকীম
- ১৬। আছারুস সুনান
- ১৭। মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ
- ১৮। ফাতহুল মুলহিম
- ১৯। লামআতুত তানকীহ
- ২০। উমদাতুল কারী
- ২১। মাআরিফুস সুনান
- ২২। নাসবুর রায়াহ
- ২৩। দারা কুতনী
- ২৪। মুসান্নাফে আব্দুর রায়্যাক
- ২৫। শরহে মাআনীল আছার/তাহাবী
- ২৬। বায়হাকী
- ২৭। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ
- ২৮। ইলাউস সুনান
- ২৯। তালীকুস সাবীহ
- ৩০। আহ্কামুল কুরআন
- ৩১। মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা
- ৩২। শরহে মুসলিম
- ৩৩। ফাতহুল কাদীর
- ৩৪। আশ শরহুল মুয়াহহাব
- ৩৫। আল ইনাইয়াহ
- ৩৬। উকূদুল জাওয়াহির
- ৩৭। আল মুগনী
- ৩৮। তালখীসুল হাবীর
- ৩৯। সহীহ ইবন খুযাইমা
- ৪০। ফাতহুল বারী
- ৪১। মাআরিফুল কুরআন
- ৪২। হেদায়া
- ৪৩। বাদায়িউস সানাই
- ৪৪। ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া
- ৪৫। মুয়াত্তা ইমাম মালিক
- ৪৬। কিতাবুল কেরাআতি
- ৪৭। রুহুল মাআনী
- ৪৮। কানযুল উম্মাল
- ৪৯। আল কাওকাবুদ দুরয়্যি
- ৫০। আল মুতালিবুল আলিয়াহ
- ৫১। বিদায়াতুল মুজতাহিদ
- ৫২। রাকাআতুত তারাবীহ
- ৫৩। মুআলাম লিল খাতাবী
- ৫৪। নূরুল আনওয়ার
- ৫৫। তাফসীরে কুরতুবী
- ৫৬। তাফসীরে মাযহারী
- ৫৭। শরহে বেকায়াহ
- ৫৮। কানযুদ দাকায়েক
- ৫৯। মুসনাদে আহমদ
- ৬০। মাবসূত
- ৬১। লিসানুল আরব
- ৬২। সীরাতে ইবন হিশাম
- ৬৩। তাবাকাতে ইবন সাদ
- ৬৪। আত তাফসীরুল কাবীর লির রাযী
- ৬৫। মীযানুল ইতিদাল
- ৬৬। তাহযীবুল কামাল
- ৬৭। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ
- ৬৮। নায়লুল আওতার
- ৬৯। ফাতাওয়ায়ে শামী
- ৭০। আল জামিউস সগীর

- ৭১। আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহু
- ৭২। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী
- ৭৩। ফাতাওয়ায়ে রশীদীয়াহ
- ৭৪। তাজুল উরুস
- ৭৫। ফিকহুস সুন্নাহ
- ৭৬। আল মুহান্না
- ৭৭। তাফসীরে মাদারিক
- ৭৮। ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়াহ
- ৭৯। জামিউল উসূল
- ৮০। মিরকাত
- ৮১। কাওয়ায়েদুল ফিকহ
- ৮২। আল মুজামুল ওয়াসীত
- ৮৩। শরহুন নিকায়াহ
- ৮৪। কিতাবুল হুজ্জাতি আলা আহলিল মদীনাতে
- ৮৫। আওনুল মাবুদ
- ৮৬। আহসানুল ফাতাওয়া
- ৮৭। ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা
- ৮৮। শারায়িউল ইসলাম
- ৮৯। যাদুল মাআদ
- ৯০। আল মুজামুল ওয়াফী
- ৯১। আল কামুসুল ওয়াজীয
- ৯২। আল মুনজিদ আল আবজাদী
- ৯৩। আল ফিকহু আলা মাযাহিকিল আরবাহাহ
- ৯৪। কামুসুল কুরআন
- ৯৫। আল লুবাব
- ৯৬। রুইয়াতুল হিলাল
- ৯৭। আল আছারুল বাকিয়াহ
- ৯৮। কিতাবুল উম্ম
- ৯৯। আত তাবয়ীনুল হাকায়েক
- ১০০। আহকামে ইতিকাফ
- ১০১। আওজায়ুল মাসালিক
- ১০২। দুররুল মুখতার

كِتَابُ الطَّهَارَةِ : পবিত্রতা অধ্যায়

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ص ৩

কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ

... عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَوَايَةً قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ

وَلَكِنْ شَرَقُوا أَوْ غَرَبُوا الْخ (بخاري ج ১ ص ২৬ باب لا تستقبل القبلة بغائط الخ، ترمذي ج ১ ص ৮

باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، نسائي ج ১ ص ১০ باب النهي عن استقبال واستدبار

القبلة عند الحاجة، ابن ماجه ص ২৭)

অনুবাদঃ ... আবু আইউব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যখন তোমরা পায়খানায় আসবে, তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে না। বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে।

বিশ্লেষণঃ কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পিছনে ফেলে মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে মতানৈক্য (اِخْتِلَافٌ) রয়েছে। নিয়ে

সংক্ষিপ্তাকারে সাতটি মত বর্ণনা করা হলঃ

১. দাউদ যাহেরির মতে, ময়দানে হোক কিংবা আবাদী জমিতে হোক সর্বাবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে ইস্তিঞ্জা (মল-মূত্র ত্যাগ) করা জায়েয।

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا- (ابو داود ج ১ ص ৩ باب

الرخصة في ذلك، ترمذي ج ১ ص ৮ باب الرخصة في ذلك، ابن ماجه ص ২৮)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইস্তিকালের এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি।

অতএব, উক্ত হাদীসে যেখানে কিবলার দিকেই মুখ করে পেশাব করার প্রমাণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে কিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ইস্তিঞ্জা করার অবকাশ তো অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

২. ইমাম মালিক, শাফেঈ, ইসহাক ইবন রাহওয়াই (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী- ইস্তিঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ ফিরানো উভয়ই লোকালয়ে জায়েয, আর ময়দানে নাজায়েয।

দলীলঃ একদা ইবন উমর (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন-

... يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِِيَ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَىٰ إِنَّمَا نُهِِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي

الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقَبِيلَةِ شَيْءٌ يُسْتَرْكَ فَلَا بَأْسَ- (ابو داود ج ১ ص ৩)

অর্থাৎ, ... হে আবু আব্দুর রহমান! কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করাতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে এই নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যদি তোমার এবং কিবলার মধ্যে এমন কোন বস্তু থাকে যা তোমাকে আড়াল করে রাখে, তাহলে কোন অন্যায় হবে না।

৩. ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইত্তিঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ করা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। আর পিঠ ফিরানো সর্বাবস্থায় জায়েয। কোন কোন আহলে যাহের এবং আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি অভিমতও অনুরূপ।

(بذل المجهود ج ১ ص ৬)

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ- (ابو داود ج ১

ص ৩, بخاري ج ১ ص ২৬ باب التبرز في البيوت، ترمذي ج ১ ص ৯, نسائي ج ১ ص ১০-১১ الرخصة في ذلك في البيوت، ابن ماجة ص ২৮)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'টি কাঁচা ইটের উপর বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, মদীনায় বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করলে বায়তুল্লাহ স্বাভাবিকভাবেই পিছনে পড়বে।

৪. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, কিবলার দিকে মুখ করা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। আর কিবলার দিকে পিঠ ফিরানো লোকালয়ে জায়েয কিন্তু খোলা ময়দানে নাজায়েয।

দলীলঃ উপরোল্লিখিত ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি ইজতিহাদ (গবেষণা) করে বলেন যে, উক্ত হাদীসে কিবলার দিকে যে পিঠ ফিরানোর কথা এসেছে, তা ছিল লোকালয়ে। সুতরাং ময়দানে তা জায়েয নয়।

৫. মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রহ.)-এর মতে, কিবলার দিকে মুখ দেয়া বা পিঠ ফিরানো সর্বাবস্থায় হারাম, এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেও।

... عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبُولٍ أَوْ غَائِطٍ - (আবু দাউদ জ ১৩, ৩, بخاري ج ১ ص ২৬ باب من تبرز على لبنتين، ابن ماجه ص ২৭)

অর্থাৎ, ... মাকাল ইবন আবী মাকাল আল-আসাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) উভয় কিবলার (বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

উল্লিখিত হাদীসে যেহেতু উভয় কিবলার উল্লেখ রয়েছে, তাই উভয় ক্ষেত্রেই হারাম।

৬. হাফিয় আবু আওয়ানা (রহ.)-এর মতে, কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ ফিরানো উভয়টির নিষিদ্ধতা কেবল মদীনাবাসীদের জন্য খাস (বিশেষিত)। অন্যদের জন্য নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লিখিত হাদীসের শেষাংশ - وَلَكِنْ شَرُّوْا أَوْ غَرَّبُوْا -

এই সম্বোধন সাধারণভাবে সবার জন্য নয়। শুধুই মদীনাবাসীদের জন্য। কেননা, মদীনাবাসীদের কিবলা ছিল দক্ষিণ দিকে। সেজন্য পেশাব-পায়খানার সময় তাদের পূর্ব-পশ্চিমমুখী হয়ে বসতে হবে।

৭. ইমাম আবু হানিফা, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, মল-মূত্র ত্যাগকালে কিবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ ফিরানো উভয়টি সাধারণভাবে নাজায়েয। খোলা ময়দানে হোক কিংবা লোকালয়ে। ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও একটি অভিমত অনুরূপ। আর হানাফীদের ফাতওয়া ইহার উপরই।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে কিবলাকে সামনে রেখে যখন মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ প্রতীয়মান হল, তাহলে কিবলাকে পিছনে রাখা তো সামনে রাখার চেয়ে আরো অধিক গর্হিত কাজ।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الْغَائِطُ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا - (আবু দাউদ জ ১৩, ৩, نسائي ج ১ ص ১৬ النهي عن الاستطابة بالروح، ابن ماجه ص ২৭)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের পিতৃতুল্য। আমি তোমাদেরকে দীনের বিষয়সমূহ শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব, তোমাদের কারো যখন পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়, সে যেন কিবলাকে সম্মুখে ও পিছনে রেখে না বসে।

অত্র হাদীসে সুস্পষ্টভাবে কিবলাকে মল-মূত্র ত্যাগের সময় সামনে ও পিছনে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (درس ترمذي ج ۱ ص ۱۸۵-۱۸۷)

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে অন্যান্য মাযহাবের দলীলের জবাবঃ

দাউদ যাহেরীর দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নামক একজন রাবী রয়েছেন, যিনি সমালোচনার উর্ধ্বে নন। আর হানাফীদের পক্ষে প্রদত্ত আবু আইউব আনসারীর হাদীসটি এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কেউ কেউ মুহাম্মদ ইবন ইসহাককে মিথ্যুক এবং দাজ্জাল বলতেও কার্পণ্য করেননি। অতএব, যার সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করা হয়েছে, তা মারফু হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া, ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এটা হয়ত ঘটনাচক্রে কোন এক সময় সংঘটিত হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু এটা নবী করীম (সাঃ)-এর সাধারণ আমল ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারা অকাট্য বিধান (حكم قطعي) মানসূখ হতে পারে না। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালিক ও শাফেঈদের দলীলের জবাবঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদভিত্তিক আমল। যা মারফু হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।

তাছাড়া ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর ইজতিহাদ প্রাধান্য লাভের উপযোগী বলে মনে হয় না। কারণ, মল-মূত্র ত্যাগকারী ও কিবলার মাঝখানে আড়ালস্বরূপ কিছু থাকা, কেবল তখনই সম্ভব, যখন হারাম শরীফে বসে সরাসরি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ইস্তিঞ্জা করা হয়। (নাউয়ুবিল্লাহ) তাছাড়া অন্য কোথাও বসে এরূপ করা সম্ভব নয়। কেননা, কোন না কোন ঘরবাড়ি বা পাহাড় তো মাঝখানে প্রতিবন্ধক হবে। এমতাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোন প্রয়োজনই হতো না। সুতরাং লোকালয়ে জায়েয আর ময়দানে জায়েয নয়, এমনটি বলা ঠিক নয়।

ইমাম আহমদের দলীলের জবাবঃ (১) ইবন উমর (রাঃ) ছাদ থেকে নবীজী (সাঃ)-কে দেখা, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন দলীল হতে পারে না। কারণ এটি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, নবী করীম (সাঃ)-এর মল-মূত্র ছিল পবিত্র। অতএব, নবী করীম (সাঃ) এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়াও বিচিত্র নয়। (২) তাছাড়া ইবন উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিপাত ঘটনাচক্রে হয়েছিল এবং তাৎক্ষণিক তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। বিশেষ করে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি এমন অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টির দরুণ তাঁর প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া ছিল তাঁর পক্ষে দুষ্কর।

(৩) অথবা, নবী করীম (সাঃ)-এর চেহারা মুবারক ঠিকই কিবলার দিকে ছিল, কিন্তু লজ্জাহুইন ছিল অন্য দিকে ফিরানো। যা অল্পক্ষণের মধ্যে ইবন উমর (রাঃ) আন্দাজ করতে পারেননি। আর ফকীহগণ বর্ণনা করেন যে, মল-মূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে কাবার দিকে মুখ বা পিঠ না ফিরানোর সম্পর্ক হল লজ্জাহুইনের সাথে, চেহারার সাথে নয়।

আবু ইউসুফ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের বিপক্ষে প্রদত্ত জবাবই যথেষ্ট।

মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ

(১) মাকাল ইবন মাকালের হাদীসে আবু যায়েদ নামক একজন রাবী রয়েছেন, যার ব্যাপারে হাফিজ বলেন, তিনি অজ্ঞাত (مجهول)।

(২) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ করার হুকুম মাকরুহ তানযীহী, বায়তুল্লাহর মত হারাম নয়।

(৩) এ হুকুম তখন দেয়া হয়েছিল, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কিবলা ছিল। অতঃপর কিবলার হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে গেলে নিষেধের হুকুমও রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়।

(৪) তাছাড়া, বায়তুল মুকাদ্দাস উত্তর দিকে এবং কাবা শরীফ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অতএব, যদি মদীনা শরীফেও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানোর অনুমতি দেয়া হত, তাহলে কাবা শরীফের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানো আবশ্যিক হত। আর আসল উদ্দেশ্য এটাই।

আবু আওয়ানার দলীলের জবাবঃ যেহেতু উক্ত সম্বোধন সরাসরি মদীনাবাসীদেরকে করেছিলেন, তাই তিনি وَلَكِنْ شَرَفُوا أَوْ غَرَّبُوا অর্থাৎ, বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করবে, নতুবা শরীয়তের হুকুম তো বিশ্ববাসীর জন্য। কারণ তিনি ছিলেন বিশৃঙ্খল, সমস্ত উম্মতের নবী।

তাছাড়া এর উদ্দেশ্য যেহেতু কাবা শরীফকে সম্মান দেখানো। সুতরাং ইহা মদীনাবাসীসহ বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য নৈতিক দায়িত্ব। চাই সে চার দেয়ালের ভিতরে হোক বা খোলা ময়দানে হোক, চাই সে এশিয়া মহাদেশে থাকুক অথবা আফ্রিকায় থাকুক। (درس مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۴۹-۱۵۰)

হানাফীদের অভিমত প্রাধান্যের আরো কতিপয় কারণঃ

(ক) আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর হাদীসটি এক্ষেত্রে সমস্ত মুহাদ্দিসীনের সর্বসম্মতিক্রমে সনদগত দিক থেকে বিশুদ্ধতম। তাই ইমাম তিরমিযী (রহ.) শাফেঈ

মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীসটি স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করার পর লিখেন-

حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْئٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ - (ترمذي ج ١ ص ٨)

অর্থাৎ, এশ্শেখ্রে আবু আইউব (রাঃ)-এর হাদীসটি সর্বোত্তম ও বিশুদ্ধতম।

(খ) হযরত আবু আইউব (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি একটি মৌলিক আইনের মর্যাদা রাখে। এর মুকাবিলায় অন্যসব রেওয়ায়েত শাখাগত ঘটনা মাত্র।

(গ) আবু আইউব (রাঃ)-এর হাদীসটি বাচনিক (قَوْلِي) আর বিরোধী রেওয়ায়েত কর্মগত (فِعْلِي)। নিয়ম হল, বিরোধের সময় সর্বসম্মতিক্রমে বাচনিক (কাওলী) হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

(ঘ) আবু আইউব (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি নিষেধসূচক (مُحَرَّم)। আর বিরোধী রেওয়ায়েতগুলো বৈধতাসূচক (مُحِل)। এটিও একটি মূলনীতি যে, পরস্পর বিরোধের সময় বৈধতাসূচক হাদীসের উপর নিষেধসূচক হাদীস প্রাধান্য পায়।

(ঙ) আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর হাদীসটি কুরআনের সাথেও অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ অর্থাৎ, যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা তার আন্তরিকতার পরিচায়ক। (হুজঃ ৩২) আর কাবা শরীফ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার একটি অন্যতম নিদর্শন।

(تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٣٨-١٤١، درس ترمذي ج ١ ص ١٨٩-١٩٥)

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُوءُ ص ٣

পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া

... عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قَفْضٍ قَالَ إِتْنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوءُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرَهُ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ - (ابو داود ج ١ ص ٤، ترمذي ج ١ ص ٢٧ باب كراهية رد

السلام غير متوضئ، نسائي ج ١ ص ١٦، رد السلام بعد الوضوء، ابن ماجه ص ٢٩)

অনুবাদঃ ... আল-মুহাজির ইবন কুনফুয (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এমন অবস্থায় পৌঁছলেন, যখন তিনি (সাঃ) পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু-নবী করীম (সাঃ) অযু না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট

ওয়ার পেশ করে বলেন, আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করা অপছন্দ করি।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ ص ٤

অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ — (بخاري ج ١ ص ٤٤ باب تلقى الحائض المenses، مسلم ج ١ ص ١٦٢ باب ذكر

الله تعالى في حال الجنابة الخ، ابن ماجه ص ٢٦)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল থাকতেন।

বিশ্লেষণঃ উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে অসামঞ্জস্য (تعارض) পরিলক্ষিত হয়। কেননা, প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) অপবিত্রাবস্থায় যিকির করতে অপছন্দ করতেন। (উল্লেখ্য যে, সালাম দেয়া-নেয়া একপ্রকার যিকির) আর আয়িশার হাদীসে সর্বাবস্থায় যিকিরের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই মুহাদ্দিসীনে কিরাম উভয় হাদীসে সামঞ্জস্য স্থাপন করে বলেন-

(ক) যে হাদীসে অপছন্দের কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অনুত্তম বর্ণনা করা। আর আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল জায়েয পদ্ধতি বর্ণনা করা।

(খ) আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অন্তরের যিকির। আর আল-মুহাজির (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৌখিক যিকির।

(গ) আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ বা সর্বাবস্থায় দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পবিত্র থাকা অবস্থায় তিনি সর্বক্ষণ যিকির করতেন। সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় যিকির করতেন না।

(ঘ) أَحْيَانَهُ শব্দে ব্যবহৃত ৫ সর্বনাম (ضمير) দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-কে বুঝানো হয়নি; বরং যিকির করা বুঝানো হয়েছে। তখন বাক্যাংশের অর্থ হবে, তিনি সবসময় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রত্যেক যিকির আদায় করতেন। যেমন, টয়লেটে যাওয়ার সময় যে যিকির (দোয়া) তা তিনি সর্বাবস্থায় আদায় করতেন, আবার বাজারে যাওয়ার সময় যে যিকির রয়েছে, তিনি (সাঃ) তা আদায় করতেন।

(درس مشکوٰۃ ج ١ ص ١٧٦، تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٧١)

পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন : بَابُ الْأِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ ص ৪

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيهِ كَيْبِيرٌ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَمَا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالثَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَيْهِ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ - (بخاري ج ۱ ص ۳۴-۳۵ باب

من الكباثر الخ، مسلم ج ১ ص ১৬১ باب وجوب الاستبراء منه، ترمذي ج ১ ص ২১ باب التشديد في البول، نسائي ج ১ ص ১২-১৩ التنزه عن البول، ابن ماجة ص ২৭)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সাঃ) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে বললেনঃ এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের এই শাস্তি কোন বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য নয়। অতঃপর তিনি (সাঃ) একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বলেন, এই ব্যক্তিকে পেশাব হতে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে এবং (দ্বিতীয় কবরের প্রতি ইশারা করে বললেন) এই ব্যক্তিকে পরনিন্দা করে বেড়ানো হেতু আযাব দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল সংগ্রহ করে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং দুইটি কবরের উপর ছাপন করে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুইটি ডালের অংশ শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের আযাব কম হবে।

প্রথম আলোচনাঃ উপরোল্লিখিত হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, যে দুটি কারণে দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তা কবীরা গুনাহের কারণে নয়। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে- وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيهِ كَيْبِيرٌ অথচ পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া এবং পরনিন্দা করা নিঃসন্দেহে এ দুটি কবীরা (বড়) গুনাহ। অতএব, হাদীসটি ব্যাখ্যার দাবী রাখেঃ

(ক) كَيْبِيرٌ বলা হয় فِعْلٌ تَرْكُهُ তথা এমন কাজ যা পরিত্যাগ করা খুবই কষ্টকর। তখন বাক্যাংশটির অর্থ হবে, তাদের দুজনকে এমন কোন কাজের উপর শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, যা পরিত্যাগ করা খুবই কষ্টকর ছিল। বরং এমন কাজের দরুন শাস্তি দেয়া হচ্ছে, যা পরিত্যাগ করা ছিল খুবই সহজ।

(খ) বাক্যাংশটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল- لَيْسَ كَيْبِيرًا فِي الصُّورَةِ وَهُوَ كَيْبِيرٌ فِي الذَّنْبِ -

অর্থাৎ, প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকা এটাতো আকৃতি বা গঠনগত কবীরা নয়, কিন্তু গুনাহের দিক দিয়ে তা কবীরা।

(গ) একথার উদ্দেশ্য হল- **لَيْسَ كَبِيرًا فِي إِعْتِقَادِهِمَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ**

অর্থাৎ, তাদের ধারণা অনুযায়ী ইহা কবীরা নয়, কিন্তু আল্লাহর নিকট ইহা কবীরা।

(ঘ) বাহ্যিকভাবে ইহা (পেশাব থেকে সতর্ক না থাকা) কবীরা গুনাহ নয়। কিন্তু ইহা যেহেতু নামায ভঙ্গের কারণ, তাই তা কবীরা।

(ঙ) উভয় বিষয় সত্ত্বাগত দিক থেকে কবীরা নয়, কিন্তু বারবার করার দ্বারা এবং অভ্যাসে পরিণত করার দ্বারা তা কবীরায় পরিণত হয়ে যায়। কেননা, যেকোন সগীরা (ছোট) গুনাহ বারবার করার দ্বারা তা কবীরায় পরিণত হয়ে যায়।

(تنظيم الاشتات ١ ج ص ١٤٢)

(চ) সহীহ বুখারীতে সুস্পষ্টভাবে **ثُمَّ قَالَ بَلَى** (অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ) শব্দ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রথমে নবী করীম (সাঃ) এ দুটি বিষয়ে কবীরা হওয়ার ব্যাপারে ইলম না থাকার কারণে তিনি না বলেছিলেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ ওহী আসল যে, ইহা কবীরা। তখন তিনি (সাঃ) **بَلَى** (হ্যাঁ, ইহা কবীরা) উচ্চারণ করে কবীরা সাব্যস্ত করলেন। অতএব, আর কোন অসামঞ্জস্য নেই। (بخاري ١ ج ص ٣٥)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ উক্ত হাদীস অধ্যয়নে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কবরের আযাব উল্লিখিত দুই গুনাহের সাথে কি যোগসূত্র (مناسبت) রয়েছে? এর সঠিক জবাব হল, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর পবিত্রতা হচ্ছে নামাযের প্রথম ধাপ। অতএব, যে ব্যক্তি প্রস্রাবের ব্যাপারে অসতর্ক, তার পবিত্রতার অভাবে নামাযই শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার হকসমূহের মধ্যে অন্যায়ভাবে হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। আর এ হত্যার প্রথম ধাপ হচ্ছে চোগলখুরী বা পরনিন্দা। আর আখিরাতের স্তরসমূহের প্রথম স্তর হচ্ছে কবর। সুতরাং আখিরাতের এই প্রথম স্তর তথা কবরে আযাব হবে এটাই স্বাভাবিক।

(البحر الرائق ١ ج ص ١١٤، درس مشکوٰة ج ١ ص ١٥٣)

তৃতীয় আলোচনাঃ কবরের উপর ফুল দেয়া বা ডাল গাড়ার হুকুমঃ

অনুচ্ছেদের হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) তাদের কবরের আযাব লঘু হওয়ার প্রত্যাশায় একটি কাঁচা খেজুরের ডাল দু' ভাগ করে তাদের উভয়ের কবরে স্থাপন করে দেন। অতএব, প্রশ্ন জাগে যে, এর দ্বারা যে কোন কোন বিদআতী কবরের উপর ফুল দেয়ার বৈধতার প্রমাণ পেশ করে থাকে, তা কতটুকু

নির্ভরযোগ্য? এর জবাব হল, প্রমাণটি সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, এ হাদীসে ফুল দেয়ার উপর কোন আলোচনা নেই। (درس ترمذي ج ١ ص ٢٨٥)

এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে রহমানিয়া (১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০) আরো উল্লেখ আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে ফুলের মালা বা তোড়ার মাধ্যমে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। কোন নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন বা কোন বুজুর্গের লাশকে এমনভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কোন প্রমাণ নেই। এতে যদি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হত, তাহলে অবশ্যই নবী-রাসূল ও বুজুর্গানে দীন এর উপর আমল করতেন। যেহেতু শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই, অতএব ইহা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। (فتاوي رحيمة ج ٥ ص ٩٨، فيض الهاري ج ١ ص ٣١١)

উল্লেখ্য যে, কবরে ডাল গাড়ার হুকুম নিয়ে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছেঃ একদল মনে করেন, এটা নবী করীম (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব, এটা অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়। আল্লামা ইবন বাত্তাল ও আল্লামা জায়রী (রহ.) এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (সাঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের কবরে আযাব হচ্ছে এবং এর সাথে এটাও জানানো হয়েছে যে, ডাল গেড়ে দেয়ার কারণে তাদের এই শাস্তি লাঘব হতে পারে। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি না কবরবাসীর আযাব হওয়ার জ্ঞান লাভ করতে পারে, না শাস্তি লঘু হওয়ার। এ কারণে অন্যদের জন্য ডাল পুঁতে রাখাও দুরস্ত নয়।

তবে, খলীল আহমদ সাহারানপুরী ও মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) সহ অনেক আলিমের মতে, কবরে ডাল পুঁতে রাখার ব্যাপারটি কোন কোন হাদীস দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত, তাই ইহা সরাসরি নিষেধ করা ঠিক নয়। তবে এক্ষেত্রে যাতে সীমালঙ্ঘন না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। (يدل المجهود ج ١ ص ١٥)

দাঁড়িয়ে পেশাব করা : بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا ص ٤

... عَنْ حَدِيثَةٍ قَالَتْ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ قَبَالَ قَائِمًا

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خَفْيِهِ - (بخاري ج ١ ص ٣٥ باب البول قائما وقاعدا، ترمذي ج ١ ص ٩)

باب الرخصة في ذلك، نسائي ج ١ ص ١١ الرخصة في البول في الصحراء قائما، ابن ماجة ص ٢٦)

অনুবাদঃ ... হুয়ায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে নেন এবং (চামড়ার) মোজার উপর মাসেহ করেন।

বিশ্লেষণঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার হুকুম কি, এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের সামান্য মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব, উরওয়া, মুহাম্মদ ইবন সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ ও শাবী (রহ.)-এর মতে, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা শর্তহীনভাবে জায়েয।

(تَظْهِيمُ الْأَشْتَاتِ ج ১ ص ১৪৫)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* কোন কোন আহলে যাহির এর বিপরীতে বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হারাম।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, প্রস্রাবের ছিটা উড়ে আসার আশংকা না থাকলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয, অন্যথায় মাকরুহ। (درس ترمذي ج ১ ص ১৭৮)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও জমহুরের মতে, ওযর ছাড়া দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরুহ তানবীহী, হারাম নয়। (بذل المجهود ج ১ ص ১৭)

দলীল عَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوُلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا (১) عُمَرُ لَا تَبُولُ قَائِمًا— (ترمذي ج ১ ص ৯ باب البولي عن النبي عن البول قائما)

অর্থাৎ, উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন, হে উমর! তুমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না।

দলীল عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْوُلُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبْوُلُ إِلَّا قَاعِدًا— (ترمذي ج ১ ص ৯، نسائي ج ১ ص ১১)

(ابن ماجة ص ২৭)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে যে, নবী করীম (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি কেবল বসেই প্রস্রাব করতেন।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা হারাম বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যেহেতু নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের প্রমাণ মিলে, তাই উভয় হাদীস একত্র করলে মাকরুহ তানবীহী সাব্যস্ত হয়।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসটি আমরাও স্বীকার করি যে, নবী করীম (সাঃ) জীবনে একবার দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, তবে তা ছিল ওযরবশত। (যার বর্ণনা পরে আসছে) সুতরাং এর দ্বারা ওযর ছাড়া ঢালাওভাবে জায়েয সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

যদি ব্যাপক আকারে জায়েযই হত, তাহলে তিনি (সাঃ) উমর (রাঃ)-কে সরাসরি নিষেধ করতেন না যে, হে উমর! তুমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না।

আহলে যাহিরের অভিমতের জবাবঃ তাঁরা শুধু নেতিবাচক হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথচ নবী করীম (সাঃ) থেকে তো দাঁড়িয়ে প্রস্রাবেরও দলীল পাওয়া যায়। সুতরাং যদি ব্যাপক আকারে হারাম হত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) এমনটি কোনক্রমেই করতেন না।

ইমাম মালিকের অভিমতের জবাবঃ আসলে প্রস্রাবের ছিঁটা উড়ে আসার সাথে দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা শক্ত জায়গায় বসে প্রস্রাব করলেও ছিঁটা উড়ে আসা সম্ভবনা থাকে। ছিঁটা উড়ে আসার মাসআলা ও দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার মাসআলা এক নয়, বরং ভিন্ন।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব প্রসঙ্গে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর সুচিন্তিত অভিমত হল, বর্তমানে যেহেতু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অমুসলিম ও কাফের-মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এজন্য এর খারাপ দিকটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আর যে মাকরুহ তানযীহী কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়, ইহার মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ - (ابو داود ج ٢ ص ٥٥٩ كتاب اللباس)

অর্থাৎ, যে যে জাতির সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুতরাং বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েয নয়। আর এর উপরই ফাতওয়া।

নবী করীম (সাঃ) নিজের অভ্যাসের বিপরীত কেন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিলেন, এর জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম একাধিক জবাব দিয়েছেনঃ

(ক) নবী করীম (সাঃ) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন জায়েয বর্ণনা করার জন্য। আর এটা উম্মতকে জানিয়ে দেয়া ছিল তাঁর দায়িত্ব। যাতে উম্মত বুঝে নেয় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা দূষণীয় নয়।

(খ) অথবা, নবী করীম (সাঃ)-এর হাঁটুতে ব্যথা ছিল। যার ফলে তিনি বসতে পারছিলেন না। (বায়হাকী)

(গ) ঐ স্থানে নাপাকী ছিল। বসলে হয়ত নাপাকী লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল।

(ঘ) ইবন খুযাইমা বলেন, প্রথমদিকে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয ছিল, পরে তা রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়। (درس مشکوٰۃ ج ١ ص ١٥٦)

হাদীসদ্বয়ে দ্বন্দ্বের (تعارض) নিরসনঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম (সাঃ) একদা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব

করেছেন, পক্ষান্তরে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে এর বিপরীত বর্ণিত আছে। অতএব, হাদীসদ্বয়ে দ্বন্দের নিরসনকল্পে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন-

(ক) হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দিয়েছেন। আর হুযায়ফা (রাঃ) একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

(খ) আয়িশা (রাঃ) নিজের ইলম অনুযায়ী বলেছেন। যা ছিল নবী (সাঃ)-এর বাড়িতে অবস্থানকালীন আমল। কিন্তু সফর অবস্থা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল না। কেননা, তিনি তো সবসময় নবী করীম (সাঃ)-এর সফরসঙ্গী হতেন না। আর হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাদীসটি ছিল নবী (সাঃ)-এর সফরের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, কোন দ্বন্দ্ব নেই। (عرف الشئ ج ১০)

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ ص

টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ

غُفْرَانُكَ - (ترمذي ج ১ ص ৭ باب اذا خرج من الخلاء، ابن ماجه ص ২৭)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) টয়লেট হতে বের হয়ে ‘গুফরানাকা’ বলতেন। (অর্থাৎ, ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।)

বিশ্লেষণঃ মানুষ সাধারণত গুনাহ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে টয়লেটে যাওয়া তথা পায়খানা করা তো কোন গুনাহের কাজ নয়। এরপরেও কেন নবী করীম (সাঃ) ক্ষমা প্রার্থনা বা গুফরানাকা পড়তেন- মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে অনেক জবাব দিয়েছেনঃ

ক. রাসূলে করীম (সাঃ) সর্বদা যিকির করতেন। কিন্তু শৌচাগারে যবানী যিকিরের ধারা বন্ধ থাকত। এই মৌখিক যিকির বন্ধ থাকার কারণে তিনি ইস্তিগফার পড়তেন।

(درس ترمذي ج ১ ص ১৭৭)

খ. হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষ স্বীয় মল-মূত্র তথা নাপাকগুলো প্রত্যক্ষ করে। এসব জাহিরী নাপাক দেখে মানুষ স্বীয় বাতিনী নাপাকগুলোর কথা স্মরণ করে। প্রকাশ থাকে যে, মনে মনে এই স্মরণ করাটাই ইস্তিগফারের কারণ হবে। এজন্য غفرانك বলার তালীম দিয়েছেন।

গ. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বলেন, পেশাব-পায়খানা, মল-মূত্র মানুষের দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তার সুস্থতা ও জীবনের জন্য আল্লাহ

তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। আর এই ইস্তিগফারের বিধান এজন্য যে, মানুষ এই নেয়ামতের শুকরিয়া পুরোপুরি আদায় করতে পারে না।

(درس مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱০০-১০৬، تنظيم الاشتات ج ۱ ص ১৪০)

ঘ. আল্লামা মাগরিবী (রহ.) বলেন, দুনিয়াতে হযরত আদম (আঃ)-এর সর্বপ্রথম মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছিল। তখন এর দুর্গন্ধতে তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কুফল এবং স্বীয় ক্রটির কথা স্মরণ করেছিলেন। অতঃপর এই ধারা তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অব্যাহত থাকে। (بذل المجهود ج ১ ص ২০)

ঙ. সর্বোত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লামা বিম্বৌরী (রহ.)। তিনি বলেন, এখানে غفرانك শব্দটি মূলতঃ শুকরিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সিবওয়াইহ স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, আরবদের নিকট لا كفرانك বাগধারাটি প্রসিদ্ধ। এতে غفرانك শব্দটি কৃতজ্ঞতার অর্থে এসেছে, যা كفرانك-এর বিপরীতে ব্যবহার করার দ্বারা বোঝা গেছে। এই উত্তরটির সমর্থন হাদীসেও পাওয়া যায়-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي (ابن ماجه ص ২৬ باب ما يقول اذا خرج من الخلا)

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক অপবিত্র বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।

بَابُ مَا يُنْهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ ص ৬

যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ الْجَنُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ أَمْتَكَ أَنْ يُسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ - (ترمذي ج ১)

ص ১১ باب كراهية ما يستنجى به

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিনদের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতকে হাড়, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করুন। কেননা, মহান আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা রেখেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

বিশ্লেষণঃ উল্লিখিত হাদীসে হাড়, গোবর ও কয়লা এই তিনটি জিনিস দ্বারা ইস্তিজ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু কি এই তিনটি জিনিস দ্বারাই ইস্তিজ্জা করা মাকরুহ? এর জবাবে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে শুধু উল্লিখিত তিনটি বস্তু দ্বারা ইস্তিজ্জা করা মাকরুহ নয়; বরং আরো এমন অনেক বস্তু আছে যার দ্বারা ইস্তিজ্জা করা মাকরুহ। যার সঠিক হিসেব দেয়া বেশ কঠিন। তবে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় যে, ফকীহগণ এর দ্বারা গবেষণা করে নিষেধ বা মাকরুহ হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। যে সমস্ত বস্তুতে নিম্নলিখিত কারণসমূহের কোন একটি কারণ পাওয়া যাবে, এর দ্বারাই ইস্তিজ্জা করা মাকরুহ।

ক. সম্মানের বস্তু দ্বারা। যেমন- টুপি, কাগজ ইত্যাদি।

খ. খাদ্যদ্রব্য দ্বারা। যথা- শুকনা রুটি।

গ. নাপাক বস্তু দ্বারা। যেমন- শুকনা গোবর।

ঘ. ক্ষতিকর বস্তু দ্বারা। যেমন- হাড়।

* আলোচ্য হাদীস দ্বারা একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গোবর ও হাড় জিনদের খাদ্য হওয়ার অর্থ কি? এর অনেক জবাব রয়েছেঃ

ক. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনদের সারের কাজ দেয়। এভাবে এটি তাদের খাদ্যের উপকরণ হয়।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনদের পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তাদের পশুদের খাবার মানে জিনদেরই খাবার। যেমন, ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে

বর্ণিত- (مُسْلِم ج ١ ص ١٨٤ كتاب الصلوة باب الجهر بالقراءة الخ) -

অর্থাৎ, প্রতিটি শুষ্ক গোবর তোমাদের জন্তুগুলোর খাবার।

গ. কারো কারো মতে, গোবর মূলত জিনদের খোরাক এবং তাদের জন্য এটা থেকে নাপাকী তুলে নেয়া হয়। তাদের জন্য গোবরকে আসল অবস্থায় ফিরিয়ে শস্যে পরিণত করা হয়। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে-

فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا

طَعَامًا- (بخاري ج ١ ص ٤٤٤ كتاب المناقب باب ذكر الجن الخ)

অর্থাৎ, অতঃপর তারা (জিন) আমার নিকট খাদ্যের আবেদন করল। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম যে, তারা যদি কোন হাড় বা শুষ্ক গোবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তার মধ্যে যেন তাদের খাবার পায়।

ঘ. হাড় জিনদের খাদ্য হওয়ার অর্থ হল, এই হাড়গুলো জিনদের জন্য গোশতে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়। যেমন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرُ مَا يَكُونُ لَحْمًا - (মসলম জ ১৮৫ বাব
لجهر بالقراءة الخ)

অর্থাৎ, যে সব হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, যা তোমাদের (জিন)
হাতে পড়ে সেগুলো সবচেয়ে বেশি মাংসল হয়ে যায়।

কُلُّ عَظْمٍ لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرُ مَا كَانَ -
لَحْمًا - (ترمذي ج ২ ص ১৬১ ابواب التفسير)

অর্থাৎ, যে সব হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না, সেগুলো তোমাদের
(জিন) হাতে পড়ে সর্বাধিক মাংসল হয়ে যায়।

যদিও বাহ্যিক অর্থে হাদীসদ্বয়ে আল্লাহর নাম স্মরণের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা
যাচ্ছে। এর সমাধানে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, হাদীসদ্বয়ের
মূল উদ্দেশ্য হল, (যেবেহ বা খাওয়ার সময়) হাড়ের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা
হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতেই ইহা জিনদের খোরাকে পরিণত হয়।

কেউ কেউ বলেন, কুকুর যেমন হাড় থেকে খাবার কাজ সারতে পারে, এমনভাবে
জিনরাও। (تنظيم الاشتات ج ১ ص ১৫৫، درس مشکوة ج ১ ص ১০৫، درس ترمذي ج ১ ص ২১০)

আবার কেউ কেউ বলেন, জিনরা হাড়গুলো পাকিয়ে তাদের খাদ্যের উপযোগী করে
তুলে। যেমন, তিরমিযীতে ইবন মাসউদের হাদীসে সরাসরি বর্ণিত হয়েছে-

فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ - (ترمذي ج ১ ص ১১)

অর্থাৎ, কারণ এগুলো (হাড়) তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

بَابُ الْأِسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ ص ১৬

পাথর দ্বারা ইস্তিজা করা

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ
إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ - (نسائي)

ج ১ ص ১৮ الاجتزاء في الاستطابة الخ

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ
করেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে
তিনটি পাথর (কুলুথ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই
তার জন্য যথেষ্ট।

বিশ্লেষণঃ ইস্তিজার জন্য পাথর বা টিলা ব্যবহারে নির্ধারিত কোন সংখ্যা সুন্নত কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, আবু সাওর ও আহলে যাহেরের মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর একটি মত অনুযায়ী, ইস্তিজাতে পরিচ্ছন্নতা ও পাথর বা টিলার ক্ষেত্রে তিন সংখ্যা ওয়াজিব এবং বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করাও ওয়াজিব।

(تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٤١)

দলীল (১)ঃ عَنْ سَلْمَانَ ... أَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ الْخ (১)

(আবু দাউদ জ ১ ص ৩ باب كراهية استقبال القبلة الخ، مسلم ج ১ ص ১২৪ باب الأيتار في الاستنثار والاستجمار، ترمذي ج ১ ص ১০ باب الاستجمار بالحجارة، نسائي ج ১ ص ১৬ اللهم عن الاكتفاء الخ) অর্থাৎ, ... সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ... আমাদের কেউ যেন তিনটি প্রস্তরের (টিলা-কুলুখের) কমে ইস্তিজা (পবিত্রতা অর্জন) না করে।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে পাথর বেজোড় হওয়া এবং তিনটি হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর উভয় হাদীসে নির্দেশমূলক শব্দ (صِغَةً اِمْر) ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমার (নির্দেশ) ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (الْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ)

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহাবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ মতে, শুধু মলদ্বার পরিষ্কার করা ওয়াজিব। আর পাথর বা টিলার সংখ্যা তিনটি হওয়া সুন্নত এবং বেজোড় সংখ্যা হওয়া মুস্তাহাব।

দলীল (১)ঃ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... مَنْ اسْتَجْمَرَ (১)

فَلْيُؤْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ الْخ (আবু দাউদ জ ১ ص ৬ باب الاستنثار في

الخلا، ابن ماجة ص ২৭)

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ... যে ব্যক্তি টিলা-কুলুখ ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করে। যে এরূপ করে, সে উত্তম কাজ করে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে না, এতে কোন ক্ষতি নেই।

উক্ত হাদীসে বেজোড় হওয়াকে অখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বেজোড় না হলে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং ইহা কোনক্রমেই ওয়াজিব হতে পারে না।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে পাথর (টিলা)-এর সংখ্যা তিনটিকেই যথেষ্ট বলা হয়েছে।

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ (৩) : الدَّلِيلُ التَّمَسُّ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ فَاتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرُوْتَةٍ فَآخَذَ بِحَجَرَيْنِ وَالْقِي الرُّوْتَةَ وَقَالَ إِنَّهَا الرُّجْسُ— (بخاري ج ١ ص ٢٧ باب لا يستلجى بروت، ترمذي ج ١ ص ١٠ باب

الاستلجاء بالحجرين، نسائي ج ١ ص ١٧ الرخصة في الاستطابة بحجرين، ابن ماجة ص ٢٧)

অর্থঃ, ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বের হলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি আমার জন্য তিনটি পাথর বা টিলা তালাশ করে নিয়ে আস। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁর নিকট দুটি পাথর এবং গোবরের একটি শুষ্ক টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি পাথর বা টিলা দুটি গ্রহণ করে শুষ্ক গোবর টুকরাটি ফেলে দিলেন এবং বললেন এটি নাপাক।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি তিন সংখ্যা ওয়াজিব হত, তাহলে তিনি (সাঃ) আরো একটি পাথর আনার নির্দেশ দিতেন।

যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ যদি পানি দ্বারা ইস্তিজ্জা করা হয়, আর মলদ্বার এক-দু'বার ধৌত করার দ্বারা যদি নাপাক ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়, তাহলে তিন বার ধৌত করা কারো মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং পাথর বা টিলার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হওয়া উচিত। কারণ উভয়টির উদ্দেশ্য এক। (درس مشکوٰه ج ١ ص ١٥١)

আহনাফদের পক্ষ হতে শাফেঈ ও হাম্বলীদের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবঃ

(১) যত রেওয়ায়েতে তিনটি পাথরের কথা উল্লেখ রয়েছে তা স্বভাব বা রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা, সাধারণত তিনটি পাথর বা টিলার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যথেষ্ট হয়ে যায়। (২) তিনটি পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুস্তাহাব বুঝানো। ওয়াজিব বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। (৩) হাদীসে যে তিনটি পাথরের সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে তা শর্ত হিসেবে নয়, বরং সতর্কতার জন্য। (৪) তিনটি পাথর বা টিলা হতেই হবে (ওয়াজিব) এই হাদীসটির বাহ্যিক অর্থের উপর তো শাফেঈগণও আমল করে না। কেননা, কেউ যদি একটি বড় পাথরের তিন কোণার দ্বারা তিন বার মাসেহ করে নেয়, তাহলে তাঁদের (শাফেঈ) নিকটও পবিত্রতা অর্জিত হবে। সুতরাং এতে বুঝা গেল যে, আসল উদ্দেশ্য তাঁদেরও তিন পাথর নয়, বরং তিন বার মাসেহ করা। উল্লেখ্য যে, পাথর বা টিলা দ্বারা ইস্তিজ্জা করা তখনই যথেষ্ট হবে, যখন নাপাকী বের হওয়ার স্থান থেকে এক দিরহামের অধিক ছড়িয়ে না পড়ে। অন্যথায় পানি দ্বারা শৌচকর্ম করা আবশ্যিক হবে। (درس ترمذي ج ١ ص ٢١٠)

নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে যেহেতু শুকনা জাতীয় খাবার খাওয়া হত, তখন তাঁদের মলও ছিল শুকনা, ফলে পায়খানা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ত না। যেমন, ছাগল বা ঘোড়ার মল। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যেহেতু তৈলাক্ত খাবারে অভ্যস্ত এবং পায়খানা শুকনা না হওয়ার কারণে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সীমিত সংখ্যক পাথর বা কুলুখ যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাই পানি ব্যবহার করাটাই সমীচীন। (درس مشكوة ج ١ ص ١٥٧)

بابُ السَّوَاكِ : মিসওয়াক করা



... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَوْلَا أَنِ اشْتَقُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمَرَّتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - (بخاري ج ١ ص ١٢٢ السواك يوم الجمعة، مسلم ج ١ ص ١٢٨ باب السواك، ترمذي ج ١ ص ١٢ باب في السواك، نسائي ج ١ ص ٦ الرخصة في السواك الخ، ابن ماجه ص ٢٥)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে এশার নামায বিলম্বে (রাত্রির এক-তৃতীয়াংশের পর) পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবেঃ

(ক) মিসওয়াকের শরঈ মর্যাদা।

(খ) মিসওয়াক কি নামাযের সুন্নত নাকি অযুর সুন্নত?

প্রথম আলোচনাঃ মিসওয়াকের শরঈ মর্যাদা সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম ইসহাক ও দাউদ যাহেরী (রহ.) থেকে দুটি মত বর্ণিত আছে। একটি হল, মিসওয়াক করা সুন্নত। অপরটি হল ওয়াজিব।

দলীলঃ “আল জামিউস্ সগীর” গ্রন্থে রাফে ইবন খাদীজ (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত- **السَّوَاكِ وَاجِبٌ وَغَسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**, মিসওয়াক করা এবং জুমুআর গোসল করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

* জমহুরের মতে, মিসওয়াক করা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। আল্লামা নববী (রহ.) মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে উস্মতের ইজমা (একমত) রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক নামাযে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়ার কেবল ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা বাস্তবে নির্দেশ দেননি।

জবাবঃ (১) উল্লিখিত ইমামদ্বয়েরও প্রসিদ্ধ মত হল, মিসওয়াক সুন্নত।

(২) ইজমার পরিপন্থী মাত্র দুই মনীযীর মিসওয়াক ওয়াজিব হওয়ার উক্তি তেমন কিছু আসে যায় না। (درس ترمذي ج ۱ ص ۲۲۲-۲۲۳)

(৩) হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) “তালখীসুল হাবীর” গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর লিখেন- **اِسْنَادُ وَاهٍ** অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। অতএব, এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ মিসওয়াক নামাযের সুন্নত নাকি অযুর সুন্নত, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, মিসওয়াক নামাযের সুন্নত, অযুর সুন্নত নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে **عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ** বলে প্রত্যেক নামাযের কথা বলা হয়েছে, প্রত্যেক অযুর কথা বলা হয়নি।

* আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মিসওয়াক অযুর সুন্নত, নামাযের সুন্নত নয়।

বক্তৃত উল্লিখিত মতানৈক্যের তাৎপর্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অযু এবং মিসওয়াক করে এক ওয়াক্তের নামায আদায় করে, অতঃপর ঐ অযু দ্বারা অন্য নামায পড়তে চায় তাহলে ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মতে, নতুনভাবে মিসওয়াক করা মাসনূন হবে। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, যেহেতু ইহা অযুর সুন্নত, এজন্য দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করার প্রয়োজন হবে না।

দলীল (১)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَوْلَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ (مسندك حاكم ج ۱ ص ۱৬৭)

অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের উপর অযুর সাথে মিসওয়াক করাকে আবশ্যক করে দিতাম।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَوْلَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمُ بِالسَّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (الار السنن ص ২৭)

অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের ক্ষেত্রে অযুর সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

দলীল (৩)ঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফু হাদীস-

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (مجمع الزوائد ج ١ ص ٢٢١)

দলীল (৪): আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ (ابن ماجه)

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মিসওয়াক অযুর সুন্নত, নামাযের সুন্নত নয়।

আকলী (বুদ্ধিভিত্তিক) দলীলঃ মিসওয়াক পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম, এর সম্পর্ক পবিত্রতার (অযু) সাথে, নামাযের সাথে নয়। যেমন হযরত আয়িশা (রাঃ)- এর সনদে বর্ণিত আছে-

الترغيب في السواك، بخاري ج ١ ص ٢٥٩ باب السواك الرطب الخ

অর্থাৎ, মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার উপকরণ এবং প্রভুর সন্তুষ্টির কারণ। আর তাই দেখা যায়, মিসওয়াকের অনুচ্ছেদটি পবিত্রতার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, নামাযের অধ্যায়ে নয়।

জবাবঃ শাফেঈদের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(১) এখানে একটি مُضَاف (সম্বন্ধকৃত বিশেষ্য) উহ্য আছে। আর তা হল وُضُوء অর্থাৎ

মূল বাক্যটি হবে এরূপ- عند وُضُوءِ كُلِّ صَلَوةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের অযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নত। যা হানাফীদের দলীলসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট।

(২) নামাযযুক্ত রেওয়ায়েতগুলোতে প্রত্যেকটি স্থানে عند (নিকটে, কাছে) শব্দ এসেছে, যা প্রকৃত মিলন বুঝায় না, বরং মিসওয়াক এবং সালাতের মাঝে যদি কিছু দেরিও হয়, তবুও তার ক্ষেত্রে عند كُلِّ صَلَوةٍ প্রয়োগ হতে পারে, এর পরিপন্থী

হানাফীদের রেওয়ায়েতগুলোতে কোন কোন স্থানে مع (সঙ্গে, সাথে) শব্দ বর্ণিত হয়েছে। যা প্রকৃত মিলন বুঝায়। আর এটি অযুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

(৩) রেওয়ায়েতগুলো দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে দাঁড়ানোর পূর্বক্ষেণে মিসওয়াক করতেন।

(৪) যদি নামাযের সময় মিসওয়াক সুন্নত হয়, তবে কোন কোন সময় কারো দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা হানাফীদের মতে অযু ভঙ্গের কারণ। শাফেঈদের মতেও অপছন্দনীয়। যা নামাযের একাগ্রতা বিনষ্টকারী। সুতরাং এসব কারণে মিসওয়াকের যথার্থ স্থান অযুই মনে হয়। (درس ترمذي ج ١ ص ٢٢٣-٢٢٤)

৭. بَابُ فَرَضِ الْوُضُوءِ : অযু ফরয হওয়া

... عَنْ أَبِي الْمَلِیح عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَوةٍ بِغَيْرِ طَهُورٍ - (بخاري ج ۱ ص ۲۵ باب لا تقبل صلوة بغير طهور، مسلم ج ۱ ص ۱۱۹ باب وجوب الطهارة للصلوة، ترمذي ج ۱ ص ۳ لا تقبل صلوة بغير طهور، نسائي ج ۱ ص ۳۳ باب فرض الوضوء، ابن ماجة ص ۲۴)

অনুবাদঃ ... আবুল মালীহ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা অসদুপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদে সদকা করলে কবুল করেন না এবং পবিত্রতা (অযু) ব্যতীত কোন নামায কবুল করেন না।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে অযু ব্যতীত নামায কবুল হবে না। একথা তো সর্বজনবিদিত যে, কোন নামাযই অযু ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। কিন্তু জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত অযু ব্যতীত শুদ্ধ হবে কিনা- এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাবী, মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী এবং ইবন উলাইয়্যার মতে, জানাযার নামায অযু ব্যতীত পড়া জায়েয আছে। এমনিভাবে উল্লিখিত ইমামগণসহ ইমাম বুখারীর মতে, সিজদায়ে তিলাওয়াতও অযুবিহীন জায়েয আছে। (تنظيم ج ۱ ص ۱۱৮)

দলীল (১)ঃ হাদীসে সাধারণভাবে (مطلقاً) নামাযের কথা বলা হয়েছে। নামায সাধারণ হওয়ার বিষয়টি কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। আর জানাযার নামায ও সিজদায়ে তিলাওয়াত হল অপূর্ণাঙ্গ। কেননা, জানাযাতে রুকু-সিজদা নেই এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতেও রুকু নেই।

দলীল (২)ঃ তাছাড়া বুখারীতে ইবন উমর (রাঃ)-এর আমল বর্ণিত আছে-
كَانَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ - অর্থাৎ, তিনি অযুবিহীন সিজদা (তিলাওয়াত) করতেন।

* চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, আহমদ), সাহাবা, তাবেঈন ও জমহুরের মতে, নামায চাই ফরয হোক কিংবা নফল, জানাযার নামায হোক বা সিজদায়ে তিলাওয়াত হোক, অযু ছাড়া জায়েয নয়। (تنظيم ج ১ ص ১১৮)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে صَلَوة (যেকোন নামায) শব্দটি نَكْرَةً (অনির্দিষ্ট) যা نَفْيِي (না-সূচক অব্যয়)-এর পরে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী অনির্দিষ্ট কোন শব্দ যখন না-সূচক অব্যয়ের পরে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সামগ্রিকতা (عُموم)-এর অর্থ জ্ঞাপন করে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসে বর্ণিত সালাতের অর্থ হবে যেকোন নামায, হোক জানাযার নামায কিংবা সিজদায়ে তিলাওয়াত। কারণ সিজদায়ে তিলাওয়াতও এক ধরনের নামায। যেমন পবিত্র কুরআনে সিজদা বলে পূর্ণ নামায বুঝানো হয়েছে- وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ অর্থাৎ, আপনি রাতে সিজদা করুন ও দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (দাহরঃ ২৬)

আর জানাযাও যে এক প্রকার নামায, তার সমর্থন পাওয়া যায় নবী করীম (সাঃ)-এর বাণীতে- صَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ النَّجَّاشِيِّ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর (জানাযার) নামায পড়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ প্রকৃতপক্ষে বুখারী শরীফে বর্ণিত বাক্যাংশটি বিতর্কের উদ্য নয়। কেননা, উসাইলীর কপিতে এর বিপরীত উল্লেখ আছে- كَانَ يَسْجُدُ عَلَى وَضُوءٍ আর নিয়ম হল, যখন একই রেওয়ায়েত পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উভয়টি পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য হবে (إذا تعارضا تساقطتا)।

(درس مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۳۲، درس ترمذي ج ۱ ص ۱۵০-১০৬)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ فَاقْدُ الطُّهُورَيْنِ অর্থাৎ যার নিকট অযুর জন্য পানি কিংবা তায়াম্মুমের জন্য মাটি কোনটিই নেই, এমন ব্যক্তি কি করবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে বেশ মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত হল, এরূপ ব্যক্তি থেকে নামায রহিত (سَاقِط) হবে। অর্থাৎ তার জন্য তখন নামায পড়া জরুরী নয় এবং পরে কাযাও করতে হবে না।

* আল্লামা মুযানী, ইবনুল মুনিযির ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হল, এমতাবস্থায় নামায আদায় করে নেয়া ওয়াজিব, পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর বিশুদ্ধতম মত হল, এমতাবস্থায় নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং পরে কাযা করাও ওয়াজিব। এছাড়াও তাঁর থেকে আরো তিনটি মত পাওয়া যায়ঃ

(ক) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অনুরূপ, (খ) তখন নামায পড়া হারাম। পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব। আওয়াঈ এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (গ) এমতাবহায মুত্তাহাব হিসেবে নামায পড়ে নিবে এবং পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ঠিক ঐ সময়ে নামায পড়বে না; বরং নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত পানি বা মাটির জন্য অপেক্ষা করবে। এরপরও যদি পানি বা মাটি না পায়, তাহলে সে নামায পড়বে না, বরং পরবর্তীতে তা কাযা করা ওয়াজিব। (بذل المجهود ج ١ ص ٣٨)

* সাহেবাইন (আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে, এমন ব্যক্তি শুধুমাত্র নামাযের ভান করবে, কিন্তু কোন কিছু পাঠ করবে না। তবে পরবর্তীতে তার উপর কাযা আবশ্যিক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এরও এই মতের দিকে প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত আছে। আর হানাফীদের এর উপরই ফাতওয়া। এ উক্তিটি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং শরীয়তে এর নযীরও পাওয়া যায়। যেমন কোন শিশু যদি রমযানের দিনে বালেগ হয় অথবা কোন কাফির মুসলমান হয় অথবা কোন ঋতুবতী মহিলা পবিত্রতা লাভ করে, তবে তাদেরকে রোযাদারদের অনুকরণে অবশিষ্ট দিন খানা-পিনা, সহবাস থেকে বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে কাযা করে নিবে। (فتح الملهم ج ٢ ص ٢٨٧)

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ فَاتِمُوا بِقِيَّةِ يَوْمِكُمْ وَأَقْضُوهُ— (ابو داود ج ١ ص ٣٣٢ باب في فضل صومه)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন মাসলামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এ দিন রোযা রেখেছ? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, তোমরা বাকি দিন আর কিছু না খেয়ে রোযা কর এবং পরে এ দিনের রোযার কাযা আদায় করবে।

উক্ত হাদীসটিতে অনুকরণের হুকুম দেয়া হয়েছে।

٩ ص : بَابُ مَا يُنَجَّسُ الْمَاءُ يا দ্বারা পানি অপবিত্র হয়

... عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَتَوْبَهُ مِنَ الذُّوَابِ وَالسَّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ

الْخَبِيثَ— (ترمذي ج ١ ص ٢١ باب ان الماء لا ينجسه شيء، نسائي ج ١ ص ٦٣ باب التوقيت في الماء، ابن ماجة ص ٤٠)

অনুবাদঃ ... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যে পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য পুনঃপুনঃ আগমন করে এবং তা যথেষ্ট ব্যবহার করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেন, যখন উক্ত পানি, দুই কুল্লা (মটকা) পরিমাণ হয়, তখন নাপাক হয় না।

বিশ্লেষণঃ পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, দাউদ যাহেরী ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিনটি গুণ (রং, গন্ধ, স্বাদ) থেকে কোন একটি গুণ পরিবর্তিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে নাপাক পতিত হলেও অপবিত্র হবে না। পানির পরিমাণ কম হোক অথবা বেশি হোক।

দলীলঃ ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَوَضُّا مِنْ بَيْرٍ بَضَاعَةٍ وَهِيَ يَبِزُّ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَاللَّنَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ— (ابو داود ج ١ ص ٩ باب

في بئر بضاعة، ترمذي ج ١ ص ٢١، نسائي ج ١ ص ٦٢ باب ذكر بئر بضاعة)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা কি বুদাআ কূপের পানি দ্বারা অযু করতে পারি? কূপটি এমন ছিল যেখানে স্ত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া, কুকুরের গোশত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, পানি পবিত্র, তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি ছোট কূপে এতকিছু নাপাক জিনিস নিক্ষেপের পরেও নবী করীম (সাঃ) শর্তহীনভাবে পানিকে পাক বলেছেন। অতএব, পানির পরিমাণ কম হোক অথবা বেশি হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।

* আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, মুজাহিদ (রহ.) ও ইবন উমর (রাঃ)-এর মতে, যদি পানির পরিমাণ কম হয়, তাহলে নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। যদিও এর একটি গুণও পরিবর্তিত না হয়। আর যদি পানি বেশি হয়, তবে নাপাক হবে না, যতক্ষণ না এর অধিকাংশ গুণ পরিবর্তিত হয়। মোটকথা,

হানাতী ও শাফেঈদের মতে, পানি পাক ও নাপাক হওয়া পানি কম ও বেশি হওয়ার উপর নির্ভর করবে। (بذل المجهود ج ১ ص ১৩)

উল্লেখ্য যে, তাঁদের মতে, কম পানি ও বেশি পানির পরিমাণ কতটুকু, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, পানি যদি দু' কুল্লা (মটকা) বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে বেশি পানি বলা হবে, আর এর চেয়ে কম হলে একে কম পানি বলা হবে।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কম ও বেশি পানির সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। তাঁর মতে, এ বিষয়টি অভিজ্ঞ বা যাচাইকারী ব্যক্তির মতের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি যদি পানি দেখে বলেন, ইহা কম তাহলে কম এবং বেশি বললে বেশি পানি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

তবে, কেউ কেউ বেশি পানির পরিমাণ বুঝাতে গিয়ে বলেন-

* ইমাম কুদুরী (রহ.)-এর মতে, পানির এক পার্শ্ব নাড়া দিলে যদি অন্য পার্শ্ব না নড়ে, তাহলে বুঝতে হবে ইহা বেশি পানি।

* ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যে পানিতে নাপাকীর ছাপ অন্যদিকে না পৌঁছে, তাই বেশি পানি।

* আবার কেউ কেউ বলেন, পানিতে রং দিলে, তা যদি সমস্ত পানিতে বিস্তার লাভ না করে, তবে তা বেশি পানি।

* পরবর্তীতে কোন কোন ফুকাহায়ে কিরাম সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে আবু সুলাইমান (রহ.) কর্তৃক (ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মসজিদের উপর কিয়াস করে) প্রদত্ত হিসেব গ্রহণ করে বলেন, যে জলাশয় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে দশ হাত দশ হাত (১০x১০=১০০ বর্গহাত), তাই অধিক পানি। (لمعات التنقيح ج ২ ص ১৩৭)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীলসমূহঃ

✓ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ - (ابو داود ج ১ ص ১০ باب البول في الماء الراكد، بخاري ج ১ ص ৩৭ باب

البول في الماء الدائم، مسلم ج ১ ص ১৩৮ باب النهي عن البول في الماء الراكد، ترمذي ج ১ ص ২১ باب

كراهية البول في الماء الراكد، نسائي ج ১ ص ২১ باب الماء الدائم)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন এমন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যার দ্বারা সে গোসল করবে।

দলীল (২): হয়রত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَ

سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَهُنَّ بِالتَّرَابِ- (আবু দাউদ জ ১০ বَاب الوضوء، بسور الكلب، بخاري ج ১ ص ২৭)

إذا شرب الكلب في الإناء، مسلم ج ১ ص ১৩৭ بَاب حَكْمَ وَلُغِ الْكَلْبِ، ترمذي ج ১ ص ২৭ بَاب سِوَر

الكلب، نسائي ج ১ ص ২২ سِوَر الْكَلْبِ، ابن ماجة ص ৩০)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম হল, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ (৩) দলীল

أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ يَدُهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ

لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ- (ترمذي ج ১ ص ১৩ বَاب إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ الْخَ، بخاري ج ১ ص ২৮ বَاب

الاستجمار وترا، مسلم ج ১ ص ১৩৬ بَاب كِرَاهِيَةِ غَسْلِ الْمَتَوَضِئِ الْخَ، نسائي ج ১ ص ৪)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন যেন সে হাত দু'বার অথবা তিনবার না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করে। কারণ রাতে তার হাত কোথায় ছিল, সে তা জানে না।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে পানির তিনটি গুণের মধ্যে কোন একটির পরিবর্তন হওয়ার শর্ত উল্লেখ নেই কিংবা দুই কুল্লার (মটকা) শর্তারোপও করা হয়নি।

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ (১) এ হাদীসের নিঃশর্ততা ও ব্যাপকতার উপর স্বয়ং ইমাম মালিক (রহ.)ও আমল করেন না। কারণ, এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায়, যদি পানির গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে যায় তবুও পবিত্র থাকবে, নাপাক হবে না। অথচ ইমাম মালিক (রহ.) এর প্রবক্তা নন। বরং তাঁর নিকট পানির পবিত্রতার জন্য তার তিনটি গুণই অপরিবর্তিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) বুদাআ কূপের বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন-

لَمْ ذَرَعَتْهُ فَإِذَا عَرَضَهَا سِنَّهُ أَدْرَعُ- (আবু দাউদ জ ১০ ص ৭৯)

অর্থাৎ, অতঃপর আমি কূপটি মেপে দেখি যে, এর প্রস্থ ছয় হাত পরিমাণ।

উক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, তাতে পানি সর্বনিম্ন হাঁটু আর সর্বোচ্চ নাভি পর্যন্ত থাকত। অতঃপর এটা কিভাবে সম্ভব যে, তাতে হয়েয়ের কাপড় এবং মৃত

কুকুরের গোশত নিষ্ক্ষেপ করা হবে, অথচ এ পানির তিনটি গুণ অপরিবর্তিত থাকবে? অতএব, যদি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করতে হয়, তাহলে পানির গুণ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র বলা উচিত। অথচ স্বয়ং ইমাম মালিকও এর প্রবক্তা নন।

(৩) আবু নহর বাগদাদী (রহ.) বলেন, বুদাআ কূপ থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি উঠানো হত। ফলে সকল নাপাকী তা থেকে দূর হয়ে যেত। সাহাবাগণের সেখান থেকে নাপাকী উত্তোলনের পরও সংশয় হলে নবী করীম (সাঃ) উক্তিটি করেছিলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, পানিতে নাপাকী পড়লেও তা নাপাক হবে না।

(تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٧٧)

(৪) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, বুদাআ কূপের পানি ছিল প্রবহমান। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, এর পানি দ্বারা বাগানগুলোতে সেচ দেয়া হত।

(تلخيص الحبير ج ١ ص ١٤)

(৫) আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, الْماءُ শব্দটিতে ব্যবহৃত عهد টি الف لام বা সুনির্দিষ্ট বস্তু বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দেশ্য বুদাআ কূপের পানি। আর لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ-এর অর্থ হল, তোমাদের সন্দেহ-সংশয় কোন কিছু এটাকে নাপাক করে না। কেননা, জাহেলী যুগে এতে বিভিন্ন রকমের নাপাক ময়লা ফেললেও ইসলামের পর এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এরপরও সন্দেহ হচ্ছিল যে, ইহা আসলে পাক কিনা। ফলে নবী করীম (সাঃ) উক্তিটি করেছিলেন।

(৬) কেউ কেউ বলেন, হাদীসটির সনদে ইযতিরাব (গরমিল) রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত কুল্লাতাইন (দুই মটকা) হাদীসের জবাবঃ (১) ‘হিদায়া’ গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন (রহ.) এর জবাবে বলেন, হাদীসে বর্ণিত لَمْ يَحْمِلْ-এর অর্থ শাফেঈগণ যা গ্রহণ করেছে তা নয়; বরং এর অর্থ হল- দুই কুল্লা পানি ইহা নাপাকীকে ধারণ করতে অক্ষম অর্থাৎ অপবিত্র হয়ে যায়। (২) এই হাদীসটি দুর্বল (যঈফ)। কেননা, এ হাদীসের সনদ মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের উপর নির্ভর। আর তিনি হলেন যঈফ (দুর্বল) রাবী। সুতরাং ইহা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) হাদীসটির সনদ, মতন, অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ গরমিল ও অসঙ্গতি (اضطراب) রয়েছে।

সনদের গরমিলঃ কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে-

عن محمد بن جعفر بن الزبير - রেওয়ায়েতে- عن الزهري عن سالم عن ابن عمر

আবার কোন রেওয়ায়েতে- عن محمد بن عباد بن جعفر - ইত্যাদি অবস্থায় বর্ণিত আছে।
তাছাড়া আবু দাউদ (রহ.)-এর মতে হাদীসটি মাওকুফ এবং তিরমিযী (রহ.)-এর
মতে হাদীসটি মারফু।

মতনের (মূল পাঠ) গরমিলঃ এক রেওয়ায়েতে এসেছে اِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ আবার
কোনটিতে اِذَا كَانَ الْمَاءُ اَرْبَعَيْنِ قَلَةً বর্ণিত হয়েছে।

অর্থের গরমিলঃ কামুস গ্রন্থকারের মতে, কুল্লার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন-
পাহাড়ের চূড়া, মানুষের কাঠামো, মটকা ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য বা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গরমিলঃ আল্লামা ইবন নুজাইম (রহ.) বলেন, যদি
কুল্লাহর অর্থ মটকা মেনে নেয়া হয়, যা ইমাম শাফেঈ (রহ.) গণ্য করেছেন; তবুও প্রশ্ন
জাগে যে, মটকা কত বড় হবে? যেহেতু হাদীসে এটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

অনেকে অবশ্য এসব গরমিলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানেরও প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
তথাপি হাদীসে ব্যবহৃত কুল্লার সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কি, তা অভিধান, কোন
বর্ণনা বা অন্য কোনভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কাজেই এমন একটি অস্পষ্ট
অর্থবোধক শব্দের হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব এবং ইজমার
পরিপন্থী। (لمعات التلويح ج ٢ ص ١٣٧)

بَابُ الْوُضُوءِ بِسُورِ الْكَلْبِ ص ١٠

কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ

فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهُنَّ بِالتَّرَابِ - (بخاري ج ١ ص ٢٩ اِذَا شَرَبَ الْكَلْبُ

فِي الْإِنَاءِ، مسلم ج ١ ص ١٣٧ باب حكم ولغ الكلب، ترمذي ج ١ ص ٢٧ باب سور الكلب، نسائي ج ١

ص ٢٢ سور الكلب، ابن ماجه ص ٣٠)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা
করেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে লেহন করে
(খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি দ্বারা
ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করবে।

বিশ্লেষণঃ এই অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-

- (১) কুকুরের ঝুটা পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে।
- (২) কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনাঃ কুকুরের ঝুটা পবিত্র না অপবিত্র, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও বুখারী (রহ.)-এর মতে, কুকুরের গোশত পাক। সুতরাং এর ঝুটাও পাক।
দলীল (১)ঃ আল্লামা তাআলার বাণী-

إِلَّا أَنْ يُكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا-

অর্থাৎ, কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস- এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ। (আনআমঃ ১৪৫, বাকারাঃ ১৭৩, মায়দাঃ ৩, নাহলঃ ১১৫)

উক্ত আয়াতে হারাম বস্তুর তালিকার মধ্যে কুকুরের উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, এর ঝুটা পাক।

দলীল (২)ঃ অর্থাৎ, যে শিকারী জন্তু শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তোমরা তা ভক্ষণ কর। (মায়দাঃ ৪)

উক্ত আয়াতেও আল্লাহ তাআলা শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ দাঁত দিয়ে শিকার করার কারণে গোশতে অবশ্যই লাল লাগেছে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা পাক।

দলীল (৩)ঃ ইবন উমর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, মসজিদে নববীর ভিতর দিয়ে কুকুর আসা-যাওয়া করত, কিন্তু তাতে পানি ঢালা হত না। অথচ কুকুরের স্বভাব হল যদিকেই যাবে লাল পড়তে থাকে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা পাক। (بخاري ج ١ ص ٢٩)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, কুকুরের গোশত নাপাক এবং এর ঝুটাও নাপাক। (شرح مسلم ج ١ ص ١٣٧)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ-

অর্থাৎ, তাদের জন্যে তিনি যাবতীয় খবীছ (অপবিত্র) বস্তু হারাম করেন। (আরাফঃ ১৫৭)
আর কুকুরও খবীছ বা অপবিত্র। অতএব, এর ঝুটা নাপাক এবং এর গোশতও নাপাক।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে সাত বার পানি দিয়ে ধোয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে পবিত্র করার জন্য। আর পবিত্র করতে হয় নাপাক জিনিসকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের ঝুটা নিঃসন্দেহে নাপাক।

দলীল (৩): এছাড়া মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কুকুরের লেহনকৃত খাদ্য যেন ফেলে দেয়া হয়। অথচ কোন বস্তু অযথা নষ্ট করা হারাম। সুতরাং যদি নাপাকই না হত তাহলে ফেলে দেয়ার হুকুম দেয়া হত না। (১৩৭.ص ۱ج مسلم)

জবাব: প্রথম দলীলের জবাব: পবিত্র কুরআনে কুকুর বা অন্য কোন জন্তু ও বস্তু উল্লেখ না থাকা ইহা হালার হওয়ার দলীল হতে পারে না। কেননা, এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা হাদীসের দ্বারা হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই। এমন অনেক পশু-পাখি রয়েছে যেগুলোকে স্বয়ং ইমাম মালিক (রহ.)ও হারাম বলে থাকেন, যা কুরআনে উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব: আয়াতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পশুকে (কিছু শর্তসাপেক্ষে) যবেহ করা ব্যতীত তা ভক্ষণ করা হালাল। কিন্তু তা কোন পদ্ধতিতে খাবে, তা তো অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয় দলীলের জবাব: একথা সর্বজনবিদিত যে, ধোয়া ব্যতীতও কোন কোন জিনিস পাক করা সম্ভব। যেমন, বীর্য যদি খুব গাঢ় হয় এবং তা যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়, এমতাবস্থায় খুঁটিয়ে উঠানোর দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যাবে। ধোয়ার প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে মাটিতে কোন নাপাক লাগলে তা শুকিয়ে গেলে এবং চুষে নিলে পাক হয়ে যায়। (۱۹۰-۱۸۹.ص ۱ج مشکوٰۃ)

দ্বিতীয় আলোচনা: কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে। কুকুরের ঝুটা পবিত্র করার জন্য পাত্র কয়বার ধোয়া ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে: * ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তবে আহমদ (রহ.) অষ্টমবার মাটি দিয়ে ধোয়ার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কুকুরের ঝুটা যেহেতু অপবিত্র নয়, সুতরাং তিনিও সওয়াবের জন্য (امر تعبدی) এবং চিকিৎসা হিসেবে সাতবার ধোয়ার প্রবক্তা। (تنظیم ۱ج ۱۸۸.ص)

দলীল: অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে সাতবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, কুকুরের ঝুটা অন্যান্য নাপাকের ন্যায় তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। (شرح مسلم ۱ج ۱۳۷.ص)

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ (১) দলীল

الْكَلْبُ فِي إِنْاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (عمدة القاري ج ١ ص ٨٧٤،

معارف السنن ج ١ ص ٢٢٥، نصب الرأية ج ١ ص ١٣١، دار قطني ج ١ ص ٢٤)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, তখন যেন সে তা ফেলে দেয় এবং এই পাত্র অবশ্যই তিনবার ধৌত করে।

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ يَغْسَلُ الْإِنْاءَ الَّذِي يَلْعُغُ فِيهِ (২) الدَّلِيلُ

الْكَلْبُ؟ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ سَمِعْتُ سَبْعًا وَخَمْسًا وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (مصنف عبد الرزاق ج ١

৯৮, ১৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০)

অর্থাৎ, ইবন জুরায়জ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে ইহা কয়বার ধুতে হবে? উত্তরে তিনি বলেন, সাতবার, পাঁচবার এবং তিনবার সবকটিই আমি শুনেছি।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আতা (রহ.) সাতবারের হাদীসেরও রাবী। যদি সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য হত তাহলে তিনি কখনো এর বিপরীত অনুমতি দিতেন না।

আকলী দলীলঃ যেখানে কুকুরের কিংবা শুকরের পায়খানা-প্রশ্রাবের দ্বারা নাপাক হলে সেই নাপাকী তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কুকুরের লালাতো নিঃসন্দেহে তার কিংবা শুকরের মল-মূত্র থেকে অনেকখানি হালকা। সুতরাং ঝুটোর ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে, এটাই যুক্তিযুক্ত।

জবাবঃ (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সাতবার ধোয়ার হাদীস বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে তিনবার ধোয়ার হাদীস বর্ণিত হওয়ার দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, সাতবারের হুকুম ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়। (২) তিনবার ধৌত করার হাদীস ওয়াজিব, আর সাতবার ধৌত করার হাদীস মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য করা হবে। অতএব, উভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। (৩) ইবন রুশদ বলেন, সাতবার ধৌত করার হুকুম চিকিৎসা হিসেবে দেয়া হয়েছে, নাপাকীর কারণে নয়। কেননা কুকুরের লালায় এক প্রকার বিষ থাকে, যা কেবল সাতবার ধৌত করা এবং মাটি দ্বারা ঘর্ষণের ফলেই দূরীভূত হয়। (৪) ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাতবারের হুকুম ছিল, অতঃপর তিনবার ওয়াজিব করা হয়। আর সাতবার ধোয়া মুস্তাহাব থেকে যাবে। (৫) সাতবারের হাদীসগুলোতে অনেক গরমিল রয়েছে। যেমন, অনুচ্ছেদের শুরুর হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষবে। ইবন মুগাফ্ফাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে- (ابو داود ج ١ ص ١٠) অর্থাৎ, অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ কর।

কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে- (ترمذي ج ١ ص ٢٧) - **أُولَٰهُنَّ وَأَخْرَهُنَّ بِالتَّرَابِ**

অর্থাৎ, প্রথমবার ও শেষ বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ কর।

আর কোন রেওয়ায়েতে আছে- (دار قطني ج ١ ص ٢٤) - **السَّابِغَةَ بِالتَّرَابِ** তথা সপ্তমবার মাটি দিয়ে মাজ। অতএব, সাতবার ধৌত করা যদি ওয়াজিব ধরা হয়, তাহলে অসঙ্গতিপূর্ণ রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। কিন্তু সাতবার ধৌত করা যদি মুস্তাহাব ধরে নেয়া হয়, তাহলে কোন অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে না; বরং প্রতিটি পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব।

(درس مشکوٰۃ ج ١ ص ١٩٠-١٩١، تلخیص ج ١ ص ١٨٨-١٩٠، درس ترمذي ج ١ ص ٣٢٢-٣٢٣)

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট : **بَابُ سُورِ الْهَرَّةِ** ص ১০

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَيْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَ مِنْهُ فَاصْنَعِي لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَيْتُ إِيَّاهُ فَقَالَ اتَّعَجِبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِقِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافِقَاتِ- (ترمذي ج ١ ص ٢٧ باب سُورِ الْهَرَّةِ، نسائي ج ١ ص ٢٣ سورِ الْهَرَّةِ، ابن ماجه ص ٣١)

অনুবাদঃ কাবশা বিনত কাব ইবন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)-এর পুত্রবধু ছিলেন। একদা হযরত আবু কাতাদা রাঃ (গৃহে) আগমন করলে আমি (কাবশা) তাঁকে অয়ুর পানি দিলাম। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এসে উক্ত পানি পান করল। (বিড়ালের পানি পান করার সুবিধার্থে) হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। হযরত কাবশা (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে এর প্রতি তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী! তুমি কি অবাক হচ্ছ? জবাবে আমি (কাবশা) বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়। নিশ্চয়ই এরা তোমাদের আশেপাশে ঘুরাফেরাকারী ও তোমাদের সংশ্রবে আশ্রিত প্রাণী।

বিশ্লেষণঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বা ঝুটোর হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* তিন ইমাম (মালিক, শাফেঈ ও আহমদ), ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, বিড়ালের ঝুটা বিনা মাকরুহ পবিত্র।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيَسْتَبْجَسُ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ - وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا -

(আবু দাউদ ১৮৮১)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়, এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর আয়িশা (রাঃ) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অযু করতে দেখেছি। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নিঃসন্দেহে মাকরুহ ছাড়াই পাক। যেহেতু নবী এখানে মাকরুহ বা অপছন্দের কথা উল্লেখ করেননি।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, বিড়ালের ঝুটা পবিত্র, তবে মাকরুহ। অতঃপর ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, ইহা মাকরুহ তাহরীমী। আর ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে, মাকরুহ তানযীহী। অধিকাংশ হানাফী কারখী (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দিয়ে মাকরুহ তানযীহীর উপর ফাতওয়া দিয়েছেন।

(درس ترمذي ج ১ ص ৩২৬، درس مشکوٰۃ ج ১ ص ১৮৭)

দলীল (১): আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... وَإِذَا وَلَغَ الْهَرُّ غَسِلَ مَرَّةً - (আবু দাউদ ১৮৮১, তرمذي ج ১ ص ২৭ باب سؤر الكلب)

অর্থাৎ, ... যদি বিড়াল কোন পাত্র লেহন করে তবে তা একবার ধৌত করতে হবে।

দলীল (২): হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

يُغَسَّلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهَرِّ كَمَا يُغَسَّلُ مِنَ الْكَلْبِ - (طحاوي ج ১ ص ১১)

অর্থাৎ, বিড়াল মুখ দিলে পাত্র এরূপভাবেই ধুতে হবে, যেভাবে ধুতে হয় কুকুর মুখ দিলে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি অন্তত মাকরুহও না হত, তাহলে ধোয়ার হুকুম দিতেন না।

দলীল (৩): এরূপভাবে তাহাবী (রহ.) স্বীয় কিতাবে ইবন উমর (রাঃ)-এর আছারও বর্ণনা করেছেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَوَضُّؤًا مِنْ سُورِ الْحِمَارِ وَلَا الْكَلْبِ وَلَا السُّنُورِ—
(شرح معاني الآثار ج ١ ص ١١)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা গাধা, কুকুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দ্বারা অযু কর না।

উক্ত হাদীসটিও অন্তত মাকরুহ হওয়ার দাবী রাখে।

জবাবঃ (১) তিন ইমামের দলীল হিসেবে প্রদত্ত উভয় হাদীসে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিড়ালের ঝুটা মাকরুহ ছাড়াই যদি পবিত্র হত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করতেন **إِنَّهَا طَاهِرَةٌ** তথা বিড়ালের ঝুটা পবিত্র। এমনভাবে পেঁচিয়ে কথা বলার দরকার ছিল না— **إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ** এতে বুঝা যায় যে, বিড়ালের ঝুটা সত্তাগতভাবে তো নাপাকই, কিন্তু ইহা গৃহে অধিক বিচরণকারী বিধায় এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে ইহা পরিপূর্ণ পাকও নয়। এই কারণটি মাকরুহ তানযীহী হওয়ার প্রমাণ। যার প্রবক্তা হানাফীগণ।

(২) মাকরুহ তানযীহীও বৈধতার একটি অংশ। অতএব, তিন ইমামের দলীল বৈধতা বা জায়েয বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হানাফীদের রেওয়ায়েত মাকরুহ তানযীহীর উপর প্রযোজ্য। (بذل المجهود ج ١ ص ٤٩، تنظيم ج ١ ص ١٨٦)

১১ : بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ ص ১১

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ تَرَكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمَلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُّورُ مَائُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ— (ترمذي ج ١ ص ٢١ باب ماء البحر انه طهور، نسائي ج ١ ص ٢١ باب ماء البحر، ابن ماجه ص ٢٤١/٣٢)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাগরে সফর করে থাকি এবং আমাদের সাথে (পান করার) সামান্য (মিঠা) পানি রাখি। যদি আমরা তা দ্বারা অযু করি তবে পিপাসার্ত থাকব। এমতাবস্থায় আমরা সাগরের (লবণাক্ত) পানি দ্বারা অযু করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-

(১) সামুদ্রিক কোন্ কোন্ প্রাণী খাওয়া হারাম, আর কোন্ কোনটি হালাল। (২) পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছের হুকুম। (৩) চিংড়ি মাছ হালাল না হারাম?

তবে, এগুলো আলোচনার পূর্বে মূল হাদীসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় যে, (ক) সাগর হল বিশাল জলাধার। এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরাম কেন এমন প্রশ্ন করলেন যে, আমরা কি সাগরের পানি দ্বারা অযু করতে পারব? যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অহেতুক মনে হচ্ছে। (খ) পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ) এর উত্তরে প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী শুধু এতটুকু বাণীই তো যথেষ্ট ছিল যে, “সাগরের পানি পবিত্র”। কিন্তু তিনি একধাপ এগিয়ে কেন বললেন, “এর মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল।”

(ক) মুহাদ্দিসগণ এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়েছেন-

(১) সাধারণত পানির রয়েছে তিনটি গুণ- রং, গন্ধ ও স্বাদ। তাঁরা যখন সাগরের পানিতে সাধারণ মিঠা পানির বিপরীত রং ও স্বাদে পরিবর্তন দেখলেন, তখন তাঁদের সন্দেহ হল, এর দ্বারা অযু জায়েয কিনা। ফলে এমন প্রশ্ন করলেন।

(২) সমুদ্র হল অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থল। আর সেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার প্রাণী মারা যাচ্ছে। তাই তাঁদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হল যে, এই মৃত প্রাণীর দ্বারা সাগরের পানি নাপাক হবে কিনা।

(৩) চতুর্দিক থেকে সাগরের পানিতে সর্বদাই নাপাক পতিত হচ্ছে, তাই তাঁরা ভাবলেন, হয়ত সাগরের পানি পবিত্র নয়।

(৪) অথবা, সন্দেহের কারণ এই ছিল যে, নবী করীম (সাঃ) একদা ইরশাদ করেছিলেন, (ابو داود، باب في ركوب البحر والغزو ج ١ ص ٣٣٧) اِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا- অর্থাৎ সমুদ্রের নিচে রয়েছে অগ্নি। যা জাহান্নামের আলামত। তাই সাহাবাগণ এমন প্রশ্ন করেছিলেন।

(খ) (১) সাহাবাগণের সাগরে যেমন পানির প্রয়োজন হবে, তেমনিভাবে খাবারেরও প্রয়োজন দেখা দেবে। তাই রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাঃ) উষ্মতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে একধাপ এগিয়ে বললেন, সাগরের মৃত প্রাণী খাওয়াও হালাল।

(২) মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, যে সাহাবাগণ সাগরের পানি দিয়ে অযু করার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন, তাঁরা তো এটা ভেবেই নিয়েছিলেন যে, সাগরের মৃত মাছ হয়ত হালাল হবে না। যেহেতু কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী। (বাকারাঃ ১৭৩)

তাই তাঁদের এই ভুল থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি অতিরিক্ত উক্তিটি করেছিলেন।

(৩) সাহাবাগণ যাতে আবার ইহা না বুঝে বসেন যে, পানি হয়ত জরুরতবশত পাক, কিন্তু এর মৃত প্রাণী হয়ত নাপাক।

(৪) এই অতিরিক্ত বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হল, তাঁদের প্রশ্নের মূল কারণের অবসান ঘটানো। অর্থাৎ, যেখানে মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল, সেখানে তো সাগরের পানি দিয়ে অযু করা নিঃসন্দেহে জায়েয। (১৮৬-১৮৭ ص ১৮০، درس مشکوٰۃ ج ১ ص ১৮৬-১৮৭)

প্রথম আলোচনাঃ সামুদ্রিক কোন কোন প্রাণী খাওয়া হালাল, আর কোনটি হারাম- এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সামুদ্রিক শূকর ব্যতীত জলজ সকল প্রাণী খাওয়া হালাল।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে এ সম্পর্কে ৪টি মত পাওয়া যায়-

(ক) হানাফীদের মত (যা সামনে আসছে)

(খ) যেসব প্রাণী স্থলে হালাল, অনুরূপ জলভাগে বসবাসরত প্রাণীও হালাল। যেমন সামুদ্রিক গরু হালাল। আর যেসব প্রাণী স্থলে হারাম, অনুরূপ জলে বসবাসরত প্রাণীও ভক্ষণ করা হারাম। যেমন, সামুদ্রিক কুকুর, শূকর হারাম। আর যেসব প্রাণী জলে বাস করে, কিন্তু স্থলে এর নথীর নেই সেগুলোও হালাল।

(গ) ব্যাঙ, কুমির, কচ্ছপ, সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর এই পাঁচ প্রকার প্রাণী ব্যতীত অন্যসব প্রাণী খাওয়া হালাল। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অভিমতও তাই।

(ঘ) ব্যাঙ ছাড়া অন্য সব সামুদ্রিক প্রাণী হালাল।

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, এই সর্বশেষ উক্তিটির উপরই শাফেঈদের ফতওয়া।

(بذل المجهود ج ১ ص ৫৬)

তিন ইমামের দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-**الْبَحْرُ وَطَعَامُهُ**- অর্থাৎ,

তোমাদের জন্য সমুদ্রে প্রাপ্ত শিকার ও খাদ্য হালাল করা হয়েছে। (মায়দাহঃ ৯৬)

উক্ত আয়াতে **صيد** (শিকার) শব্দটি **مصيد** (শিকারকৃত প্রাণী) অর্থে **مفعول** (কর্মপদ)

হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর **اضافت** (সম্বন্ধপদ) ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অতএব, আয়াতের মর্মার্থ হল- সমুদ্রের সকল শিকারলব্ধ প্রাণী ভক্ষণ করা জায়েয। এখানে আমভাবে বলা হয়েছে। কোন কিছুকে খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসেও আমভাবে (ব্যাপকভাবে) সমস্ত মৃত প্রাণী খাওয়ার বৈধতার প্রমাণ মিলে। কেননা, হাদীসে কোন কিছুকে খাস করা হয়নি।

দলীল (৩): হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

... فَأُلْقِيَ لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ - (بخاري ج ٢)

ص ১২০-১২১ باب عزوة سيف البحر

অর্থাৎ, অতঃপর সমুদ্র আমাদের জন্য একটি প্রাণী নিক্ষেপ করল। যাকে আমরা বলা হয়। আমরা এটি থেকে অর্ধ মাস ভক্ষণ করেছি।

এই রেওয়ায়েতে دَابَّة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর মাছের জন্য কখনো دَابَّة শব্দ ব্যবহৃত হয় না। এতে বুঝা যায় যে, আমরা কোন মাছ ছিল না। অতএব মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও ভক্ষণ করা হালাল।

ইমাম মালিক (রহ.) নিম্নলিখিত আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেন-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ -

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত। (বাকরাঃ ১৭৩)

উল্লিখিত আয়াতে لحم الخنزير (শূকরের গোশত)-এর ব্যাপকতার কারণে সামুদ্রিক শূকরকেও খাওয়া হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) ব্যাঙ মারার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর কারণে ব্যাঙকে হালাল থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করেন। (درس ترمذي ج ١ ص ২৮০)

* ইমাম আবু হানিফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, পানিতে বসবাসরত প্রাণীদের মধ্যে মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়েয নেই।

(بذل المجهود ج ١ ص ৫৬، تنظيم ج ١ ص ১৮১)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ -

অর্থাৎ, তাদের জন্য তিনি যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। (আরাফঃ ১৫৭)

আল্লামা আইনী (রহ.) কুরআনের এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, الخبائث শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সেন্সব মাখলুক যেগুলোকে মানুষ স্বভাবতঃ ঘৃণা করে। মাছ ছাড়া সামুদ্রিক প্রাণী এরূপ, যেগুলোকে স্বভাবতঃ মানুষ ঘৃণা করে। অতএব, মাছ ছাড়া সামুদ্রিক অন্যান্য প্রাণী الخبائث-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী- (البقرة الآية ১৭৩) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ -

এতে বুঝা যায় যে, প্রতিটি মৃত জন্তু হারাম। হুলের হোক কিংবা জলের হোক। তবে শরঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত যেসব মৃত প্রাণী (মাছ) ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো আলাদা।

দলীল (৩): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدِمَانٌ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدِّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ— (ابن ماجه ص ২৬৬ باب الكبد والطحال)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাদের জন্য দুটি মৃত বস্তু এবং দুটি রক্তপিণ্ড হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি হল- মাছ ও পঙ্গপাল। আর দুটি রক্তপিণ্ড হল- কলিজা ও প্লীহা।

দলীল (৪): সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীল হল, নবী করীম (সাঃ)-এর সারা জীবনে তিনি এবং তৎপরবর্তী সাহাবায়ে কিরাম থেকে মাছ ছাড়া অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ প্রমাণিত নয়। যদি এ প্রাণীগুলো হালাল হত তবে তিনি কোন না কোন সময় বৈধতার বিবরণের জন্য হলেও অবশ্যই তা খেতেন। যেহেতু তা করেননি, তাই সেগুলো হালাল হবে না। (درس ترمذي ج ১ ص ২৮০)

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ صيد শব্দটিকে مفعول-এর অর্থে ব্যবহার করা রূপক (مَجَازًا)। আর প্রয়োজন ব্যতীত রূপকের শরণাপন্ন হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

তাই হানাফীগণ বলেন যে, এখানে صيد (শিকার) শব্দটি প্রকৃত (حقيقي) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مصيد (শিকারলব্ধ প্রাণী) অর্থে নয়।

মোট কথা হল, হানাফীদের মতে, আয়াতটির অর্থ হবে, তোমাদের (মুহরিমের) জন্য সমুদ্রের প্রাণী শিকার করা হালাল। আর ইমামত্রয় আয়াতটির অর্থ করেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকারলব্ধ প্রাণী (যেকোন প্রকার) ভক্ষণ করা হারাম। অথচ আয়াতটির পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করলে হানাফীদের প্রদত্ত অর্থই মেনে নিতে হয়। কেননা, আলোচনা চলছে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন্ কোন্ কাজ করা বৈধ আর কোন্ কোন্টি বৈধ নয়। সুতরাং উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হল শুধু একথা বলা যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সমুদ্রে শিকার করা হালাল তথা জায়েয। এর দ্বারা যেকোন প্রকার প্রাণী খাওয়া যে হালাল তা প্রমাণ করে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) আলোচ্য হাদীসে **مَيْتَهُ** (সমুদ্রের মৃত্যু)-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ (اضافت) রয়েছে এর দ্বারা সব মৃত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সুনির্দিষ্ট (**عهد خارجي**) মৃত জন্তু হালাল বুঝানো উদ্দেশ্য। আর সেই সুনির্দিষ্ট প্রাণীটি হচ্ছে মাছ। অন্য কিছু নয়।

(২) যদি **مَيْتَهُ** দ্বারা ব্যাপকও বুঝানো হয়, কিন্তু পরবর্তীতে নবী করীম (সাঃ)-
-**أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ**- (অর্থাৎ, আমাদের জন্য দুইটি মৃত বস্তু হালাল। একটি হল মাছ, অপরটি পঙ্গপাল) বলে দুটিকে খাস করে দিয়েছেন।

(৩) আল্লামা শাইখুল হিন্দ (রহ.) বলেন, যদি সম্বন্ধ পদটি (**اضافت**) সমস্ত সংখ্যা (**استغرائی**) বুঝানোর জন্য মেনে নেয়া হয়, তাহলে **الحل** শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য বৈধতা নয়; বরং পবিত্রতা। আর বাক্যের ধারা পবিত্রতা সংক্রান্তই চলে আসছে। সুতরাং নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী **أُحِلَّ مَيْتَتُهُ**-এর অর্থ হবে, “সমুদ্রের মৃত প্রাণীগুলো পবিত্র থাকে।”

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ সহীহ বুখারীতেই আশ্বর সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- (**بُخَارِي ج ২ ص ১২৬-১২৭**) **فَأَلْفَى الْبَحْرُ حَوْثًا مَيْتًا**- অর্থাৎ, অতঃপর সমুদ্র একটি মৃত মাছ নিক্ষেপ করল। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, অন্য রেওয়ায়েতে **دَابَّة** শব্দ দ্বারাও উদ্দেশ্য মাছ। (**دروس مشکوة ج ১ ص ১৮৫-১৮৬**, **درس ترمذی ج ১ ص ২৮১-২৮২**)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ প্রথমে জানা থাকা দরকার যে, ভাসমান মাছ বা **سماك طافي** বলতে সেই মাছকে বলা হয়, যা পানিতে কোন বহির্গত কারণ ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মরে পেট উল্টে ভেসে থাকে। সুতরাং পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এরূপ মাছ খাওয়া হালাল।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে **الحل مَيْتَهُ** উল্লেখ রয়েছে, যার দ্বারা জবাইবিহীন মৃত উদ্দেশ্য। হাদীসে এর বৈধতার হুকুম দেয়া হয়েছে।

দলীল (২)ঃ আশ্বর সংক্রান্ত হাদীস। সাহাবায়ে কিরাম এটি পেয়েছিলেন মৃত অবস্থায়। তা সত্ত্বেও তাঁরা এটাকে অর্ধমাস পর্যন্ত খেতে থাকেন।

দলীল (৩): হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একটি আছার। যেটি সুনানে বায়হাকী ও দারা কুতনীতে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এই আছারে মরে ভেসে ওঠা মাছকে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। (معارف السنن ج ১ ص ২০৭)

* ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহীম নাখঈ, শাবী, তাউস, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) ও হযরত আলী, ইবন আব্বাস এবং জাবির (রাঃ)-এর মতে, এরূপ মাছ খাওয়া হালাল নয়।

দলীল: হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفًا فَلَا تَأْكُلُوهُ— (ابو داود ج ২ ص ৩৫ باب في اكل الطافي من السمك، ابن ماجه ص ২৬১)

باب الطافي من صيد البحر

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সমুদ্র যে প্রাণী নিক্ষেপ করেছে অথবা সমুদ্রে ভাটা লাগার কারণে চরে আটকে পড়েছে, তোমরা সেটি ভক্ষণ কর। আর যেটি পানিতে মরে ভেসে উঠে তা ভক্ষণ করো না।

জবাব: প্রথম দলীলের জবাব: الحل ميتته দ্বারা জবাইবিহীন জন্তু বুঝানো হয়নি; বরং এমন জন্তু বুঝানো হয়েছে, যার রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

দ্বিতীয় দলীলের জবাব: আম্বর সংক্রান্ত হাদীসের উত্তর হল, এটা মরে ভেসে ওঠা মাছ বলে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। طافي শুধু সে মাছকে বলে, যেটি কোন বাহ্যিক কারণ ব্যতীত নিজে নিজে পানিতে মরে ভেসে উঠে। পক্ষান্তরে যদি কোন মাছ কোন বাহ্যিক কারণে যেমন প্রচণ্ড গরম ও শৈত্য প্রবাহে বা ঢেউ-তরঙ্গের কারণে অথবা তীরে উঠার পর পানি সরে যাওয়ার কারণে মরে যায়, তবে সেটি طافي নয়। এটা খাওয়া হালাল। আম্বর সংক্রান্ত হাদীসেও সংশ্লিষ্ট মাছটি পানি থেকে তীরে উঠে আসার কারণে মরে গিয়েছিল বলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। অতএব, এ মাছটি হালাল হওয়া সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয় দলীলের জবাব: আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আছারের উত্তরে বলা যায়, প্রথমতঃ তো এতে প্রচণ্ড ইযতিরাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যদি এটাকে সূত্রগতভাবে সহীহও মেনে নেয়া হয় তবুও এটি একজন সাহাবীর ইজতিহাদ হতে পারে, যা মারফু হাদীসের বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তৃতীয়ত, এটাও হতে পারে যে, এখানে মৃত মাছ দ্বারা এমন মাছ বুঝানো হয়েছে, যেটি বাহ্যিক কারণে মারা গেছে।

তৃতীয় আলোচনাঃ চিংড়ি মাছ হালাল না হারাম?

শাফেঈ এবং মালিকীদের মতে তো এর হালাল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে হানাফীদের মতে এটা মাছ কিনা, বিষয়টি তার উপর নির্ভর করবে। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষতঃ ভারতীয় উলামায়ে কিরামের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। আল্লামা দমীরী (রহ.) ‘হায়াতুল হায়াওয়ান’ নামক গ্রন্থে এটাকে এক প্রকার মাছ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে ভারতীয় কোন কোন আলিম এর হালাল হওয়ার প্রবক্তা। তাঁদের মধ্যে হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)ও আছেন। তিনি ‘ইমদাদুল ফতওয়া’তে এটা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ‘ফাতওয়া হাম্মাদিয়া’ গ্রন্থকার ও অন্যান্য কোন কোন ফকীহ এটাকে মৎস বলতে অস্বীকার করেছেন। কেননা প্রাণীবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের নিকট এ সম্পর্কে তাহকীক করা হলে, তাদের সবাই চিংড়ি মাছ নয় বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, মাছ হল এরূপ মেরুদণ্ড বিশিষ্ট প্রাণী যেটি পানি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না এবং এটি চোয়াল দিয়ে শ্বাস নেয়। এতে চিংড়ি প্রথম শর্ত দ্বারাই বাদ পড়ে যায়। কেননা চিংড়ির কোন মেরুদণ্ড নেই। কোন কোন প্রাণী বিশেষজ্ঞ তো একে পোকাকার অন্তর্ভুক্ত প্রাণী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর পোকা ভক্ষণ করা জায়েয নেই। অতএব, যে বিষয়ে হালাল-হারামের প্রমাণাদি বিপরীতমুখী সেখানে হারামেরই প্রাধান্য হবে। এজন্য এটা খাওয়া থেকে পরহেয করাই উচিত।

সূর্যব্য যে, আল্লামা তাকী উসমানী অনেক গবেষণার পর সর্বশেষে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, চিংড়ি না খাওয়াই উত্তম। যেহেতু শরীয়তে উরফ বা প্রচলিত প্রথা ধর্তব্য, আর আমাদের দেশেও যেহেতু সবাই এটাকে মাছ হিসেবেই গণ্য করে, তাই চিংড়ি খাওয়া হালাল। এতদঞ্চলের সব আলিমই তিন ইমামের সাথে একমত পোষণ করে থাকেন। (فتح الملهم ج ۳ ص ۵۱۳-۵۱۴)

অম্বুর পরিপূর্ণতা : بَابُ فِي اسْبَاغِ الْوُضُوءِ ص ۱۳

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا وَاعْقَابُهُمْ تَلَوُّهُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اسْبِغُوا الْوُضُوءَ — (بخاري ج ۱ ص ۲۸ باب غسل الاعقاب، مسلم ج ۱ ص ۱۲۴ باب وجوب غسل الرجلين، ترمذي ج ۱ ص ۱۶ باب ويل للاعقاب من النار، نسائي ج ۱ ص ۳۰ باب ايجاب غسل الرجلين، ابن ماجه ص ۳۶)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যাদের পায়ের গোড়ালি (পানি ভালভাবে না পৌঁছার কারণে)

বাকবাক করছে। তিনি বলেনঃ এরূপ পায়ের গোড়ালি ওয়ালাদের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে অযু কর।

বিশ্লেষণঃ অযুর সময় উভয় পা ধৌত করা জরুরী নাকি মাসেহ করতে হবে, এ নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছেঃ

* শিয়া সম্প্রদায়ের রাফেযীদের মধ্য হতে ফিরকায়ে ইমামিয়ার মতে, অযুর সময় উভয় পা না ধুয়ে বরং মাসেহ করা ফরয।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ ধৌত কর ও তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং উভয় পা টাখনুসহ। (মায়েদাহঃ ৬)

উক্ত আয়াতে তারা **أَرْجُلَكُمْ** শব্দটি **لَا** হরফে যের দিয়ে পড়ে। তাদের যুক্তি হল, এই শব্দটি পূর্বের শব্দ **بِرُءُوسِكُمْ**-এর উপর **عَطَفَ** (সংযোজন) হয়েছে। অতএব, মাথা যেমন মাসেহ করা ফরয, অনুরূপ হুকুম পদদ্বয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দলীল (২)ঃ আবু নুআইম উবাদা ইবন তামীম সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَرِجْلَيْهِ-

(مجمع الزوائد ج ١ ص ٢٣٤، كنز العمال ج ٥ ص ١٠٢)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখেছি তিনি অযু করেছেন এবং তাঁর দাড়ি ও উভয় পা মাসেহ করেছেন।

* আবু আলী জুন্নাযী (মুতাযিলা) ও ইমাম ইবন জারীর তাবারী (শিয়া)-এর মতে পদদ্বয় ধৌত করা কিংবা মাসেহ করা উভয়টি জায়েয আছে।

দলীলঃ আয়াতে বর্ণিত **أَرْجُلَكُمْ** শব্দটি যেহেতু যবর কিংবা যের উভয় কিরাআতে পড়া জায়েয আছে। সুতরাং বুঝা যায় অযুকারী যেকোন একটির উপর আমল করলেই হবে।

* আহলে যাহিরের মতে, মাসেহ করা এবং ধোয়া উভয়টি করতে হবে।

দলীলঃ যেহেতু **أَرْجُلُكُمْ** শব্দটিতে যবরযোগে এবং যেরযোগে উভয় কিরাআতে পড়া সুপ্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং ধৌত ও মাসেহ উভয়টি করলে কোন মতানৈক্য থাকবে না।

* চার ইমামসহ জমতুর সাহাবা ও তাবেঈনের মতে, মোজা না থাকাবস্থায় অযুর সময় উভয় পা ধৌত করা ফরয।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত আয়াতে **أَرْجُلُكُمْ** যবরযোগে পড়তে হবে। কেননা, এটি আতফ (সংযোজন) হয়েছে **وَأَيْدِيكُمْ**-এর উপর। মুখ এবং উভয় হাত ধৌত করা যেমন ফরয, তেমনিভাবে পদদ্বয় ধৌত করাও ফরয।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ নবী করীম (সাঃ) পুরো নবুওয়াত জীবনে মোজাবিহীন অবস্থায় পদদ্বয় না ধুয়ে মাসেহ করেছেন, এমনটি একবারও প্রমাণিত নেই। অতএব, পদদ্বয় মাসেহ করা যদি ফরযই হত অথবা মাকরুহের সাথেও যদি জায়েয হত, তাহলে তিনি কমপক্ষে একবার হলেও ইহার উপর আমল করে দেখিয়ে দিতেন। যেমন তিনি অনেক মাকরুহ বিষয়ও বৈধতা বর্ণনার জন্য আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এতে বুঝা যায়, পদদ্বয় মাসেহ করা ফরয তো দূরের কথা, মাকরুহের সাথেও জায়েয নয়।

দলীল (৪)ঃ আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা বলেন, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অযুতে মোজাবিহীন অবস্থায় পদদ্বয় ধৌত করা ফরয।

(درس مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۶۳-۱۶۴)

জবাবঃ ফিরকারে ইমামিয়া ও অন্যান্যদের প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

(১) উক্ত আয়াতে **أَرْجُلُكُمْ**-এর মধ্যে যের দেয়া হয়েছে কাছাকাছি শব্দে (**بِرُؤُوسِكُمْ**)

যের হওয়ার কারণে। অন্যথায় **أَرْجُلُكُمْ**-এর আতফ হয়েছে **أَيْدِيكُمْ**-এর উপর।

(২) যেরের কিরাআতটি মোজা পরিহিত অবস্থায় প্রযোজ্য, আর যবরের কিরাআতটি প্রযোজ্য সাধারণ অবস্থায়।

(৩) প্রকৃতপক্ষে **أَرْجُلُكُمْ** শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার (فعل محذوف) কর্ম (مفعول) হিসেবে যবর হয়েছে। আসল বাক্যটি ছিল- **وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ**

কিন্তু পাশাপাশি দুটি **عامل**-এর পৃথক পৃথক **مفعول** থাকলে একটি আমেল উহ্য (حذف)

রেখে এর **مفعول** কে প্রথম মামূলের উপর আতফ করে তাহ ইরাব দেয়া যায়। আর এর

ভিত্তিতেই **أَرْجُلَكُمْ**-কে **بِرُؤُوسِكُمْ**-এর উপর আতফ করে **أَرْجُلُكُمْ** পড়া জায়েয আছে।

(৪) আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, কুরআনের বিবরণ বুঝার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ হল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমল। আর তাঁর থেকে মোজাবিহীন অবস্থায় পদদ্বয় মাসেহ করেছেন এমন একটি রেওয়ায়েতও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হয়ত নবী করীম (সাঃ) তখন মোজা পরিহিত ছিলেন। তাই তিনি মাসেহ করেছেন। (২) ইজমা ও মুতাওয়াতিহ হাদীসের বিরোধিতার কারণে এই হাদীসটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। আর তা হল, এখানে মাসেহ শব্দটি হালকা ধোয়ার সাথে সাথে ঘষা বা ডলা অর্থে প্রযোজ্য। যার প্রমাণ হল, দাড়ি সম্পর্কেও মাসেহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ ইহাও ধোয়ার অঙ্গ।

(৩) যে সমস্ত হাদীসে পা মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে, ঐ সমস্ত হাদীস রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অযুতে পা ধোয়াই যদি আল্লাহ তাআলার কাম্য হয়, তাহলে উল্লিখিত আয়াতে বাকরীতিতে এমন অস্পষ্টতা রাখা হল কেন? পাগুলোকে স্পষ্টভাবে ধোয়ার আওতায় কেন উল্লেখ করা হল না, যাতে কোনরকম বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি ফায়দা ও হিকমত নিম্নে প্রদত্ত হল-

(১) একথা বুঝানো যে, কোন কোন সময় পায়ের উপরেও মাসেহ করার বিধান রয়েছে। যেমন, মোজা পরা অবস্থায়। যদি এই শব্দে যেভাবে কুরআন পড়ার অবকাশ না থাকত, তাহলে আয়াত দ্বারা সর্বাবস্থায় ধোয়াই সাব্যস্ত হত এবং মোজার উপর মাসেহের রেওয়ায়েতগুলো এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হত। এ কুরআনের কারণে এই বৈপরীত্যের অবসান ঘটেছে।

(২) মাথা মাসেহের এবং পা ধোয়ার বিষয়টি কোন কোন হুকুমে যৌথ। যেমন, তায়াম্মুমে উভয়টি বাদ পড়ে যায়।

(৩) رجل শব্দটিকে رُؤوس-এর পরে উল্লেখ করে মাসনূন তারতীবের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ, এর উল্টো তারতীবে এ ফায়দা অর্জিত হত না।

(৪) মাথা মাসেহ এবং পা ধোয়া এ দুটি বিষয়ের মাঝে সামঞ্জস্য হল, উভয়টি শরীয়ত প্রবর্তকের বিধি প্রবর্তনের কারণে জানা গেছে। অথচ চেহারা ও হাত ধোয়ার বিধান অযুর পূর্বেও আরবদের নিকট ছিল। এ হিসেবেও এ দুটি বিষয়কে এক সাথে উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল।

তাছাড়া আরো অনেক অজ্ঞাত হিকমত থাকতে পারে।

بَاب فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ ص ۱۳



অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ - (ابو داود ج ۱ ص ۱৫, بخاری ج ۱ ص ২৫)
 باب لا تقبل صلاة بغير طهور, ترمذي ج ۱ ص ۱۳ باب التسمية عند الوضوء, نسائي ج ۱ ص ২৫ باب التسمية عند الوضوء, ابن ماجه ص ৩২)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না যে সঠিকভাবে অযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির অযু হয় না যে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না (বিসমিল্লাহ বলে না)।

বিশ্লেষণঃ অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* আহলে যাহির, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তবে, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, যদি কেউ জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তাহলে পুনরায় অযু করা ওয়াজিব। আর যদি ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে অযু দোহরানো ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ (রহ.) ও জমহুরের মতে এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক উক্তি অনুযায়ী, অযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত, ওয়াজিব নয়।

(العيني ج ১ ص ১৭০)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত কর এবং তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ কর। এবং তোমাদের পদদ্বয় টাখনুসহ ধৌত কর। (মায়োদাহঃ ৬)

উক্ত আয়াতে অযুর ফরয হিসেবে শুধু চারটি অঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ নেই।

দলীল (২)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফু হাদীস বর্ণিত-

مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِحَسَدِهِ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَائِهِ— (দার কুত্বী ج ১ ص ৭৫-৭৬, بیہقی ج ۱ ص ۴۵)

অর্থাৎ, যে অযুর সময় আল্লাহর নাম নিয়ে অযু করবে, ইহা তার গোটা দেহের পবিত্রতার কারণ হবে। বর্ণণাকারী বলেন, আর যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে অযু করবে, ইহা তার অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতার কারণ হবে। উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ ছাড়াও অযু শুদ্ধ হবে। যদিও বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত।

দলীল (৩): আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরো একটি মারফু হাদীস-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَبْرَحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ— (إثار السنن ص ৩০, مجمع الزوائد ج ১ ص ২২০)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি যখন অযু কর, তখন বল বিসমিল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ। কারণ তোমার রক্ষক ফেরেশতারা তোমার জন্য এই অযু থেকে (পুনরায়) অপবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নেকী লিখতেই থাকবে। এ হাদীসটি বিসমিল্লাহ সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট। কেননা, এতে আলহামদুলিল্লাহ বলারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা কারো মতে ওয়াজিব নয়।

দলীল (৪): অনেক সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-এর অযুর বিবরণ সবিস্তারে দিয়েছেন। তাতে কোথাও বিসমিল্লাহর আলোচনা পাওয়া যায় না। যদি বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব হত, তবে সেসব হাদীসে অবশ্যই এর আলোচনা করা হত।

জবাবঃ (১) বিসমিল্লাহ প্রমাণিত হয়েছে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা। সুতরাং বিসমিল্লাহকে যদি ওয়াজিব মানা হয়, তাহলে ইহা কুরআনের উপর বৃদ্ধি করা হবে। যা জায়েয নয়। কেননা, কুরআনে শুধু চারটি অঙ্গের কথাই উল্লেখ রয়েছে।

(২) উক্ত হাদীসে নফী (না) দ্বারা নফী কামিল (অপূর্ণাঙ্গতা) উদ্দেশ্য। এর দ্বারা অবৈধতা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হল-

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির অযু পরিপূর্ণ নয়, যে لَا الْوُضُوءَ الْكَامِلَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ- অযুতে বিসমিল্লাহ বলে না। যেমন অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

لَا صَلَوةَ لِحَجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ— (দার কুত্বী ج ১ ص ২২০)

অর্থাৎ, মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদ ছাড়া হয় না। এখানেও নফী (না) দ্বারা নফী কামিল উদ্দেশ্য।

(৩) বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোন শক্তিশালী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে-

لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ - (ترمذي ج ١ ص ١٣)

অর্থাৎ, এই অনুচ্ছেদে উত্তম সনদ বিশিষ্ট কোন হাসীস সম্পর্কে আমার জানা নেই।

بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص ١٤

নবী করীম (সাঃ)-এর অযুর বর্ণনা

... عَنْ حُمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَاقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ - ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا الْخ

(بخاري ج ١ ص ٢٧-٢٨ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا/ ج ١ ص ٢٢ باب مسح الرأس مرة، مسلم ج ١ ص ١١٩)

باب صفة الوضوء، وكما له، نسائي ج ١ ص ٣١ باب حد الغسل

অনুবাদঃ ... হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রাঃ)-কে অযু করতে দেখেছি। তিনি (প্রথমে) তাঁর দুই হাতের উপর তিনবার করে পানি ঢেলে ধৌত করেন। অতঃপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার (সমস্ত) মুখমণ্ডল ধৌত করেন। পরে তিনি তাঁর ডান হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন এবং বাম হাতও অনুরূপভাবে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ করেন। পরে তিনি স্বীয় ডান পা তিনবার ধৌত করেন এবং একইরূপে বাম পা ধৌত করেন। অবশেষে তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার এই অযুর ন্যায় অযু করতে দেখেছি।

বিশ্লেষণঃ অযুর সময় মাথা তিনবার মাসেহ করা সুন্নত নাকি একবার, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, অযুর সময় তিনবার মাথা মাসেহ করা সুন্নত। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকেও অনুরূপ একটি উক্তি বর্ণিত আছে।

দলীলঃ ... عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ✓

ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا—
(ابو داود ج ١ ص ١٥)

অর্থাৎ, ... শাকীক ইবন সালামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রাঃ)-কে অযুর মধ্যে দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করতে এবং তিনবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

উক্ত হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহ করা উল্লেখ রয়েছে। অতএব, ইহা সুন্নত।

কিয়াসী দলীলঃ অযুর অন্যান্য অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা সুন্নত। আর মাথাও অযুর অঙ্গসমূহের একটি অঙ্গ। সুতরাং ইহাও তিনবার মাসেহ করা সুন্নত।

(درس مشکوٰۃ ج ١ ص ١٦٣)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী ও আহমদ (রহ.)-এর এক উক্তি অনুযায়ী, মাথা শুধু একবার মাসেহ করা সুন্নত।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ)-এর অযুর পদ্ধতি খুলে খুলে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করার কথাও উল্লেখ রয়েছে, যা সুন্নত। কিন্তু মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে তিনবারের কথা উল্লেখ নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করাই সুন্নত, তিনবার নয়।

دَلِيل (٢) : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— (ابو داود ج ١ ص ١٦)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে অযু করতে দেখি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এইরূপে অযু করতেন। (পূর্ববর্তী সূত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।)

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ كُلَّهُ ثَلَاثًا

ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً— (ابو داود ج ١ ص ١٨, ترمذي ج ١ ص ١٦ باب ان

مسح الرأس مرة، نسائي ج ١ ص ٢٨ باب صفة الوضوء، ابن ماجة ص ٣٥)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অযু করতে দেখেন। তিনি (সাঃ) অযুর সময় প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও কর্ণদ্বয় একবার মাসেহ করেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নত।

কিয়াসী দলীলঃ মোজা ও পট্টির উপর একবার মাসেহ করলে তা যথেষ্ট হবে। সুতরাং মাথা মাসেহও একবারই হওয়া উচিত।

জবাবঃ (১) শাফেঈদের পক্ষে বর্ণিত হাদীসটি শায (বিরল)। কারণ শুধু দু'একটি হাদীস ছাড়া উসমান (রাঃ)-এর সকল রেওয়ায়েত শুধু একবার মাসেহ করার প্রমাণ রয়েছে। তাই স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) শাফেঈ মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনবার মাসেহ বিশিষ্ট রেওয়ায়েতটিকে এই বলে রদ করে দিয়েছেন যে-

أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصَّحَّاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَمَّ مَرَّةً فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ— (ابو

داود ج ١ ص ١٥)

অর্থাৎ, হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত হয় যে, অযুর মধ্যে মাথা মাসেহ শুধু একবার করতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তিনবার করে ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকের বর্ণনায় কেবলমাত্র وَمَسَحَ رَأْسَهُ তথা ‘মাথা মাসেহ করেছেন’ উল্লিখিত আছে, কিন্তু সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। অথচ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ব্যাপারে তিন-তিনবারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

(২) ‘হিদায়া’ গ্রন্থকার বলেন, নতুন পানি দিয়ে যদি তিনবার মাসেহ করা হয়, তাহলে ইহা আর মাসেহ রইল না; বরং অন্যান্য অঙ্গের মতই গোসল বা ধৌত হয়ে যাবে।

(৩) যদি মেনে নেয়া হয়, তিনবার মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসটিও বিশুদ্ধ, তবে তা বৈধতার (জায়েয) জন্য প্রযোজ্য, সুন্নত হিসেবে নয়।

(৪) আসলে হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি ছিল পূর্ণ মাথা মাসেহের একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ, মাথার সামনের অংশ, পিছনের অংশ এবং উভয় পার্শ্ব- এই তিন অবস্থা নবী করীম (সাঃ) হযরত শিক্ষা দেয়ার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে মাসেহ করেছেন। আর এটাকেই রাবী তিনবার বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ শাফেঈদের কিয়াসী দলীলটি সহীহ নয়। কেননা ধোয়ার উপর মাসেহ-এর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

তাছাড়া, অন্যান্য অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হল, পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা- যা ফরয। কিন্তু একবারে পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব বিধায় তিনবার ধুতে হয়, যা সুন্নত। পক্ষান্তরে, মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয নয় এবং প্রত্যেকটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোও ফরয নয়। এজন্য তিনবারেরও প্রয়োজন নেই। ফলে ইহা সুন্নতও নয়। (درس مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۶۳)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি শর্ত কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) সহ জমহুরের মতে, মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া শর্ত। অতএব, কেউ যদি হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাসেহ করে, তবে তার অযু শুদ্ধ হবে না।

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وَضُوءَهُ قَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى انْقَاهُمَا— (ابو داود ج ۱ ص ১৬, مسلم ج ১ ص ১২৩ باب آخر في صفة الوضوء, ترمذي ج ১ ص ১৬ باب يأخذ لراسه ماء جديدا)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ ইবন আসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অযু করতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি অযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন এবং পদযুগল পরিষ্কার করে ধৌত করেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অযু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দলীলঃ ... عَنْ الرُّبَيْعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ— (ابو داود ج ১ ص ১৭)

অর্থাৎ, ... রুবাই (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তাঁর হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসেহ করেন।

জবাবঃ মূলত জমহুরের প্রদত্ত দলীল হানাফীদের পরিপন্থী নয়। কারণ, উক্ত হাদীস দ্বারা সুন্নত প্রমাণিত হবে, ওয়াজিব নয়। আর হানাফীগণও তো একে সুন্নত বলে থাকেন। অতএব, কোন বৈপরীত্য নেই।

উল্লেখ্য যে, এই মতবিরোধের মূল ভিত্তি হল, 'ব্যবহৃত পানি' (ماء مستعمل) সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে। কেননা, ব্যবহৃত পানি দ্বারা অন্য অঙ্গ ধৌত বা মাসেহ করা

জায়েয নয়। শাফেঈ ও অন্যদের নিকট, কোন পানি অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বেই তা 'ব্যবহৃত পানি' হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর হানাফীদের মতে, পানি ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহৃত সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

(درس ترمذي ج ١ ص ٢٤٦)

১৯. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ص ১৯

... عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ-

অনুবাদঃ ... সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাঃ (শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য) একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ফিরে এলে তিনি (সাঃ) তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসে করার আদেশ (অনুমতি) দেন।

বিশ্লেষণঃ অযুর ক্ষেত্রে মাথা মাসেহ না করে কেবল পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ, আওযাইঈ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয। আর এতেই অযু শুদ্ধ হয়ে যাবে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ- (بخاري ج ١ ص ٣٣ باب المسح على الخفين، ترمذي ج ١ ص ٢٩ باب المسح على الجوربين والعمامة، ابن ماجه ج ٤)

অর্থাৎ, ... আল মুগীরা ইবন শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) অযু করেছেন এবং চামড়ার মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন।

দলীল (৩)ঃ ... عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ

وَالْخِمَارِ- (ترمذي ج ١ ص ٢٩، نسائي ج ١ ص ٢٩ باب المسح على العمامة، ابن ماجه ج ٤)

অর্থাৎ, ... বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) মোজাধর এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন।

কিয়াসী দলীলঃ পায়ে মোজা পরিধানের ফলে মোজার উপর মাসেহ করা যেমন জায়েয, তেমনিভাবে মাথার উপর পাগড়ী থাকলে এর উপরও মাসেহ করা জায়েয।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, ইবন মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, শাবী ও ইবরাহীম (রহ.)-এর মতে, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ**

অর্থাৎ, তোমরা (অযুতে) তোমাদের মাথা মাসেহ কর। (মায়েদাঃ ৬)

উক্ত আয়াতে মাথা মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। পাগড়ী মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়নি।

দলীল (২)ঃ মাথা মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির এবং অসংখ্য।

কিয়াসী দলীলঃ পবিত্র কুরআনে যে তায়াম্মুমের জন্য মুখ ও হাত মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে যদি মুখ ও হাতের উপর কোন প্রকার কাপড় থাকে, তাহলে এই মাসেহ আদায় হবে না। এর মূল কারণ হল মাঝখানে কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা। আর এক্ষেত্রেও পাগড়ী হল মাথার জন্য প্রতিবন্ধকতা। অতএব, পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে, তা শুদ্ধ হবে না।

জবাবঃ (১) পাগড়ীর উপর মাসেহ করার হাদীসগুলো খবরে ওয়াহিদ এবং সংখ্যায় খুবই কম। যা দ্বারা কিতাবুল্লাহ ও মাথা মাসেহ সংক্রান্ত অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীসের বিধান খর্ব করা যায় না।

(২) আল্লামা হাফিয যায়লাঈ (রহ.) বলেন, যেসব রেওয়ায়েতে পাগড়ীর উপর মাসেহ করার আলোচনা রয়েছে, সেগুলো সংক্ষিপ্ত। যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। যেমন মূলে ছিল **مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ** অর্থাৎ, তিনি তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগ ও তাঁর পাগড়ী মাসেহ করেছেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطْرِيَّةٌ فَادْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ

الْعِمَامَةَ- (ابو داود ج ١ ص ١٩)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটি কিতরী পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় অযু করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করেন, কিন্তু পাগড়ী খুলেননি।

এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) প্রথমে ফরয পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ীর উপর মাসেহ করেন। আর এটা তো সবার নিকটই জায়েয।

(৩) আল্লামা সারাখসী (রহ.) অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত সাওবান (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের অন্য একটি জবাবে বলেন, পাগড়ীর উপর মাসেহ করার হুকুমটি ছিল ঐ সেনাদলের জন্য খাস। যা ওয়রের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন। (تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٥٩)

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ (১) মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির, কিন্তু পাগড়ীর উপর মাসেহের ক্ষেত্রে এমনটি নয়। সুতরাং কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি বলা যায়, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন-

بَلَّغْنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ فَتْرَكَ- (موطا محمد ص ৭১)

অর্থাৎ, আমরা জানতে পেরেছি যে, পাগড়ীর উপর মাসেহের আমল প্রথমে ছিল, পরবর্তীতে তা পরিহার করা হয়েছে।

আব্দুল হাই লাখনভী (রহ.) লিখেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর উক্তিটি দ্বারা পাগড়ীর উপর মাসেহের বিষয়টির এইভাবে চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায় যে, এ বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। (درس ترمذي ج ١ ص ٣٣٦-٣٣٨، اعلاء السنن ج ١ ص ٨-٣٧)

২০ : بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ : মোজার উপর মাসেহ করা

... عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَسِيْتُ قَالَ بَلْ أَنْتَ تَسِيْتُ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ- (ابو

داود ج ١ ص ২১)

অনুবাদঃ ... মুগীরা ইবন শোবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোজার উপর মাসেহ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন? তিনি বলেন, বরং তুমিই ভুলে গেছ। আমাকে আমার প্রভু এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্লেষণঃ মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছেঃ

* খারেজী ও রাফেজীদের মতে, মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا

وْجُوْهُكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ কনুইসহ ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর ও পদযুগল টাখনু সহ ধৌত কর। (মায়েদাঃ ৬)

উক্ত আয়াতে যেহেতু পদযুগলকে ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং মাসেহ করা জায়েয নয়।

* চার ইমামসহ সকল ফকীহর মতে, (চামড়ার) মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল(২)ঃ ... عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ... عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ - (ابو দাউদ জ ১৮২, بخاری ج ১ ص ২৩, باب المسح على الخفين / ج ১ ص ৫০ باب التيمم ضربة, مسلم ج ১ ص ১৩২, باب المسح على الخفين, ترمذي ج ১ ص ২৭, باب المسح على الخفين, ابن ماجه ص ৪১)

অর্থাৎ, ... আবু যুরআ ইবন আমর ইবন জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা হযরত জারীর (রাঃ) পেশাবের পর অযু করার সময় মোজা মাসেহ করেন এবং বলেন, (মোজার উপর) আমাকে মাসেহ করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বচক্ষে এভাবে মাসেহ করতে দেখেছি। উপস্থিত লোকেরা বলেন, এটা সূরা মায়েদাহ নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। জবাবে তিনি বলেন, আমি সূরা মায়েদাহ নাযিল হওয়ার পরই ইসলামে দীক্ষিত হই।

ইজমাঃ মোজার উপর যে মাসেহ করা জায়েয, এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন হাসান বসরী (রহ.) বলেন-

حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ - (معارف السنن ج ১ ص ২৩১)

অর্থাৎ, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ৭০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাঃ) মোজার উপর মাসেহ করতেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন-

مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ حَتَّى جَاءَنِي مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ - (تنظيم ج ১ ص ১৭৮)

অর্থাৎ, আমার নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহের প্রবক্তা হইনি।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ৮০ জনের অধিক সাহাবী মোজার উপর মাসেহের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

* আবুল হাসান কারখী (রহ.) বলেন-

أَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْحَ - (البحر الرائق ج ١ ص ١٦٥)

অর্থাৎ যে মোজার উপর মাসেহ করার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে, আমি তার কুফরীর আশংকা করি।

জবাবঃ (১) আবু বকর জাসসাস (রহ.) বলেন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতে বর্ণিত "أَرْجُلَكُمْ" (তোমাদের পদযুগল)-কে "رُءُوسِكُمْ" (তোমাদের মাথা)-এর উপর আতফ (সংযোজন) করে যের দ্বারা পড়াও জায়েয আছে। আর তখন এর অর্থ হবে, যদি মোজা পরিহিত অবস্থায় হয়, তখন মাসেহ করা জায়েয আছে। (احكام القرآن)

(২) জমহুরের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির। আর মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতও রহিত (মানসূখ) করা জায়েয হবে। আর তাই জমহুরের দ্বিতীয় দলীলে দেখা যায় যে, সূরা মায়েদার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরেও হযরত জারীর (রাঃ) মোজার উপর মাসেহ করেন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর আমলও যে এরূপ ছিল তা বর্ণনা করেন। (فتح الملهم ج ١ ص ٤٣١، العيني ج ١ ص ٨٥١)

بَابُ التَّوْقِيفِ فِي الْمَسْحِ ص ٢١

মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

... عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ وَلَوْ السَّتْرَدَنَاهُ لَزَادَنَا - (ترمذي)

ج ١ ص ٢٧ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ابن ماجه ص ٤١

অনুবাদঃ ... খুযাইমা ইবন সাবিত (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার নির্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের (নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী) জন্য একদিন একরাত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন।

বিশ্লেষণঃ চামড়ার মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা কয়দিন, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, হাসান বসরী ও লাইছ ইবন সাদ (রহ.)-এর মতে, মাসেহের কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর মাসেহ করতে পারবে। মুসাফির হোক কিংবা মুকীম। (تعلیق الصبیح ১ ج ص ২৫৬)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির শেষাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিন দিনের বেশি মাসেহ করা জায়েয আছে। অর্থাৎ, একই মাসেহ দ্বারা তিন দিনেরও অধিককাল নামায পড়া জায়েয।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ أَبِي بِنِ عُمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلَاثَةً قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ ... قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا— قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ مَا بَدَأَكَ— (ابو داود ج ১ ص ২১, ابن ماجه ص ৫২)

অর্থাৎ, ... উবাই ইবন উমারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবন আইউব বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী তাঁকে এক, দুই ও তিন দিন পর্যন্ত মাসেহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি তাঁকে ইহার অনুমতি দিয়ে বলেন, তুমি যতদিনের জন্য ইচ্ছা কর। ... অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাতদিন পর্যন্ত পৌঁছান। জবাবে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ; যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর।

উক্ত রেওয়ায়েতে সময় অনির্দিষ্ট থাকার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট।

কিয়াসী দলীলঃ মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সময়সীমা নেই; তাই মোজা মাসেহের ক্ষেত্রেও সময়সীমা না থাকা উচিত।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, সাহেবাইন, আওয়াঈ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মুকীম একদিন একরাত মাসেহ করবে, আর মুসাফির করবে তিন দিন তিন রাত।

... عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ آتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ يَا بَنَ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمَقِيمِ - (مسلم ج ١ ص ١٣٥ باب التوقيت في المسح

على الخفين، نسائي ج ١ ص ٣٢ باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم)

অর্থাৎ, ... শুরাইহ ইবন হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে এলাম মোযার উপর মাসেহ করার মাসআলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবু তালিবের পুত্র (আলী রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এ মাসআলা জিজ্ঞেস কর। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফর করতেন। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত।

দলীল (২): عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ - (ترمذي
ج ١ ص ٢٧، نسائي ج ١ ص ٣٢، ابن ماجه ص ٤١-٤٢)

অর্থাৎ, সাফওয়ান ইবন আসসাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যখন মুসাফির হতাম তখন যেন গোসল ফরয হওয়া ব্যতীত আমাদের মোজাগুলো তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত না খুলি।

দলীল (৩): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) হাদীসে বর্ণিত (আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন) এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ নয়। আল্লামা যায়লাঈ ও আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

(২) কেউ কেউ বলেন, এটা হযরত খুযাইমা (রাঃ)-এর নিজস্ব ধারণা, যা শরঈ মতে প্রমাণ নয়।

(৩) কতিপয় আলিম বলেন, এটি প্রথম দিকের ঘটনা। পরবর্তীতে সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। (درس ترمذي ج ١ ص ٣٣٠)

(৪) যদি এই অতিরিক্ত অংশটি প্রমাণিতও হয়, তবুও এ বাক্য দ্বারা সময়ের অনির্দিষ্টতা প্রমাণিত হবে না। কেননা, বাক্যাংশটিতে বলা হয়েছে, যদি আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট সময় আরো বেশি চাইতাম তাহলে তিনি আরো সময়

বাড়িয়ে দিতেন; যেহেতু আরও অধিক সময় চাওয়া হয়নি, এজন্য সময় বৃদ্ধিও করা হয়নি। (نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۷۹)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসটি সনদগতভাবে দুর্বল। স্বয়ং আবু দাউদ (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন-

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِأَلْقَوَى - (ابو داود ج ۱ ص ২১)

অর্থাৎ, এর সনদে মতানৈক্য রয়েছে। এটি শক্তিশালী নয়।

অতএব, এমন একটি দুর্বল হাদীস দ্বারা মুতাওয়াতিহ হাদীস বর্জন করা উচিত নয়।

(২) অথবা, নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী - نَعَمْ مَا بَدَأَكَ - (হাঁ, তুমি যতদিনের জন্য ইচ্ছা কর। হাঁ, যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর)-এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হল, সফর অবস্থায় তিন দিন তিনদিন করে এবং মুকীম অবস্থায় একদিন একদিন করে যতদিন ইচ্ছা শরঈ নিয়মানুযায়ী মাসেহ কর।

(৩) অথবা, প্রথম দিকে মাসেহের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ (১) কোন বিষয়ে কিয়াস তো তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কোন বর্ণনা না পাওয়া যায়। কিন্তু মোজা মাসেহের ক্ষেত্রে তো একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং সহীহ হাদীসসমূহের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) তাছাড়া কিয়াসটি শুদ্ধ হয়নি। কেননা, মাথা মাসেহ করা এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ফরয, যার বিকল্প অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। আর মোজার উপর মাসেহ করা এটি পাদৌত করার পরিবর্তে একটি বিকল্প পদ্ধতি। সুতরাং উভয়টির হুকুমও ভিন্ন হবে, এটিই যুক্তিসঙ্গত।

২২ : بَابُ كَيْفَ الْمَسْحِ ص ২২

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوَّلِيَّ الْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ-

অনুবাদঃ ... হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দ্বীনের মাপকাঠি যদি রায়ের (যুক্তির) উপর নির্ভরশীল হত, তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ না করে নিম্নাংশে মাসেহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। রাবী হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছি।

বিশ্লেষণঃ মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে হবে, নাকি নিম্নভাগ- এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, ইসহাক, যুহরী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, মোজাদ্বয়ের উপর ও নিচে উভয়দিকে মাসেহ করতে হবে। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, উভয়দিকে মাসেহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, উপরের অংশে মাসেহ করা ওয়াজিব, আর নিচের অংশে মাসেহ করা সুন্নত বা মুস্তাহাব।

দলীলঃ ... عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ...

غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفَيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا - (ابو داود ج ১ ص ২২, তرمذি ج ১ ص ২৮ باب

في المسح على الخفين اعلاه واسفله، ابن ماجه ص ১২)

অর্থাৎ, ... মুগীরা ইবন শোবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)-কে অয়ু করিয়েছি। তখন তিনি মোজার উপরের ও নিচের অংশে (উভয়ই) মাসেহ করেন।

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, মোজার শুধু উপরের অংশ মাসেহ করা আবশ্যিক। নিচের অংশ মাসেহ করা বিধানসম্মত নয়।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (২)

يَمَسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا - (ترمذি ج ১ ص ২৮)

অর্থাৎ, ... মুগীরা ইবন শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে দেখেছি, তিনি মোজার উপরের দিকে মাসেহ করেছেন।

জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর স্বয়ং আবু দাউদ (রহ.) হাদীসটি দুর্বল (যঈফ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন-

... بَلَفَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ نَوْرَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَجَاءٍ - অর্থাৎ, আমার নিকট (এ কথা)

পৌঁছেছে যে, সাওর এই হাদীসটি রাজা (নামক ব্যক্তি) থেকে শোনেননি।

(২) ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটিকে ক্রটিযুক্ত (মালূল) বলেছেন।

(৩) হাদীসের সনদে রাবী ওলীদ মুদাল্লিস।

অতএব যঈফ, মালূল ও মুদাল্লিস রাবী বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

(৪) সর্বোপরি বলা যায়, যদি এটাকে প্রমাণযোগ্য মেনেও নেয়া হয়, তখন এর উত্তর হল, হয়ত নবী করীম (সাঃ) মোজার নিচের অংশ ধরে শুধু উপরের অংশে মাসেহ করেছেন। আর নিচের অংশে ধরাকে রাবী মাসেহ মনে করেছেন।

২৪ : بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ (স্ত্রীকে) চুম্বনের পর অযু করা

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكْتَ - (ترمذي ج ১ ص ২০)

باب ترك الوضوء من القبلة، نسائي ج ১ ص ৩৭ باب ترك الوضوء من القبلة، ابن ماجه ص ৩৮-৩৯

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করে অযু করা ব্যতিরেকে নামায পড়তে যান। উরওয়া (রহ.) বলেন, আমি তাঁকে (আয়িশাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনিই কি আপনি নন? এতদশ্রবণে তিনি মুচকি হাসি দেন।

বিশ্লেষণঃ মহিলাকে স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া অযু ভঙ্গের (ناقص وضوء) কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মহিলাকে স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া অযু ভঙ্গের কারণ। তবে ইমামগণ এতে কিছুটা শর্তারোপ করেছেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তিনটি শর্তের সাথে তা অযু ভঙ্গের কারণ-

- (১) মহিলা বালগ বা প্রাপ্তবয়স্কা হতে হবে।
- (২) গায়রে মাহরাম (যাদেরকে বিয়ে করা হারাম নয় এমন) মহিলা হতে হবে।
- (৩) শাহওয়াত বা কামনার সাথে স্পর্শ করতে হবে।

শাফেঈদের নিকট শুধু একটি শর্ত, তা হচ্ছে স্পর্শ আবরণহীনভাবে হলে। অতএব আবরণহীনভাবে কোন ছোট কিংবা বড় মেয়ে, মাহরাম কিংবা গায়রে মাহরাম, কামনার সাথে কিংবা কামনা ছাড়া হোক, স্পর্শ করলেই তা অযু ভঙ্গের কারণ হবে। এমন কি কোন কোন শাফেঈ মতাবলম্বী বলেন, যদি কেউ মহিলাকে চড়-থাপ্পড় দেয় অথবা তার জখমের চিকিৎসা করে, তবেও তার অযু ভঙ্গে যাবে। (بذل المجهود ج ১ ص ১০৭)

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী - ... أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

অর্থাৎ, ... অথবা তোমরা যদি নারী স্পর্শ (গমন) করে থাক, কিন্তু পরে পানি না পাও, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (নিসাঃ ৪৩)

উক্ত আয়াতে لمس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ- হাত দ্বারা স্পর্শ করা। আর আয়াতে নারী স্পর্শ করার পর পানি না পেলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায় যে, নারী স্পর্শ বা চুমু অযু ভঙ্গের কারণ।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী ও যুফার (রহ.)-এর মতে, মহিলা স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া সাধারণভাবে অযু ভঙ্গের কারণ নয়।

(احكام القرآن ج ٢ ص ٤٥٠، تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٣٤)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

... لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْجِدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يُسْجِدُ— (ابو داود ج ١ ص ١٠٣ باب من قال

المرأة لا تقطع الصلوة، بخاري ج ١ ص ١٦١ باب ما يجوز من العمل في الصلوة، مسلم ج ١ ص ١٩٨ باب

سترة المصلي الخ، نسائي ج ١ ص ٣٨ باب ترك الوضوء من مس الرجل الخ)

অর্থাৎ, ... আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি যে, আমি তাঁর সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিলে আমি পা টেনে নিতাম এবং তিনি সিজদায় যেতেন।

দলীল (৩): عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِّنَ الْفَرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ— (مسلم ج ١ ص ١٩٢ باب ما يقال في

الركوع والسجود، نسائي ج ١ ص ٣٨ ترك الوضوء من مس الرجل الخ)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার বিছানা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হারিয়ে ফেললাম। অতঃপর আমি তাঁকে তাল্লাশ করতে গিয়ে আমার হাত তাঁর পায়ের তালুতে পড়ল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তাঁর পদদ্বয় ছিল খাড়া। তখন তিনি (নিম্নোক্ত) দোয়া পড়ছিলেন- “হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তোষের আশ্রয় গ্রহণ করছি।”

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মহিলা স্পর্শ অযু ভঙ্গের কারণ নয়। যদি স্পর্শ অযু ভঙ্গের কারণ হত, তাহলে আয়িশা (রাঃ)-এর স্পর্শের কারণে নবী করীম (সাঃ) নামায ছেড়ে দিতেন।

জবাবঃ (১) মুফাসসিরকুল শিরোমনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতে বর্ণিত أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ কে সহবাস দ্বারা তাফসীর করেছেন। আর হযরত আলী, আবু মূসা আশআরী (রাঃ), আতা, তাউস, হাসান বসরী, শাবী ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.) প্রমুখের অভিমতও অনুরূপ। যদিও শাফেঈ ও মালিকীগণ হযরত ইবন মাসউদ ও ইবন উমর (রাঃ)-এর তাফসীরকে গ্রহণ করে বলেন যে, এর দ্বারা

উদ্দেশ্য হল স্পর্শ করা, সহবাস নয়। কিন্তু একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অধিক নির্ভরযোগ্য। যা হানাফীগণ গ্রহণ করেছেন।

(২) যখন لمس (স্পর্শ, ছোঁয়া, পরশ, সংস্পর্শ)-এর نسبت মহিলার দিকে করা

হয়, তখন এর অর্থ হবে সহবাস। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ**

قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ অর্থাৎ, যদি তোমরা তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে

দাও। ... (বাকারাহঃ ২৩৭)

উক্ত আয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে مس দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য, হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নয়। (تنظيم ج ১ ص ১৩০)

(৩) তাছাড়া, কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রদত্ত দলীলে لَمَسْتُمْ শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَةٍ থেকে এসেছে, যা ক্রিয়ার (فعل) ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে অংশীদারিত্ব বুঝায়। আর এই অংশীদারিত্ব সহবাস ও স্ত্রী মিলনেই হতে পারে।

(درس مشکوٰۃ ج ১ ص ১৪৪, درس ترمذي ج ১ ص ৩১১)

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ص ২৪

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে অযু

... عَنْ عُرْوَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

فَقَالَ مَرْوَانُ وَمَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرْتَنِي بِسَرَةٍ

بُنْتُ صَفْوَانَ أَكْهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ

فَلْيَتَوَضَّأْ- (ترمذي ج ১ ص ২৫ باب الوضوء من مس الذكر, نسائي ج ১ ص ৩৮ باب الوضوء من مس

الذكر, ابن ماجة ص ৩৭)

অনুবাদঃ ... উরওয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কারণে অযু করার প্রয়োজন হয়? জবাবে মারওয়ান বললেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তা কিরূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনত

সাফওয়ান (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন অবশ্যই অযু করে নেয়।

বিশ্লেষণঃ পুরুষাঙ্গ বা নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা অযু ভঙ্গের কারণ কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে এখতেলাফ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বলের মতে এবং মালিক (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অযু ভঙ্গে যাবে। ইসহাক, আওযাই, যুহরী ও মুজাহিদ (রহ.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তবে এ ব্যাপারে তিন ইমামের মাঝে কিছুটা এখতেলাফ রয়েছে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শে অযুভঙ্গের তিনটি শর্ত রয়েছে-

(ক) হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করা, (খ) কোন পর্দা ছাড়া সরাসরি স্পর্শ করা, (গ) স্বাদ বা উপভোগের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ নিঃশর্তে অযু ভঙ্গকারী।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যদি খোলা হাতের তালুতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে তা অযু ভঙ্গকারী হবে। তাঁর মতে, মহিলাদের লজ্জাস্থান স্পর্শ করার হুকুমও তাই। ইমাম শাফেঈ (রহ.) ‘কিতাবুল উম্ম’-এ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, পায়ুপথ স্পর্শ করাও অযু ভঙ্গের কারণ।

তিন ইমামের দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, ইবন মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, পুরুষাঙ্গ, মহিলার লজ্জাস্থান ও পায়ুপথ স্পর্শ করা অযু ভঙ্গকারী নয়। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতও তাই।

... عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذِكْرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ

مِنْهُ— (ابو داود ج ১ ص ২৬ باب الرخصة في ذلك، ترمذي ج ১ ص ২৫ باب ترك الوضوء، من

مس الذكر، نسائي ج ১ ص ৩৮، ابن ماجه ص ৩৭)।

অর্থাৎ, ... কায়েস ইবন তাল্ক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহর নবী! অযু করার পর যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

(২৫) (ترمذي ج ١ ص ٢٥) — اَرْثَآءُ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَحْسَنُ — (ত্রম্‌ডি জ ১ স ২৫)

(৪) এ হাদীসের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রশ্রাব করা উদ্দেশ্য।

(৫) এর দ্বারা আভিধানিক অযু বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ শুধু হাত ধৌত করা। যেমন

হাদীসে এসেছে— (ترمذي ج ٢ ص ٦، تنظيم ج ١ ص ١٣٣) — اَلْوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ

অর্থাৎ, খাবার পূর্বে অযু কর।

(৬) যদি এর দ্বারা প্রকৃত অযুই ধরে নেয়া হয়, তখন এর অর্থ হবে, এটা মুস্তাহাব।

অতএব, আর কোন অসামঞ্জস্য থাকে না।

(৭) হাদীসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধের সময় কিয়াসের শরণাপন্ন হতে হয়। কিয়াস দ্বারাও হানাফীদের মায়হাবের সহায়তা হয়। কারণ, মল-মূত্র ইত্যাদি যেগুলো সরাসরি নাপাক, সেগুলো স্পর্শ করলে যেহেতু কারো মতেই অযু ভঙ্গ হয় না; তাই সুনির্দিষ্টভাবে যেসব অঙ্গের পবিত্রতা সর্বসম্মত, সেগুলো স্পর্শ করলে তো অযু ভঙ্গ না হওয়ারই কথা। (درس ترمذي ج ١ ص ٣٠٩)

بَابُ فِي تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ص ٢٥

আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর অযু না করা

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

يَتَوَضَّأُ — (মসল জ ১ স ১০৭) باب الوضوء مما مسّت النار، ابن ماجه ص ৩৮)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বকরীর রান খাওয়ার পর অযু না করেই নামায আদায় করেন।

বিশ্লেষণঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযু ভেঙ্গে যাবে কিনা তথা অযু করা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য ছিল।

* হযরত আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবন উমর ও যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ)-এর মতে, আগুনে পাকানো কোন বস্তু খেলে অযু ভেঙ্গে যাবে। তাই নামায আদায়ের জন্য নতুন করে অযু করা ওয়াজিব।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا

اَنْضَجَتِ النَّارُ (ابو داود ج ১ স ২৬) باب التّشديد في ذلك، مسلم ج ১ স ১০৭، ترمذي ج ১ স ২৫

باب الوضوء مما غيرت النار، نسائي ج ১ স ৩৭) باب الوضوء مما غيرت النار، ابن ماجه ص ৩৮)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, রক্ষনকৃত দ্রব্যাদি আহার করলে অযু করতে হবে।

দলীল (২): হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-
الثَّارُ অর্থাৎ, আঙুনে রান্না করা খাদ্য আহারের পর তোমরা অযু কর।
(সূত্রঃ ঐ)

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে অযু করা ওয়াজিব।

* খোলাফায়ে রাশেদা, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, জাবির, আনাস (রাঃ) ও চার ইমামসহ জমহুর সাহাবা-তাবেঈনের মতে, আঙুনে পাকানো বস্তু খেলে অযু ভাঙ্গবে না।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَسَ مِنْ كَنْفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ— (ابو داود ج ١ ص ٢٥)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তাঁর সামনের দাঁত দিয়ে (বকরীর) ঘাড়ের গোশত খান। অতঃপর তিনি অযু না করেই নামায পড়েন।

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ الثَّارُ— (ابو داود ج ١ ص ٢٥)

অর্থাৎ, ..জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'টি কাজের সর্বশেষ কাজ এই ছিল যে, তিনি রান্না করা খাদ্য আহারের পর অযু করেননি।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা এবং আরো অন্যান্য অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক্ষেত্রে অযু ভাঙ্গবে না। তাই অযু করা ওয়াজিব নয়।

জবাবঃ (১) আঙুনে পাকানো জিনিস খেলে অযু করতে হবে, এর হুকুম যদি থেকেও থাকে, তবে তা রহিত হয়ে গেছে। এর দলীল হল, উপরে বর্ণিত হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস।

(২) হাদীসে বর্ণিত অযু দ্বারা শরঈ বা পারিভাষিক অযু উদ্দেশ্য নয়, আভিধানিক অযু উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, খাওয়ার পর হাত-মুখ ধৌত করা। যেমন ইকরাশ ইবন যুয়াইব (রাঃ)-এর দাওয়াত সংক্রান্ত এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

... ثُمَّ آتَيْنَا بِمَاءٍ فَنَسَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكرَاشُ! هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ— (ترمذي ج ২)

ص ৭, باب التسمية على الطعام، مجمع الزوائد ج ১ ص ১০১)

অর্থাৎ, ... অতঃপর আমাদের কাছে পানি আনা হল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন। আর পানিতে ভেজা হাতের তালুর দ্বারা তাঁর চেহারা, দু'হাত ও মাথা মাসেহ করলেন। আর বলেন, হে ইকরাশ! এই অযু আগুনের রান্নাকৃত খাদ্য ভক্ষণের কারণে।

(৩) ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আগুনে পাকানো দ্রব্য খেলে অযু করা ওয়াজিব নয়।

(৪) অথবা, হাদীসে বর্ণিত অযু হুকুম মুস্তাহাবরূপে পরিগণিত, ওয়াজিব হিসেবে নয়। এর প্রমাণ নবী করীম (সাঃ) থেকে অযু করা ও না করা উভয়টি প্রমাণিত। এটা মুস্তাহাব হওয়ার জন্যই।

(৫) হাফেয ইবন কায়্যিম (রহ.) বলেন, যেহেতু আগুনে পাকানোর ফলে বস্তুতে আগুনের একটি প্রভাব থেকে যায়। আর আগুন হল শয়তান সৃষ্টির মূল উপাদান। আর আগুন পানি দ্বারা নিভে যায়। এ হিকমতের জন্যই অযুর হুকুম দেয়া হয়েছে। যেমন রাগান্বিত অবস্থায় অযুর হুকুম দেয়া হয়ে থাকে- যা মুস্তাহাব।

(৬) ইমাম মুহাল্লিব (রহ.) বলেন, যেহেতু সাহাবাগণ জাহেলী যুগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কম অভ্যস্ত ছিলেন, তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে পরিচ্ছন্নতার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে এমন হুকুম দেয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সাঃ)-এর হায়াত মুবারকের শেষের দিকে মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিও রহিত করে দেয়া হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: مصنف ابن أبي شيبة ج ১ ص ৬৭, مجمع)

(الزوائد ج ১ ص ২০১, اعلاء السلطن ج ১ ص ১৭০)

رَكْعَتَا بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الدُّمِّ ص ২৬

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَاصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةً رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهْرِقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتَّبِعُ أَثَرَ اللَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزَلَ اللَّيْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلُونَا فَاتْتَدَبَ رَجُلٌ مِّنْ

الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِيَعْمِ الشَّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فِى الشَّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَيَأْتِي الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَةً عَرَفَ أَنَّهُ رَيْبَنَةُ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ صَاحِبَهُ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَدَرُوا بِهِ هَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبِئْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ إِنْ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرُؤَهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا— (بخاري ج ١ ص ٢٩ باب من

لم يرى الوضوء الخ)

অনুবাদঃ ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যাতুর রিকা নামক যুদ্ধে গমন করি। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক স্ত্রীকে বন্দী অথবা হত্যা করে। তখন সে ব্যক্তি এরূপ শপথ করে যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ না মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোন একজন সাহাবীর রক্ত প্রবাহিত করি। তখন সে নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ করতে লাগল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছে যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা দুইজন গিরিপথের চূড়ায় পাহারা দিবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন এবং আনসারী সাহাবী নামাযে রত হন। তখন শত্রু পক্ষের ঐ ব্যক্তি (স্ত্রীলোকটির স্বামী) সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং তা আনসার সাহাবীর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু-সিজদা করে (নামায শেষে) তাঁর সাথীকে জাগ্রত করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! শত্রু পক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে সতর্ক করেননি? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযের মধ্যে (তন্ময়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম যা শেষ না করে নামায ছেড়ে দেয়া পছন্দ করিনি।

বিশ্লেষণঃ শরীর থেকে রক্ত বের হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, রবীআ ও মাকহুল (রহ.)-এর মতে, পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে অযু ভাঙ্গবে না।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসের শেষের দিকে বর্ণিত আছে যে, আনসারী সাহাবী (আব্বাদ ইবন বিশর রা.)-কে পরপর তিনটি তীর দ্বারা রক্তাক্ত করার পরেও তিনি রুকু-সিজদা করেছেন। আর রক্ত বের হওয়াতে যদি অযু ভেঙ্গেই যেত, তাহলে তো তিনি অযুবাহীন অবস্থায় নামায পড়তেন না।

দলীল (২): দারা কুতনীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - (تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٣٧)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) শিঙ্গা লাগানোর পর অযু না করে নামায পড়েছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, আহমদ, আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, কাতাদা, ইবরাহীম নাখঈ ও যুহরী (রহ.)-এর মতে, শরীরের যেকোন অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে অযু ভেঙ্গে যাবে।

দলীল (১): হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফু হাদীস-

... قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَهُ قَيْئٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيُنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَوَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ - (ابن ماجه ص ٨٥ باب في البناء على الصلوة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যার বমি হয়েছে অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে অথবা পেট থেকে মুখে পানি এসেছে কিংবা ময়ী (বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত অপেক্ষাকৃত তরল শুক্ররস) বেরিয়েছে, সে যেন ফিরে গিয়ে অযু করে। অতঃপর সে ইতোমধ্যে যদি কথা না বলে থাকে, তাহলে স্বীয় নামাযের উপর বিনা করে অর্থাৎ পূর্বে যেখান থেকে নামায ভঙ্গ হয়েছে সেখান থেকে পূর্ণ করে।

দলীল (২): নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত একটি বাচনিক (قولی) মারফু হাদীস-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ...

দলীল (৩): ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: ...

দাউদ জ ১৮, ৩৭ বাব اذا قبلت الحيضة تدع الصلوة، بخاري ج ১ ص ৬৬ বাব اقبال الحيض وادباره،
 মুসলিম জ ১৮, ১০১ বাব استحاضة وغسلها وصلواتها، ترمذي ج ১ ص ৩২ বাব المستحاضة، نسائي ج ১
 ص ৬০ বাব الفرق بين دم الحيض والاستحاضة)

অর্থাৎ, ... ফাতিমা বিনত আবু হুবায়েশ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ইন্তেহাযাগ্রস্ত (রক্তপ্রদর) হওয়ায় নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বলেন, হয়েযের রক্ত হল কালো রংয়ের। কাজেই যখন রক্তপ্রবাহের সময় কালো রং দেখা দিবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দিবে, তখন থেকে অযু করে নামায আদায় করবে। কেননা, এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রক্ত বের হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নামক একজন রাবী রয়েছে। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অনেক সমালোচনা করেছেন। যেমন, কেউ কেউ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবার কেউ তাকে দাজ্জাল বলতেও কৃপণতা করেননি। তাছাড়া হাদীসে ‘আকীল’ নামক যে রাবী রয়েছে তিনি অজ্ঞাত। অতএব, এ হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।

(২) ইহা ছিল এক সাহাবীর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। যা বাচনিক (কাওলী) হাদীসের মুকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়।

(৩) এমনও হতে পারে যে, রক্ত বের হওয়া যে অযু ভঙ্গের কারণ, এই ইলম (জ্ঞান) তখন পর্যন্ত ঐ সাহাবীর জানা ছিল না।

(৪) অথবা, রক্ত বের হওয়া যে অযু ভঙ্গের কারণ তখনো এ বিধান ছিল না, পরবর্তীতে এই বিধান নির্ধারিত হয়েছে।

(৫) সাহাবী হযরত আব্বাদ (রাঃ) নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ উপভোগে এতটা বিভোর ছিলেন যে, হয়তো তাঁর রক্ত বের হওয়ার খবরই ছিল না। অথবা খবর ছিল কিন্তু তিলাওয়াতের স্বাদ উপভোগের প্রাবল্যের কারণে নামায ভঙ্গ করতে পারেননি। যেমন হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে-

— اِنْ كُنْتُ فِي سُوْرَةِ اَقْرُوْهَا فَلَمْ اُحِبُّ اَنْ اَقْطَعَهَا (অর্থ পূর্বে দেয়া হয়েছে)

সুতরাং এটা ছিল অবস্থার প্রাবল্য। যার দ্বারা কোন ফিকহী মাসআলা উৎসারণ করা যায় না। কারণ এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসে সালেহ বিন মুতাকিল এবং সালামান ইবন দাউদ উভয়েই দুর্বল রাবী। সুতরাং উক্ত হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

(২) অথবা, হাদীসে বর্ণিত অযু না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি তাৎক্ষণিক অযু করেননি। আর তাৎক্ষণিক অযু না করার দ্বারা তিনি যে একেবারেই অযু করেননি, এমনটি বলা ঠিক নয়। (تنظيم الاشتات ج ১ ص ১৩৮)

২৭ : بَابُ فِي الْمَدْيِ (বীর্ষরস) সম্পর্কে

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَدْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ— (بخاري ج ١ ص ٤١ باب الغسل المدي والوضوء منه، مسلم ج ١ ص ١٤٣ باب المدي، نسائي ج ١ ص ٣٦ باب ما يلقض الوضوء الخ)

অনুবাদঃ ... হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার প্রায়ই মযী* নির্গত হত এবং আমি গোসল করতাম। এমনকি এ কারণে (অধিক গোসলের ফলে ঠাণ্ডাবশতঃ) আমি আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করতাম। অতঃপর আমি বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উল্লেখ করি অথবা (রাবী বলেন) অন্য কারো দ্বারা পেশ করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই তুমি তোমার লিঙ্গাশ্রে মযী দেখবে, তখনই তা ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য অযু করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনাবশতঃ বীর্ষ নির্গত হয় তবে গোসল করবে।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-

(ক) কাপড়ে মযী লাগলে পাক করার পদ্ধতি কি হবে?

(খ) মযী নির্গত হলে লিঙ্গ ধোয়ার বিধান সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনাঃ কাপড়ে মযী লাগলে তা পাক করার পদ্ধতি কি হবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ ও আহলে যাহিরের মতে, কাপড় ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই; বরং সংশ্লিষ্ট স্থানে শুধু পানির ছিটিয়ে দিলেই কাপড় পাক হয়ে যাবে।

... عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَدْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ الْإِغْتِسَالُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِيكَ عَنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنَّ

* সামান্য কামোত্তেজনার ফলে যে পাতলা আঠাল পানি পুরুষাঙ্গ হতে নির্গত হয় তাকে মযী বলে।

তা বের হলে শুধু অযু ভঙ্গ হয়।

تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَّاءٍ فَيَنْضَحُ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ - (ابو داود ج ١ ص ٢٨)

ترمذي ج ١ ص ٣١ باب المذي يصيب الثوب، ابن ماجه ص ٣٩

অর্থাৎ, ... সাহল ইবন হুнайফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক ময়ী নির্গত হত। তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, ময়ী বের হওয়ার পর অযু করাই যথেষ্ট। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাপড়ে ময়ী লাগলে কি করব? তিনি বলেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, কাপড়ের যে অংশে ময়ী লেগেছে তাতে এক আজলা পানি দেবে। যাতে তা দূরীভূত হয়।

উক্ত হাদীসে نضح শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল, পানি ছিটিয়ে দেয়া। সুতরাং ধোয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, কাপড়ে যদি ময়ী লাগে তাহলে তা ধৌত করা ওয়াজিব, যেক্ষণ পেশাব লাগার কারণে ধৌত করা ওয়াজিব। শুধু পানি ছিটানোর দ্বারা কাপড় পাক হবে না।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে- اغسل ذكرک (তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত কর)। পুরুষাঙ্গ ধৌত করার হুকুমের কারণ হল, ময়ী লাগা। অতএব, কাপড়ের হুকুমও তাই হবে।

আকলী দলীলঃ ময়ী এটা তো নাপাক। সুতরাং নাপাক প্রশ্রাব কাপড়ে লাগার কারণে যদি কাপড় ধৌত করা জরুরী হয়, তাহলে ময়ী কাপড়ে লাগলেও তা পবিত্র করার জন্য ধৌত করা জরুরী।

জবাবঃ যে সমস্ত হাদীসে نضح শব্দ এসেছে এর দ্বারা পানি ছিটানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল হালকাভাবে ধুয়ে নেয়া। যার ইঙ্গিত হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীসেও প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আরবী ভাষাভাষীরাও نضح দ্বারা গোসল বা ধৌত করা বুঝিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ ময়ী নির্গত হলে লিঙ্গ ধৌত করার বিধান কি- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, ময়ী নির্গত হওয়ার পর পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ উভয়টি ধৌত করা ওয়াজিব। ময়ী লাগুক কিংবা না লাগুক।

... عَنْ عُرْوَةَ ... قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (১) দলীল

وَسَلَّمَ لِيَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَأَنْتَنِيهِ— (ابو داود ج ১ ص ২৮, نسائي ج ১ ص ৩৭)

অর্থাৎ, ... উরওয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। ... রাবী বলেন, মিকদাদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তির স্বীয় লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করা উচিত।

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ (২) দলীল

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلُ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ

فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرَجَكَ وَأَنْتَنِيكَ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ— (ابو داود ج ১ ص ২৮)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন সাদ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গোসল ফরয হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি এবং পেশাবের পর মযী নির্গত হওয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, এটা হল মযী এবং পুরুষাঙ্গ থেকে যখন মযী নির্গত হয়, তখন তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করবে। অতঃপর নামায আদায়ের জন্য অযু করবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, শুধু ঐ জায়গাটুকু ধৌত করা ওয়াজিব, যেখানে মযী লেগেছে। পুরো লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করা ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে শুধু লিঙ্গ ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন অণ্ডকোষ ধৌত করার হুকুম দেননি।

আকলী দলীলঃ কোন জায়গা তখনই ধৌত করা ওয়াজিব, যখন তাতে নাপাক লাগে। সুতরাং অণ্ডকোষ বা পুরো লিঙ্গে মযী (নাপাক) না লাগলে তা ধৌত করা কোনক্রমেই ওয়াজিব হতে পারে না।

জবাবঃ (১) যে সকল হাদীসে পুরো লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়; বরং মুত্তাহাব উদ্দেশ্য।

(২) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, অণ্ডকোষদ্বয় ধোয়ার হুকুম শরঈ নয়; বরং চিকিৎসার্থে। কারণ ঠান্ডা পানি যেক্রপভাবে পেশাব ও দুধ বন্ধ করে দেয়, এক্রপভাবে মযীও বন্ধ করে। কারণ অণ্ডকোষের সাথেই মযীর সম্পর্ক।

بَابُ فِي مِبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمَوَاطِنِهَا ص ২৮

ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَذَكَرَ مَوَاطِنَ الْحَائِضِ أَيْضًا

অনুবাদঃ ... হারাম ইবন হাকীম থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী হয়, তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল? তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু করতে পার এবং ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে খানাপিনার বৈধতা সম্পর্কেও আলোচনা করলেন।

বিশ্লেষণঃ بِالْحَائِضِ বা ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশার অবস্থা তিনটি।

(ক) اِسْتِمْتَاعٌ بِالْجِمَاعِ বা সঙ্গমের মাধ্যমে ফায়দা নেয়া।

(খ) الْمِبَاشَرَةُ فِيمَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ বা নাভির উপরে ও হাঁটুর নিচে মেলামেশার দ্বারা ফায়দা নেয়া।

(গ) الْمِبَاشَرَةُ فِيمَا بَيْنَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ فِي غَيْرِ الْقَبْلِ وَالذُّبْرِ- অর্থাৎ, নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ এবং গুহ্যদ্বার ব্যতীত মেলামেশা করা।

প্রথম প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَى فَاغْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ-

অর্থাৎ, আর তারা তোমার কাছে হয়েয (ঋতু) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হয়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। (বাকারঃ ২২২)

অধিকাংশ আলিমের অভিমত হল, ইহাকে হালাল মনে করা কুফরী।

আর দ্বিতীয় প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। এই মেলামেশা চাই পুরুষাঙ্গ দ্বারা হোক কিংবা চুমুর দ্বারা হোক অথবা স্পর্শ-আলিঙ্গনের দ্বারা হোক এবং চাই কাপড়ের উপর দিয়ে হোক কিংবা কাপড় ছাড়া হোক, সর্বাবস্থায় জায়েয আছে।

তবে তৃতীয় প্রকারটি হালাল কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আওযাই, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, শাবী ও মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, কোন প্রকার কাপড় ছাড়াই নাভির নিচ থেকে

নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ ও গুহ্যদ্বার ব্যতীত ফায়দা নেয়া জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

দলীল (১): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُنَّ (১) الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوَهَا مِنَ الْبُيُوتِ ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ الْفُكَّاحِ الْخ- (ابو داود ج ১ ص ২৫ باب مؤكلة الحائض ومجامعتها، مسلم ج ১ ص ১৫৩ باب جواز غسل الحائض الخ، نسائي ج ১ ص ৫৫ باب تاويل قول الله الخ، ابن ماجه ص ৫৭)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা ঋতুবতী স্ত্রীদের ঋতুর সময় ঘর হতে বের করে দেয়। ... অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ঋতুকালীন একত্রে এক ঘরে বসবাস কর এবং সঙ্গম ছাড়া সব কিছুই করতে পার।

উক্ত হাদীসে আমভাবে বলা হয়েছে যে, শুধু সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই জায়েয। সুতরাং কাপড় দ্বারা অন্তরাল থাকতে হবে এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব, কাপড় না থাকা অবস্থায়ও রান থেকে ফায়দা নেয়া জায়েয হবে।

দলীল (২): উমারা ইবন গুরাব-এর ফুফু হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট হায়েয অবস্থায় স্বামীর সাথে সহাবস্থানের সঠিক পদ্ধতি কি, তা জানতে চাইলে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

... دَخَلَ لَيْلًا وَأَنَا حَائِضٌ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ فَلَمْ يَنْصَرَفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ أَدْنِي مِنِّي فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ وَأَنْ أَكْشِفِي عَنْ فَخْذِكَ فَكَشَفْتُ فَخْذِي وَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَيَّ فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفَنِي وَنَامَ- (ابو داود ج ১ ص ৩৬ باب في الرجل يصب منها الخ)

অর্থাৎ, ... একদা রাতে নবী করীম (সাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকটে এসো (আমার শরীরের সাথে মিশে যাও)। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার উরুদেশ উন্মুক্ত কর। তখন আমার উরুদেশ উন্মুক্ত করি। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল (গরম হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়ি। অতঃপর তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ) নাভি ও হাঁটুর মাঝখানে কাপড়ের অন্তরাল ছাড়াই উন্মুক্ত অবস্থায় ফায়দা নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তা জায়েয আছে।

দলীল (৩): পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে যে হুকুম এসেছে, তাতেও শুধুমাত্র যৌনাস্ত্র উপভোগ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, তাউস, আতা ও কাতাদা (রহ.) প্রমুখের মতে, কোন প্রকার কাপড়ের অন্তরাল ছাড়া নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কোন স্থান থেকেই কোন প্রকার ফায়দা নেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি অভিমতও অনুরূপ।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাপড়ের নিচ দিয়ে ফায়দা নেয়া জায়েয নয়।

দলীল (২): ... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَمْرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْإِرَارِ وَالْتَعَفُّ عَنْ

ذَلِكَ أَفْضَلُ— (ابو داود ج ১ ص ২৮)

অর্থাৎ, ... মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যতটুকু সম্ভব। তবে এটা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

দলীল (৩): ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ:

إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَنْزِرَ ثَمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجَهَا وَقَالَتْ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا— (ابو

দাউদ জ ১ ص ৩৫, بخاري ج ১ ص ৪৪ باب مباشرة الحائض، مسلم ج ১ ص ১৪১ باب مباشرة الحائض فوق

الازار، ترمذي ج ১ ص ৩২ باب مباشرة الحائض، نسائي ج ১ ص ৫৫ باب مباشرة الحائض)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে তাকে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, তিনি (সাঃ) কখনো কখনো তাঁর সাথে রাত যাপন করতেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ সহ আরো এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যেখানে পাজামা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাজামার উপর দিয়ে ফায়দা উঠানোর অনুমতি দিয়েছেন। যদি পাজামার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয হত, তাহলে কাপড়

বাঁধার নির্দেশ দিতেন না। এতে বুঝা যায় যে, পাজাপমার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়েয নয়।

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের একটি সার্বিক জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীসমূহ হালাল বা জায়েয সংক্রান্ত, আর আমাদের দলীলসমূহ হারাম সংক্রান্ত। আর ফিকহের একটি মূলনীতি হল, যখন একই বিষয়ে হালাল ও হারাম নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন হারাম সংক্রান্ত দলীলসমূহ প্রাধান্য পাবে।

প্রথম দলীলের জবাবঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে যে نكاح শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা শুধু সহবাস উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা সহবাস ও সহবাসের দিকে আকৃষ্টকারী বিষয়ও (دواعي وطى) উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস হারাম, তার আনুষঙ্গিক বিষয়ও হারাম।

(২) নবী করীম (সাঃ) 'নিকাহ' বলে ইঙ্গিতে পাজামার নিচের কার্যাদিকে বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসে আব্দুর রহমান ইবন যিয়াদ নামক একজন রাবী রয়েছে, যাকে ইয়াহইয়া ইবন মুঈন, ইমাম আহমদ, আবু যুরআ ও ইমাম তিরমিযী (রহ.) সহ অনেকেই যঈফ বলেছেন। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য হতে পারে না। (بذل المجهود ج ১ ص ১৬১)

(২) অথবা, এটি ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য খাস। যা অন্যের জন্য জায়েয নয়। কারণ নবী করীম (সাঃ)-এর স্বীয় নফস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজেই বলেন-

... وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ - (ابو

داود ج ১ ص ৩৬, مسلم ج ১ ص ১৬১)

অর্থাৎ, ... তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে কি, যে রূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছিল?

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত আয়াতে فَاعْتَزِلُوا বলে সঙ্গমের নিষেধ করা হয়েছে।

আর وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ (তাদের নিকটবর্তী হওয়া না) বলে পাজামার নিচে যে সহবাসের কামোদ্দীপক উপকরণ রয়েছে, তা থেকে পরহেয করতে বলা হয়েছে।

(تنظيم الاشتات ج ১ ص ২১২-২১৩)

২৮ : بَابُ فِي الْإِكْسَالِ ص ২৮

... عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ رُحْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقَلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ - (بخاري ج ১)

ص ৪৩ : باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، مسلم ج ১ ص ১০০ : باب بيان ان الجماع كان

الخ، ترمذي ج ১ ص ৩১ : باب ان الماء من الماء)

অনুবাদঃ ... উবাই ইবন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতা হেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের স্ত্রী-সহবাসে বীর্ষপাত না ঘটলে গোসল করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি গোসলের নির্দেশ দেন এবং পূর্বোক্ত অনুমতি রহিত করেন।

বিশ্লেষণঃ পুরুষের যৌনাস্থের অগ্রভাগ নারীর যৌনাস্থের অগ্রভাগে প্রবেশ করার ফলে গোসল ওয়াজিব হবে কিনা, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম দাউদ যাহেরীর মতে, শুধু পুরুষাস্থের অগ্রভাগ মহিলার যৌনাস্থের অগ্রভাগে ঢোকান দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না; বরং গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্ষপাত শর্ত। প্রথম দিকে হযরত উসমান, আলী, যুবাইর, তালহা ও উবাই ইবন কাব (রাঃ)-এরও অভিমত তাই ছিল। (العيني ج ১ ص ৮০)

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ -

وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ - (ابو داود ج ১ ص ২৭, مسلم ج ১ ص ১০০, ابن ماجه ص ৪০)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ পানির (বীর্ষপাতের) কারণেই পানি (গোসল) অপরিহার্য হয়। আবু সালামা (রহ.) এরূপ ফাতওয়া দিতেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) ও জমহুর সাহাবাদের মতে, পুরুষাস্থের অগ্রভাগ মহিলার যৌনীর অগ্রভাগে প্রবেশ করলেই গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্ষ বের হওয়া জরুরী নয়।

(بذل المجهود ج ১ ص ১৩৪, تعليق الصبيح ج ১ ص ২১৭)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ ...

شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَالزَّقِ الْخِتَانِ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ - (ابو দাউদ জ ১৮৮, بخاری

ج ১৮৮ ১৩ باب اذا التقي الختانان، مسلم ج ১ ১০৬, نسائي ج ১ ১১ باب وجوب الغسل اذا التقى

الختانان، ابن ماجه ص ১০৬)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কামস্পৃহা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর উপর উপগত হবে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনির অগ্রভাগে প্রবেশ করাবে- তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

দলীল (৩): ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجِبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ

أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْتَسَلْنَا - (ترمذی ج ১ ৩০ باب اذا لقي الختانان

وجوب الغسل، ابن ماجه ص ১০৬)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ রমণীর যোনাঙ্গের অগ্রভাগে অতিক্রম করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুরূপ করে আমরা গোসল করেছি।

ইজমাঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন, প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে যদিও কিছুটা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে এ বিষয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের শরণাপন্ন হওয়ার পর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উভয়ের যোনাঙ্গের অগ্রভাগ মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হবে, বীর্য বের হওয়া জরুরী নয়। (شرح مسلم ج ১ ১০৬)

জবাবঃ (১) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। যার প্রমাণ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসটি। (২) অথবা, হাদীসে "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বীর্যের ব্যাপারে সতর্ক করা। অর্থাৎ, মযী দ্বারা তো গোসল ওয়াজিব নয়, কেবল বীর্যের দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হয়।

(৩) অথবা, এই হাদীসটি স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, স্বপ্নে যা কিছুই দেখুক না কেন, বীর্য স্খলন না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না। (طحاوی ج ১ ৩১)

بَابُ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ص ৩০

অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ

... عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُهُ يَبُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تُنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ -

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে নববীতে এসে দেখতে পান যে, তাঁর সাহাবীদের ঘরের দরজা মসজিদমুখী (অর্থাৎ তাঁদের ঘরে যাতায়াতের পথ ছিল মসজিদের ভিতর দিয়ে)। তখন তিনি বলেন, তোমাদের ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে নাও। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। সাহাবাগণ এই আশায় ঘরের দরজা পরিবর্তন করেননি যে, হয়ত এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে রুখছত (অবকাশ) সূচক কোন নির্দেশ নাযিল হতে পারে। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বের হয়ে পুনরায় নির্দেশ দেন, তোমাদের গৃহের দরজা মসজিদের দিক হতে অন্যদিকে ফিরাও। কেননা ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা আমি হালাল (বৈধ) মনে করি না।

বিশ্লেষণঃ এই অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয় দুটিঃ

(ক) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয কিনা।

(খ) নাপাকী অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করা জায়েয কিনা।

প্রথম আলোচনাঃ ইবনুল মুনযিরের মতে, গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা নিঃশর্তে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

দলীলঃ ... عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَاهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي

جُنُبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ (ابو داود ج ১ ص ৩০ باب في الجنب يضاف، مسلم ج ১

ص ১৬২ ان المسلم لا ينجس، ابن ماجه ص ৪১)

অর্থাৎ, ... হুয়ায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি (সাঃ) তাঁর সাথে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে

দেন। তখন হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি অপবিত্র। নবী করীম (সাঃ) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি কখনো অপবিত্র হয় না।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, অপবিত্র ব্যক্তি যদি অযু করে মসজিদে প্রবেশ করে, তবে জায়েয আছে।

দলীলঃ رَوَى عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّأُوا وَضُوءَ الصَّلَاةِ - (تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٧٢)

অর্থাৎ, সাহাবাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নাপাক অবস্থায় সত্ত্বেও (গোসল না করে) নামাযের অযুর মত অযু করে মসজিদে বসতেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ (রহ.) ও জমহুর উম্মতের মতে, অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান করা জায়েয নয়। (معارف السنن ج ١ ص ٤٥٤-٤٥٥)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীল সমূহের বিপক্ষে একটি সামগ্রিক জবাব হলঃ প্রতিপক্ষের দলীলসমূহ হালাল সংক্রান্ত আর তিন ইমাম ও জমহুরের দলীলটি হারাম সংক্রান্ত। অতএব উসূল মোতাবিক হারামটি প্রাধান্য পাবে।

আহলে যাহিরের দলীলের জবাবঃ আসলে উক্ত বাণী মুসাফাহার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অর্থাৎ, মুসলমান কখনো এমন অপবিত্র হয় না, যার ফলে তার সাথে মুসাফাহা করা যায় না। নতুবা যদি হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ নেয়া হয়, তাহলে তো একথাও বলা সহীহ হবে যে, বীর্যপাত বা রক্তস্রাবের ফলেও একজন মুসলমান নাপাক হবে না।

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ মারফু হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবাগণের আমল দলীলযোগ্য নয়। (بذل المجهود ج ١ ص ١٤٠)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ নাপাক অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করা জায়েয কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা জায়েয আছে, তবে মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ...

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ। আর (নামাযের কাছে যেও না) অপবিত্র অবস্থায়। কিন্তু পথ অতিক্রমকারীর কথা ভিন্ন। (নিসাঃ ৪৩)

ইমাম শাফেঈ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর তাফসীর গ্রহণ করে বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত **صَلَاة**-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল **موضع صلاة** তথা মসজিদ আর **عابري** **سبيل**-এর অর্থ হচ্ছে, মসজিদের ভিতর দিয়ে গমনকারী। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ হবে, নাপাক ব্যক্তি মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করতে পারবে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক (রহ.) ও জমহুর ফকীহগণের অভিমত হল, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা এবং অবস্থান করা কোনটিই জায়েয নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) মসজিদমুখী ঘরের দরজাকে তো এজন্যই বন্ধ করতে বলেছিলেন, যাতে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করার কোন সুযোগ না থাকে। যদি নাপাক অবস্থায় চলাচল করা জায়েযই হত, তাহলে মসজিদমুখী ঘরের দরজা বন্ধের জন্য নির্দেশ দিতেন না।

জবাবঃ (১) তাফসীরের ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য হল হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর। আর তিনি আয়াতটির তাফসীরে বলেন- **صَلَاة** দ্বারা নামায উদ্দেশ্য, মসজিদ উদ্দেশ্য নয় এবং **عابري سبيل** দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসাফির। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে, তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ো না। কিন্তু যদি মুসাফির হও, তাহলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ এমতাবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় কর।

(২) **صَلَاة** দ্বারা **موضع صلاة** তথা মসজিদ অর্থ নেয়া হলে এটি হবে রূপক (**مجازي**)।

আর নিয়ম হল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শব্দের প্রকৃত (**حقيقي**) অর্থ নেয়া সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত রূপক অর্থ নেয়া জায়েয নয়। আর উক্ত আয়াতে প্রকৃত অর্থ নেয়া অনায়াসে সম্ভব, যা ইবন আব্বাসের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) নামাযে কিরাআত পড়া শর্ত। আর আয়াতটিতেও গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, "حتى تعلموا ما تقولون" উল্লেখ করার দ্বারা এই শর্তের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সুতরাং সালাত দ্বারা যদি মসজিদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এই শর্তারোপের কোন মূল্য থাকে না। তাছাড়া আয়াতটির শানে নুযুলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতটি নামায সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, মসজিদ বুঝানোর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়নি। (تنظيم ج ১ ص ১৭৩، احكام القرآن)

بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَوةٍ ص ১০

ইস্তেহাযাগ্রস্ত (রক্তপ্রদর) মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা
সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَحِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حَفْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ - (بخاري ج ১ ص ১৭ باب عرق الاستحاضة، مسلم ج ১ ص ১০১ باب

المستحاضة وغسلها وصلوتها، نسائي ج ১ ص ১৩ ذكر الاغتسال من الحائض، ابن ماجة ص ১৬)

অনুবাদঃ ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবিবা বিনত জাহশ (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্যালিকা ছিলেন এবং আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন, একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং একটি বিশেষ শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত। অতএব তুমি গোসলান্তে নামায আদায় করবে। আয়িশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি (উম্মে হাবিবা) তাঁর বোন যয়নব বিনত জাহশের হুজরাতে একটি বড় পাত্রে গোসল করতেন এবং পানিতে রক্তের লাল রং-এর প্রাধান্য হত।

বিশ্লেষণঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার গোসল সম্পর্কে বেশ এখতেলাফ রয়েছেঃ

* ইবন উমর, ইবন যুবাইর ও আতা ইবন আবী রাবাহ (রাঃ)-এর মতে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার জন্য প্রত্যেক নামাযে গোসল করা ওয়াজিব।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتَحِضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَوةٍ الْخ (ابو داود ج ১ ص ১০১،

مسلم ج ১ ص ১০১)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্শ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশ দেন।

অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা ওয়াজিব।

* হযরত আলী (রাঃ) ও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে একবার গোসল করবে। অর্থাৎ, যোহর ও আসরের নামাযের জন্য একবার গোসল করে যোহরের নামাযকে শেষ সময়ে এবং আসরের নামাযকে একটু অগ্রসর করে আউয়াল ওয়াক্তে পড়বে। কিন্তু প্রত্যেক নামায ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর মাগরিব ও এশার নামাযের জন্য একবার গোসল করে মাগরিবের নামাযকে শেষ সময়ে এবং এশার নামাযকে প্রথম সময়ে আদায় করে নেবে। তবে প্রত্যেক নামায ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর ফযরের নামাযের সময় আরেকবার গোসল করবে। অতএব, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মোট তিনবার গোসল করবে। তাঁদের মতে, প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করার হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে।

দলীল: ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهْلٍ اسْتَحْضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَغْسِلُ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَغْسِلُ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ - (ابو

داود ج ١ ص ٤١ باب من قال تجمع بين الصلاتين الخ، نسائي ج ١ ص ٤٥ ذكر اغتسال المستحاضة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহলা বিনত সুহায়েল (রাঃ) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে আগমন করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য এটা কষ্টদায়ক হওয়ায় নবী করীম (সাঃ) তাঁকে যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসলের নির্দেশ দেন।

* সাঈদ ইবন মুসায়্যিব ও হাসান বসরী (রহ.) প্রমুখের মতে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক দিন যুহরের সময় মাত্র একবার গোসল করবে।

দলীল: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ... أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ وَتَوَضَّأَ

لِكُلِّ صَلَاةٍ الخ (ابو داود ج ١ ص ٤٢ باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر الى ظهر)

অর্থাৎ, আল কানাবী ... আল-কাকা এবং যায়েদ ইবন আসলাম (রহ.) উভয়ই সুমাইয়াকে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, তাকে দৈনিক এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করতে হবে। (অর্থাৎ প্রত্যহ দুপুরের সময়) তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করতে হবে।

* চার ইমাম ও জমহুরের মতে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার হয়েযের সময়সীমা যখন চলে যায়, তখন হয়েয বন্ধের সময় শুধু একবার গোসল করে নেয়াই যথেষ্ট। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য অথবা দুই নামাযের মাঝখানে গোসল করার কোন প্রয়োজন নেই। ইবন মাসউদ, আয়িশা, উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালামা (রাঃ) প্রমুখের অভিমতও তাই। (بذل المجهود ج ١ ص ٢٥٧، بذل المجهود ج ١ ص ١١٣)

দলীল (১)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) উম্মে হাবীবা বিনত জাহশ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন-

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي - (ابو داود ج ١ ص ৩৮)

باب اذا اقبلت الحيضة الخ، بخاري ج ١ ص ٤٧ باب اذا رأت المستحاضة الطهر، مسلم ج ١ ص ١٥١

অর্থাৎ, যখন তোমার হয়েযের জন্য নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে তখন নামায হতে বিরত থাকবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নামায আদায় করবে। উক্ত হাদীসে শুধুমাত্র হয়েয বন্ধের পর গোসলের হুকুম দেয়া হয়েছে। বারবার গোসল করার কথা বলা হয়নি।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - (طحاوي ج ١ ص ১৩)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত (রক্তপ্রদর) মহিলার ব্যাপারে বলেন- সে হয়েযের দিনসমূহে নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর একবার গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে।

হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ফাতওয়া সম্পূর্ণভাবে জমহুরের সাথে মিলে যায়।

দলীল (৩)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবু হুবায়েশ নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট ইস্তেহাযা সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করলে নবী করীম (সাঃ) বলেন-

اغْتَسِلِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي - (ابو داود ج ١ ص ৪১ باب تغتسل من طهر الى طهر)

অর্থাৎ, পবিত্রতার জন্য একবার গোসল কর, পরে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযু করে নামায আদায় কর।

দলীল (৪)ঃ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ تَغْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَانِهَا -

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হয়েয়ের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার মাত্র গোসল করা ওয়াজিব। অতঃপর পুনঃ হয়েয়কালীন নির্ধারিত সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযু করবে। (সূত্রঃ ঐ)

জবাবঃ (১) প্রতিপক্ষদের থেকে বর্ণিত “প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা” এবং “দুই নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করা” উভয় হাদীসের রাবী হলেন হযরত আয়িশা (রাঃ)। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাঃ)-ই উল্লিখিত হাদীস দুটির বিপরীত হয়েয বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করার ফাতওয়া দেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ রহিত হয়ে গেছে। (طحاوي ج ١ ص ٦٣)

(২) যখন একই বিষয়ে হাদীসের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করে। জমহুরের দলীল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে, যা সনদের দিকে দিয়েও শক্তিশালী। অতএব জমহুরের হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

(৩) যে ঋতুবতী মেয়ের হয়েয়ের অভ্যাস জানা থাকে, হয়েয ও ইস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, এমন মহিলার জন্য হয়েয বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করতে হবে। যদি কোন মহিলা হয়েয এবং ইস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে এবং পূর্বে স্বভাবত হয়েয়ের সময়কাল কতদিন হত তা জানা না থাকে, এমন মহিলার জন্য প্রত্যেক নামাযে গোসল করার হুকুম প্রযোজ্য হবে। এবং যে মহিলার নিজের অভ্যাস জানা নেই, কিংবা যে রক্তের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারে; বরং কখনো রক্ত আসে এবং কখনো রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ঐ মহিলার জন্য হুকুম হল দুই নামাযের জন্য একবার গোসল করবে।

(৪) যে হাদীসে দুই নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করার হুকুম রয়েছে, এটা মুস্তাহাব, যা চিকিৎসা হিসেবে বলা হয়েছে। যাতে ঠাণ্ডার দরুণ রক্ত কম বের হয়। নতুবা আসল হুকুম তো হল, হয়েয বন্ধ হওয়ার পর একবার গোসল করা। আর এই হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব হিসেবে। (تنظيم الاشتات ج ١ ص ٢١٦)

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ ص ٤١

দুই তুহরের মধ্যবর্তী সময় গোসল

... عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

অনুবাদঃ ... আদী ইবন সাবেত (রহ.) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে এবং তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট থেকে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে, তারা হয়েযের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে নামায ত্যাগ করবে, অতঃপর পবিত্রতার জন্য গোসল করে নামায আদায় করবে। এরপর প্রত্যেক নামাযের জন্য কেবলমাত্র অযু করতে হবে।

বিশ্লেষণঃ ইস্তেহাযা ও সমস্ত মাযুর, যারা ধারাবাহিকভাবে নাপাকীর শিকার অর্থাৎ যাদের অযু থাকে না এবং চার রাকাতাত নামাযও অযু ভঙ্গ ছাড়া পড়তে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* রবীআতুর রায় ও দাউদ যাহেরীর মতে, ইস্তেহাযার রক্ত অযুভঙ্গকারী নয়। এজন্য তাদের মতে ইস্তেহাযা বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাযের জন্য অযুর হুকুম মুস্তাহাবরূপে প্রযোজ্য। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতেও ইস্তেহাযা অযুভঙ্গের কারণ নয়। কেননা, এটা সরাসরি জরায়ু থেকে বের হয় না; বরং দেহ থেকে অস্বাভাবিকভাবে একটি বিশেষ শিরা থেকে নির্গত হয়।

* সুফিয়ান সাওরী ও আবু সাওরের মতে, এমন ব্যক্তি এক অযু দ্বারা শুধু ফরয পড়বে। সুন্নত ও নফলের জন্য আলাদা অযুর প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ প্রতিটি স্বতন্ত্র নামাযের জন্য অযু জরুরী।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। তাঁরা উক্ত হাদীসে বর্ণিত **الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ**-এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বলেন, এর আবেদন হল, প্রতিটি নামাযের জন্য স্বতন্ত্র অযু করা।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এমন ব্যক্তি এক অযু দ্বারা ফরয এবং এর অধীনস্থ সুন্নত ও নফলগুলো আদায় করতে পারবে। কিন্তু এগুলো আদায়ের পর উক্ত অযু ভেঙ্গে যাবে এবং এরপর যদি কুরআন তিলাওয়াত বা কোন নফল নামায পড়তে চায়, তাহলে আলাদা অযু করতে হবে।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। তাঁদের মতে, “প্রতিটি নামাযের জন্য অযু”-এর অর্থ হল, “ফরযসহ একসময়ে আদায়কৃত নামাযসমূহ।”

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, যুফার ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত এই অযু থাকে এবং এর দ্বারা ফরয নামায ও অন্যান্য নফল এবং কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয আছে।

অবশ্য ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই অযু ভেঙ্গে যাবে।

দলীলঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ফাতেমা বিনতে জাহশ (রাঃ)-কে ইস্তেহাযার ব্যাপারে নির্দেশ দেন যে-

تَوَضَّيْ لَوْقَتِ كُلِّ صَلَوةٍ - (كتاب الاثار ج ۱ ص ۹۱)

অর্থাৎ, তুমি প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের জন্য অযু কর।

কিয়াসী দলীলঃ ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, মোজার উপর মাসেহকারীর ক্ষেত্রেও সময় শেষ হয়ে যাওয়া অযু ভঙ্গের কারণ। নামায থেকে বের হয়ে আসা কোনক্রমেই অযু ভঙ্গের কারণ নয়। অনুরূপভাবে এখানেও অযু ভঙ্গের কারণ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া, নামায নয়। (طحاوي ج ۱ ص ۱৬)

জবাবঃ রবীআতুর রায়, দাউদ যাহেরী ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতের জবাবঃ (১) ইতিপূর্বে হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীর থেকে নির্গত প্রবাহিত রক্ত অযু ভঙ্গের কারণ।

(২) বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সাঃ) ইস্তেহাযার ফলে অযুর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, যা বহুসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এর উপর কিয়াস করার কোন অবকাশ নেই।

সুফিয়ান সাওরী ও আবু সাওরের দলীলের জবাবঃ لكل صلوة-এর দ্বারা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা আদৌ ঠিক নয়। বরং এর দ্বারা পুরো নামায বুঝানো হয়েছে।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ যে সকল হাদীসে "الوضوء عند كل صلوة" বা "تتوضأ لكل صلوة" শব্দ এসেছে, এর দ্বারা খোদ নামায ও নামাযের সময় উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, عند শব্দ প্রায়ই ওয়াক্তের অর্থে প্রযোজ্য হয়।

আর لام হরফটিও সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, "إِذَا" "لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا" উক্ত হাদীসে لام হরফটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, এর অর্থ হবে, নিশ্চয় নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। (تنظيم الاشتات ج ۱ ص ২০৭)

হায়েয, ইস্তেহাযা ও নেফাস সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ

হায়েয, ইস্তেহাযা ও নিফাসের বিষয়গুলো ফিকহ ও হাদীসের জটিলতম মাসায়িলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোর সাথে দীনের অনেক আহকাম সম্পৃক্ত। যেমন, নামায, রোযা, তওয়াফ, মসজিদে প্রবেশ, সহবাস, তালাক, ইদ্বত, খুলআ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। আর এজন্যই সর্বযুগে উলামায়ে কিরাম এগুলোর সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এ বিষয়গুলোর উপর দুইশত পৃষ্ঠার,

ইমাম তাহাবী (রহ.) ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাছাড়া বাহরুর রাযিক ও শরহুল মুহাযযিব কিতাবেও এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অতি সংক্ষেপে মৌলিক বিষয়াবলী আলোচনা করা হল।

হায়েযঃ হায়েয (حيض) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হল- প্রবাহ, নিঃসরণ, ঋতুস্রাব, মাসিক, রজঃস্রাব ইত্যাদি। পরিভাষায় হায়েয বলা হয়-

هُوَ دَمٌ يَرْخِيهِ رَحِمُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا فِي أَوْقَاتٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ لَا يُولَدُ - (العيني ص ২৭৮, فتح القدير ص ১১১)

অর্থাৎ, হায়েয হল এমন রক্ত, যা প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার জরায়ু থেকে রীতিসিদ্ধ সময়ে বের হয়, সন্তান প্রসবের কারণে নয়।

হায়েযের হুকুমঃ সঙ্গম নিষিদ্ধঃ ঋতু অবস্থায় সহবাসে লিপ্ত হওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে এমন মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা করেছে। (পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে) এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যদি কেউ সঙ্গম করে তাহলে সাঈদ ইবন যুবাইর, হাসান বসরী, আওয়াঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এর কাফফারা স্বরূপ এক বা অর্ধ দিনার সদকা করা ওয়াজিব। আর তিন ইমামের মতে, সদকা আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং এই কবীরা গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা ও ইস্তেগফার পড়তে হবে।

নামায-রোযা নিষিদ্ধঃ হায়েয অবস্থায় নামায আদায় করা ও রোযা রাখা নিষেধ। আল্লামা নববী (রহ.) বলেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ঋতুবতী মহিলার জন্য নামায কাযা করার প্রয়োজন নেই, তবে রোযা কাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধু খারেজীদের মতবিরোধ রয়েছে। তারা হাদীস অস্বীকার করে বলে, রোযার ন্যায় নামাযও কাযা করা জরুরী। (المغنى ج ১ ص ৩১৭)

নামায কাযা মওকুফ হওয়ার সম্পর্কে বলা যায়, এই হুকুমটি কিয়াস দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয়। এটি শরীয়ত প্রবর্তকের নির্দেশ। তবে ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হায়েযকালে নামাযের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়। যা আদায় করা কষ্টসাধ্য। আর এরূপ কষ্ট শরীয়তে থাকার কথা নয়। কিন্তু রোযা এর পরিপন্থী। কেননা, রোযার সংখ্যা খুব বেশি হয় না।

কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধঃ ইমাম মালিক ও দাউদ যাহেরীর মতে, গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে তিলাওয়াত সাধারণত জায়েয।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ও ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে, ঋতুবতী ও গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি শুধুমাত্র

আয়াতের একটি অংশ বা হরফ কিংবা অনুরূপ খণ্ড খণ্ড করে পড়তে পারবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না। তবে গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি ও ঋতুবতীর জন্য তাসবীহ-তাহলীলের অনুমতি রয়েছে। হানাফীগণ আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন, দোয়া বিশিষ্ট আয়াতগুলো কেবল মাত্র বরকত ও দোয়ার উদ্দেশ্যে পড়া জায়েয। কিন্তু সূরা ফাতিহা দোয়া হিসেবেও পড়া যাবে না।

(شرح المذهب ج ٢ ص ١٥٨)

হায়েযের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সময়সীমাঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন কোনসময় সুনির্দিষ্ট নেই; বরং এক ফোঁটা বা একবার রক্ত প্রবাহও মাসিক হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর মতে, হায়েযের সর্বোচ্চ কাল হল সতের দিন। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, এর সর্বনিম্ন সময় হল একদিন একরাত। আর আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, দুদিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। তবে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এর সর্বোচ্চ কাল হল পনের দিন। আর ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হল তিন দিন তিন রাত। আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হল দশ দিন দশ রাত। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর পক্ষ থেকে এর সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে উল্লিখিত তিনটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আর পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ ও মালিকের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী পবিত্রতার সর্বনিম্ন কাল হল ১৫ দিন। (تنظيم الاشتات ج ١ ص ٢٠٨-٢٠٩)

আল্লামা ইবন রুশদ, ইবন কুদামা এবং আল্লামা নববী (রহ.) লিখেছেন যে, ঋতু ও পবিত্রতার সময় সম্পর্কে এই ব্যাপক মতবিরোধের কারণ হল, রেওয়ায়েতগুলোতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বিবরণ নেই। তাই ফুকাহায়ে কিরাম স্ব-স্ব পরিবেশের অভিজ্ঞতা, চাক্ষুস দর্শন এবং প্রচলিত প্রথার দিকে লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা যায়লাঈ (রহ.) বলেছেন, ঋতু এবং পবিত্রতা সম্পর্কে হানাফীদের প্রমাণ হযরত আয়িশা, মুআয ইবন জাবাল, আনাস, ওয়াসিলা ইবন আসকা ও আবু উমামা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত। এই রেওয়ায়েতগুলো যদিও কিছুটা দুর্বল, কিন্তু সূত্রাধিক্যের কারণে হাসানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(نصب الرأية ج ١ ص ١٢١-١٥٠)

ইস্তেহাযাঃ استحاضة (ইস্তেহাযা) শব্দটি حیض থেকে উদ্ভূত। বাবে ইস্তিফআলের মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল- রক্তপ্রদর।

পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার বলেন-

هُوَ دَمٌ يَسِيلُ مِنَ الْعَادِلِ مِنَ الْمَرْأَةِ لِدَاءٍ بِهَا-

অর্থাৎ, নারীর রোগের কারণে জরায়ুর বাইরের মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই ইস্তেহাযা।

* ড. আ.ফ.ম. আবুবকর সিদ্দীক বলেন, হয়েছে অথবা নিফাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও যেসব স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয়ে থাকে তাকে ইস্তেহাযা (রক্তপ্রদর) বলে।

ইস্তেহাযা ও মাসিকের রক্তের রঙঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, শুধু লাল এবং কাল রঙের রক্ত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রঙ ইস্তেহাযার রক্ত। হাম্বলীদের মায়হাবও এটাই। ইমাম মালিক (রহ.) হলুদ এবং মলিন রঙকেও হয়েছে সাব্যস্ত করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, মাসিকের সময়ে যে রঙের রক্তই বের হোক না কেন তা হয়েছে হিসেবে গণ্য হবে। তবে পরিষ্কার সাদা স্রাব বের হলে সেটা হয়েছে নয়। উল্লেখ্য যে, হানাফী মতাবলম্বী হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন, হয়েছে রক্ত ছয় প্রকার। যথা- কাল, লাল, হলুদ, মলিন, সবুজ ও মেটে। (درس ترمذي ১ ج ص ৩১১)

ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার হুকুমঃ এরূপ মহিলার জন্য শরীয়তের হুকুম এই যে, তারা তাদের হয়েছে ও নিফাসকালীন পূর্ব নির্ধারিত স্বাভাবিক সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোসল করে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য তাদেরকে অযু করতে হবে। অপরপক্ষে যে সমস্ত মহিলার ঋতুবতী হওয়ার প্রথম হতেই ‘ইস্তেহাযা’ দেখা দিবে তারা শরীয়তের নির্ধারিত সময় (হানাফী মতে, হয়েছে রক্তের জন্য ১০ দিন এবং নিফাসের জন্য ৪০ দিন সর্বোচ্চ) অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করবে। ইস্তেহাযার সময় স্ত্রী সহবাস বৈধ এবং তাকে রমযানের রোযাও রাখতে হবে।

নেফাসঃ نَفَاس (নেফাস) শব্দটি আরবী। এটি نَفْسٌ يَنْفُسُ থেকে সিফাতের সীগা। যার অর্থ হল নেফাসবিশিষ্ট মহিলা। এর আরো আভিধানিক অর্থ হল, প্রসূতি-অবস্থা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

পরিভাষায় নেফাস বলা হয়, সন্তান প্রসবের পর মহিলার যৌনাঙ্গ থেকে যে রক্ত বের হয়। (العناية ১ ج ص ১২১)

সময়সীমা ও হুকুমঃ এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। এমনকি কোন মহিলার নেফাস নাও হতে পারে। কাজেই যখনই নেফাস থেকে পবিত্রতা অর্জিত হবে (দু’একদিন বা দু’এক ঘণ্টা হোক না কেন) তখনই গোসলান্তে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রী সুলভ ব্যবহারও করতে পারবে। তবে নেফাসকালীন অবস্থায় যেসব নামায ছেড়ে দিয়েছে এর কাযা আদায় করতে হবে না, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে।

নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফেঈ, শাবী ও আতা (রহ.)-এর মতে, নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৬০ দিন। তবে ইমাম মালিক ও হাসান বসরী (রহ.) থেকে ৫০ দিনের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৪০ দিন। ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েতও তাই। ইমাম তিরমিযীর (রহ.) উক্তি মুতাবিক ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মাযহাব এটাই। (ترمذي ج ১ ص ৩১، باب كم تكث النفس)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলতঃ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন মারফু হাদীস নেই। তাই ফুকাহায়ে কিরাম স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এসব সময় নির্ধারিত করেছেন। অবশ্য হানাফীগণ এক্ষেত্রে কিয়াসের পরিবর্তে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির উপর আমল করেছেন-

... عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نَفْسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَظْلِي عَلَى وَجْهِهَا الْوَرُسَ تَعْنِي

مِنَ الْكَفِّ - (ابو داود ج ১ ص ৪৩، باب في وقت النفساء، ترمذي ج ১ ص ৩১، ابن ماجه ص ৪৭)

অর্থাৎ, ... উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় নেফাসগ্রস্ত হওয়ার পর মহিলার ৪০ দিন অথবা ৪০ রাত অপেক্ষা করতেন। রাবী বলেন, আমরা আমাদের চেহারার কাল দাগ উঠাবার জন্য এক ধরনের ‘ওয়ারস’ নামীয় সুগন্ধ ঘাস ব্যবহার করতাম।

৪৫ : بَابُ التَّيْمُمِ

... عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيْمُمِ فَأَمَرَنِي بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ - (ابو داود ج ১ ص ৪৭، بخاري ج ১ ص ৫০، باب التيمم ضربة،

مسلم ج ১ ص ১১১، باب التيمم، ترمذي ج ১ ص ৩৭، باب في التيمم)

অনুবাদঃ ... আম্মার ইবন ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট তায়াম্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, মাটিতে একবার হাতের তালু লাগিয়ে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল মাসেহ করবে।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) তায়াম্মুমে মাটিতে কয়বার হাত লাগাতে হবে।

(খ) উভয় হাত কতটুকু পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

প্রথম আলোচনাঃ তায়াম্মুমে মাটিতে কয়বার হাত লাগাতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, মাকহুল ও আওয়াসি (রহ.)-এর মতে, মুখ এবং উভয় হাতের জন্য শুধু একবারই মাটিতে হাত লাগানো যথেষ্ট। দুইবার প্রয়োজন নেই।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত আশ্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) আশ্মার (রাঃ)-কে বলেন-

... إِمَّا كَانَ يَكْفِيكَ وَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ الْخ - (ابو داود ج ١ ص ٤٦، بخاري ج ١ ص ٤٨ باب هل ينفخ في يديه الخ، ابن ماجه ص ٤٣)

অর্থাৎ, ... তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি নিজের মাটিতে হাত লাগান। অতঃপর হাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহ করেন।

উক্ত হাদীসেও দেখা যাচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) মাটিতে একবার হাত লাগিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, ইবরাহীম নাখসি ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, মুখ ও উভয় হাত মাসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত লাগানো যথেষ্ট নয়; বরং একেকটির জন্য আলাদাভাবে হাত লাগাতে হবে। অর্থাৎ, মোট দুইবার হাত লাগাতে হবে।

দলীল (১)ঃ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيْمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوُجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذَّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - (دار قطني ج ١ ص ١٨٩)

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়াম্মুম একবার চেহারার জন্য হাত লাগাবে এবং আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত লাগাতে হবে।

দলীল (২)ঃ আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوُجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - (مسندك حاكم ج ١ ص ١٧٩، دار قطني ج ١ ص ١٨٠)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, তায়্যাস্মুম হল দুবার মাটিতে হাত লাগানো। একবার চেহারার জন্য, আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।

দলীল (৩): عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَيَمُّمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبَتَيْنِ (৩) : ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - (عقود الجواهر الثيقة للزيدي ص ৪০)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তায়্যাস্মুম ছিল দুইবার হাত লাগানো। একবার চেহারার জন্য, আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।

দলীল (৪): আল্লাহ তাআলার বাণী-

... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ-

অর্থাৎ, ... তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়্যাস্মুম করে নাও। (এর পদ্ধতি হল) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে মাসেহ কর। (নিসাঃ ৪৪)

উক্ত আয়াতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে আলাদাভাবে মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর অযুতে যেহেতু একই পানি দিয়ে উভয় অঙ্গকে ধৌত করা জায়েয নয়, তেমনিভাবে তায়্যাস্মুমের ক্ষেত্রেও একই মাটি দ্বারা উভয় অঙ্গ মাসেহ করা জায়েয নয়। কেননা, তায়্যাস্মুম হল অযুর স্থলাভিষিক্ত। (تنظيم الاشتات ১ ج ص ২০৬)

জবাবঃ দলীল হিসেবে বর্ণিত হযরত আশ্মার (রাঃ)-এর হাদীসদ্বয় সংক্ষিপ্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত আশ্মার (রাঃ)-এর বাণী দ্বারাই জানতে পারি-

... قَالَ عَمَّا رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَ أَنْتَ فِي الْإِبِلِ فَاصْبَأْنَا

جَنَابَةً فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ الْخ- (ابو داود ج ১ ص ৬৬, بخاري ج ১ ص ৬৮, مسلم ج ১ ص ১৬১, ابن

ماجة ص ৬৩)

অর্থাৎ, ... আশ্মার (রাঃ) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা স্মরণ নেই, যখন আমি এবং আপনি উটের চারণভূমিতে ছিলাম, তখন আমরা উভয়েই অপবিত্র হই। এ সময় (পানি না পাওয়ার কারণে তায়্যাস্মুম দ্বারা) পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই।

আর এই সংবাদ যখন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট বললেন, তখন নবী করীম (সাঃ) সংক্ষেপে উক্ত বাণী ইরশাদ করেন, যা প্রতিপক্ষ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এর দ্বারা তায়্যাস্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তায়্যাস্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল। আর তাহল এই যে, গোসল ফরয অবস্থায় পানি না পেলে তায়্যাস্মুমের জন্য এভাবে জমির উপর

গড়াগড়ি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি একবারই হাত লাগানো যথেষ্ট হত, তাহলে হযরত আশ্কার (রাঃ) থেকেই দুইবার হাত মারার অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হত না। এমনই একটি উদাহরণ অন্য একটি হাদীসে পাওয়া যায়-

... عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كَلْتَيْهِمَا- (ابو داود ج ১ ص ৩২ باب في الغسل من الجنابة، بخاري ج ১ ص ৩৭ باب من افاض على رأسه ثلاثا، ابن ماجه ص ৪৪)

অর্থাৎ, ... যুবায়ের ইবন মুতঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট অপবিত্রতার গোসলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। (কেমনা তাঁরা ফরয গোসলে ভীষণ কঠোরতা অবলম্বন করতেন)। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি তো আমার মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি নিজের দুই হাতের দিকে ইশারা করেন।

প্রকাশ থাকে যে, এর অর্থ এই নয় যে, ফরয গোসলেও শুধু মাথা ধোয়া যথেষ্ট, অবশিষ্ট শরীর ধোয়া জরুরী নয়। এরূপভাবে হযরত আশ্কার (রাঃ)-এর হাদীসেও এই উদ্দেশ্য নয় যে, একবার হাত মারা অথবা দুই হাতের তালু মাসেহ করা যথেষ্ট; বরং এর দ্বারা প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (৩৮৮ টর্মডি জ ১)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে উভয় হাত কতটুকু মাসেহ করতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইবন শিহাব যুহরীর মতে, উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ- (النساء الآية ৪৪)

উল্লেখ্য যে, অযুর আয়াতে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অত্র আয়াতে মাসেহের ক্ষেত্রে শুধু হস্তদ্বয়ের কথাই উল্লেখ রয়েছে; কনুই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়নি। অতএব, পূর্ণ হাত মাসেহ করতে হবে।

দলীল (২)ঃ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ... فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلَّهَا إِلَى الْمَنَاقِبِ

وَالْأَبْط- (ابو داود ج ১ ص ৪০)

অর্থাৎ, আশ্কার ইবন ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... অতঃপর তারা তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন।

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, আওয়াঈ ও ইবন মুনযির (রহ.)-এর মতে, উভয় হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

দলীলঃ প্রথম আলোচনায় তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দ্বিতীয় দলীল দ্রষ্টব্য। উক্ত হাদীসে দুই হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

কিয়াসী দলীলঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা চুরির শাস্তির বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- **الْسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا** - অর্থঃ, পুরুষ চোর ও মহিলা চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। (মায়েদাহঃ ৩৮)

চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার কথা বলা হয়েছে, আর এর পরিমাণ হল দুই কজি। তদ্রূপ মাসেহের ক্ষেত্রেও শুধু হাত মাসেহের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর পরিমাণও হবে দুই কজি পর্যন্ত।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান, শাবী (রহ.) প্রমুখের মতে, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হল উভয় হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ করা।

দলীল (১)ঃ প্রথম আলোচনায় তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দলীলসমূহ।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - (ابو داود ج ١ ص ٤٧)

অর্থঃ, ... আম্মার ইবন ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

জবাবঃ ইবন শিহাব যুহরী দলীল হিসেবে যে আয়াত পেশ করেছেন, এর জবাব হল, আল্লাহ তাআলা অযুর ক্ষেত্রে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার বিধান বর্ণনা করে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে **فامسحوا بوجوهكم وأيديكم** উল্লেখ করেছেন। আর ইহা তো সুস্পষ্ট যে, তায়াম্মুম হল অযুর হুলাভিষিক্ত। যেহেতু অযুর ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার পরিমাণ “কনুই পর্যন্ত” উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসটি সাহাবাগণের আমল। যেখানে পাঁচটিরও অধিক মারফু হাদীস দ্বারা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার প্রমাণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সাহাবাগণের আমল দলীলযোগ্য নয়। তাছাড়া আম্মার ইবন ইয়াসার (রাঃ) থেকেও কনুই পর্যন্ত মাসেহের হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ এর জবাব প্রথম আলোচনায় বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ইমামগণ যে কিয়াস করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাঁরা শব্দের উপর শব্দকে কিয়াস করেছেন। আর তিন ইমাম তায়াম্মুমকে অযুর উপর কিয়াস করেছেন। আর এটা হল অর্থের উপর অর্থের কিয়াস। এই কিয়াসটি এজন্য প্রাধান্যপ্রাপ্ত যে, তায়াম্মুম হল অযুর জ্বালাভিষিক্ত। তাছাড়া তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কনুইয়ের সীমা হল অধিক সতর্কতামূলক।

(درس ترمذي ج ١ ص ٣٨٩)

بَابُ الْمُتَيْمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ ص ٤٩

তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيْمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يَعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجَزَاتِكَ صَلَوَتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْآجَرَ مَرَّتَيْنِ - (نسائي ج ١ ص ٧٥ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلوة)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পশ্চিমধ্যে নামাযের সময় উপনীত হওয়ায় তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন অযু করে পুনরায় নামায আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি নামায আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি সে সুল্লাত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি অযু করে নামায আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেন, তুমি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়েছ।

বিশ্লেষণঃ প্রথম আলোচনাঃ তায়াম্মুম করে নামায শুরু করার পর যদি নামাযে থাকতেই পানি পাওয়া যায় (যেমন কেউ পানি নিয়ে আসল) তবে দাউদ যাহেরীর

মতে, নামায ছাড়বে না; বরং এমতাবস্থায়ই নামায শেষ করবে। তাঁর মতে এমতাবস্থায় নামায ভেঙ্গে দেয়া হারাম।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আমলকে বাতিল (বিনষ্ট) করো না। (মুহাম্মদঃ ৩৩)

অতএব এমতাবস্থায় নামায ভঙ্গ করা আমলকে বাতিল করার শামিল। ফলে ইহা হারাম।

* চার ইমামের মতে, এমতাবস্থায় নামায ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নামায আদায়ের জন্য অযু করা ওয়াজিব।

দলীলঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পানি থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার আদেশ হল-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْخ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন মুখ ধৌত কর ... (মায়দাহঃ ৬) সুতরাং এর উপর অবশ্যই আমল করতে হবে।

জবাবঃ দাউদ যাহেরী যে আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এর উত্তর হল, এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া বাহ্যিকভাবে যদিও আমল বাতিল (বিনষ্ট) হওয়া বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটাই আমলের পরিপূর্ণ রূপ।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ কোন ব্যক্তি নামায আদায়ের নিমিত্তে তায়াম্মুম সম্পন্ন করেছে, এমন সময় পানি পাওয়া গেল, তখন এর হুকুম কি, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে-

* দাউদ যাহেরীর মতে, অযু করা ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেন, এটা আল্লাহ তাআলার বাণী- لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ-এর পরিপন্থী। কেননা, তায়াম্মুমও তো এক প্রকার আমল।

* চার ইমাম সহ জমহুরের মতে, এমতাবস্থায়ও আল্লাহ তাআলার হুকুম "فاغسلوا"

আদায়ের নিমিত্তে অযু করা ওয়াজিব। দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْخ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন মুখ ধৌত কর ... (মায়দাহঃ ৬)

জবাবঃ এখানেও প্রত্যক্ষ ও বাহ্যিকভাবে যদিও আমল বাতিল করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমলকেই পরিপূর্ণ করা হচ্ছে।

তৃতীয় আলোচনাঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর যদি পানি পাওয়া যায় এবং নামাযের সময়ও যদি অবশিষ্ট থাকে, তখন এর হুকুম কি, এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছেঃ

* তাউস, আতা, ইবন সীরীন ও যুহরী (রহ.) প্রমুখের মতে, নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, এখনো যেহেতু সময় বাকি আছে, অতএব নামায আদায়কারী ব্যক্তি এখনো আল্লাহ তাআলার বাণী “فَاغْسِلُوا”-এর সম্বোধনের আওতায় রয়েছে। আর উক্ত শব্দটি আদেশসূচক। যা পালন করা ওয়াজিব।

* জমহুর ইমামগণের মতে, এমতাবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পানি পাওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করেনি, তাকে পুনরায় নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং তাঁর সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেন, “তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি, সে সুন্নত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।”

জবাবঃ উক্ত আয়াতে তো বলা হয়েছে, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন হাত-মুখ ইত্যাদি ধৌত করবে। অতএব, যেহেতু নামায পড়ে ফেলেছে, তখন আর এই অবকাশ নেই।

٤٩ : بَابُ فِي الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ ص

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَبْنِي هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ اتَّحْتَسِبُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا أَن سَمِعْتُ النَّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ الْوُضُوءُ أَيْضًا أَوْ لَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ - (بخاري ج ١ ص ١٢٠ باب فضل الغسل يوم

الجمعة، مسلم ج ١ ص ٢٨٠ كتاب الجمعة، ترمذي ج ١ ص ١١١ باب من أتى الجمعة فليغتسل، نسائي ج ١ ص ٢٠٤ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাকে (আবু সালামাকে) বলেন যে, একদিন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে উমর (রাঃ) তাঁকে বলেন, তোমরা কি নামাযে আসতে দেরি কর? তখন আগন্তুক ব্যক্তি (হযরত উসমান রাঃ) বললেন, আমি তো আযান শুনেই অযু করলাম। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, শুধুই কি অযু? আর কিছু? তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুননি, যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামায আদায়ের ইরাদা করে, সে যেন গোসল করে।

বিশ্লেষণঃ জুমআর নামাযের জন্য গোসল করা ওয়াজিব নাকি সুন্নত, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* দাউদ যাহেরীর মতে, জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে-

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

দলীল (২)ঃ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ

يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ - (ابو داود ج ১ ص ৪৭, بخاری ج ১ ص ১২১, মুসলিম ج ১

ص ১৮০, نسائي ج ১ ص ২০৪)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

* চার ইমাম ও জমহুরগণের মতে, জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ

أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَطَهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنْ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ

يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ

يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضِيقًا مُّقَارِبَ السَّقْفِ إِنْ

هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍ وَعَرِقَ النَّاسُ

فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِياحٌ أَذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ

فَاغْتَسِلُوا وَلَيْمَسَ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِبِّهِ-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِالْخَيْرِ وَلَيْسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُّوا الْعَمَلَ
وَوُسَّعَ مَسْجِدَهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ - (ابو داود

ج ১ ص ৫১ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة)

অর্থাৎ, ... ইকরামা (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল এসে ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, হে ইবন আব্বাস! আপনার মতে কি জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব? উত্তরে তিনি বলেন, না। কিন্তু গোসল করা খুবই উত্তম ও পবিত্রতম কাজ- যে ব্যক্তি তা করে। এবং যে ব্যক্তি তা করে না, তার জন্য এটা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে গোসলের ইতিবৃত্ত বলব। অতঃপর তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মোটা (চামড়া ও পশমের) কাপড় পরিধান করে দৈহিক পরিশ্রম এমনকি বোঝা বহনের কাজও করত। তাদের মসজিদ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নীচু ছাদ বিশিষ্ট। একদা গরমের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে গিয়ে দেখতে পান যে, অত্যধিক গরমের ফলে মুসল্লীদের শরীরের ঘাম কাপড়ে লেগে তা হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ কারণে সকলেই কষ্ট অনুভব করছে। নবী করীম (সাঃ) নিজেও এই দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেন, “হে লোকসকল! যখন আজকের দিন (জুমুআর দিন) আসবে, তোমরা গোসল করে সাধ্যানুযায়ী তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে।” অতঃপর ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, পরবর্তীকালে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন যখন মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন, তখন তারা মোটা কাপড় পরিধান ত্যাগ করে উত্তম পোশাক পরিধান করতে থাকে, নিজেদের কাজ অন্যদের দ্বারা করাতে থাকে এবং তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে তারা ঘর্মাক্ত হওয়ায় যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত তা দূরীভূত হয়।

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জুমুআর দিন গোসল ওয়াজিব নয়।

... عَنْ سَعْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ (২) دَلِيل

فَبِهَا وَتَعِمَّتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ - (ابو داود ج ১ ص ৫১, ترمذي ج ১ ص ১১১ باب الوضوء

يوم الجمعة، نسائي ج ১ ص ২০৫ باب الرخصة في ترك الغسل الخ)

অর্থাৎ, ... সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন অযু করবে, সে যেন সুন্নাহের উপর আমল এবং উত্তম কাজ করল। কাজেই যে ব্যক্তি গোসল করবে, তা তার জন্য সর্বোত্তম হবে।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرَوْحُونَ إِلَى (৩) دَلِيل

الْجُمُعَةِ يَهَيِّئَاتِهِمْ فَيَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ - (ابو داود ج ১ ص ৫১)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করত এবং ঐ সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেই মসজিদে যেত। তাদেরকে বলা হল (নবী করীম সাঃ বলেন), যদি তোমরা গোসল করে মসজিদে আসতে (তবে উত্তম হত)।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, জুমুআর দিনে গোসল করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) যদি জুমুআর গোসল ওয়াজিব হত, তাহলে হযরত উসমান (রাঃ) কখনো গোসল পরিহার করতেন না এবং হযরত উমর (রাঃ)ও তাঁকে ফিরে গিয়ে গোসল করে আসার নির্দেশ দিতেন। যেহেতু তা করেননি, অতএব বুঝা যায়, গোসল ওয়াজিব নয়।

(২) অথবা, **فليغسل** বলে এখানে মুস্তাহাব হিসেবে হুকুম দেয়া হয়েছে, ওয়াজিবের জন্য নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ এমনও হতে পারে, হুকুমটি ওয়াজিবের জন্যই ছিল, কিন্তু পরে মানসূখ হয়ে গেছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় জমহুরের পক্ষে বর্ণিত প্রথম দলীল দ্বারা।

৫৩ : بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ التُّوبَ ص ৫৩ কাপড়ে বীর্ষ লাগলে

... عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ - (মসল জ ১০৮ ব ১৪০ باب حكم المنى، ترمذي ج ১ ص ৩১ باب المنى)

يُصِيبُ التُّوبَ، نسائي ج ১ ص ৫৬ باب فرك المنى من التوب، ابن ماجه ص ৪১)

অনুবাদঃ ... আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় হতে মনী (বীর্ষ) ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতেন।

বিশ্লেষণঃ বীর্ষ পবিত্র না অপবিত্র, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, বীর্ষ (মনী) অপবিত্র নয়।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ : (২) দলীল
 جَارِيَةً لِّعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَأَخْبِرَتْ عَائِشَةَ
 فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ابو داود

১৮৩৩, ৫৩, ১৮৩৩, ১৮৩৩)

অর্থাৎ, ... হাম্মাম ইবন হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি আয়িশা (রাঃ)-এর মেহমান ছিলেন। তাঁর স্বপ্নদোষ হওয়ার পর তিনি কাপড় হতে বীর্য ধৌত করছিলেন। তা আয়িশা (রাঃ)-এর বাঁদী দেখে তাঁকে (আয়িশাকে) অবহিত করেন। তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় হতে তা ঝুঁটে তুলে ফেলে দিতাম। উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে বীর্য ঝুঁটিয়ে বা ঘষে তোলা বিবরণ রয়েছে। অতএব, বীর্য যদি নাপাকই হত, তাহলে ঝুঁটিয়ে তোলা বা ঘষে তোলা যথেষ্ট হত না; বরং রক্তের ন্যায় ধোয়া জরুরী হত।

✓ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَخَاطِ الْخ (مجمع الزوائد ج ১, ২৭৭,

ترمذي ج ১, ৩২)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) সূত্রে মারফু আকারে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বীর্য (যদি) কাপড়ে লেগে যায় (তাহলে কি করবে?) উত্তরে তিনি বললেন, এটা তো শ্লেষ্মার মত।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে বীর্যকে নাকের শ্লেষ্মার ন্যায় বলে পবিত্র সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তা অপবিত্র নয়।

আকলী দলীলঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, অসংখ্য আন্বিয়া কিরামের জন্মের মূল উৎস হল বীর্য। অতএব, পবিত্র এই মানুষগুলোর মূল উৎস বীর্যকে কিভাবে নাপাক বলতে পারি? (كتاب الام)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য নাপাক। (شرح مسلم ج ১, ১৮৩৩)

... عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ : (১) দলীল
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ
 الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَفِهِ أَدَى - (ابو داود ج ১, ৫৩ باب الصلوة في

الثوب الخ، نسائي ج ١ ص ٥٦ باب المني يصيب الثوب، ابن ماجة ص ٤١)

অর্থাৎ, ... মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর বোন এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নী উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রী সঙ্গমকালে পরিহিত বস্ত্রে নবী করীম (সাঃ) কি নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ পড়তেন, যদি তাতে নাপাক কিছু না দেখতেন।

উক্ত হাদীসে বীর্যকে নাপাক বলা হয়েছে।

দলীল (২): **مَاعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ**

الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةٌ أَوْ بُقْعَانِ (ابو داود

১৮৩৮, بخاري ج ১ ص ৩৬ باب اذا غسل الجنابة، مسلم ج ১ ص ১৪০, نسائي ج ১ ص ৫৬, ابن

ماجة ص ৪১)

অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (আয়িশা) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় হতে মনী (বীর্য) ধৌত করতেন। তারপরও বস্ত্রের উপর ভিজা দাগ পরিলক্ষিত হত।

অতএব, মনী যদি পবিত্রই হত, তাহলে ধোয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দলীল (৩): হানাফীদের প্রমাণ সেসব রেওয়ায়েতও যাতে বীর্য খুঁটিয়ে, ঘষে বা ডলে তোলা কিংবা ধুয়ে তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বীর্য কাপড়ে রেখে দেয়া তিনি বরদাশত করতেন না। যদি এটা নাপাক না হত, তাহলে তো কোথাও না কোথাও বৈধতার বিবরণের জন্য এটা প্রমাণিত হত যে, বীর্য কাপড় বা দেহে রেখে দেয়া হয়েছে অথবা তা নিয়ে নামায পড়েছেন। এবং ন্যূনতম পক্ষে বৈধতা বিবরণের জন্য এটাকে বাচনিক বা ক্রিয়াগতভাবে পবিত্র সাব্যস্ত করা হত। অথচ গোটা হাদীস ভাঙারে কোথাও এর নযীর নেই। অতএব, বীর্য পবিত্র নয়।

দলীল (৪): পবিত্র কুরআনে বীর্যকে “তুচ্ছ পানি” বলা হয়েছে। এটাও অপবিত্র হওয়ার সহায়ক।

আকলী দলীলঃ পেশাব, মযী, ওয়াদী সবই সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। অথচ এগুলো বের হওয়ার ক্ষেত্রে অযু ওয়াজিব। অতএব, বীর্য আরো অধিক নিশ্চিতরূপে নাপাক হওয়া উচিত। কেননা, এর ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। (درس ترمذي ج ১ ص ৩৬৭)

জবাবঃ প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ নাপাক জিনিসের পাক করার পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কখনো পাক করার জন্য ধৌত করা আবশ্যিক, আবার কখনো

ধৌত করার প্রয়োজন নেই। যেমন- মাটি বা জমি শুষ্ক হওয়ার সাথে সাথেই পাক হয়ে যায়। ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই। এমনভাবে তুলা পাক করার পদ্ধতি হল, সেটাকে ধুনে ফেলা। আর বীর্য মিশ্রিত কাপড় বা স্থান পাক করার একটি পন্থা হল, বীর্যকে খুঁটে বা ঘষে তুলে ফেলানো। কিন্তু শর্ত হল বীর্য শুষ্ক ও ঘন হতে হবে। যদি ভিজা এবং পাতলা হয়, তাহলে অবশ্যই ধুতে হবে। যা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত:-

قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَاطِبًا— (إثار السنن ج ١ ص ١٥، المغني ج ١ ص ١٢٥)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম, যখন সেটি শুষ্ক থাকত। আর ধুয়ে ফেলতাম, যখন ভিজা হত।

সুতরাং শাফেঈদের পক্ষে প্রদত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে যে বীর্য ঘষে তোলা হয়েছে, এটি ছিল পাক করার একটি পদ্ধতি। যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশসহ বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষের বীর্য যেহেতু পাতলা, সেমতে কাপড়ে বা শরীরে লাগলে তা ধৌত করা বৈ পাক করার অন্য কোন পন্থা নেই।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকেই বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে-

قَالَ إِذَا اجْتَنَبَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ يَرِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ— (مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٨٢)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন কেউ কাপড় পড়ে অপবিত্র হয়, অতঃপর তাতে এর নিদর্শন দেখে, তবে সে যেন অবশ্যই তা ধৌত করে। আর যদি তাতে নিদর্শন না দেখে তাহলে যেন হালকাভাবে ধৌত করে।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর নিকটও বীর্য নাপাক। অতএব, এই বৈপরীত্য অবসানের জন্য "المني بمنزلة المخاط" বাক্যটি অবশ্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যথা-

(ক) কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য বীর্যের পবিত্রতা বর্ণনা করা নয়; বরং উপমার কারণ হল, বীর্য শ্বেশ্বার মত আঁঠালো বা পিচ্ছিল হওয়া।

(খ) আবার কেউ কেউ বলেছেন, তুলনা দেয়ার উদ্দেশ্য হল, নাকের শ্বেশ্বা যেমন সুস্থ অবস্থাতে ঘৃণা জন্মায়, তেমনিভাবে বীর্যতেও ঘৃণার উদ্বেক করে।

(গ) কেউ কেউ বলেন, নাকের শ্লেষ্মা ঘন ও শুষ্ক হলে যেমন ঘষে বা খুঁটিয়ে দূর করা যায়, তেমনিভাবে ঘন ও শুষ্ক বীর্যকেও ঘষে বা খুঁটিয়ে দূর করা সম্ভব।

আকলী দলীলের জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর কিয়াসটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বীর্য দ্বারা যেরূপভাবে আস্থিয়ায়ে কিরাম সৃজিত হয়েছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহর অনেক দুশমন যেমন ফেরাউন, হামান, নমরুদ, আবু জাহল প্রমুখ বড় বড় জঘন্য কাফির-মুশরিকও সৃজিত হয়েছে। অতএব, এমন খোঁড়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হল, অনেক সময় মূল বস্তু (حقیقة) পরিবর্তন হয়ে নাপাক জিনিসও পাক হয়ে যায়। অতএব, বীর্য যখন গোশতে রূপান্তরিত হয়ে গর্ভজাত শিশু হয়ে যায় তখন মূল (বীর্য) পরিবর্তিত হওয়ার কারণে তা আর নাপাক থাকে না। তাই ইমাম নববী (রহ.) এই কিয়াসটি দ্বারা বীর্য পাক প্রমাণ করাকে একেবারেই অবৈধ মনে করেন এবং কঠোর সমালোচনা করেছেন। (شرح المذهب ج ২ ص ৫৫৫)

بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ ص ৫৩



শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

... عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَخْصَنٍ أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ - (بخاري ج ১ ص ৩৫ باب بول الصبيان، مسلم ج ১ ص ১৩৭ باب حكم بول الطفل الخ، ترمذي ج ১ ص ২১ باب نضح بول الغلام الخ، نسائي ج ১ ص ৫৬ باب بول الصبي الخ، ابن ماجه ص ৫০)

অনুবাদঃ ... উম্মে কায়েস বিনত মিহসান (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিশুটিকে কোলে নেয়ার পর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। অতঃপর তিনি পানি আনিয়া কাপড়ের উক্ত স্থানে ছিটিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা ধৌত করেননি।

বিশ্লেষণঃ দাউদ যাহেরীর মতে, দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাব পাক। কিন্তু অন্য সকলের মতে দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাবও নাপাক। তবে ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশুর পেশাব পবিত্র করার পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, হাসান বসরী ও আতা (রহ.)-এর মতে, ছেলে শিশুর পেশাব ধোয়ার পরিবর্তে এর উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। তবে দুগ্ধপোষ্য কন্যা শিশুর প্রস্রাব ধৌত করা জরুরী।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ لُهَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرٍ (۲) دَلِيلِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى
أَغْسِلَهُ قَالَ إِمَّا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ ذَكَرٍ - (ابو داود ج ١ ص ٥٤، ابن
ماجة ص ٤٠)

অর্থাৎ, ... লুবা বা বিনত হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসায়েন ইবন আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোলে ছিলেন। এমনভাবে হুসায়েন তিনি তাঁর (সাঃ) কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে বলি, আঃ! নি অন্য একটি কাপড় পরিধান করুন এবং এই কাপড় দুটি আমাকে ধৌত করতে দিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মেয়ে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর পেশাব থেকে কাপড় পাক করার জন্য হাদীসে نفخ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ ছিটানো।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইবরাহীম নাখঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, কন্যা শিশুর পেশাবের ন্যায় ছেলে শিশুর পেশাবও ধৌত করা জরুরী। শুধু পানি ছিটালেই পাক হবে না। অবশ্য দুগ্ধপোষ্য ছেলে শিশুর প্রস্রাব অধিক ধোয়া জরুরী নয়; বরং সামান্য ধোয়াই যথেষ্ট। (عربي ۱ ج ص ۸۸۹)

দলীল (১): নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

اِسْتَنْزَهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ- (مستدرک حاکم ج ۱ ص ۱۸۳، معارف السنن ج ۱ ص ۲۷۵)

অর্থাৎ, তোমরা পেশাব থেকে সতর্ক থাক। কেননা, কবরের অধিকাংশ আযাব এ কারণে হয়ে থাকে।

দলীল (২): হযরত আম্মার (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস। এতে উল্লেখ রয়েছে-

إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ - (تنظيم الاشتات ج ١ ص ١٩٣، درس مشکوٰۃ ج ١ ص ١٩٤)

অর্থাৎ, পেশাব লাগলে তোমার কাপড় ধৌত করবে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে সাধারণভাবে প্রস্রাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। ছেলে শিশুর পেশাব হোক বা কন্যা শিশুর পেশাব হোক, মানুষের পেশাব হোক বা অন্যান্য জীবজন্তুর

পেশাব হোক, বালেগের পেশাব হোক বা নাবালেগের পেশাব হোক, আমভাবে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, হাদীসের এই ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ছেলে শিশুর পেশাব এবং কন্যা শিশুর পেশাবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না, বরং উভয়ের পেশাবই ধৌত করা জরুরী।

দলীল (৩): عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَأَتَى بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا— (اعلاء السنن

ج ১ ص ৪৭৩، اثار السنن ج ১ ص ১৭، بخاري ج ১ ص ৩০)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট শিশুদের আনা হত। একবার এক শিশুকে আনার পর তাঁর গায়ে পেশাব করে দেয়। ফলে তিনি বলেন, এর উপর ভাল করে পানি ঢেলে দাও।

জবাবঃ نضح ও رشى শব্দটি শুধুমাত্র ছিটানোর অর্থেই ব্যবহৃত হয় না; বরং গোসল করা বা ধৌত করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অতএব, نضح-এর অর্থ হবে হালকাভাবে ধৌত করা। আর لم يغسله غسلا مبالغا এর অর্থ হল لم يغسل খুব ভালভাবে ধৌত করেননি। আর হানাফীগণ তো একথা স্বীকার করে যে, ছেলে শিশুর পেশাব হালকাভাবে ধুলেই পাক হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, نضح শব্দটি যে ধৌত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এর উদাহরণ হাদীসেই পাওয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন-
أَرْسَلْنَا الْعِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنْضَحَ فَرَجَّكَ— (مسلم ج ১ ص ১৪৩ باب المذي)

অর্থাৎ, আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মযী বের হলে কি করবে? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি অযু কর এবং তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর।

উক্ত হাদীসে মযী বের হলে লজ্জাস্থান ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। এবং শাফেঈ মাযহাবের অভিমতও এই যে, মযী বের হলে লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে, শুধু পানি ছিটানো যথেষ্ট নয়। অথচ স্বয়ং শাফেঈ (রহ.) উক্ত হাদীসে نضح শব্দটির অর্থ করেছেন ধৌত করা, ছিটানোর অর্থ গ্রহণ করেননি।

নামায অধ্যায় : كِتَابُ الصَّلَاةِ

নামাযের ওয়াক্তসমূহ : بَابُ الْمَوَاقِيتِ ص ৫৬

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ قَدَرُ الشَّرَاكِ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي يَغْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَاسْفَرْتُ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ - (ترمذي ج ۱ ص ۳۸ باب مواقيت الصلوة صلعم)

অনুবাদঃ ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের নিকটে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে সামান্য ঢলে পড়েছিল এবং জুতার এক ফিতা পরিমাণ সামান্য ছায়া বায়তুল্লাহর পূর্ব দিকে দেখা গিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করেন- যখন রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় এশার নামায আদায় করেন, যখন পশ্চিমাকাশের লাল শুভ্র রং লোপ পায়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফজরের নামায আদায় করেন, যখন রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায ঐ সময় আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের নামায আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগরিবের নামায আদায় করেন যখন রোযাদার ইফতার করে। পরে তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফজরের নামায ঐ সময় আদায় করেন, যখন দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (হযরত জিবরাঈল আঃ) আমাকে লক্ষ্য করে

বলেনঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী আস্থিয়ারদের জন্য এটাই নামাযের নির্ধারিত সময় এবং এই দুই সময়ের মাঝখানেই নামাযের সময়।

বিশ্লেষণঃ উপরোল্লিখিত হাদীসের আলোকে প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে, নিঃসন্দেহে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর তুলনায় নবী করীম (সাঃ) আফজল বা উত্তম। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে উত্তম না হয়ে ইমামতি করান? সংক্ষেপে এর জবাব হল-

(১) হাদীসে 'أَمْنِي' শব্দ উল্লেখ আছে, যার অর্থ হল, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) মুক্তাদি হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নামাযের তালিম দিয়েছেন।

(২) অথবা, যদিও নবী করীম (সাঃ) উত্তম, কিন্তু এ সময় জিবরাঈল (আঃ) একটি অংশ বিশেষে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।

(৩) অথবা, তিনি নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে এসেছিলেন বলে তিনি ইমামতি করেছিলেন। এতে নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কোন হানি হয় না।

(৪) সাধারণত তুলনামূলক কম মর্যাদাশীল ব্যক্তির ইমামতি করা দৃশ্যবীয় নয়। আর এখানে নবী করীম (সাঃ) যদিও জিবরাঈল (আঃ)-এর তুলনায় উত্তম ছিলেন, তাতে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। কেননা, নবী করীম (সাঃ) অন্তিমকালে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। এমনিভাবে হুজুর (সাঃ) আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ)-এর পিছনেও নামায আদায় করেছেন।

(ابو داود ج ١ ص ٢٠ باب المسح على الخفين)

যুহরের নামাযের শেষ সময় ও আসরের নামাযের প্রথম সময়ঃ যুহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে যুহরের নামাযের সময় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যুহরের শেষ এবং আসরের নামায শুরু হওয়ার সময় নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, এক মিসল তথা যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সে বস্তুর ছায়া হতে এক গুণ বৃদ্ধি পাবে তখন যুহরের সময় শেষ এবং আসরের নামাযের সময় শুরু হবে। (فتح الملمم ج ١ ص ١٩١)

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ: (১) দলীল

وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوَّلِهِ مَا لَمْ يُحْضَرِ الْعَصْرُ- (مسلم ج ١ ص ٢٢٣ باب اوقات الصلوة

(الخمس)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যুহরের সময় শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া তার সমান দৈর্ঘ্য পরিমাণ পর্যন্ত বাকি থাকে, যতক্ষণ না আসর উপস্থিত হয়।

* ইমাম হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হলো- দুই মিসল পর্যন্ত যুহরের নামাযের সময় থাকে অর্থাৎ, ছায়া আছলী ব্যতীত দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের শেষ সময় থাকে এবং এর পরেই শুরু হয় আসর নামাযের ওয়াক্ত।

(تنظيم الاشتات ١ ج ص ٢٢١، درس ترمذي ١ ج ص ٣٩٥)

দলীল (১)ঃ আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

... كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ الظَّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ أَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى رَأَيْنَا فِيءَ التَّلَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ - (ابو داود ج ১ ص ৫৮) باب وقت صلوة الظهر، بخاري ج ১ ص ৮৭-৮৮ باب الاذان للمسافر الخ، ترمذي ج ১ ص ৪১ باب في تاخير الظهر في شدة الحر)

অর্থাৎ, ... আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। মুআয্বিন যুহরের নামাযের আযান দিতে প্রস্তুত হলে তিনি (সাঃ) বলেন, ঠাণ্ডা হতে দাও (অর্থাৎ রোদের প্রখরতা একটু নিজেজ হোক)। কিছুক্ষণ পর মুআয্বিন পুনরায় আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বলেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। রাবী বলেন, নবী করীম (সাঃ) একথা দুই অথবা তিনবার বলেন। এমতাবস্থায় যুহরের নামাযের সময় প্রায় শেষ বলে প্রতীয়মান হল। তখন নবী করীম (সাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই প্রচণ্ড গরম জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপের অংশ বিশেষ। অতএব যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - (ابو داود ج ১ ص ৫৮) بخاري ج ১ ص ৭৬ باب الابراد بالظهر في شدة الحر، مسلم ج ১ ص ২২৪ باب استحباب الابراد بالظهر الخ، ترمذي ج ১ ص ৪০ باب تاخير الظهر في شدة الحر، نسائي ج ১ ص ৮৭ الابراد بالظهر الخ، ابن ماجه (৪৯)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা নিশ্চয়ই অত্যধিক গরম জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপের অংশ বিশেষ।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে গরমের সময় যুহরের নামাযকে দেরি করে পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর হিজায় অঞ্চলে **شدة الحر** বা অধিক গরম এক মিসল পর্যন্ত ঠান্ডা হয় না। তাছাড়া বুখারীতে বর্ণিত আছে, **حتى ساوى الظل التلول** অর্থাৎ তিনি এমন সময় যুহরের নামায পড়েছেন, যখন টিলাগুলোর ছায়া এক মিসল হয়ে গেছে। আরবের টিলাগুলো সাধারণত চ্যাপ্টা ধরনের হয়। এজন্য এগুলোর ছায়া এক মিসল অপেক্ষা অনেক দেরিতে প্রকাশ পায়। (تظييم ١٦ ص ٢٢٢)

জবাবঃ (১) আল্লামা উসমানী (রহ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত **وكان ظل الرجل كطوله** অংশটি পূর্বোক্ত **زالت الشمس** ১১-এর উপর **عطف** (সংযোজন) হয়েছে। তাই এ হাদীসে যুহরের প্রথম সময়ের কথা বলা হয়েছে। শেষ সময়ের কথা বলা হয়নি।

(২) অথবা, উক্ত হাদীস নামাযের সময়ের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত হাদীসটি দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

(৩) অথবা, উক্ত হাদীসে উত্তম ও সতর্কতামূলক সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তবে দুই মিসল পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয। (درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ١٢)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে পড়ার পর যদি কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়, তাহলে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাবে। এবং তখন যুহরের নামাযের সময়ও বাকি থাকবে। সুতরাং তাঁর মতে, এই এক মিসলের সময়টা হচ্ছে যৌথ সময় (**وقت مشترك**) অর্থাৎ এই সময় যুহর ও আসরের চার চার রাকাত নামায আদায় করা যাবে।

দলীলঃ হাদীসে জিবরাঈল (আঃ)-

... صلى بي العصر (في اليوم الاول) حين كان ظله مثله وصلى بي الظهر (في اليوم الثاني) حين كان ظله مثله-

(অনুচ্ছেদের শুরুতে পূর্ণ হাদীসটির অর্থ দেয়া হয়েছে।)

উক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একই মিসলে যুহর ও আসর উভয় ওয়াক্তের নামায আদায় করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমহুর ইমামগণের মতে, যুহর ও আসরের ওয়াক্তের মধ্যে কোন যৌথ সময় নেই। বরং যুহরের সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আসরের সময় শুরু হয়ে যাবে। (درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ١٠)

أَكُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ (১) : (১) দলীল
كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ— (মসলম ১ জ ২২৩)

(ইতিপূর্বে হাদীসটির অর্থ দেয়া হয়েছে।)

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ (২) : (২) দলীল
أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ
يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ... (ترمذي ১ জ ৩৭ باب منه)

অর্থাৎ, .. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, নিশ্চয় নামাযের শুরু ও শেষ সময় আছে। যুহরের নামাযের প্রথম সময় হল, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করে। আর শেষ ওয়াক্ত হল, যখন আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرِ الشَّمْسُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْزُ الشَّفَقِ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ— (ابو داود ১ জ ৫৮ باب المواقيت، مسلم ১ জ ২২৩ باب اوقات

الصلوات الخمس، نسائي ১ জ ৯০-৯১ آخر وقت الغرب)

অর্থাৎ, ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, আসরের নামাযের সময় আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত যুহরের নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে এবং সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। মাগরিবের নামাযের সময়সীমা হল পশ্চিম আকাশের শাফাক অন্তিমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এশার নামাযের ওয়াক্ত রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত এবং সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের সময়।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যৌথ সময় বলতে কোন ওয়াক্ত নেই।

জবাবঃ হাদীসে জিবরাঈলের জবাবঃ (১) জমহুরের পক্ষে দলীল হিসেবে বর্ণিত তৃতীয় হাদীস দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা উক্ত হাদীসে প্রত্যেক নামাযের সময় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(২) প্রথম দিন আসরের নামায আরম্ভ করেছিলেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ ছিল এবং পরের দিন যুহরের নামায শেষ করেছিলেন এক মিসল হওয়ার সাথে সাথেই। যদিও বাহ্যিকভাবে উভয়টিই একই ওয়াক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু উভয়টির ওয়াক্ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

* يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ (হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী আশ্বিয়াদের জন্য এটাই নামাযের নির্ধারিত সময়) বাক্যের ব্যাখ্যা-

উল্লিখিত বাক্যে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায কি তাহলে সকল নবীদের সময়েও ছিল? অথচ আমরা জানি যে, তা কখনো ছিল না। বরং হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে পাই, হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেশত থেকে নির্বাসনের পর ফজরের সময় তাঁর তওবা কবুল হলে তৎক্ষণাৎ তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করেন। সেখান থেকেই ফজরের নামাযের সূচনা। আর যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে যুহরের সময় কুরবানী করতে পারেননি; বরং বেহেশতী দুশা কুরবানী হলে তখন তিনি শুকরিয়াস্বরূপ চার রাকাত নামায আদায় করেন। তখন থেকেই যুহরের চার রাকাত নামায শুরু হয়। হযরত উযাইর (আঃ) একশত বছর মৃত থাকার পর যখন আল্লাহ তাআলা আসরের সময় জীবিত করলেন, তখন তিনি শুকরিয়া জ্ঞাপন পূর্বক চার রাকাত নামায আদায় করেন, তখন থেকেই আসরের চার রাকাত নামাযের প্রচলন হয়। মাগরিবের সময় হযরত দাউদ (আঃ)-কে ক্ষমা করা হলে তিনিও শুকরিয়া স্বরূপ চার রাকাতের নিয়ত করে তিন রাকাত আদায়ের পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বাকি এক রাকাত আর আদায় করতে পারেননি। সেখান থেকেই মাগরিবের নামায তিন রাকাত হিসেবে পড়া হয়। (طحاوي ١ ج ٨٥-٨٦)

আর আমাদের নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম এশার নামায আদায় করেন। যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ... فَقَالَ اعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فَضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ تَصْلُهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ - (ابو داود ج ١ ص ٦١ باب وقت العشاء الآخرة)

অর্থাৎ, ... মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা এই (এশার) নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা, এই নামাযের কারণেই অন্যান্য উম্মতগণের উপরে তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে কোন নবীর উম্মত এই নামায আদায় করেনি।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবীগণের সময় এশার নামায ছিল না, কিন্তু এ হাদীস দ্বারা সকল নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবন হাজার

আসকালানী (রহ.) বলেন, হাদীসে যে وَقْتُ الْاِنْشَاءِ বলা হয়েছে তা বহুবচনের জন্য- পৃথকীকরণ বুঝানোর জন্য নয়।

* আল্লামা বায়যাতী (রহ.) বলেন, এশার নামায পূর্ববর্তী নবীগণের উপর ফরয ছিল না। কিন্তু নবীগণ তা নফল হিসেবে আদায় করতেন। এ জন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উল্লেখ করেন। অথবা হাদীসের এ উক্তি দ্বারা নামাযের দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি; বরং পূর্ববর্তী আদ্বিয়ায়ে কিরামের ওয়াক্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (درس ترمذي ج ١ ص ٤٠٠)

* উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে আরো একটি প্রশ্ন উঠে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) তো নামাযের জন্য আদিষ্ট নন। সুতরাং তাঁর উপর নামায বড়জোর নফল হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর উপর তো নামায ফরয। সুতরাং এক্ষেত্রে নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয নামায আদায়কারীর ইজ্জিদা হচ্ছে- যা হানাফী মাযহাব মতে জায়েয নয়। এর উত্তর হল-

(১) কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের আকৃতি ও পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)-এর উপরও নামায ফরয ছিল না, বরং নফলই ছিল। আর নফল নামায আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর ইজ্জিদা নিঃসন্দেহে জায়েয।

(২) অথবা, এটা তো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক যুগে হয়তো নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইজ্জিদা জায়েয ছিল। যেমন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযে চলাফেরা করা বা কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল। অতঃপর এগুলো রহিত হয়ে যায়।

(৩) আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)-কে আদেশ করার ফলে তার উপরও নামায আদায় ফরয হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং জিবরাঈল (আঃ)ও ফরয আদায়কারী ছিলেন। (تظهير ج ١ ص ٢٢٦)

بابُ وَقْتِ صَلَوةِ الظُّهْرِ ص ٥٨

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِّنَ الْحَصَى لِيَتَرَدَّ فِيَّ كَفِّي أَضَعَهَا لِحَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ-

অনুবাদঃ ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যুহরের নামায আদায় করতাম। তিনি এক মুষ্টি পাথরের নুড়ি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য আমার হাতে দেন, যেন আমি অত্যধিক গরমের কারণে তা আমার সিজদার স্থানে রেখে তার উপর সিজদা করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম, নাকি বিলম্বে পড়া উত্তম- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর এক উক্তি অনুযায়ী, যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। তবে গ্রীষ্মকালে উষ্ণ দেশে এবং দূর দূরান্ত থেকে লোকজনের জামাআতে শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়া উত্তম। (فتح الملموع ج ২ ص ১৭৭)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) যদি বিলম্বেই নামায আদায় করতেন, তাহলে তো অত্যধিক গরম থেকে বাঁচার নিমিত্তে সিজদার স্থানে রাখার জন্য পাথরের নুড়ি জাবিরের হাতে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সাঃ) যুহরের নামায বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।

দলীল (২)ঃ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ

وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَقُوبُ اللَّهِ - (ترمذي ج ১ ص ৬৩ باب في الوقت الاول من الفضل، دار قطني ج ১ ص ৭৩)

অর্থাৎ, হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, নামাযের প্রথম ওয়াক্ত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর শেষ ওয়াক্ত হল আল্লাহর পক্ষ হতে মার্জনা।

... عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا

أَنْتَ الْخ (ترمذي ج ১ ص ৬৩)

অর্থাৎ, আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, হে আলী! তিনটি বিষয়ে তুমি কখনো দেরী করবে না। নামায- যখন ওয়াক্ত এসে যায়।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুহরের নামাযও তাড়াতাড়ি আদায় করাই উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, ইসহাক, ইবন মুবারক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক মতানুযায়ী, গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়া এবং শীতকালে যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। (شرح مسلم ج ১ ص ২২৬)

দলীল (১): হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-
 ... حَتَّى رَأَيْنَا فَيْئَ التُّوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ
 فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ - (ابو داود ج ১ ص ৫৮ باب وقت صلاة الظهر)

(ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদীসটির অর্থ ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।)

দলীল (২): ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ
 الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ الْخ - (ابو داود ج ১ ص ৫৮)

(ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদীসটির অর্থ ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।)

দলীল (৩): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ
 الْبُرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ - (بخاري ج ১ ص ১২৬ كتاب

الجمعة باب اذا اشتد الحر الخ)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)
 প্রচণ্ড শীতের সময় নামায আগে পড়তেন এবং প্রচণ্ড গরমের সময় নামায পড়তেন
 ঠান্ডার সময়ে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালের নামায
 আদায়ের সময়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এবং এর হুকুমও ভিন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে
 নামায বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব এবং শীতকালে নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা
 তাড়াতাড়ি প্রমাণিত হয়, তা حديث ايراد তথা শীতকালীন হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসদ্বয়ে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা উত্তম ওয়াক্তের
 প্রথম সময়কে বুঝানো হয়েছে, সাধারণ ওয়াক্তের প্রথম সময়কে বুঝানো হয়নি।

সুতরাং তাড়াতাড়ি নামায পড়ার যে হাদীস তা শীতকালের জন্য উত্তম ওয়াক্ত
 হিসেবে গণ্য হবে এবং দেরিতে নামায পড়ার যে হাদীস তা গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম
 ওয়াক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। আর হযরত আনাস (রাঃ)-এর উল্লিখিত হাদীসটি
 স্পষ্টভাবে এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে। অতএব কোন মতানৈক্যের অবকাশ নেই।

(تنظيم الاشتات ج ১ ص ২২৭)

بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ ص ৫৯ : আসরের নামাযের ওয়াক্ত

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ مُرْتَفَعَةً حَيَّةً وَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً— (بخاري ج ١ ص ٧٨ باب وقت العصر، مسلم ج ١ ص ٢٢٥ باب استحباب تقديم الظهر الخ، نسائي ج ١ ص ٨٨ تعجيل العصر، ابن ماجه ص ٤٩)

অনুবাদঃ ... হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য উপরে উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত এবং কোন ব্যক্তি নামায শেষে ‘আওয়ালীয়ে মদীনা’* বা মদীনার উচ্চ শহরতলীতে যাওয়ার পরেও সূর্য উপরে দেখতে পেত।

বিশ্লেষণঃ ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। উল্লেখ্য যে, শাফেঈ (রহ.) বলেন, সূর্য হলুদ বর্ণ হলেই আসরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

... قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ— (ابو داود ج ١ ص ৫৯، بخاري ج ١ ص ৭৮، مسلم ج ١ ص ২২২ باب اوقات الصلوات الخمس، ترمذي ج ١ ص ৪১ باب تعجيل العصر، نسائي ج ١ ص ৮৮، ابن ماجه ص ৪৯)

অর্থাৎ, ... উরওয়া বলেন, আয়িশা (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যখন সূর্যের রশ্মি তাঁর ঘরের মধ্যে থাকত এবং তা দেয়ালে উঠার পূর্বে।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া হত। কেননা, সূর্য উপরে থাকলেই তো হুজরার ভিতরে রশ্মি পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ রাফি ইবন খাদীজ (রাঃ) বলেন—

* আওয়ালী হল মদীনার পার্শ্ববর্তী শহরতলীতে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। মদীনা হতে এর নিকটতম দূরত্ব হল দুই মাইল এবং শেষ প্রান্তের দূরত্ব হল আট মাইল।

... كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَنَحَّرَ الْجَزُورُ فَتَقَسَّمَ عَشَرَ قِسْمًا ثُمَّ تَطْبِخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ - (মসল জ ১০২ বাব
استحاب التبرك بالعصر)

অর্থাৎ, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আসরের নামায আদায় করতাম। অতঃপর উট জবাই করা হত এবং তা দশ ভাগে বিভক্ত করা হত। অতঃপর তা রান্না করা হত। এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা ভোনা গোশত খেতাম।

সুতরাং, আসরের পর এত কাজ তখনই সম্ভব, যখন আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া হবে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়াই উত্তম।

* আর আসরের নামাযের শেষ ওয়াক্তের দলীল- আওয়াঈ (রহ.) বলেন-

... وَذَلِكَ أَنْ تَرَى مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ - (আবু দাউদ জ ১০২ বাব التشديد
الخ)

অর্থাৎ, ... আসরের নামাযের সর্বশেষ সময় হল যখন সূর্যের হলুদ রঙ ভূমিতে প্রতিভাত হতে দেখা যায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, আসরের নামায সূর্যালোক ফ্যাকাশে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেরি করা উত্তম। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- সহ জমহুরগণ বলেন, আসরের নামাযের শেষ সময় হল সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (যদিও মাকরুহ)

(درس ترمذي ج ১ ص ৪০৯)

... عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّينَةُ فَكَانَ يُؤَخَّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيَضَاءَ نَقِيَّةَ - (আবু দাউদ জ ১০২ ص ৪০৯)

অর্থাৎ, ... আলী ইবন শায়বান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট মদীনাতে আগমন করি। এ সময় তিনি আসরের নামায সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকাবস্থায় (সূর্যের রং পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে) আদায় করেন।

দলীল (২): হযরত উস্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ - (ترمذي ج ১ ص ৪২ باب في تأخير صلاة العصر)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহরের নামায তোমাদের চেয়ে অনেক আগে পড়তেন। আর তোমরা তাঁর চেয়েও অনেক আগে আসর পড়।

উক্ত হাদীসে আসরের নামায তাড়াতাড়ি না পড়ার জন্য পরোক্ষভাবে আদেশ করা হয়েছে। অতএব বিলম্বে আদায় করাই উত্তম।

দলীল (৩): রাফি ইবন খাদীজ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ - (مجمع الزوائد

ج ১ ص ৩০৬، مصنف ابن أبي شيبة ج ১ ص ৩২৭)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) আসরের নামায দেরি করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।

উক্ত হাদীস দ্বারাও আসরের নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব বুঝা যায়।

দলীল (৪): সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের নামাযের ওয়াক্ত থাকার দলীল-

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ رَكْعَةً

قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْخ (ابو داود ج ১ ص ৫৭ باب من ادرك ركعة الخ، بخاري ج ১

ص ৮২ باب من ادرك من الفجر ركعة، ترمذي ج ১ ص ৫৫، نسائي ج ১ ص ৯০، ابن ماجه ص ৫১)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরো নামায (ওয়াক্তের মধ্যে) আদায় করল (এবং তা কাযা গণ্য হবে না)।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাব (১): হাফিজ ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এখানে হুজরা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আয়িশা (রাঃ)-এর কক্ষ। যদি ধরে নেয়া হয় হুজরাটি ছিল ছাদবিশিষ্ট, এমতাবস্থায় সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করার পথ শুধু দরজাই হতে পারে। আর আয়িশা (রাঃ)-এর কক্ষের দরজা ছিল পশ্চিম দিকে। কিন্তু ছাদ যেহেতু ছিল নীচু এবং দরজাটিও ছিল ছোট, এজন্য তাতে সূর্যের আলো তখনই ভিতরে আসা সম্ভব, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকটুকু নীচে চলে যায়। সুতরাং উক্ত হাদীসটি হানাফীদের মাযহাব মুতাবিক আসর দেরিতে পড়ার প্রমাণ মিলে, আগে পড়ার নয়।

(২) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হুজরাটি ছিল ছাদবিশীন। এমতাবস্থায় সূর্যের আলো কক্ষে প্রবেশ করার পথ হবে ছাদের দিকে ওথা উপর দিক। কিন্তু যেহেতু দেয়ালগুলো ছিল ছোট এজন্য সূর্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত হুজরার উপরে থাকত, আর সূর্যের আলো দেয়ালের উপর পড়ত একেবারে শেষ গময়ে। দেয়াল যে ছোট ছিল এর দলীল হল- কতক সময় নবী করীম (সাঃ) হুজরার

ভিতরে থেকে ইমামতি করতেন আর সাহাবাগণ বাইরে থেকে ইকতিদা করতেন। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন দেয়াল ছোট হয় এবং মুকতাদি ইমামের অবস্থা দেখতে পায়। সুতরাং উক্ত হাদীসটি দ্বারা আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার দলীল পেশ করা যায় না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) ‘আওয়ালী মদীনা’ যাওয়ার ঘটনাটি এমন লোকের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যারা খুবই দ্রুতগতিতে চলতে পারতেন অথবা ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তারা সেখানে দ্রুত যেতেন। অতএব, এর দ্বারা তাড়াতাড়ি প্রমাণিত হয় না।

(২) গ্রীষ্মের সময় আসরের নামাযের পরেও অনেক সময় বাকি থাকে। হয়ত ইহা ঐ সময়ের ঘটনা।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) কসাই এবং বাবুর্চি যদি সুদক্ষ হয়, তবে আসরের পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই এগুলো আনজাম দেয়া কোন ব্যাপারই নয়। বিশেষ করে আরব জাতির জন্য। কেননা, তারা এখনো অর্ধসিদ্ধ গোশত খেতে পছন্দ করে। আর এজন্য খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। এক-দেড় ঘণ্টাই যথেষ্ট। আর যদি তাড়াতাড়ি আসরের নামায পড়া হয়, তাহলে তো তিন ঘণ্টার উপরে সময় থাকে। আর এ সময়ে তো সবাই এই কাজ করতে পারবে। বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এর দ্বারা দেরি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

(২) আসরের পর উটের গোশত রান্না করে খাওয়া, এগুলো ঘটনাচক্রে হয়েছিল, ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল না। সুতরাং এগুলো দ্বারা আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করার দলীল দেয়া যায় না। কারণ, ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হয় না।

(فتح الملمح ج ٢ ص ٢٠١، درس ترمذي ج ١ ص ٤٠٩، تنظيم ج ١ ص ٢٣٠-٢٣١، درس مشکوٰة ج ٢ ص ١٩-٢٠)

সর্বোপরি বলা যায় যে, আসর (عَصْر) শব্দের অর্থই হল নিংড়ানো, যা কোন বস্তুর শেষ অংশকে বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং আসর দিনের শেষ অংশ মাগরিবের এক-দেড় ঘণ্টা পূর্ব মুহূর্তটি হওয়াই যথোপযুক্ত সময়।

* আসরের নামাযের শেষ ওয়াক্তের দলীলের জন্য ইমাম শাফেঈ (রহ.) যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাব হল- (১) উক্ত হাদীসে মুস্তাহাব সময়ের শেষ ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে, মুতলাক বা নিরঙ্কুশ ওয়াক্তের কথা বলা হয়নি।

(২) অথবা, সূর্য হলুদ হওয়ার পর وَقْتُ كَامِلٍ (পূর্ণ ওয়াক্ত) থাকে না, সেকথা বলা হয়েছে। তবে وَقْتُ نَاقِصٍ (অপূর্ণ ওয়াক্ত) সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাকরুহের সাথে রিদ্‌যমান থাকে।

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ص ৫৭

যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পেল, সে যেন পুরো নামায পেল

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ— (بخاري ج ১ ص ৪২ باب من ادرك من الفجر ركعة، مسلم ج ১ ص ২২১، ترمذي

ج ১ ص ৪৫ باب من ادرك ركعة، نسائي ج ১ ص ৯০، ابن ماجه ص ৫১)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরো নামায (ওয়াক্তের মধ্যে) আদায় করল (এবং তা কাযা গণ্য হবে না)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত আদায় করতে পারল সে যেন পুরা নামাযই (ওয়াক্ত থাকতেই) আদায় করল।

বিশ্লেষণঃ উপরিউক্ত হাদীসটির শাব্দিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামায পেলেই একথা বলা যাবে যে, সে পূর্ণ নামাযই পেয়ে গেছে, অবশিষ্ট নামায আদায় বা পূর্ণ করার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ সকল উলামাদের অভিমত হল এই যে, বাকী নামায আদায় করা অবশ্যই জরুরী। অতএব নিঃসন্দেহে এই হাদীসে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যথাঃ

১। مَنْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ رُكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ ১ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আসরের এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, সে ব্যক্তি আসরের নামাযের সময় পেল। এমনিভাবে-

مَنْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ رُكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, সে ব্যক্তি ফজরের নামাযের সময় পেল। সুতরাং ঐ নামায কাযা করতে হবে।

২। অথবা, এই হাদীস মাসবুক (যে পরে এসে ইমামের পিছনে নিয়ত করল) ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ وَآيُضًا فِي الْفَجْرِ—

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে আসরের এক রাকাত নামায পড়ার সুযোগ পেল সে যেন পুরো জামাতের সওয়াব পেল। এমনিভাবে ফজরের নামাজের ক্ষেত্রেও।

৩। অথবা, مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَجُوبَ الصَّلَاةِ الصُّبْحِ

وَكَذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ وَجُوبَ الصَّلَاةِ الْعَصْرِ-

অর্থাৎ, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাতের সময় পেল, সে ফজরের নামাযের উজুব বা আবশ্যিকতা পেয়ে গেল। আর যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাতের সময় পেল, সে আসরের নামাযের আবশ্যিকতা পেল।

৪। অথবা, ইহা নেফাস ও ঋতুবতী মহিলাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এমন মহিলা যদি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হয়ে এক রাকাত নামায পড়ার সুযোগ পায়, তাহলে সে এই নামাযকে কাযা করবে।

৫। অথবা, এমতাবস্থায় যদি কোন কাফের মুসলমান হয় বা কোন শিশু বালেগ হয় যে, সে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, তাহলে ঐ নামায তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং কাযা আদায় করে নিবে।

৬। অথবা, উক্ত উক্তির অর্থ হবে- **فَقَدْ أَدْرَكَ حُكْمَ الصَّلَاةِ** যেমন- কোন ব্যক্তি মাম্নত করল যে, ঢাকা যাওয়ার পর যদি আমি আজকের আসর অথবা ফজরের নামায পাই, তাহলে আমার গোলাম আযাদ। আর ঐ ব্যক্তি ঢাকা ঐ সময় পৌঁছল যে, সে এক রাকাত নামায পড়ার মত সময় পেল। তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর নামায পাওয়ার বিধান ধার্য হবে। এমতাবস্থায় তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

৭। অথবা, **فَقَدْ أَدْرَكَ ثَوَابَ كُلِّ الثَّوَابِ بِإِعْتِبَارِ نِيَّةٍ لَا بِإِعْتِبَارِ عَمَلٍ** অর্থাৎ, নিয়তের কারণে নামাযী ব্যক্তি পুরোপুরি সওয়াব পেয়ে যাবে, আমলের কারণে নয়।

(درس ترمذي ج ١ ص ٤٣٤، فتح العلم ج ٢ ص ١٨٦)

১০. **بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ** : মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ- (بخاري ج ١ ص ٧٩ باب وقت المغرب، مسلم ج ١ ص ٢٢٨)

باب اول وقت المغرب، نسائي ج ١ ص ٩٠ تعجيل المغرب، ابن ماجه ص ٥٠)

অনুবাদঃ ... হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা তীর নিক্ষেপ করতাম। তা পতিত হওয়ার স্থান আমাদের যে কেউ দেখতে পেত।

বিশ্লেষণঃ মাগরিব নামাযের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে জমহুর ইমামগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। ইহা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায়। তবে এর শেষ সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ এবং আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, সূর্যাস্তের পর আযান ও ইকামত সম্পন্ন করে পাঁচ রাকাত নামায আদায় করতে যে সময়টুকু লাগে, ঠিক ততটুকু সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। এরপর থেকেই এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলীলঃ হাদীসে জিবরাঈল। জিবরাঈল (আঃ) পরপর দু'দিন একই সময়ে মাগরিবের নামায আদায় করেছেন। হাদীসটিতে উল্লেখ আছে-

... وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ الْخ

(পূর্ণ হাদীসটি নামায অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে)

যদি মাগরিবের সময়সীমার ক্ষেত্রে প্রশংসিতার অবকাশ থাকত তবে তিনি উভয় দিন একই সময়ে নামায পড়তেন না। অথচ অন্যান্য ওয়াক্তের নামায তিনি দু'দিন দু'সময়ে আদায় করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, “শাফাক”^{*} অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত থাকে। এর পর থেকে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَقْتُ

الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْزُ الشَّفَقِ الْخ (ابو داود ج ১ ص ৫৮ باب المواقيت، مسلم ج ১ ص ২২৩)

باب اوقات الصلوات الخمس، نسائي ج ১ ص ৫১ آخر وقت المغرب)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ... মাগরিবের নামাযের সময়সীমা হল পশ্চিম আকাশের “শাফাক” স্তিমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং মাগরিবের নামাযের সময়ের ব্যাপারে যত বাচনিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই “শাফাকের” কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব, মাগরিবের নামাযের শেষ সময় হল “শাফাক”-এর সমাপ্তিকাল।

১. ইমাম শাফেঈ ও অধিকাংশ আলোমের মতে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লাল আভা দেখা দেয় তাকে “শাফাক” বলে। ইমাম আবু

হানিফার প্রসিদ্ধ মতে, লাল আভা দূরীভূত হওয়ার পর যে গুহতা উদ্ভূত হয় তাকে “শাফাক” বলে।

জবাবঃ (১) হাদীসে জিবরাঈল উক্ত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা উক্ত হাদীসে প্রত্যেকটি নামাযের সময় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(২) অথবা, মাগরিবের নামায যে সর্বদা প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব, একথা বুঝানোর জন্য জিবরাঈল (আঃ) উভয় দিন প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করেছেন। তবে একথা সত্য যে, মাগরিবের নামায বিলম্ব করা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরুহ। কিন্তু একথা বলা আদৌ সমীচীন নয় যে, পাঁচ রাকাতের পরে আর মাগরিবের ওয়াক্তই বাকি থাকে না। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১৩)

عَشَارِ النَّامَايَ شَيْخِ الْوَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ص ১০

... عَنْ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسَقُوطِ الْقَمَرِ الثَّلَاثَةِ - (ترمذي ج ১ ص ৪২ باب وقت الصلوة العشاء الآخرة، نسائي ج ১ ص ৭২ تعجيل العشاء)

অনুবাদঃ হযরত নোমান ইবন বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই নামায তৃতীয়ার চাঁদ অন্তিমিত হওয়া পরিমাণ সময়ের পর আদায় করতেন।

বিশ্লেষণঃ এই অনুচ্ছেদে দু'টি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যথা-

(ক) এশার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম নাকি রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা উত্তম। (খ) এশার নামাযের শেষ সময় কখন?

প্রথম আলোচনাঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এশার নামায শাফাক বিলীন হওয়ার পর তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। আর তৃতীয়ার চাঁদ তো শাফাকের একটু পরেই অন্তিমিত হয়ে যায়। সুতরাং এর দ্বারা এশার নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম প্রমাণিত হয়।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ (রহ.) প্রমুখের মতে, এশার নামায রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা মুস্তাহাব।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَّنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نُنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا

نَذَرِيْ أَشْيَئُ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ تَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِيْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ - (ابو داود ج ١ ص ٦٠، بخاری ج ١ ص ٨١ باب النوم قبل العشاء الخ، مسلم ج ١ ص ٢٢٩ باب وقت العشاء، ترمذی ج ١ ص ٤٢ باب تأخير العشاء الآخرة، نسائی ج ١ ص ٩٣ ما يستحب من تأخير العشاء)

অর্থাৎ, ... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আগমন করেন। তিনি কি কারণে বিলম্ব করেন তা আমরা অবগত ছিলাম না। তিনি এসে বলেন, তোমরা কি এই নামাযের প্রতীক্ষায় ছিলে? যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক না হত তবে আমি প্রত্যহ এশার নামায এই সময়ে আদায় করতাম। অতঃপর তিনি মুআযযিনকে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন।

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوُ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَآخِذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَآخِذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَأَنْكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَخْرَتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ - (ابو داود ج ١ ص ٦١، نسائی ج ١ ص ٩٣، ابن ماجه ٥٠)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এশার নামায আদায় করি। সেদিন তিনি আনুমানিক অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর এশার নামায আদায় করতে আসেন। অতঃপর বলেন, তোমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর আমরা নিজেদের স্থানে গসে থাকি। অতঃপর বলেন, অনেকেই এশার নামায আদায় করে শুয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ এ নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ তোমরা নামায আদায়কারী হিসেবে পরিগণিত হয়েছ। যদি দুর্বলের দুর্বলতা ও রোগীর রোগগ্রস্ততার আশংকা না থাকত, তবে আমি এই নামায আদায়ের জন্য অর্ধ-রজনী পর্যন্ত বিলম্ব করতাম।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এশার নামায রাত্রে এর এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা উত্তম।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) নোমান ইবন বশীর (রাঃ)-এর যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে জমহুর আলিমগণ বলেন যে, (১) যদিও দ্বিতীয় তারিখের চাঁদ শাফাক বিলুপ্ত হওয়ার পরপরই অস্তমিত হয়ে থাকে, কিন্তু তৃতীয় চাঁদ বেশ দেরিতে অস্তমিত হয়। কেননা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে, চাঁদ প্রতি রাতে প্রথম রাতের তুলনায় প্রায় ৪৮ মিনিট আকাশে বেশি থাকে। এরূপভাবে তৃতীয় তারিখে চাঁদের অস্ত সূর্যাস্তের প্রায় আড়াই বা পৌনে তিন ঘণ্টা পরে হয়ে থাকে। ফলে তৃতীয় চাঁদ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অতএব, এ হাদীসটি শাফেঈর দলীল নয়; বরং জমহুরের দলীল। (درس ترمذي ج ১ ص ১১৭)

(২) নোমান বিন বশীর (রাঃ)-এর হাদীসটি ক্রিয়াবাচক আর জমহুরের প্রদত্ত দলীল বাচনিক। সুতরাং বাচনিক দলীলই প্রাধান্য পাবে। (تنظيم الاشتات ج ১ ص ২৩০)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এশার নামাযের আখেরী ওয়াক্ত হল অর্ধ রাত্র পর্যন্ত। এরপর থেকে ফজর উদয় পর্যন্ত সময়টি হল মুহমাল (উপেক্ষিত)। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর একটি মত অনুরূপ।

দলীলঃ ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ... وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ... (ابو داود ج ১ ص ৫৮, بخاري ج ১ ص ৮১ باب وقت العشاء إلى نصف الليل، مسلم ج ১ ص ২২৩، نسائي ج ১ ص ৭১)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ... এশার নামাযের ওয়াক্ত রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমহুরের মতে, এশার নামাযের আখেরী ওয়াক্ত হল সুবেহ সাদিক পর্যন্ত। (যদিও মাকরুহ)

দলীলঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يُغِيبُ الشَّفَقُ وَأَخْرُهُ حِينَ يَطْلُعَ الْفَجْرُ - (طحاوي)

অর্থাৎ, এশার প্রথম ওয়াক্ত হল যখন শাফাক অস্তমিত হয় এবং এর শেষ ওয়াক্ত হল যখন ফজর উদিত হয়।

জবাবঃ সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও অন্যান্যরা যে হাদীস পেশ করেছেন, এর জবাব হল, এর দ্বারা নির্বাচিত সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যা সকলেই বলে থাকেন।

* আল্লামা ইবন হুমাম ও তাহাবী (রহ.) বলেন, এশার শেষ সময় নিয়ে যে অখতেলাফ রয়েছে, এর সমাধান হল এই, রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মুস্তাহাব। রাতের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধরাত্র পর্যন্ত মাকরুহ ব্যতীত জায়েয এবং অর্ধরাত্র থেকে নিয়ে ফজর উদয় পর্যন্তও জায়েয তবে মাকরুহসহ। আহনাফগণের মাহহাবও তাই। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১৫-১০)

بابُ وَقْتِ الصُّبْحِ ص ১১ : ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

... عَنْ عَائِشَةَ أَهْمَا قَالَتْ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ مَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغُلَسِ - (بخاري ج ১ ص ৮২ باب وقت الفجر، مسلم ج ১ ص ২৩০ باب استحباب التكبير بالصبح الخ، ترمذي ج ১ ص ৬০ باب التغليس، نسائي ج ১ ص ৯৬ التغليس في الحضرة، ابن ماجه ص ৬৯)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করত এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ফজর শুরু হয় সুবেহ সাদিক থেকে এবং ইহা শেষ হয় সূর্য উদয় পর্যন্ত। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যেকোন সময় ফজরের নামায পড়লে তা আদায় হয়ে যাবে। এতে কোন মতানৈক্য নেই। তবে মতানৈক্য হল ফজরের মুক্তাহাব বা উত্তম সময় নিয়েঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, ফজরের নামাযের শুরু ও শেষ অন্ধকার থাকতেই হওয়া উত্তম। (درس ترمذي ج ১ ص ৬০২) দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামায অন্ধকারে শুরু করে অন্ধকারেই শেষ করতেন। নতুবা তাদেরকে না চেনার কোন কারণ নেই।

... عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ (ۨ) الدَّلِيلِ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا - (ابو داود ج ১ ص ৬১ باب المحافظة على الصلوة، ترمذي ج ১ ص ৬২ باب في الوقت الاول من الفجر)

অর্থঃ, ... উম্মে ফারওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামায আদায় করা সর্বোত্তম আমল।

دَلِيل (۩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ - (ترمذي ج ১ ص ৬৩، دارقطني ج ১ ص ৯৩)

অর্থঃ, হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, নামাজের প্রথম ওয়াক্ত হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আর শেষ ওয়াক্ত হল আল্লাহর ক্ষমা হতে মার্জনা।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামায প্রথম ওয়াক্ত তথা অন্ধকারে পড়াই উত্তম।

... عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ... صَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً يَغْلَسُ ثُمَّ صَلَّى : (8) **دَلِيلُ**
 مَرَّةً أُخْرَى فَاسْتَفْرَبَهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَوَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى
 أَنْ يُسْفَرَ - (ابو داود ج ١ ص ٥٧ باب المواقيت)

অর্থাৎ, ... উসামা ইবন যায়েদ আল-লায়হী হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) একবার ফজরের নামায অঙ্ককার থাকতেই আদায় করেন এবং পরেরবার দিগন্ত উজ্জ্বল হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষেণে আদায় করেন। তিনি তাঁর ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামায অঙ্ককার থাকতেই আদায় করতেন। উক্ত দিনের পর আর কখনো সূর্যোদয়ের পূর্বে পর্বাকাশে লাল রং প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি।

দলীল (৫): হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) অন্ধকারে নামায পড়তেন।

* ইমাম তাহাবী ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ফজরের নামায অন্ধকারে শুরু করে ফরসা অবস্থায় শেষ করা উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরের নামায শুরু ও শেষ করা ফর্সা অবস্থায় উত্তম। তবে এতটুকু সময় হাতে রেখে নামায পড়া উচিত, যাতে নামায ভুল হয়ে গেলে সুন্নত কিরাত দ্বারা পুনরায় আদায় করা যায়। (تنظيم ج ١ ص ٢٣٢)

... عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (۵) دَلِيلُ
أَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْآخِرِ- (ابو داود ج ۱ ص ۶۱ باب وقت

الصحيح، ترمذي ج ١ ص ٤٠ باب الاسفار بالفجر، نسائي ج ١ ص ٩٤ باب الاسفار، ابن ماجه ص ٤٩
অর্থাৎ, ... রাফে ইবন খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)
বলেছেন, তোমরা পূর্ব দিগন্ত পরিষ্কার হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় করবে;
কেননা এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে।

দলীল (২): হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) হতে একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে-
 ... وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ (بخاري ج ١ ص ٧٨ باب

وقت العصر

অর্থাৎ, ... তিনি ফজর নামায থেকে তখন প্রত্যাবর্তন করতেন, যখন একজন ব্যক্তি তার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনতে পারত।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে নববীর দেয়ালগুলো ছোট ছিল এবং ছাদ ছিল নীচু। অতএব, মসজিদের ভিতরে পাশের লোকজনকে তখনই চেনা সম্ভব, যখন বাইরে পূর্ণ ফর্সা হয়ে যায়।

... عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لَوْقَهَا إِلَّا يَجْمَعُ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَجْمَعُ وَصَلَّى

صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا (ابو داود ج ১ ص ২৬৭ كتاب المناسك باب الصلوة بجمع)

অর্থাৎ, ... ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ওয়াক্ত ছাড়া অন্য কোন সময়ে নামায আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুয়াদলিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। আর পরবর্তী দিন ফজরের নামায আদায় করেছেন ওয়াক্তের পূর্বে।

উক্ত হাদীসে وَقْتِهَا দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে উদ্দেশ্য হল, ঐ দিন তিনি স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে তথা অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করেছিলেন, তবে সুবেহ সাদিকের আগে নয়। এতে প্রমাণিত হয়, নবী করীম (সাঃ)-এর সাধারণ রীতি ছিল ফর্সা হলে নামায পড়া। (১০৬৬ টর্মডি জ ১৮৬)

দলীল (৪)ঃ হযরত রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَوْرُوا بِالصُّبْحِ بِقَدْرِمَا يَبْصُرُ الْقَوْمُ

مَوَاقِعَ نَبِيلِهِ - (مجمع الزوائد ج ১ ص ৩১৬، تلخيص الحبير ج ১ ص ১৮৩)

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তোমরা ফজরের নামায এতটুকু ফর্সা হওয়ার পর আদায় কর যখন কওমের লোকজন তাদের তীর নিশ্কেপের স্থল দেখতে পায়।

জবাবঃ সামষ্টিক জবাবঃ (১) অন্ধকারে নামায পড়ার যে রেওয়াজে ত তা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, অন্ধকারে নামায পড়ার যে রেওয়াজে এটা ঐ সময়ের উপর ভিত্তি করে পড়া হত, যখন মহিলারাও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হত। অতঃপর যখন মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হল, তখন এই অন্ধকারের হুকুমও মানসুখ হয়ে গেছে।

(২) অন্ধকারে নামায পড়ার যে হাদীস তা ক্রিয়াবাচক (فعلی) এবং আলোকিত অবস্থায় নামায পড়ার যে হাদীস তা ক্রিয়াবাচক এবং বাচনিকও (قولی)। অতএব, দ্বন্দ্বের সময় উসূল মোতাবেক বাচনিক হাদীস প্রাধান্য পাবে।

(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.) অন্ধকারে নামায পড়ার যে সকল রেওয়াজেতে রয়েছে সেগুলোকে নামায শুরু করা হিসেবে এবং আলোকিত অবস্থায় নামায পড়ার যে রেওয়াজেতে রয়েছে সেগুলোকে নামায শেষ করার হিসেবে গণ্য করেছেন।

অথবা, হুজুর (সাঃ) সফরে কোন ওযর থাকার কারণে অন্ধকারে নামায পড়েছেন এবং যে সময় ওযর ছিল না তখন আলোকিত অবস্থায় নামায পড়েছেন।

স্বত্ত্ব জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) হাদীসের বাণী- مَا يُعْرِفَنَّ مِنَ الْفُلْسِ

(অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না)। এখানে غلس বা অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মসজিদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বুঝানো, মসজিদের বাইরের অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। অতএব যদি মসজিদের ভিতরের অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মসজিদের ছাদ যেহেতু নিচু ছিল এ কারণে মসজিদের ভিতর ছিল অন্ধকার। ফলে তাদেরকে চেনা যেত না। কিন্তু বাহির তো ফর্সা ই ছিল। সুতরাং কোন দ্বন্দ্ব নেই।

আর যদি غلس দ্বারা মসজিদের বাহির অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এই চেনার দ্বারা হয়ত কোন জাতি বা শ্রেণী (معرفت جنس) চেনা উদ্দেশ্য হবে, অর্থাৎ

পুরুষ না মহিলা। অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে (معرفت شخص) চেনা উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত “তাদেরকে চেনা যেত না”- এর দ্বারা যদি জাতি বা শ্রেণী বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা হবে অযৌক্তিক কথা। কেননা এ সময় মহিলা অথবা পুরুষ চেনা কোন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। আর এর দ্বারা যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা অন্ধকারের কারণে নয়, বরং কাপড়ের দ্বারা সারা শরীর ঢেকে থাকার কারণে চেনা যেত না।

(২) অথবা, من الغلس শব্দটি হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নয়; বরং তাঁর উক্তি مَا

يَعْرِفَنَّ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মহিলারা যেহেতু চাদর গায়ে দিয়ে আসত এজন্য তাদেরকে চেনা যেত না। কোন রাবী মনে করেছেন, এই চেনা না যাওয়ার কারণ হয়ত অন্ধকার। এজন্য من الغلس শব্দটি রাবী নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। (ابن ماجه ص ১৭)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুস্তাহাব সময়ের প্রথম ওয়াক্ত। আর ফজরের মুস্তাহাব সময়ই হল ফর্সা হওয়া।

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ স্বয়ং আবু দাউদ (রহ.) নামাযের উল্লিখিত এ অংশটিকে ঋটিপূর্ণ (মালুল) সাব্যস্ত করেছেন। কেননা উসামা বিন যায়েদ ব্যতীত আর কেউই নামাযের ওয়াক্ত সংক্রান্ত এ অংশটুকু বর্ণনা করেননি।

(فتح الهاري ج ٢ ص ٥٠، صحيح ابن خزيمة ج ١ ص ١٨١)

পঞ্চম দলীলের জবাবঃ তাদের এ প্রমাণ তখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে, যখন প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা অন্ধকারে নামায শুরু করে অন্ধকারেই শেষ করতেন। অথচ এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়; বরং এর বিপরীত প্রমাণিত। বর্ণিত আছে-

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِينَ فَرَغَ كَرَبَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ قَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ (مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٣٥٣)

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আবু বকর (রাঃ) ফজরের নামাযে সূরা বাকারার তিলাওয়াত করলেন। তখন উমর (রাঃ) তাঁকে নামায থেকে অবসর হওয়ার পর বললেন, সূর্য তো উদিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে গেছে। উত্তরে আবু বকর (রাঃ) বললেন, যদি সূর্য উদিত হয়ে যায় তবে তুমি আমাদের উদাসীন পাবে না।

আযানের সূচনা : بَابُ بَدْءِ الْإِذَاانِ ص ٧١

... عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا أَذَّنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ - قَالَ فَذَكَرَ لَهُ الْقَتْعُ يَعْنِي الشُّبُورَ وَقَالَ زِيَادُ شُبُورِ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ الثَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَأَنْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّبِعْ الثَّاقُوسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ... فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ
مَعَ بِلَالٍ فَاتَّقِ عَلَيْهِ بِمَا رَأَيْتُ فَتَتَوَدَّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ
فَجَعَلْتُ الْقِنِيَّ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّنْ بِهِ— قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ
مِثْلَ مَا أُرِي— فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ— (مسلم ج ١ ص ١٦٤)

باب بدأ الاذان، ترمذي ج ١ ص ٤٨ باب في بدأ الاذان

অনুবাদঃ ... আবু উমায়ের ইবন আনাস থেকে কোন একজন আনসার সাহাবীর
সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) এজন্য চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েন যে,
লোকদেরকে নামাযের জন্য কিরূপে একত্রিত করা যায়। কেউ কেউ পরামর্শ দেন
যে, নামাযের সময় হলে ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়া হোক। যখন লোকেরা তা দেখবে
তখন একে অন্যকে নামাযের জন্য ডেকে আনবে। কিন্তু তা নবী করীম (সাঃ)-এর
মনোপুত হয়নি। অতঃপর কেউ এরূপ প্রস্তাব করে যে, শিংগা ফুঁকা হোক। যিয়াদ
বলেন, শিংগা ছিল ইহুদীদের ধর্মীয় প্রতীক। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা অপছন্দ
করেন। রাবী বলেন, অতঃপর একজন ঘন্টা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রাবী বলেন,
উপাসনার সময় ঘন্টাধ্বনি করা ছিল নাসারাদের রীতি। এজন্য নবী করীম (সাঃ)
তাও অপছন্দ করেন। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিনের বৈঠক শেষ হয় এবং
সকলে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যায়। আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-ও রাসূলুল্লাহ
(সাঃ) চিন্তিত থাকার কারণে ব্যথিত হৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ... অন্য
রেওয়াকে আন্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক
ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি
শিংগা বিক্রয় করবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তার
সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি কি এর চেয়ে উত্তম
কোন জিনিসের সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাঁ। রাবী বলেন, তখন সে
বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবে- “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ... ”
অতঃপর ভোরবেলা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট
আমার স্বপ্নের বর্ণনা করি। নবী করীম (সাঃ) বলেন, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন।
অতঃপর তিনি বলেন, তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে নাও এবং তুমি যেরূপ
স্বপ্ন দেখেছ, তদ্রূপ তাকে শিক্ষা দাও- যাতে সে (বিলাল) ঐরূপে আযান দিতে
পারে। কেননা, তাঁর কণ্ঠস্বর তোমার স্বরের চাইতে উচ্চ। অতঃপর আমি বিলাল
(রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াই এবং তাঁকে এই আযানের শব্দগুলি শিক্ষা দিতে থাকি
এবং তিনি উচ্চারণপূর্বক আযান দিতে থাকেন। বিলালের এই আযান-ধ্বনি উমর

ইবনুল খাতাব (রাঃ) নিজ আবাসে বসে শুনে পান। তা শুনে উমর (রাঃ) এত দ্রুত পদে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে আগমন করেন যে, তাঁর গায়ের চাদর মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি যে রূপ অন্যরা দেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আযানের আভিধানিক অর্থঃ الْإِدَان শব্দটি বাবে تَفْعِيل এর মাসদার। অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. الْإِعْلَان বা ঘোষণা দেয়া ২. الْإِعْلَام বা জানিয়ে দেয়া (২৪৩ ج ১) تنظيم

৩. النَّدَاء বা আহবান করা, ডাকা ৪. النَّدَاءُ لِلصَّلَاة বা সালাতের জন্যে ডাকা।

পবিত্র কুরআনে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে-

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ-

অর্থাৎ, আর মহান হজ্জের দিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদেরকে জানিয়ে দিন। (তওবাঃ ৩)

আযানের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

هُوَ الْإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ بِالْفَاطِ مَخْصُوصَةٍ- (تنظيم ج ১ ص ২৪৩)

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শব্দমালার সাহায্যে নামাযের সময়ের কথা জানিয়ে দেয়াই হল আযান।

هُوَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالْفَاطِ بِطَرِيقَةٍ مَخْصُوصَةٍ-

বিশেষ শব্দমালার সাহায্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাতের সময় হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়া।

— هُوَ الصَّوْتُ الرَّفِيعُ لِلْمُؤَذِّنِ عِنْدَ كُلِّ الصَّلَاةِ- অর্থাৎ, প্রতি সালাতের ওয়াক্তে

একজন আহবায়কের উচ্চকণ্ঠে সালাতের কথা জানিয়ে দেয়া।

মোটকথা, আযান হল শরীয়ত নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ এমন কিছু বাক্য যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় হওয়ার কথা জানানো হয়।

ইকামতের আভিধানিক অর্থঃ الْإِقَامَة শব্দটি বাবে أَفْعَال-এর মাসদার। অভিধানে এর অর্থ লিখা হয়েছে, প্রতিষ্ঠা, স্থাপন, উত্তোলন, অবস্থান, বসবাস, দাঁড়াতে আহবান করা, কাতারবন্দী হওয়া ইত্যাদি। (المعجم الوافي ص ১০৯)

إِلْقَامَةُ هِيَ نِدَاءُ الْمُصَلِّي إِلَى الْجَمَاعَةِ - ইকামতের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

অর্থাৎ, ইকামত হল নামাযীদেরকে জামাআতের প্রতি আহবান জানানো।

— هِيَ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ لِلْجَمَاعَةِ بَعْدَ الْإِذَانِ - অর্থাৎ, আযানের পর মুসলমানদের

জামাআতের জন্য আহবান জানানোর প্রক্রিয়াই হল ইকামত।

প্রকৃতপক্ষে ফরয সালাত শুরু পূর্বে ইমাম ব্যতীত মুসল্লীদের মধ্য থেকে কোন একজন (সাধারণত মুআযযিন) আযানের মত বাক্য দিয়ে লোকদেরকে জামাআত শুরুর সংবাদ দেয়ার জন্যে একটু উচ্চকণ্ঠে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাকে ইকামত বলে।

আযান প্রচলনের সময়কালঃ ইসলামে আযান কখন এবং কোথায় প্রবর্তিত হয়েছে, এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের চারটি মত পাওয়া যায়। যথা-

(১) উলামাদের একদল মনে করেন, হিজরতের আগে মক্কায় আযান প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে-

أَنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاحُهُ بِالْإِذَانِ حِينَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ -

অর্থাৎ, যখন নামায ফরয হয়, তখন জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে আযানের আদেশ দেন।

আর সালাত যে মক্কায় ফরয হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং আযানও মক্কাতেই প্রবর্তিত হয়েছে। (فتح الباري ২/ ১৮৬)

(২) অন্য একদল মুহাদ্দিস মনে করেন, মিরাজের রাতে রাসূল (সাঃ)-কে সালাতের সাথে সাথে আযানও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে, যখন সালাত ফরজ হয় তখন জিবরাঈল (আঃ) মহানবী (সাঃ)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। আর সালাত তো মিরাজের রজনীতেই ফরজ হয়েছিল।

(৩) জমহুর মুহাদ্দিসীন ও ইতিহাসবিদদের মতে, আযান ১ম হিজরীতে মদীনাতে প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন, এক বর্ণনায় এসেছে, ইবন মানজুর বলেন, রাসূল (সাঃ) মক্কায় সালাত ফরজ হওয়ার পরও আযান ছাড়াই সালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর আযানের বিধান চালু হয়।

(৪) ইবন হাজার আসকালানী (রহ.)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে মদীনাতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ -

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন যখন তোমাদেরকে সালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ত্বরান্বিত হও। (জুমআঃ ৯)

যেহেতু আয়াতটি বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে নাযিল হয়েছে, সুতরাং তখন থেকেই আযান প্রচলিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

আযানের নিয়ম : بَابُ كَيْفَ الْأَذَانُ ص ৭১

... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِي قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرَفَعُ بِهَا صَوْتُكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتُكَ ثُمَّ تَرَفَعُ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ابو داود ج ١)

ص ٧٢، ترمذي ج ١ ص ٤٨ باب الترجيع في الاذان، ابن ماجه ص ٥٢)

অনুবাদঃ ... মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু মাহযুরা থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাবী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলি, আমাকে আযানের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি বলবে- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, তা উচ্চস্বরে বলবে। অতঃপর আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ- বলার সময় গলার স্বর নীচু করবে। অতঃপর উচ্চকণ্ঠে বলবেঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ- হইয়া আলাস-সালাহ, হইয়া আলাস-সালাহ; হইয়া আলাল-ফালাহ, হইয়া আলাল-ফালাহ। অতঃপর ফজরের নামাযের আযানের সময় বলবেঃ আস-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম। অতঃপর বলবেঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”।

تَفْعِيلُ (তারজী)-এর সংজ্ঞা এবং আযানে এর হুকুম: التَّرْجِيعُ শব্দটি বাবে

এর মাসদার। এর মূল ধাতু ع-ج-و ; এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَعَدَّ বা
পূনরায় করা, প্রত্যাবর্তন করা। পরিভাষায় তারজী হল-

هُوَ رَفَعُ الصَّوْتِ بِكَلِمَتِي الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْخَفْضِ بِهِمَا-

অর্থাৎ, আযানের মধ্যে শাহাদাতাইন বা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ বাক্যদ্বয়ের প্রথমে নিম্নস্বরে দুইবার করে উচ্চারণ করে পুনরায় দুইবার করে উচ্চস্বরে পড়াকে তারজী বলে।

আযানে তারজী করার হুকুমঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তারজী করা বা না করা উভয় অবস্থায়ই আযান শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে আযানের মধ্যে তারজী করা উত্তম কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, আযানে তারজী করা সুন্নত।

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে,

الْتَّرْجِيعُ وَعَدَمُهُ كِلَاهُمَا جَائِزَانِ وَلَكِنْ تَرْكُهُ أَحَبُّ- (تنظيم ج ১ ص ২৫০)

অর্থাৎ, আযানে তারজী করা বা না করা উভয়ই জায়েয, তবে না করাই আমার পছন্দ।

* ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, আযানে তারজী করা সুন্নত নয়, বরং মাকরুহ। (فتح الملهم ج ২ ص ৫০)

* আযানের বাক্য সংখ্যাঃ আযানের বাক্য সংখ্যা কয়টি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, আযানে যেহেতু তারজী উত্তম, তাই তাঁর নিকট আযানের বাক্য ১৭টি। যেমন-

আল্লাহু আকবার - ২ বার

শাহাদাতাইন - ৮ বার

হায্যালাতাইন - ৪ বার

আল্লাহু আকবার - ২ বার

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ১ বার

মোট ১৭ বার

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ بِلَالٍ أَنْ يُشَفِّعَ الْأَذَانَ وَيُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ- (ابو داود ج ১ ص ৭৫) (১) দলীল

باب في الإقامة، بخاري ج ১ ص ৪৫ باب الآذان مثلث مثلث، مسلم ج ১ ص ১৬৫ باب الامر بشفع الآذان الخ، ترمذي ج ১ ص ৪৮ باب افراد الإقامة، نسائي ج ১ ص ১০৩ تثلية الآذان، ابن ماجه ص ৫৩

অর্থাৎ, ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ)-কে আযান জোড় শব্দে এবং ইকামত বেজোড় শব্দে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (২) দলীল

وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - (ترمذي ج ١ ص ٤٨ باب ان الاقامة مثلى مثلى)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আযান ও ইকামতের শব্দগুলো ছিল জোড়া জোড়া।

সুতরাং হাদীসদ্বয়ে আযানে শফ (জোড়া) শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর শফ শব্দের অর্থ হল, একটি বাক্যকে দু'বার বলা। সুতরাং তাকবীরও (আল্লাহু আকবার) দু'বার হবে। চারবার হবে না।

তারজী উত্তম হওয়ার দলীলঃ

(১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ)-এর হাদীস।

... عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ (২)

تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ... (ابو داود ج ١ ص ٧٣، ترمذي ج ١ ص ٤٨)

باب الترجيع في الأذان، نسائي ج ١ ص ١٠٣ كم الأذان من كلمة، ابن ماجه ص ٥٢)

অর্থাৎ, ... আবু মাহযুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে উনিশ শব্দে আযান এবং সতের শব্দে ইকামত শিক্ষা দিয়েছেন।

আযানে উনিশটি শব্দ তখনই হওয়া সম্ভব, যখন তারজী করা হবে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)ও তারজী উত্তম হওয়ার প্রবক্তা। এজন্যে তাঁর মতে আযানের বাক্য ১৯টি। যথা-

আল্লাহু আকবার - ৪ বার

শাহাদাতাইন - ৮ বার

হায়ালাতাইন - ৪ বার

আল্লাহু আকবার - ২ বার

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ১ বার

মোট ১৯ বার

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ (২) দলীল

الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ... (ابو داود ج ١ ص ٧٣)

উল্লেখ্য যে, এগুলো তারজী উত্তম হওয়ারও দলীল।

* ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, আযানের বাক্য সংখ্যা ১৫টি। কেননা তাঁদের মতে, আযানে তারজী সুন্নত নয়।

আল্লাহু আকবার - ৪ বার

শাহাদাতাইন - ৪ বার

হায়্যালাতাইন - ৪ বার

আল্লাহু আকবার - ২ বার

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ - ১ বার

মোট

১৫ বার

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (১) :
بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ النَّاسُ لِيَجْمَعَ الصَّلَاةُ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يُحْمِلُ
نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبْنِعُ النَّاقُوسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو
بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ
تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الخ (ابو داود ج ১
ص ৭১-৭২)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিংগা ধ্বনি করে লোকদের নামাযের জন্য একত্র করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় করবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি এর সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিসের সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবে- “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাল-ফালাহ, হাইয়া আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।”

উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, যাকে (আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ) স্বপ্নযোগে আযান শেখানো হয়েছিল, তাতে তারজী ছিল না।

দলীল (২): হযরত বিলাল (রাঃ) আজীবন তারজী ছাড়া আযান দিতেন। হযরত সুয়াইদ ইবন গাফালা (রাঃ) বলেন-

سَمِعْتُ بِلَالَ يُؤَدِّنُ مَثْنَى وَيَقِيمُ مَثْنَى - (شرح معاني الآثار)

অর্থাৎ, আমি বিলালকে জোড়াশব্দে আযান ও ইকামত দিতে শুনেছি।

দলীল (৩): আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

قَالَ كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ -

(ترمذي ج ١ ص ٤٨ باب ان الاقامة مثنى مثنى)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আযান ও ইকামতের শব্দগুলো ছিল জোড়া জোড়া।

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ... (ابو داود ج ١ ص ٧٦ باب في الاقامة)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে আযানের শব্দ দু'বার করে বলা হত।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন আযানের শব্দসমূহ দু'বার করে বলার প্রমাণ মিলে, তখন তো আর তারজীর প্রমাণ মিলে না। কেননা, তারজীর সময় তো প্রত্যেক শাহাদাতইনকে চারবার করে বলতে হয়।

* তাছাড়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যামানায় মুআযযিন তারজী ছাড়া আযান দিত। এর দ্বারা সাহাবাগণের পক্ষ থেকে তারজী না হওয়ার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(تنظيم ج ١ ص ٢٤٥)

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ হযরত আবু মাহযূরা, বিলাল, আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) প্রমুখের আযান যেসব রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে চারবার তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাতে **شفع** -এর অর্থ হল, দুই শাহাদাত এবং দুই হায়্যা আলা দুইবার পড়া।

অথবা, এটাও হতে পারে, যেহেতু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দুইবার এক শ্বাসে আদায় করা হয়, এজন্য দুটি করে চার তাকবীরকে **شفع** বা জোড় বলা হয়েছে। (درس ترمذي ج ١ ص ٤٥٣-٤٥٤)

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলসমূহের (তারজী রদ সহ) জবাবঃ

১. আল্লামা উসমানী ‘ফাতহুল মুলহিম’ গ্রন্থে বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মহানবী (সাঃ) আযান দিয়ে সালাত আদায় করলে কাফিরদের বালক-বালিকারা এ সময়ে বিদ্রূপ করে আযানের বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। এদের মধ্যে আবু মাহযুরাও ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, আযান দাও। তখন অভ্যাসগত কারণে আবু মাহযুরা শাহাদাতাইন নিম্নস্বরে পড়েছেন। ফলশ্রুতিতে রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, “আস্তে বলছ কেন? উচ্চ কণ্ঠে বলো।” তখন আবু মাহযুরা দ্বিতীয়বার শাহাদাতাইন উচ্চকণ্ঠে বললেন। এতে তারজী প্রমাণ হয় না।

২. কিংবা বলা যায়, তারজী তখন কেবল মক্কার জন্য খাস ছিল। কেননা, এর আগে এখানে শাহাদাতাইন ছিল জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই গুকরিয়া স্বরূপ মক্কায সীমিত সময়ের জন্য তারজীর প্রচলন করা হয়েছিল।

(تنظيم ج ١ ص ٢٤٥-٢٤٦، فتح الهاري ج ٢ ص ٦٣-٦٤، معارف السنن ج ٢ ص ١٨١)

৩. অথবা, তারজীর বিষয়টি আবু মাহযুরার জন্য খাছ ছিল। কেননা এটি ছিল তাঁর ইসলাম কবুলের কারণ; তাই তিনি এটাকে বরকতময় মনে করে উচ্চারণ করতেন। এ হুকুম সার্বজনীন হবে না। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে-

... قَالَ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجْزُ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرِقُهَا لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا- (ابو داود ج ١ ص ٧٣)

অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, আবু মাহযুরা (রাঃ) কখনও তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের চুল (বরকতের জন্য) কাটতেনও না এবং পৃথকও করতেন না। কেননা, নবী করীম (সাঃ) তাঁর এই চুলের উপর হাত বুলিয়েছিলেন।

بَابُ مَنْ أَدَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ص ٧٦

যে আযান দিয়েছে, সেই ইকামত দিবে

... عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي يَعْني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَا حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ يَعْني فَتَوَضَّأَ فَأَرَادَ بِإِلَانٍ أَنْ يَقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَا صَدَائِهِ هُوَ أَذَنٌ وَمَنْ أَذَنَ فَهُوَ يُقِيمُ قَالَ فَاقَمْتُ-

(ترمذي ج ١ ص ٥٠ باب من الذن فهو يقيم، ابن ماجه ص ٥٣)

অনুবাদঃ ... যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদাই (রাঃ) বলেন, যখন আযানের প্রথম সময় উপনীত হয়, তখন নবী করীম (সাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে আমি আযান দেই। অতঃপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইকামত দিব কি? তখন নবী করীম (সাঃ) পূর্ব দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, না। অতঃপর পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি তার বাহন হতে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জা করে আমার নিকট আসেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি অযু করেন। এ সময় হযরত বিলাল (রাঃ) ইকামত দিতে চাইলে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে নিষেধ করে বলেন, (তোমার) ভাই যিয়াদ আস-সুদাই আযান দিয়েছে এবং (নিয়ম এই যে), যে ব্যক্তি আযান দিবে, সেই ইকামত দেওয়ার অধিকারী। রাবী বলেন, আমি ইকামত দেই।

বিশ্লেষণঃ যে ব্যক্তি আযান দেয়, তাকেই ইকামত দিতে হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ)-এর মতে, যে আযান দিবে, সে-ই ইকামত দেবে। মুআযযিন ব্যতীত অন্য কারো ইকামত দেয়া মাকরুহ। অন্যজন ইকামত দিলে মুআযযিনের মনে কষ্ট হোক বা না হোক এবং মুআযযিন অন্যকে অনুমতি দিক বা না দিক। (তল্ফিহ জ ১ ص ২৫৭)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আবু সাওর (রহ)-এর মতে, মুআযযিন ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ইকামত দেয়া জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, এক্ষেত্রে মুআযযিনের সম্মতি থাকতে হবে। অন্যথায় মাকরুহ হবে। (২৮ ص ২৮৮)

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَأَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ أَلْقِ عَلَى بِلَالٍ فَالْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ فَاقِمِ أَنْتَ-

(ابو داود ج ١ ص ٧٦ باب الرجل يؤذن ويقوم اخر)

অর্থঃ ... আব্দুল্লাহ থেকে তাঁর চাচা আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আযান প্রথা চালু করা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে এর কোনটি গৃহীত হয়নি। হযরত

আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ)-কে স্বপ্নযোগে আযানের শব্দ জ্ঞাত করা হয়। অতঃপর তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তুমি তা বিলালকে শিক্ষা দাও। অতঃপর তিনি তা বিলালকে শিখানোর পর তিনি (বিলাল) আযান দেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রাঃ) বলেন, যেহেতু আযান সম্পর্কিত স্বপ্নটি আমিই দেখেছি, কাজেই আমি স্বয়ং আযান দিতে ইরাদা করেছিলাম। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি ইকামত দাও।

উপরোল্লিখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দিলেও ইকামত দিয়েছেন আব্দুল্লাহ (রাঃ)। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুআযযিন ব্যতীত ইকামত দেয়া জায়েয আছে।

দলীল (২): কোন কোন সময় হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দিতেন এবং ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ) ইকামত দিতেন। কোন কোন সময় এর বিপরীতও হত।

(ابو داود حاشية ج ١ ص ٧٦)

জবাব: (১) যায়েদ ইবন হারিছের (রাঃ)-এর যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে-মূলতঃ তিনি ছিলেন নও মুসলিম। অন্য কেউ ইকামত দিলে হয়ত তিনি এতে ব্যথিত হতে পারেন। এদিকে চিন্তা করেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিলাল (রাঃ)-কে ইকামত দিতে নিষেধ করলেন।

(২) অথবা, এর দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর এ বিষয়টিই বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, মুআযযিনের ইকামত দেয়াই মুস্তাহাব, যার প্রবক্তা হানাফীগণও। (درس ترمذي ج ١ ص ١٦٤)

بَابُ اخْذِ الْاَجْرِ عَلَى التَّأْدِينِ ص ٧٩

আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ

... عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنَا لَا يَأْخُذُ عَلَى إِذَانِهِ أَجْرًا- (ترمذي ج ١ ص ٥١)

باب كراهية ان يأخذ المؤذن الخ، نسائي ج ١ ص ١٠٩ اتخاذ المؤذن الخ، ابن ماجة ص ٥٢)

অনুবাদঃ ... উসমান ইবন আবুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বললাম, আমাকে আমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হল। তুমি দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মুআযযিন নিযুক্ত করবে, যে আযানের কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না।

বিশ্লেষণঃ আযান, ইমামতি, কুরআন তালীম ইত্যাদি ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে এখতেলাফ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, আযান কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। (بذل المجهود ج ১ ص ২০৩)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস- কোন এক সফরে তিনি এক গোত্রের সর্প দংশিত নেতাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছেন এবং এর বিনিময় স্বরূপ এক পাল বকরী গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মদীনায এসে এ বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)-কে জানালে তিনি তা অনুমোদন করে বলেছেন-

... قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسَمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ- (بخاري ج ১ ص ২০৪ باب ما يعطى في الرقية الخ، ابو داود ج ২ ص ৫৫৫، ترمذي ج ২ ص ২৬)

باب اخذ الاجر على التعميد

অর্থাৎ, তোমরা ঠিক করেছ। এগুলো বন্টন করে দাও। তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ বন্টন করে দাও। অতঃপর তিনি (সাঃ) হেসে দিলেন।

দলীল (২)ঃ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ فَالْقَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (২) الْأَذَانَ فَأَذَنْتُ ثُمَّ أَعْطَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ صُرَّةً فِيهَا شَيْئٌ مِّنْ فِضَّةٍ- (تنظيم

ج ১ ص ২০৩)

অর্থাৎ, হযরত আবু মাহযুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন, অতঃপর আমি আযান দিলাম। আমার আযান দেয়া শেষ হওয়ার পরে তিনি আমাকে একটি রৌপ্য খণ্ড উপহার দিলেন।

* পূর্ববর্তী আহনাফ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অনুসারীদের মতে, আযান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত উবাই ইবন কাব (রাঃ) বলেন-

عَلِمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَاهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَذْتُهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِّنْ نَّارٍ فَردَدْتُهَا- (ابن ماجه ص ১০৭ باب الاجر

على تعلم القرآن)

অর্থাৎ, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিখালাম। সে আমাকে একটি তীরের ধনুক হাওয়া দিল। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আলোচনা করলে তিনি

বললেন, যদি তুমি তা গ্রহণ করে থাক, তাহলে জাহান্নামের একটি তীর-ধনুক গ্রহণ করলে। অতঃপর আমি তা ফেরত দিয়ে দেই।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে যে সর্প দংশনের ব্যথা ভাল করেছিলেন, তা কোন ধর্মীয় বিষয় ছিল না, বরং ইহা ছিল চিকিৎসা। আর চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। সুতরাং এ হাদীসটি দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আবু মাহযুরাকে মহানবী (সাঃ) যে রৌপ্য খণ্ডটি দিয়েছিলেন, তা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। আর উসমান ইবন আবুল আস (রাঃ) তাঁর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং উসমান ইবন আবুল আসের হাদীস দ্বারা ঐ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী আহনাফদের অভিমতঃ দীনকে প্রচার-প্রসার করার নিমিত্তে প্রয়োজনের তাগিদে আযান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

দলীলঃ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুআযযিন, ইমাম, মুফতি ও মুআল্লিমগণের জন্য ভাতার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী হুকুমাত না থাকার কারণে ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব, এখন যদি তাদেরকে কোন পারিশ্রমিক না দেয়া হয়, তাহলে এক সময় দেখা যাবে মসজিদে আযান ও নামায ঠিকমত হচ্ছে না। এবং সমস্ত দীনী নিদর্শনগুলোতে বিশৃংখলা ও aÿংসের মারাত্মক আশংকা দেখা দেবে। তাই শুধুমাত্র দীনকে প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ইমাম, মুআযযিন ও মুআল্লিমদেরকে বেতন বা পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয বলে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* একটি মাসআলা জানা থাকা আবশ্যিক যে, কুরআন মাজীদ ও সহীহ বুখারী খতম দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া তখনই বৈধ হবে, যদি তা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য পড়া হয়। কিন্তু যদি ইছালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পড়া হয়, তাহলে পারিশ্রমিক নেয়া বিলকুল নাজায়েয হবে। আর এজন্যই মসজিদের ভিতরে বসে কুরআন মাজীদ ও সহীহ বুখারীর খতম দেয়া বা তাবিজ লিখে ও অন্যান্য খতম পড়ে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। কেননা, মসজিদে দুনিয়াবী কাজ করা হালাল নয়। আর এগুলো হল দুনিয়াবী কাজ।

بَابُ فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ص ৭৭

ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَدَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَعَ فَيُنَادِيَ إِلَّا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ— (ترمذي ج ১ ص ৫০ باب الاذان بالليل)

অনুবাদঃ ... হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) ফজরের নামাযের আযান সুবেহ সাদিকের পূর্বেই দিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তা পুনরায় দিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বিলাল (রাঃ) ঘুমের কারণে যথা সময়ে আযান দিতে সক্ষম হতেন না। রাবী মুসার বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর বিলাল (রাঃ) পুনর্বার আযান দিলেন। জেনে রাখ! মানুষেরা এ সময় ঘুমে বিভোর থাকে।

বিশ্লেষণঃ যুহর, আসর, মাগরিব এবং এশার আযান দেয়া ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শুধুমাত্র ফজরের আযানের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমাদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে দেয়াও জায়েয আছে। এমতাবস্থায় এর পুনরাবৃত্তি ওয়াজিব নয়।

দলীলঃ ... عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُّوْا وَأَشْرُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا تَأْذِيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ— (مسلم ج ১)

৩৪৭/১ باب ان الدخول في الصوم الخ، ترمذي ج ১ ص ৫০، بخاري ج ১ ص ৮৭ باب الاذان قبل الفجر
অর্থঃ ... সালিমের পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, বিলাল রাতে আযান দেয়। অতএব, ইবন উম্মে মাকতুমের আযান শোনা পর্যন্ত তোমরা (সাহরী) খাও এবং পান কর।
উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে দেয়াও জায়েয আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে দেয়া জায়েয নয়। যদি দেয়া হয়, তাহলে তা পুনরায় দেয়া ওয়াজিব। (فتح الهاري ج ২ ص ৮৫)

... عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تُؤْذِنُ (১) دَلِيلٌ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرَضًا— (ابو داود ج ১ ص ৭৭)

অর্থাৎ, ... হযরত বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলেন, পূর্ব দিগন্তে ফজরের আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি আযান দিবে না- এই বলে তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করেন।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ مُؤَذِّنٍ لَعَمْرُ يَقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ— (ابو داود ج ১ ص ৭৭)

অর্থাৎ, ... হযরত উমর (রাঃ)-এর মুআযযিন মাসরুহ হতে বর্ণিত। তিনি সুবেহ সাদিকের পূর্বে আযান দিলে উমর (রাঃ) তাকে পুনরায় আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুবেহ সাদিকের পূর্বে আযান দেয়া জায়েয নেই। যদি জায়েয থাকত, তাহলে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দিতেন না।

আকলী দলীল: আযানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া। সুতরাং রাতে আযান দিলে ঘোষণা হয় না, বরং বিভ্রান্ত করা হয়।

(درس ترمذي ج ১ ص ৪৭০)

জবাব: (১) হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযানের উপর কখনো নির্ভর করা হতো না, বরং ওয়াক্তের পরে পুনরায় আযান দেয়া হত। যদি হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযানই যথেষ্ট হত, তাহলে অন্তত একবার হলেও তাঁর আযানের উপর নির্ভর করা হত। কিন্তু এমনটি কোন সময়ই করা হয়নি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সময়ের পূর্বে আযান দেয়া জায়েয নেই।

(২) অথবা, হযরত বিলাল (রাঃ)-এর আযান ছিল রমযানের সেহেরী খাওয়ার জন্য এলান স্বরূপ বা তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য। (اثر السنن ص ৫৭)

যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِّنْ سَحْوَهِ فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ الخ (ابو داود ج ১ ص ৩২০ باب وقت السحور، بخاري ج ১ ص ৮৭، مسلم ج ১ ص ৩৫০ باب ان

الدخول في الصوم الخ، نسائي ج ১ ص ১০৫ الآذان في غير وقت الصلوة)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া হতে বিরাত না রাখে। কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহবান করে তাদের, যারা তাহাজ্জুদ নামাযরত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগ্রত করার জন্য।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ص ৮০

জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامُ ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيَصْلِي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ يَبُوتَهُمْ بِالنَّارِ (بخاري ج ১ ص ৮৯ باب وجوب صلاة الجمعة، مسلم ج ১ ص ২৩২ باب فضل صلاة الجماعة الخ، ترمذي ج ১ ص ৫২ باب من

سمع النداء فلا يجيب، نسائي ج ১ ص ১৩০ التشديد في لاتخلف عن الجماعة، ابن ماجة ص ৫৮)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেই।

বিশ্লেষণঃ জামাআতে নামায আদায়ের হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

+ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন খুযাইমা, ইবনুল মুনযির, আতা, আওয়াঈ এবং আবু সাওর (রহ.)-এর মতে, জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন। এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, বিনা ওজরে একাকী নামায আদায়কারীর নামায ফাসেদ।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে যারা জামাআতে শরীক না হয় তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন। নতুবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন কঠিন বাণী উচ্চারণ করতেন না।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الدَّلِيلَ (২): الْمُعَادِي فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى - (ابو داود ج ১ ص ৮১, ابن ماجه ص ৫৮)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনে বিনা কারণে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করবে না, তার অন্যত্র আদায়কৃত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

সাহাবীগণ ওযর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যদি কেউ ভয়ভীতি ও অসুস্থতার কারণে জামাআতে হাজির হতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য বাড়ীতে নামায পড়া দৃষণীয় নয়।

উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জামাআতে নামায পড়া ফরজে আইন।

... عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يَلَاوُمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

(ابو داود ج ১ ص ৮১, مسلم ج ১ ص ২২২, نسائي ج ১ ص ১৩৬, المحافظة على الصلوات, ابن ماجه ص ৫৮)

অর্থাৎ, ... ইবন উম্মে মাকতুম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অন্ধ, তদুপরি মসজিদও আমার ঘর হতে অনেক দূরে। কিন্তু আমাকে মসজিদে আনা-নেওয়ার জন্য লোক আছে। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে (ফরয) নামায আদায় করতে পারি? নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আযান শুনে পাও? আমি বলি, হ্যাঁ। নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি তোমার জন্য (জামাআত থেকে) অব্যাহতির কোন কারণ পাচ্ছি না।

অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জামাআতে নামায পড়া ফরযে আইন।

* কতক আহলে যাহিরের মতে, জামাআতে নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাআত শর্ত।

* ইমাম শাফেঈ, তাহাবী ও কারখী (রহ.)-এর মতে, জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ফরযে কিফায়া।

দলীলঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলসমূহ।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জামাআতের সাথে নামায পড়া সুন্নতে মুআক্কাদাহ। (فتح الملمم ج ২ ص ২১৮)

দলীল (১): ঐ সকল হাদীসসমূহ, যাতে জামাআতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে-

... عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (ابو داود ج ১ ص ৮২ باب في فضل صلاة الجماعة، نسائي ج ১ ص ১৩৫ الجماعة اذا كانوا اثنين)

অর্থাৎ, ... উবাই ইবন কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ... একাকী নামায হতে দুইজনের একত্রে নামায আদায় করা অধিক উত্তম এবং দুইজনের একত্রে নামায অপেক্ষা তিনজনের একত্রে নামায আদায় করা আরও অধিক উত্তম। এর অধিক জামাআতে যতই লোক বেশী হবে, ততই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

দলীল (২): ... عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجَرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ - (ابو داود ج ১ ص ৮২, مسلم ج ১ ص ২৩২, ترمذي ج ১ ص ৫৩ باب فضل

العشاء الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত উসমান ইবন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায জামাআতে আদায় করল, সে যেন সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকল।

দলীল (৩): ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سَوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً - (ابو داود ج ১ ص ৮২ باب في فضل المشي الى الصلوة، بخاري ج ১ ص ৮৯-৯০,

مسلم ج ১ ص ২৩১, ترمذي ج ১ ص ৫২ باب فضل الجمعة، نسائي ج ১ ص ১৩৪, ابن ماجه ص ৫৭)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে, বাড়িতে এবং গাভারে একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা তা পঁচিশগুণ শ্রেয়।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামাআতে নামায আদায় করা খুবই সওয়াবের কাজ এবং খুব বড় ওয়র ব্যতীত জামাআত ত্যাগ করাও একজন মুমিনের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। তাই বলে জামাআতে নামায না পড়লে নামাই শুদ্ধ হবে না বা কয়েকজন আদায় করলেই ফরযে কিফায়া হিসেবে আদায় হয়ে যাবে এমনটি বলা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, জামাআতে নামায পড়া বলিষ্ঠভাবে সুন্নতে মুআক্কাদাহ।

জবাবঃ (১) প্রতিপক্ষগণ যে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার হাদীস উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা ধমক ও হুঁশিয়ারী এবং জামাআতের গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। প্রকৃত অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

(২) কাযী আযাজ (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) পুড়িয়ে বা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বাস্তবে জ্বালিয়ে দেননি। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আসলে তা ফরয নয়, নতুবা তিনি তা অবশ্যই পুড়িয়ে দিতেন। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর সামনে কোন ফরয তরক হবে, আর তিনি তা শুধু মুখেই প্রকাশ করে নিবৃত্ত হবেন, এমন ধারণা করা উচিত নয়।

(৩) অথবা, এমন হুঁশিয়ারী ঐ কওমের প্রতি প্রদান করেছেন, যারা খোদ নামাযকেই ছেড়ে দেয়, শুধু জামাআতকে নয়।

(৪) ইবনে বাযীযাহ বলেন, অনেকে উক্ত হাদীস দ্বারাই জামাআত ফরয না হওয়ার দলীল পেশ করে থাকেন। কেননা, জামাআত যদি ফরযই হত, তাহলে নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জামাআত ত্যাগকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) জামাআত ত্যাগ করে তাদের দিকে অভিযুক্তি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন না। (৩৭০-৩৭১ص ۱ج تنظيم الاشتات)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ নামায কবুল না হওয়ার অর্থ হল নামায পূর্ণাঙ্গ না হওয়া।

কিন্তু একেবারে না হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, হাদীসে এসেছে- **لَا صَلَوةَ لِمَجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا**

(في المسجد) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নামায তো কবুল হয়ে যাবে, কিন্তু এতে পূর্ণ সওয়াব পাবে না। (دارقطني ج ۱ ص ১২০)

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাকতুম (রাঃ)-কে জামাআতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা জামাআত ফরয হওয়ার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং জামাআতের ফযীলত ও গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে এই হুকুম দেয়া হয়েছিল।

* অথবা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে জামাআতে নামায পড়া ফরয ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেছে। নতুবা জামাআতে নামায যদি ফরযে আইন হত, তাহলে একথা

বলার কোন অবকাশ থাকে না যে, জামাআতে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশি। কেননা, একাকী নামায পড়লে যেখানে নামাযই কবুল হবে না, (ইমাম আহমদের মতে), সেখানে পঁচিশ গুণ সওয়াবের কি মূল্য রাখে?

(التعليق ج ٢ ص ٣٧، فتح الملهم ج ٢ ص ٢١٨)

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ ص ٨٤

মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرِجْنَ وَهْنٌ تَفْلَاتَ - (بخاري ج ١ ص ١٢٠ باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد، مسلم ج ١ ص ١٨٣ باب خروج النساء الى المساجد)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা আল্লাহর বাঁদীদের (মহিলাদের) আল্লাহর মসজিদসমূহে যাতায়াতে নিষেধ করো না। কিন্তু খোশবু ব্যবহার না করে তারা মসজিদে যাবে।

বিশ্লেষণঃ মহিলাদের নামাযে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া কতটুকু বৈধ, এ নিয়ে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছেঃ

পূর্ববর্তীগণের মাঝে মতবিরোধঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, নামাযের জামাআতের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বের হওয়া মুবাহ (অনুমোদিত)। এবং বৃদ্ধাদের জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। হযরত আবু বকর, আলী ও ইবন উমর (রাঃ)-এর অভিমতও অনুরূপ।

(معارف السنن ج ٤ ص ٤٤٥)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ হযরত উস্মে আতিয়া (রাঃ)-এর হাদীস-

... عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ الْخ (ابو داود ج ١ ص ١٦١ باب خروج النساء في العيد)

অর্থাৎ, ... উস্মে আতিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য আমাদের (মহিলাদের) নির্দেশ দেন। ...

* ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, বৃদ্ধাদের জন্য দুই ঈদে ১ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।

দলীলঃ ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম শাফেঈ (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত উভয় দলীলকে বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। আর সাহেবাইন বলেন, যেহেতু বৃদ্ধা হওয়ার কারণে তাদের প্রতি কারো আকর্ষণ জাগবে না, ফলে ফিতনারও কোন আশংকা নেই। (৩৭৮ ১৮ تنظيم)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সাধারণ নামাযগুলোতে ফযর, মাগরিব এবং এশায় বৃদ্ধাদের উপস্থিতিতে কোন দোষ নেই। (১২৬ ১৮ هداية)

দলীলঃ যেহেতু সাধারণত এই সময়গুলোতে ফিতনা-ফাসাদের আশংকা কম এবং বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে যুবতীদের তুলনায় ফিতনা অনেকটা কম, তাই তাদের জন্য বৈধ।

পরবর্তীদের ইজমাঃ পরবর্তীতে হক্কানী সকল ফকীহ ও আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, রিসালত যুগে প্রথমতঃ ফিতনার সম্ভাবনা ছিল কম, দ্বিতীয়তঃ মহিলারা সাজসজ্জাবিহীন বাইরে বের হতেন। এজন্য নামাযের জামাআতে তাদের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর পর তারা সাজসজ্জায় নব নব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তাছাড়া ফিতনার সুযোগও বেড়ে গেছে বহুগুণে। অতএব, এখন তাদের কোন প্রকার জামাআতেই উপস্থিত না হওয়া উচিত। যদি নবী করীম (সাঃ) জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিও এ যুগে মহিলাদেরকে নামাযের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিতেন না বলেই মনে হয়। এ কারণে পরবর্তী যুগে উলামায়ে কিরামের ফাতওয়া হল, বর্তমান যুগে (যুবতী হোক অথবা বৃদ্ধা হোক) কোন মহিলাই ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে যাওয়া সমীচীন নয়।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

أَحْدَثَ النِّسَاءَ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ - (ابو داود ১৮ ৮৬)

باب التشديد في ذلك، بخاري ১৮ ১২০ باب خروج النساء الى المساجد الخ، مسلم ১৮ ১৮৩، مؤطاء امام مالك ১৮ ১৮৪)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান মহিলাদের আচার-আচরণ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বচক্ষে দেখতে পেতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যে রূপ বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল।

দলীল (২)ঃ وَأَقْرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى - আল্লাহ তাআলার বাণী-

অর্থাৎ, তোমরা গৃহান্তরে অবস্থান করবে, মুর্থতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (আহযাবঃ ৩৩)

দলীল (৩): মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অধিক সওয়াব অর্জন করা। অথচ বহু হাদীসে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّوْهُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مُخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا - (ابو داود ج ১ ص ৮৬)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা বৈঠকখানায় নামায আদায় করার চাইতে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম।

(খ) ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকুফরূপে বর্ণিত আছে-

مَا صَلَّتْ أَمْرَأَةً مِنْ صَلَاةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً - (مجمع الزوائد ج ২ ص ৩০)

অর্থাৎ, একজন মহিলার নিজ ঘরে সাধারণ জায়গার তুলনায় অধিকতর অন্ধকার স্থানে নামায পড়া আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

(গ) আবু আমর শায়বানী থেকে বর্ণিত আছে-

أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ أَخْرِجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرَ لَكُمْ - (مجمع الزوائد ج ২ ص ৩০)

অর্থাৎ, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখেছেন, তিনি মসজিদ থেকে জুমআর দিন মহিলাদেরকে বের করে দিচ্ছেন এবং তিনি বলছেন, তোমরা বেরিয়ে তোমাদের ঘরের দিকে চলে যাও। এটা তোমাদের জন্য উত্তম।

(ঘ) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে-

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ - (مجمع الزوائد ج ২ ص ৩৩)

অর্থাৎ, মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ হল তাদের ঘরের একদম অন্তপুর।

সুতরাং উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার চেয়ে ঘরে নামায পড়াই শ্রেয়।

* অনেকেই হয়ত অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার দলীল পেশ করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষণীয়- নবী করীম (সাঃ)-এর বরকতময় ও তাকওয়া-পরহেযগারীর যামানায়ও শর্ত ছিল যে, “তবে তারা যেন অবশ্যই সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হয়।” তাহলে আমাদের ফিতনাপূর্ণ

যামানায় কি হুকুম হবে? বিষয়টি ভেবে দেখা আবশ্যিক। আর তাই আমরা সাহাবী যুগেই দেখতে পাই যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর পুত্র বিলাল এ ব্যাপারে বলেন-

... وَاللّٰهِ لَا نَأْذُنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَعْلًا وَاللّٰهِ لَا نَأْذُنُ لَهُنَّ الْخ (ابو داود ج ১ ص ৮৬)

মসলম জ ১ ص ১৮৩, তرمذি জ ১ ص ১২৭ باب خروج النساء الى المساجد

অর্থঃ, ... আল্লাহর শপথ! আমি তাদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেব না। কেননা এতে তারা ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে কিছুতেই অনুমতি দেব না।

بَابُ فِي الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ ص ৮৫

একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ- (ترمذی ج ১ ص ৫৩ باب

الجماعة في مسجد الخ)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে (জামাআতের পর) একাকী নামায আদায় করতে দেখে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই, যে এ ব্যক্তিকে সদকা দেয়, যাতে সে তাকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়তে পারে?

বিশ্লেষণঃ যদি কোন মসজিদে নির্দিষ্ট ইমাম না থাকে অথবা যদি পথের মসজিদ হয় বা বাজারের মসজিদ হয়, তবে তাতে পুনরায় জামাআত জায়েয আছে। এমনভাবে যদি মহল্লাহর মসজিদ হয় যেখানে ইমাম-মুআযযিন সুনির্দিষ্ট সেখানে যদি মহল্লাবাসী ছাড়া অন্যরা এসে জামাআত করে, তাহলে মহল্লাবাসীদের দ্বিতীয়বার জামাআত করার অধিকার রয়েছে। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১০৮)

কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি মহল্লাহর মসজিদে ইমাম-মুআযযিন নির্দিষ্ট থাকে এবং তাতে মহল্লাবাসী একবার জামাআত পড়ে থাকে, সেই মসজিদে অন্যদের জন্য দ্বিতীয় জামাআত জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আহলে যাহির এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত আদায় করা জায়েয আছে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): হযরত আনাস (রাঃ)-এর সেই ঘটনা, যা ইমাম বুখারী (রহ.) প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন-

... وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً-

(بخاري ج ١ ص ٨٩ باب فضل صلاة الجماعة)

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) এক মসজিদে এলেন, যেখানে নামায পড়া হয়ে গেছে। তিনি এসে আযান-ইকামত দিয়ে জামাআতে নামায আদায় করলেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় জামাআত জায়েয আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.) সহ জমহুরের মাযহাব হল, যে মসজিদে ইমাম-মুআযযিন নির্ধারিত এবং তাতে এলাকাবাসী একবার জামাআতে নামায পড়ে ফেলেছে, সেখানে দ্বিতীয়বার জামাআত করা মাকরুহ তাহরীমী।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি রেওয়াতে আছে, যদি স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ মিহরাব থেকে সরে আযান, ইকামত ও আহবান ব্যতীত দ্বিতীয় জামাআত করে, তাহলে জায়েয আছে। (কিন্তু ফাতওয়া হল, এভাবেও দ্বিতীয় জামাআত করা জায়েয নেই।)

জমহুরদের দলীল (১): عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ

فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ- (إثار السنن ص ১৩৫، مجمع الزوائد ج ২ ص ৬৫)

অর্থাৎ, হযরত আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনার আশপাশ থেকে এসে নামায পড়তে চাইলেন। দেখলেন লোকজন নামায পড়ে ফেলেছে। অতঃপর তিনি ঘরে যেয়ে পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করে তাদের নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করলেন।

অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি একই মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত আদায় করা জায়েয হত, তাহলে তিনি মসজিদে নববীর ফযীলত ছেড়ে বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হতেন না। সুতরাং মসজিদে পুনরায় জামাআত করা যে মাকরুহ, এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ

هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامُ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِيَ بِرَجَالٍ مَعَهُمْ حَزْمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ بِالنَّارِ-

(ابو داود ج ١ ص ٨٠ باب التشديد في ترك الجماعة، بخاري ج ١ ص ٨٩ باب وجوب صلوة الجماعة، مسلم ج ١ ص ٢٣٢ باب فضل صلوة الجماعة الخ، ترمذي ج ١ ص ٥٢ باب من سمع النداء فلا يجيب، نسائي ج ١ ص ١٣ التشديد في تخلف عن الجماعة، ابن ماجة ص ٥٨)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেই।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম জামাআতেই উপস্থিত হওয়া জরুরী। কেননা, যদি পুনরায় জামাআত জায়েযই হতো, তাহলে যারা প্রথম জামাআতে যাবে না, পেছনে থেকে যাবে, তাদের জন্য এই ওয়র ছিল যে, আমরা দ্বিতীয় জামাআতে যাওয়ার ইচ্ছা করি। (درس ترمذي ج ١ ص ٤٨٤)

আকলী দলীলঃ জামাআতের মূল উদ্দেশ্যই হল, বেশি সংখ্যক মানুষ একত্র হয়ে নামায আদায় করা এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ মহব্বত ও হৃদয়তা সৃষ্টি হওয়া এবং ইসলামের শান প্রকাশ করা। যদি দ্বিতীয় জামাআতের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মসজিদের জামাআতের উদ্দেশ্য ও গাণ্ঠীর্ষ অবশিষ্ট থাকবে না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যেখানে পুনরায় জামাআতের প্রচলন রয়েছে, সেখানে লোকজন প্রথম জামাআতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই অলসতা করে। (درس مشکوة ج ٢ ص ١٠٨)

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) আলোচ্য হাদীসটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া গোটা হাদীস ভাঙারে এরূপ কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না, যাতে মসজিদে নববীতে দ্বিতীয় জামাআত করার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়।

(২) এই জামাআতটি ছিল সর্বমোট দুইজনের এবং আহবান ব্যতীত। আর আমাদের (জমহুর) মতে আহবান ছাড়া কখনো কখনো পুনরায় জামাআত জায়েয আছে। বস্তুত আহবানের সীমা কোন কোন ফকীহ এই নির্ধারণ করেছেন যে, ইমাম ছাড়া চারজন হবে।

(৩) আলোচ্য হাদীসে ঐ ব্যক্তির সাথে যে নামায পড়েছিলেন তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), যিনি ছিলেন নফল আদায়কারী। আর আলোচ্য মাসআলা হল, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে হবে ফরয আদায়কারী।

(৪) সর্বোপরি বলা যায় যে, বৈধ ও মাকরুহের বিরোধের সময় মাকরুহের প্রাধান্য হয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) ইহা ছিল বনু সালাবার মসজিদ, যা পথে অবস্থিত ছিল। সুতরাং এটি সাধারণভাবে দলীলযোগ্য নয়। (فتح الهاري ج ٢ ص ١٠٩)

(২) স্বয়ং হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا إِذَا فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ فَرَادَى- (بدائع ج ১ ص ১০৩, معارف السنن ج ২ ص ২৮৮)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের যখন জামাআত ছুটে যেত, তখন তারা মসজিদে একাকী নামায আদায় করতেন।

এটা দ্বিতীয় জামাআত না হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল।

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ ص ৮৬

ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি কে?

... عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَرُوا أَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَرُوا أَكْبَرَهُمْ سِنًا- وَلَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ- (مسلم ج ১ ص ২৩৬ باب من احق

بالإمامة، ترمذي ج ১ ص ৫৫، نسائي ج ১ ص ১২৬، ابن ماجه ص ৭০)

অনুবাদঃ ... হযরত আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব (ও তার কেবল) সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি এ বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি সমান যোগ্যতার অধিকারী হয়, তবে যিনি প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি তিনি ইমাম হবেন। যদি তাতেও কয়েকজন সমান হয়, তবে যিনি অধিক বয়স্ক হবেন, তিনিই ইমামতি করবেন। কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন স্থানে অথবা অন্যের আধিপত্যের স্থানে ইমামতি না করে। কারো জন্য নির্ধারিত আসনে তার অনুমতি ব্যতিরেকে যেন আসন গ্রহণ না করে।

বিশ্লেষণঃ নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীতে মুসল্লীদের মধ্যে অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা যায়। যথা-

(১) দীন সম্পর্কে যিনি বেশি ইলম ও জ্ঞান রাখেন। বিশেষ করে নামাযের মাসআলা-মাসায়িল সম্পর্কে যিনি বেশি জ্ঞানী।

(২) প্রয়োজনীয় কিরাত বিশুদ্ধ থাকার পর যার কুরআন তেলাওয়াত বেশি সহীহ ও ভাল।

জবাবঃ সাহাবায়ে কিরামের সময়ে যেহেতু শ্রেষ্ঠ আলিম ও শ্রেষ্ঠ ক্বারীর মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না; বরং যে শ্রেষ্ঠ আলিম ছিল, সে শ্রেষ্ঠ ক্বারীও ছিল। তাই উক্ত হাদীসে কিতাবুল্লায় শ্রেষ্ঠ ক্বারী দ্বারা কিতাবুল্লায় অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝানো উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকেই বলেন, এ জবাব সঠিক নয়। কেননা শ্রেষ্ঠ ক্বারী দ্বারা যদি শ্রেষ্ঠ আলিম বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো ক্বারী উবাই ইবন কাব (রাঃ) সাহাবাগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম মেনে নেয়া হয়। অথচ তা ইজমার পরিপন্থী। তাছাড়া আরেকটি অভিযোগ হল, কোন কোন হাদীসে তো কিতাবুল্লাহর শ্রেষ্ঠ ক্বারীর পরে সুন্নতের সবচেয়ে বড় আলিমের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

... عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ اللَّيْثِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ ... (ابو داود ج ١ ص ٨٦، مسلم ج ١ ص ٢٣٦، ترمذي ج ١ ص ٥٥)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যদি সকলে কেরাতের মধ্যে সমান হয়, তবে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ (আলিম), সে-ই ইমামতি করবে।

অতএব, অফ্রা দ্বারা যদি আলিম বুঝানোই উদ্দেশ্য হত, তাহলে হাদীসে অফ্রা-এর পরে علم শব্দকে কেন উল্লেখ করা হল? এতে তো পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং সঠিক জবাব হল এই যে, উল্লিখিত হাদীসে শ্রেষ্ঠ ক্বারীকে ইমামতির জন্য প্রাধান্য দেয়া ইহা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। এ সময়ে কুরআনের আয়াত মুখস্থকারী খুবই বিরল ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির এতটুকু পরিমাণ আয়াত পর্যন্ত মুখস্থ ছিল না, যদ্বারা মাসনুন কিরাতের হুকু আদায় হয়। তখন হিফয ও কেরাতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ইমামতিতে শ্রেষ্ঠ ক্বারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন কুরআন ভালরূপে প্রচলিত হয়ে গেল, তখন সবচেয়ে বড় আলিম হওয়াকে ইমামতির জন্য উত্তম বা মুস্তাহাব হওয়ার সর্বপ্রথম মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ ক্বারীর প্রয়োজন শুধু একটি রুকন তথা শুধু কিরাতে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আলিমের প্রয়োজন নামাযের সবগুলি রুকনে হয়ে থাকে। মোটকথা, রাসূল (সাঃ) অস্তিমশয্যার সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন শ্রেষ্ঠ আলিম হওয়ার কারণে; আর যেহেতু এ ঘটনাটি একেবারে অস্তিমকালের, এজন্য এটি সেসব হাদীসের জন্য রহিতকারীর মর্যাদা রাখে, যেগুলোতে শ্রেষ্ঠ ক্বারীর প্রাধান্যের বিবরণ রয়েছে। (درس ترمذي ج ١ ص ٤٩٣)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাবালেগ শিশুর ইমামতিঃ

... عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ ... فَأَنْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَقَالَ يَوْمَكُمْ أَقْرَأَكُمْ فَكَانَتْ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكَانَتْ أَوْمُهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكَانَتْ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَارَوْا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ ... فَكَانَتْ أَوْمُهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعٍ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ سِنِينَ - (ابو داود ج ১ ص ৮৬, نسائي ج ১ ص ১২৭ امامة الغلام

قهل ان يحتلم)

অনুবাদঃ ... হযরত আমর ইবন সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... রাবী বলেন, একদা আমার পিতা তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট যান। তখন তিনি তাদেরকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন এবং একথাও বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যার অধিক কুরআন মুখস্থ আছে সে যেন ইমামতি করে। আমি অধিক কুরআন মুখস্থকারী ও বিশুদ্ধরূপে তিলাওয়াতকারী হিসেবে তাঁরা আমাকেই ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর আমি তাঁদের ইমামতি করতে থাকি। এসময় আমার গায়ে হলুদ বর্ণের একটি ছোট চাদর ছিল। নামাযের সময় যখন আমি সিজদায় যেতাম, তখন তা খুলে যেত। মহিলাদের মধ্যে একজন বলেন, তোমরা তোমাদের ইমামের সতর ঢাকার ব্যবস্থা কর। ... আমি এমন সময় ইমামতি করতে আরম্ভ করি যখন আমার বয়স ছিল ৭ বা ৮ বছর।

বিশ্লেষণঃ নাবালেগের ইমামতি জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে, নাবালেগ শিশুর ইমামতি জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

দলীলঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত আমর ইবন সালামা (রাঃ) ৭/৮ বছর বয়সে ইমামতি করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ও সাওরী (রহ.)-এর মতে, নাবালেগ ছেলের ইমামতি জায়েয নেই।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ

ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمِنٌ - (ابو داود ج ১ ص ৭৭ باب ما يجب على المؤذن الخ, ترمذي ج ১ ص ১০

باب ان الامام ضامن الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, ইমাম হলো মুসল্লীদের জন্য যিম্মাদার এবং মুআযযিন আমানতদার স্বরূপ।

মূলত নাবালেগের উপর নামায ফরয নয়। অতএব সে যে নামায পড়বে বা পড়াবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর নফল নামায আদায়কারী (مُتَعَفِّل)-এর উপর ফরয আদায়কারী (مُفْتَرَض)-এর ইক্তিদা জায়েয নেই এবং ইমামের নামায ফাসেদ হওয়াতে মুক্তাদীর নামাযও ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ কোন কিছু তার উপর হুজ্বিনিসের জিস্মাদার হয় না। সতরাং নাবালেগের ইমামতি জায়েয নেই।

দলীল (২): হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

لَا يَوْمُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ - (تنظيم ج ١ ص ٣٩٢)

অর্থাৎ, কোন ছেলে ইমামতি করবে না, যতক্ষণ না সাবালক হয়।

জবাবঃ (১) আহমদ ও হাসান বসরী (রহ.) উক্ত হাদীসকে যঈফ বলেছেন।

(২) সম্পূর্ণ হাদীস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, রুকু ও সেজদার সময় তাঁর হাতর খুলে যেত। আর নামাযে হাতর খোলা নামায ভঙ্গের কারণ। সুতরাং উক্ত হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।

(৩) আমার ইবন সালামা (রাঃ)-কে যে ইমাম বানানো হয়েছিল, তা ছিল সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদের ভিত্তিতে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশে নয়। কেননা, তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, যে বেশি কুরআন জানে তাকেই ইমাম নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু তাঁরা নও মুসলিম হওয়ার কারণে নামায ও ইমামতির অন্যান্য আহকাম সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ।

(৪) অথবা এটা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ঘটনা, যখন শরীআতের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়নি। অতএব উক্ত হাদীস দলীলযোগ্য নয়। (درس مشکوٰۃ ২ج ص ১০৭)

بَابُ إِمَامَةِ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ ص ٨٨

কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর ঐ নামাযে পুনরায় ইমামতি করা

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ - (بخاري ج ١ ص ٩٨ ١٣٤ ص نسائي ج ١ ص ١٣٤ اختلاف نية الامام والمأموم)

অনুবাদঃ ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত মুআয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এশার নামায আদায়ের পর স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের ঐ এশার নামাযে ইমামতি করতেন।

বিশ্লেষণঃ উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত মুআয (রাঃ) একবার নামায আদায়ের পর পুনরায় ঐ নামাযেরই ইমামতি করেছেন, অর্থাৎ ইমাম হচ্ছেন নফল আদায়কারী (مُتَمَلِّل) আর মুক্তাদী হচ্ছে ফরয আদায়কারী (مُفْتَرِض)। সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইজ্তিদা জায়েয কিনা। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, ইবন মুনিয়র, আতা, তাউস (রহ.) এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের এক রেওয়ায়েত মোতাবেক নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইজ্তিদা জায়েয আছে। (فتح الملهم ج ২ ص ৮২)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। প্রমাণের কারণ হল, হযরত মুআয (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর নিজের কওমে গিয়ে সেই নামাযই পড়তেন। অতএব, দ্বিতীয়বার তিনি হতেন নফল আদায়কারী। অথচ তাঁর মুক্তাদীরা ছিলেন ফরয আদায়কারী।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, যুহরী ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইজ্তিদা জায়েয নেই। (معارف السنن ج ৫ ص ৯১-৯২)

দলীল (১)ঃ হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন-

... اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... (ابو داود ج ১ ص ৮৯ باب الامام يصلي من قعود، بخاري ج ১

ص ১৫০ باب صلاة القاعد، مسلم ج ১ ص ১৭৭ باب اتتمام المأموم بالامام، ترمذي ج ১ ص ৮৩ باب اذا

صلى الامام قاعدا الخ، نسائي ج ১ ص ১৬৬ تاويل قوله الخ، ابن ماجه ص ৮১/৮২)

অর্থাৎ, ... ইমামকে এজন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে, যেন তার অনুসরণ করা হয়।

সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, খোদ নামায, নামাযের ক্রিয়াসমূহ, নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং নামাযের নিয়তসহ সব বিষয়ে ইমামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা জরুরী। সুতরাং ইমাম-মুক্তাদীর নিয়ত যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাকে তার অনুসারী বলা যায় না।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِمَامُ

ضَامِنٌ وَالْمُؤَدَّنُ مُؤْتَمَنٌ— (ابو داود ج ১ ص ৭৭ باب ما يحب على المؤذن الخ، ترمذي ج ১ ص ৫১

باب ان الامام ضامن الخ)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ইমাম হলো মুসল্লীদের যিস্মাদার এবং মুআযযিন আমানতদার। সুতরাং ইমাম নফল আদায়কারী হয়ে ফরয আদায়কারীর যিস্মাদার হতে পারে না। কারণ কোন কিছু তার উপরন্তু জিনিসের যিস্মাদার হয় না।

আকলী দলীলঃ যদি নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর নামায জায়েযই হত, তাহলে শংকাকালীন নামাযে (صَلَاةُ الْخَوْفِ) এত কষ্ট স্বীকার করে পড়ার কোন দরকার ছিল না; বরং সহজ পদ্ধতি এই ছিল যে, একই ইমাম দুই দলকে দুইবার পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়িয়ে দিতে পারতেন। প্রথম দলের ক্ষেত্রে ফরযের নিয়তে এবং অপর দলের জন্য নফলের নিয়ত করলেই হত। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ৭৭)

জবাবঃ (১) হযরত মুআয (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে হযত নফলের নিয়তে শরীক হয়েছিলেন এবং কওমকে নামায পড়াচ্ছিলেন ফরযের নিয়তে।

(২) যদিও মেনে নেয়া হয় তিনি নফলের নিয়তে ইমামতি করেছিলেন, তবুও এতে নবী করীম (সাঃ) থেকে অনুমোদন প্রমাণিত নয়। ইহা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ। আর তাই দেখা যায়, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট মুআয (রাঃ)-এর বিলম্বে আসা এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে ইমামতি করার অভিযোগ করলে নবী করীম (সাঃ) বলেন-

يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ لَا تَكُنْ فَكَّائًا إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِيَ وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ-
(مجمع الزوائد ج ২ ص ৭২)

অর্থাৎ, হে মুআয! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ো না। হয় আমার সাথে নামায পড়বে, অথবা তোমার কওমকে সংক্ষেপে নামায পড়াবে।

(৩) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে মাগরিবের নামায পড়তেন আর কওমকে পড়াতেন এশার নামায। অতএব নফল আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর প্রশ্নই আসে না।

(معارف السنن ج ৫ ص ১০২)

যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُؤْمِمُهُمْ- (ترمذي)

অর্থাৎ, ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত মুআয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায়ের পর স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের এশার নামাযে ইমামতি করতেন।

(৪) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, এটা তখনকার ঘটনা যখন একই ফরয নামায একাধিকবার পড়া জায়েয ছিল। অতঃপর তা নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (طحاوي ج ١ ص ١٩٩)

যেমন নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ - (ابو داود ج ١ ص ٨٥-٨٦ باب اذا صلى في جماعة الخ، نسائي ج ١ ص ١٣٨ سقوط الصلاة، دار قطني ج ١ ص ٤١٦)

অর্থাৎ, তোমরা একই (ফরয) নামায একই দিনে দু'বার আদায় করো না।

بَابُ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا ص ٩١

নামাযের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সমাप्তি) জিনিসের বর্ণনা

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ - (ترمذي ج ١ ص ٥٥ باب تحريم الصلاة وتحليلها، ابن ماجه ص ٢٤)

অনুবাদঃ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা নামাযের চাবি স্বরূপ। তাকবীর হল তার (নামাযের) জন্য অন্যান্য বিষয়কে হারামকারী এবং সালাম হল তার জন্য অন্যান্য বিষয়কে হালালকারী।

বিশ্লেষণঃ التَّكْبِيرُ (নামায বহির্ভূত কাজ হারাম করার মাধ্যম হল তাকবীর)

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা-এর উচ্চারণভঙ্গি এবং হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, নামায শুরু করার জন্য তাকবীর বা অন্য কোন যিকির জরুরী নয়; বরং শুধু নিয়ত দ্বারা নামায শুরু করা যায়।

* জমহুরের মতে, শুধু নিয়ত দ্বারা শুরু হতে পারে না, বরং যিকির (তাকবীর উচ্চারণ করা) জরুরী।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসটি প্রথম মায়হাবের পরিপন্থী জমহুরদের প্রমাণ।

* উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, নামাযে তাকবীর (اللهُ أَكْبَرُ) বলা ফরয। তাঁদের মতে, সৃষ্টিকর্তার তাজীম সংক্রান্ত অন্য কোন শব্দ এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

* অতঃপর তাকবীরের শব্দ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

(ক) ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, তাকবীরের শব্দ শুধু আল্লাহু আকবার (اللهُ أَكْبَرُ)।

(খ) ইমাম শাফেঈ (রহ.) এতে اللهُ الْأَكْبَرُ-কেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

(গ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এ দুটোর সাথে اللهُ الْكَبِيرُ এবং اللهُ الْكَبِيرُ শব্দ দুটিকেও শামিল করেন। তাঁর মতে, আল্লাহর ছিফাতের মধ্যে أَفْعَلُ এবং فَعِيلُ উভয়টিই বরাবর।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস- تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ- এতে খবরটি (التكبير)

“أ” দ্বারা নির্দিষ্ট তথা معرف باللام যা সীমাবদ্ধতা বুঝায়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাহরীমা তাকবীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (حصراً)। আর উল্লিখিত ইমামগণ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয সাব্যস্ত করার প্রবক্তা।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য বুঝায় এরূপ যে কোন যিকির দ্বারা তাহরীমার ফরয আদায় হয়ে যাবে। যেমন- اللهُ أَجَلُ - اللهُ أَعْظَمُ - اللهُ الرَّحْمَنُ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে তার নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যেহেতু তাকবীরের (اللهُ أَكْبَرُ) বর্ণনা এসেছে। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, اللهُ أَكْبَرُ ব্যতীত অন্য শব্দ ব্যবহার করলে নামায দোহরানো ওয়াজিব হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى অর্থাৎ, সে তার পালনকর্তার নাম উচ্চারণ করেছে, অতঃপর নামায আদায় করেছে। (আল-আলাঃ ১৫)
উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলার নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাকবীরের শব্দের কোন খাস নেই।

দলীল (২)ঃ তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পুরোপুরি আহনাফের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

জবাবঃ (১) তিন ইমাম সীমাবদ্ধতার কথা যে উল্লেখ করেছেন, এর জবাব হল, এখানে সীমাবদ্ধতা দ্বারা আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা (حصر اضافي) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এমন শব্দের উপর সীমাবদ্ধ করা যে সকল শব্দে আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্যের নিদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

(২) হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা দলীল (প্রমাণ) চার প্রকার। যথাঃ

(১) **الاثبات قطعي** (অকাট্য অর্থ অকাট্যভাবে প্রমাণিত)। যেমনঃ কুরআনের আয়াতে মুহকাম এবং হাদীসে মুতাওয়াতির- যার দ্বারা ফরয এবং হারাম প্রমাণিত হয়।

(২) **الاثبات ظني** (ধারণামূলক অর্থ ধারণামূলকভাবে প্রমাণিত)। যার অর্থ ও ভাব অনুমানভিত্তিক ও সন্দেহপূর্ণ, এ সকল দলীল দ্বারা মাকরুহ তানযিহী ও মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।

(৩) **الاثبات قطعي** (অকাট্য অর্থ ধারণামূলকভাবে প্রমাণিত)। যেমন, ইহা আখ্বারে আহাদ। যার অর্থ ও ভাব সুনির্দিষ্ট ও সন্দেহহীন। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে তা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

(৪) **الاثبات ظني** (ধারণামূলক অর্থ অকাট্যভাবে প্রমাণিত)। যেমন- কুরআনুল কারীমের আয়াতে মুআওয়াল (ব্যখ্যামূলক আয়াত) যেহেতু কুরআনের আয়াত, তাই তা অকাট্য। আর এগুলো যেহেতু মুআওয়াল সে কারণে ধারণামূলক। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার দলীল দ্বারা ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ এবং মাকরুহ তাহরীমী প্রমাণিত হয়। আর উক্ত হাদীস **الاثبات قطعي** তথা তৃতীয় প্রকার দলীলে অন্তর্ভুক্ত। তাই এর দ্বারা ফরয প্রমাণিত হবে না, বরং ওয়াজিব প্রমাণিত হবে। তাই আহনাফগণ তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলাকে ফরয না বলে ওয়াজিব বলে থাকেন।

* মূলত এই এখতেলাফটি একটি মৌলিক মতানৈক্যের উপর নির্ভরশীল। তা হচ্ছে তিন ইমামের মতে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং ফরয-সুন্নতের মধ্যে আদিষ্ট বিষয়ের অন্য কোন স্তরও নেই। এজন্য তারা খবরে ওয়াহিদ দ্বারাও ফরয সাব্যস্ত করার প্রবক্তা। কিন্তু হানাফীদের নিকট ফরয ও সুন্নতের মাঝে আরেকটি স্তর হল ওয়াজিব। এই মৌলিক এখতেলাফের সাথে এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই মতপার্থক্য চিন্তাগত। আমলীভাবে উভয় মাযহাবে স্পষ্ট কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাকবীর (الله أكبر) ছেড়ে দিলে উভয় দলের মতেই নামায দোহরানো

ওয়াজিব। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তিন ইমামের মতে এমতাবজ্জায় ফরযও আদায় হবে না। অতএব, তাদের মতে এরূপ ব্যক্তিকে যে তাকবীরের শব্দের সাথে নামায না দোহরাবে তাকে নামায তরককারী বলা যাবে। পক্ষান্তরে, হানাফীদের মতে এরূপ ব্যক্তিকে ওয়াজিব তরককারী বা গোনাহগার বলবে, কিন্তু আমভাবে নামায তরককারী বলা যাবে না।

দ্বিতীয় বাক্য-“وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ” (নামাযে নিষিদ্ধ এমন কাজ হালাল করার মাধ্যম হল সালাম)

সালামের ব্যাপারেও ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* তিন ইমাম ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, নামায থেকে বের হওয়ার জন্য সালামের শব্দ তথা السَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা ফরয। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি সালাম ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে নামায শেষ করে তবে তার নামায গুদ্ব হবে না।

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস-“وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ”

এখানেও معرف باللام-এর দ্বারা খবরকে সীমাবদ্ধতার সাথে আনা হয়েছে। যার সারনির্যাস হল, নামায থেকে হালাল হওয়া তাসলীম শব্দের সাথে বিশেষিত। তাছাড়া উপরোল্লিখিত তিন ইমামই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয প্রমাণিত হওয়ার প্রবক্তা।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে ফরয হচ্ছে মুসল্লীর যেকোন কর্ম দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া। বস্তুত সালামের শব্দ বলার ব্যাপারে হানাফী মাশায়েখদের দুই ধরনের উক্তি রয়েছেঃ

(ক) ইমাম তাহাবী (রহ.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহা সুন্নত।

(খ) আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, ইহা ওয়াজিব। দ্বিতীয় উক্তিটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পর সালামের শব্দ ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে নামায থেকে বের হয়ে যায়, তার ফরয আদায় হবে, কিন্তু দোহরানো ওয়াজিব।

দলীলঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর সেই ঘটনা, যাতে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে তাশাহুদের তালীম দিয়ে তাঁকে বলেছেন-

... إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَوَتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ

شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ— (ابو داود ج ১ ص ১৩৭ باب التشهد)

অর্থাৎ, ... যখন তুমি তা বলবে অথবা তা আদায় করবে, তখন তুমি তোমার নামায সমাপ্ত করে ফেললে। এ সময় তুমি ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে যেতে পার এবং ইচ্ছা করলে বসেও থাকতে পার।

প্রত্যুত্তরঃ এক্ষেত্রেও একই জবাব যা প্রথম অংশে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আহনাফদের নিকট খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয প্রমাণিত হয় না। তাই আহনাফরা তাসলীমকে ফরয না বলে ওয়াজিব বলে থাকেন। (১৭৭-১৭৮৬ জ ১৮৬ তرمذي)

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةُ ص ১০২

যে যে কারণে নামায নষ্ট হয়

... عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدٌ أَوْ خِرَّةٌ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ - (মসলম জ ১৮৬ ১৭৭)

باب سترة المصلى الخ، ترمذي ج ১৮৬ ৭৭ باب لا يقطع الصلاة الا الكلب الخ، نسائي ج ১৮৬ ১২২ ذكر ما يقطع الصلاة الخ، ابن ماجه ص ৬৮

অনুবাদঃ ... আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, নামায নষ্ট করে দেয় অথবা নামাযীর নামায ঐ সময় নষ্ট হয়, যখন তার সামনে উটের পিঠের হাওদার পিছন ভাগের কাঠের মত কোন কিছু না থাকে (অর্থাৎ সুতরা না থাকে) এবং তার সামনে দিয়ে গাধা, কাল কুকুর এবং স্ত্রীলোক গমন করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, কালো কুকুরের কী বিশেষত্ব আছে? যদি লাল, হলুদ ও সাদা রংয়ের হয় তবে কি হবে? তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যে রূপ আমাকে প্রশ্ন করলে, আমিও তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, কাল কুকুর হল শয়তান।

বিশ্লেষণঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা এবং মহিলা গমন করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* আহলে যাহির, হাসান বসরী ও আবুল আহওয়াসের মতে, মুসল্লীদের সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা এবং মহিলা গমন করার কারণে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

* তিরমিযী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, কেবল কাল কুকুর সামনে দিয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

(معارف السنن ج ৩ ص ৩০৭)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ - (ابو

داود ج ১ ص ১০২, نسائي ج ১ ص ১২৩)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী মহিলা এবং কুকুর নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) এই হাদীস দ্বারাই দলীল পেশ করেন। তবে মহিলাদের ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক এবং গাধার ব্যাপারে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা নামায ভঙ্গের (যার বর্ণনা জমহুরদের দলীলে আসবে) কারণ সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারে কোন বিপরীত হাদীস নেই।

(درس مشكوة ج ২ ص ০৭)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর, মহিলা ও গাধা তথা কোন জিনিসই অতিক্রম করার কারণে নামায নষ্ট হবে না। (معارف السنن ج ৩ ص ৩০৭, درس ترمذي ج ২ ص ১১৬)

দলীল (১): ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ

الصَّلَاةَ شَيْئٌ وَادْرُؤُوا مَا سَتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - (ابو داود ج ১ ص ১০৬ باب

من قال لا يقطع الصلاة شيء، ابن ماجه ص ১৮)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোন কিছু নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কারণে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না, তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী এরূপ করতে বাধা দেবে। কেননা (নামাযীর সামনে দিয়ে) গমনকারী একটা শয়তান।

উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হল, شَيْئٌ (কোন কিছু) শব্দটি নكرة তথা অনির্দিষ্টভাবে না-সূচক বাক্যের অধীনে (تحت النفي) নেয়া হয়েছে, যা عموم نفي-এর ফায়দা দেয়। অর্থাৎ কোন কিছুই নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করলে নামায নষ্ট হবে না।

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ : (২) দলীল
مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي تَرَقُدُ عَلَيْهِ
حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ يَقْظَهَا فَأَوْتَرَتْ— (ابو داود ج ১ ص ১০৩ باب من قال المرأة

لا تقطع الصلوة، بخاري ج ১ ص ৭৩ باب الصلوة خلف النائم، مسلم ج ১ ص ১৭৭، نسائي ج ১ ص ১২৬
الرخصة في الصلوة الخ، ابن ماجة ص ১৮)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে
নামায আদায়কালে তিনি (আয়িশা) তাঁর বিছানায় নবী করীম (সাঃ) ও কিবলার
মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি যখন বিতরের নামায পড়তে মনস্থ
করতেন, তখন তাঁকে (আয়িশা) জাগ্রত করলে তিনিও বিতরের নামায পড়তেন।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْجُدَ
غَمَزَ رَجُلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ— (ابو داود ج ১ ص ১০৩، بخاري ج ১ ص ৭৩

من لا يقطع الصلوة شئ/ص ১৬১، مسلم ج ১ ص ১৭৮)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা খুবই পরিতাপের
বিষয় যে, তোমরা নামায নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের
পর্যায়ভুক্ত করেছ। পক্ষান্তরে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ অবস্থায় নামায
আদায় করতে দেখেছি যে, আমি তাঁর সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজদা
করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিলে আমি পা টেনে নিতাম
এবং তিনি সিজদায় যেতেন।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى آتَانَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ
نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمَعَى فَمَرَدْتُ
بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ
ذَلِكَ أَحَدٌ— (ابو داود ج ১ ص ১০৩ باب من قال الحمار لا يقطع الصلوة، مسلم ج ১ ص ১৭৬،

ابن ماجة ص ১৮)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রাপ্ত বয়স্ক
হওয়ার কাছাকাছি সময়ে একদিন গাধীর পিঠে আরোহণ করে মীনায় যাই, যখন
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে নামাযের ইমামতি করছিলেন। তখন আমি নামাযীদের

কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি। আমি আমার গাধীকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে নামাযের কাতারে शामिल হই। এ সময় কেউই আমাকে এ কাজের জন্য নিষেধ করেনি।

... عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (৫) : وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُرَّةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي ذَلِكَ - (ابو داود ج ١ ص ١٠٤ باب من قال الكلب لا يقطع الصلوة)

অর্থাৎ, ... হযরত আল-ফাদল ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট আসেন। আমরা তখন আমাদের খোলা মাঠে ছিলাম। হযরত আব্বাস (রাঃ)ও তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ খোলা মাঠে সুতরাবিহীন অবস্থায় নামায পড়েন যখন তাঁর সামনে আমাদের গাধা ও কুকুর দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু এটাকে তিনি আপত্তিকর মনে করেননি।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু গমন করলে নামায নষ্ট হয় না।

জবাবঃ (১) হাদীসে বর্ণিত قطع الصلوة দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বান্দা এবং তার রবের সম্পর্কের মাঝখানে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া, যা বাস্তব অর্থে সম্পর্ক হ্রাসকরণ নয়।

(২) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নামাযের খুশু-খুযু বা একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়া।

(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যে সকল হাদীসসমূহে কুকুর, গাধা ও মহিলার দ্বারা নামায ভঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে, ঐ সকল হাদীস রহিত হয়ে গেছে।

(درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ٥٨، تلخیص ج ١ ص ٢٨٠)

কেননা হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) নিজেই স্ববিরোধী হাদীস সত্ত্বেও বর্ণনা করেছেন।

* স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, কোন কিছুই অতিক্রম করলে যেহেতু নামায নষ্ট হয় না, তথাপি এ তিনটি জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কি?

এর উত্তর হল, এই তিনটি জিনিসের মাঝে শয়তানী প্রভাবের দখল রয়েছে। যথা-

(ক) কালো কুকুরঃ অনুচ্ছেদের শুরুতেই ইরশাদ হয়েছে-

الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ অর্থাৎ, কালো কুকুর এক ধরনের শয়তান।

(খ) মহিলাঃ মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ রয়েছে-

النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ (مشکوٰۃ المصابیح ج ١ ص ٤٤٤) অর্থাৎ, নারী হল শয়তানের ফাঁদ।

(গ) গাধাঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে এসেছে-

وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا - (مسلم ج ২)
(৩০১ص)

অর্থাৎ, যখন তোমরা গাধার চিৎকার শ্রবণ কর, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে পানাহ চাও। কারণ, সে একটি শয়তান দেখেছে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ص ১০৬

রাফউল ইয়াদাইন বা নামাযে হস্তদ্বয় উত্তোলন

... عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَادِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ - (بخاري ج ১ ص ১০২ باب رفع اليدين اذا كبر، مسلم ج ১ ص ১৬৮ باب استحباب رفع اليدين الخ، ترمذي ج ১ ص ৫৭ باب رفع اليدين عند الركوع، نسائي ج ১ ص ১৬১ باب رفع اليدين الخ، ابن ماجه ص ৬২)

অনুবাদঃ ... সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নামায আরম্ভ করার সময় তাঁর দু'হাত স্বীয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। অনুরূপভাবে রুকু করার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর পরও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। কিন্তু তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না।

বিশ্লেষণঃ রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানোকে রাফউল ইয়াদাইন বা হস্তদ্বয় উত্তোলন বলা হয়। আর এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, চার ইমামের মাঝে এই মতবিরোধ শুধুমাত্র উত্তম ও অনুত্তমের; বৈধতা-অবৈধতার নয়। উভয় দলের নিকট বিনা মাকরুহ উভয় পদ্ধতি জায়েয। আর তাই না শাফিঈদের মাযহাব মতে হাত উত্তোলন না করা নামায ফাসেদ হওয়ার কারণ, না হানাফিদের মতে হাত উঠানো মাকরুহ। সুতরাং এই সাধারণ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করে মূল্যবান সময় নষ্ট করা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। যদিও ইমাম আওযাইঈ, ইমাম হুমায়দী এবং ইমাম ইবন খুযায়মা (রহ.) হস্তদ্বয় উত্তোলনকে ওয়াজিব বলতেন। কিন্তু ইহা বিতর্কের খাতিরে তাদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি বিধায় জমহুরগণ তাঁদের মতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (فتح الباري ج ২ ص ১৭৬)

নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, হাসান বসরী, ইবন সীরীন, ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক মত অনুযায়ী রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন সুন্নত।

(تنظيم ج ١ ص ٢٩٢)

দলীল (১)ঃ ইমাম শাফেঈ ও হাম্বলীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দলীল হল-

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبُهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَرْفَعُ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ - (ابو داود ج ١ ص ١٠٤)

অর্থাৎ, ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে দাঁড়ানোর সময় নিজের দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন এবং দুই হাত উপরে তুলতেন। রুকু হতে উঠার সময়ও স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ” বলতেন। তিনি সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না এবং প্রত্যেক রুকুর জন্য তাকবীর বলার সময় তিনি হাত উঠাতেন এবং এইরূপে নামায শেষ করতেন। (পূর্ববর্তী হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قَرَأْتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْئٍ مِّنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ - (ابو داود ج ١ ص ١٠٩ باب من ذكر انه يرفع يديه الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং কিরআত শেষ করার পর রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে উঠবার সময় অনুরূপ করতেন। তিনি বসে নামায পড়াকালে এরূপ হাত

তুলতেন না। তিনি যখন সিজদার পর দশায়মান হতেন তখন হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন। (পূর্বের হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

... عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أَذُنَيْهِ - (ابو داود ج ১ ص ১০৭)

অর্থাৎ, ... হযরত মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত উঠাতে দেখেছি। আমি তাঁকে রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে উঠার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। (সূত্রঃ ঐ)

দলীল (৪)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এছাড়া এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাফউল ইয়াদাইন সুন্নত। যা নবী করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, আলকামা, যুফার (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী রাফউল ইয়াদাইন শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় সুন্নত। আর রুকুর সময় যদিও জায়েয তবে এমনটি না করাই উত্তম। (تنظيم ج ১ ص ২৭২)

... عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً - (ابو داود ج ১ ص ১০৭)

অর্থাৎ, ... আলকামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন।

... عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِينٍ مِّنْ أَذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ - (ابو داود ج ১ ص ১০৭)

অর্থাৎ, ... হযরত বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায আরম্ভের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলমাত্র একবার কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। এরপরে তিনি আর হাত উঠাতেন না।

... عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسُ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ - (ابو داود ج ১ ص ১৪৩ باب في السلام بالأيدي ج ১ ص ১৮১ باب الامر بالسكون في الصلوة الخ، نسائي ج ১ ص ১৭৬ باب السلام بالأيدي في الصلوة)

অর্থাৎ, ... হযরত জাবির ইবন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাযের মধ্যে তাদের হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ছিল। এতদর্শনে নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি এটা কী দেখছি? মনে হয়, যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের মত মশা-মাছি বিতাড়নের জন্য আন্দোলিত করছ? তোমরা নামাযের মধ্যে শান্ত থাকবে।

দলীল (৪)ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) যিনি রাফউল ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদীসের রাবী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ - (طحاوي ج ১ ص ১১০، مصنف ابن أبي شيبة ج ১ ص ২৩৬، مصنف عبد الرزاق ج ২ ص ৭১)

অর্থাৎ, ... মুজাহিদ বলেন, আমি ইবন উমর (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি কেবল নামাযে প্রথম তাকবীরের সময়ই হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অন্য কোথাও নয়।

সুতরাং, রাবী নিজের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল করাতে একথাই বুঝা যায় যে, প্রথম রেওয়ায়েত রহিত হয়ে গেছে।

দলীল (৫)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ اسْتِقْبَالَ الْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَعِنْدَ الْحَجَرِ - (مجمع الزوائد ج ২ ص ১০৩، مصنف ابن أبي شيبة ج ১ ص ২৩৬-২৩৭)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত। সাত জায়গায় হাত উত্তোলন করা হবে- নামাযের শুরুতে, বায়তুল্লাহ শরীফ সামনে রেখে, সাফা-মারওয়ায়, দুই মাওকিফ সামনে রেখে এবং হজরে আসওয়াদের সামনে।

এই সাত জায়গার মধ্যে নামাযের শুরুতে তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু রুকু এবং রুকু থেকে উঠার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখ নেই। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, এই হাদীসটি প্রমাণযোগ্য। (نهل الفرقدین ص ۱۱۹)

জবাবঃ (১) শাফেঈ ও হাম্বলীগণ রাফউল ইয়াদাইনের সুন্নত বা উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য দলীলের সাথে সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য যে দলীলটি পেশ করেন, তাহল হযরত উমর (রাঃ)-এর হাদীস। আসলে এ হাদীসটি স্বয়ং রাবীর বিপরীতধর্মী আমলের কারণে তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, ইবন উমর (রাঃ)-এর একান্ত শাগরিদ মুজাহিদ বলেন, আমি দশ বছর যাবত ইবন উমর (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি, কিন্তু তিনি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও রাফউল ইয়াদাইন করতেন না। (درس مشکوٰۃ ج ۲ ص ۶۵)

(২) যদিও উক্ত হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধতম। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল জন্য এ হাদীসটিকে হানাফীগণ এজন্য প্রাধান্য দেন না যে, হাত উত্তোলনের ব্যাপারে ইবন উমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত এতটাই পরস্পরবিরোধী যে, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া খুবই জটিল। কেননা, এ ব্যাপারে ছয় ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। যথা-

১. কোনটিতে শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময়।
২. কোনটিতে শুধু তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু হতে উঠার সময়।
৩. কোনটিতে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময়।
৪. কোনটিতে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে উঠার সময় এবং প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়।
৫. কোনটিতে উল্লিখিত চারটি সময় ও সিজদায় যাওয়ার সময়।
৬. এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রুকু, কিয়াম, বৈঠক, সিজদা, দুই সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

(شرح معاني الآثار ج ۱ ص ۱۱۰، مؤطا امام مالك ص ৫৭، بخاري ج ১ ص ১০২، معارف السنن ج ২ ص ৪৭৬)

শাফেঈগণ এসব রেওয়ায়েতের মধ্য থেকে তৃতীয়টির উপর আমল করতে গিয়ে শুধু একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আর অবশিষ্টগুলো ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ অন্য রেওয়ায়েতগুলোও প্রমাণযোগ্য। সহীহ অথবা নূনতম পক্ষে হাসান সনদে প্রমাণিত। অতএব, হানাফীগণ যদি এগুলোর মধ্য থেকে প্রথম প্রকার রেওয়ায়েতটিকে গ্রহণ

করে কোন এক পদ্ধতি গ্রহণ করে, তবে শুধু তাদের উপরেই প্রশ্ন কেন? অথচ, হানাফীদের নিকট প্রথম রেওয়ায়েতটি অবলম্বন করার যৌক্তিক কারণও আছে, যদ্বারা অন্য রেওয়ায়েতগুলোরও ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে নামাযের আমলগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নামাযের আহকাম নড়াচড়া থেকে স্থিরতার দিকে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। যেমন, প্রথমে নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল, অতঃপর তা রহিত হয়ে যায়। প্রথমে আমলে কাসীর নামায ভঙ্গের কারণ ছিল না, অতঃপর ইহাকে নামায ভঙ্গের কারণ সাব্যস্ত করা হয়। প্রথমে এদিক-সেদিক তাকানো জায়েয ছিল, অতঃপর এটাকে বাতিল করে দেয়া হয়, এতে বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে প্রচুর পরিমাণ হাত উত্তোলন হত এবং প্রতিটি অবস্থান্তরকালে তা বৈধ ছিল। অতঃপর তা হ্রাস করা হয় এবং শুধু পাঁচটি স্থানে বিধিবদ্ধ থেকে যায়। এরপর আরো হ্রাস করা হয় এবং চারটি স্থানে বিধিবদ্ধ থেকে যায়। এমনিভাবে হ্রাস করতে করতে শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠানোর বিধান অবশিষ্ট থেকে যায়।

হানাফীগণ যেহেতু হাত তোলার বিষয়টিকে প্রমাণিত বলে স্বীকার করেন, সেহেতু তারা হাত তোলার রেওয়ায়েতগুলোর কোন সমালোচনা করেন না। অতএব, হাত তোলার ব্যাপারে হানাফীদের পক্ষ থেকে আলোচনার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, হাত তোলা নাজায়েয, অথবা এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, শুধু এতটুকু প্রমাণ করা যে, হাত না তোলার বিষয়টিও কুরআন, হাদীস, আছার দ্বারা প্রমাণিত এবং এই পদ্ধতিটিই প্রধান ও উত্তম। যেমন-

(১) আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** অর্থৎ, আর আল্লাহর সামনে তোমরা একান্ত আনুগত্যের সাথে (নামাযে) দন্ডায়মান হও। (বাকারঃ ২৩৮)

এই আয়াতের দাবী হল, নামাযে নড়াচড়া যেন সবচেয়ে কম হয়। অতএব, যেসব হাদীসে নড়াচড়া ন্যূনতম কম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো এ আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(২) হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে কোন এখতেলাফ নেই এবং এতে প্রশ্নোত্থাপন করারও সুযোগ নেই। কেননা, তার আমল ও বর্ণনার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

(৩) হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতের সমস্ত রাবী ফকীহ। স্বয়ং ইবন মাসউদ (রাঃ) হাত উত্তোলন সংক্রান্ত সমস্ত রাবীদের তুলনায় বড় ফকীহ। আর হাদীসে মুসালসাল বিল ফুকাহা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

(৪) সর্বোপরি বলা যায় যে, হাদীসগুলোতে পারস্পরিক বিরোধের সময় সাহাবায়ে কিরামের আমল খুবই গুরুত্ববহ। তাই হানাফীগণ বলেন, আমরা যখন এ দিকটি লক্ষ্য করি তখন হযরত উমর, আলী ও ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর আমল দেখি হাত

উত্তোলন না করার। আর তাঁদের বিপরীতে যাঁদের থেকে হাত তোলা বর্ণিত আছে তাঁদের বেশির ভাগ কম বয়স্ক সাহাবী। যেমন হযরত ইবন উমর ও ইবন যুবাইর (রাঃ)। (درس ترمذي ج ٢ ص ٢٦-٤٣)।

* তাই আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, হাত উঠানোর হাদীসগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। কিন্তু হাত না তোলার হাদীসগুলো আমলের দিক থেকে মুতাওয়াতির। (نهج الفرقدين ص ১১৭)

* আল্লামা নীমভী (রহ.) বলেন, সাহাবা ও তৎপরবর্তীগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যত্র হাত তোলা প্রমাণিত নেই। (اثر السنن ص ১০৫-১১১)

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَأَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - ص ১১৫

উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না বলা

... عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (بخاري ج ١ ص ١٠٣ باب ما يقرأ بعد التكبير، مسلم ج ١ ص ١٧٢ باب حجة من لا يجهر بالبسملة، ترمذي ج ١ ص ٥٧ باب في افتتاح القراءة بالحمد لله الخ، نسائي ج ١ ص ١٤٤ ترك الجهر ببسم الله الخ)

অনুবাদঃ ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ), আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) “আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন” হতে কেরাত পাঠ শুরু করতেন।

বিশ্লেষণঃ এখানে যে দুটি বিষয় এক সাথে আলোচনা করা হবে, তাহল- বিসমিল্লাহি রাহমানির রাহীম কুরআনের অংশ কিনা এবং উচ্চস্বরে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে উচ্চস্বরে পড়তে হবে, নাকি আন্তে- এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সূরা নমলে ৩০ নং আয়াতে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর চিঠিতে যে বিসমিল্লাহ এসেছে তা কুরআন মাজীদে অংশ।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, দু’সূরার মাঝখানে যে বিসমিল্লাহ রয়েছে, তা কুরআনের অংশ নয়; বরং ইহা দু’সূরাকে পৃথক করার জন্য নাযিল হয়েছে। অন্যান্য যিকিরের ন্যায় ইহাও একটি যিকির। কতক হাম্বলীর অভিমতও তাই। সুতরাং ইমাম মালিক (রহ.) যেহেতু ইহাকে কুরআনের অংশ হিসেবে স্বীকার করেন না, তাই

নামাযের মধ্যেও ইহা পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তা আস্তে হোক অথবা জোরে হোক। তবে নফলে পড়ার অনুমতি রয়েছে।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এখানে বিসমিল্লাহ পড়ার উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ নয় এবং নামাযেও তা পড়তে হবে না।

দলীল (২): আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি তাঁর ছেলেকে নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এটাকে বিদআত সাব্যস্ত করে বলেছেন-

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (ترمذي ج ١ ص ٥٧ باب في ترك الجهر بسم الله الخ)

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতে শুনিনি। অতএব, তুমি তা বলো না। তুমি যখন নামায পড় তখন বল, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, বিসমিল্লাহ কুরআন মাজীদে অংশ। এমনকি তাঁর মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ এবং প্রত্যেক সূরার অংশ। তাই জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া এবং আস্তে কিরআত বিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া সুন্নত।

দলীল (১): হযরত নুআইম আল-মুজমির-এর রেওয়ায়েত। তিনি বলেন-

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ الْخ (نسائي ج ١ ص ١٤٤ قراءة بسم الله الخ)

অর্থাৎ, আমি আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি পড়ছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর তিনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَوَتَهُ

بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - (ترمذي ج ١ ص ٥٧ باب من رأى الجهر بسم الله الخ)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা তাঁর নামায আরম্ভ করতেন।

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ أَنْفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ... حَتَّى

خَتَمَهَا الْخ (ابو داود ج ১ ص ১১৬, نسائي ج ১ ص ১৪৩-১৪৬)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এখনই আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইম্মা আতায়না কাল-কাওসার ... তিনি সূরাটির শেষ পর্যন্ত তোলাওয়াত করেন।

দলীল (৪)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - (نصب
الرواية ج ১ ص ৩৪০)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উচ্চস্বরে পড়তেন।

সূতরাং উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ এবং জোরে কিরাতবিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে এবং আন্তে কিরাতবিশিষ্ট নামাযে বিসমিল্লাহ আন্তে পড়া সুন্নত।

* ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ, তবে এটি কোন বিশেষ সূরার অংশ নয়।

অবশ্য প্রত্যেক নামাযে “বিসমিল্লাহ” আন্তে পড়া উত্তম। জোরে কেঁরাতবিশিষ্ট নামাযে হোক অথবা আন্তে কেঁরাতবিশিষ্ট নামাযে হোক।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ

الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْخ (ابو داود ج ১ ص ১১৬)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভ করতেন এবং আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলে কেঁরাত শুরু করতেন।

দলীল (৩): عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ (৩) وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ/وَفِي رِوَايَةٍ نَسَائِي يَجْهَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- (মসল জ ১৮, ১৭২, নসائي ج ১ ص ১৪৪)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবুবকর, উমর ও উসমান (রাঃ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে শুনিনি। নাসায়ী রেওয়ায়েতে আছে, উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।

দলীল (৪): হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يُسْمِعْنَا مِنْهُمَا- (নসائي ج ১ ص ১৪৪)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নামাযে ইমামতি করেছেন, তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আমাদের শুনিতে পড়েননি। এমনিভাবে আবু বকর ও উমর (রাঃ) আমাদের ইমামতি করেছেন। তাঁরাও আমাদেরকে শুনিতে পড়েননি।

দলীল (৫): হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ- (ترمذي ج ২ ص ১৩২ ابواب فضائل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الملك)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে। এটি এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সূরাটি হচ্ছে- تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ-

আর সূরা মুলকের ৩০ আয়াত তখনই হয়, যখন বিসমিল্লাহকে এর অংশ হিসেবে গণ্য করা না হয়। নতুবা ৩১ আয়াত হয়ে যাবে।

দলীল (৬): পবিত্র কুরআনের আয়াত- وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمُنَافِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ

অর্থাৎ, আমি আপনাকে ‘সাবই মাসানী’ তথা পুনরাবৃত্ত সাত আয়াত এবং মহান কুরআন দান করেছি। (হিজরঃ ৮৭)

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে ‘সাবই মাসানী’ দ্বারা সূরা ফাতিহা উদ্দেশ্য।

কারণ এটি এরূপ সাতটি আয়াত দ্বারা গঠিত যেগুলো নামাযে বারবার তিলাওয়াত করা হয়। অতএব, সূরা ফাতিহার সাত আয়াত তখনই হয়, যখন বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ ধরা না হয়। নতুবা আটটি আয়াত হয়ে যাবে।

অতএব, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ তবে তা সর্বাবস্থায় আন্তে পড়াই উত্তম।

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাব-

উল্লিখিত হাদীসে **يَفْتَحُونَ الْقُرْآنَ** দ্বারা বিসমিল্লাহ না পড়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এখানে কেরাত গুরুত্ব উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। আর ইহা তো জানা কথা যে, বিসমিল্লাহ কেরাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এর দ্বারা বিসমিল্লাহ না পড়ার দলীল প্রদান করা সঠিক নয়। তবে তা জোরে না পড়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রাঃ)-এর হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। এটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আসলে হাদীসটিতে জোরে পড়তে বারণ করা হয়েছে, কিন্তু বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ করা হয়নি। আর তাই জোরে পড়াকে আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল স্বীয় পুত্রকে বিদআত বলেছেন। কেননা খোদ হাদীসেই এর প্রমাণ রয়েছে-

— **سَمِعْنِي أَبِي ... فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ** অর্থাৎ, ‘আমার পিতা আমাকে নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতে শুনেছেন। ... আমি তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলতে শুনিনি।’

সুতরাং হাদীসটি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তাঁরা জোরে পড়তেন না। অতএব, হাদীসের পরের অংশে বর্ণিত **فَلَا تَقْلَهَا** তথা তুমি তা বলো না- এর অর্থ হচ্ছে **تَجْهَرُ بِهَا** অর্থাৎ তুমি তা জোরে বলো না।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলসমূহের জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে যতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সবগুলো রেওয়ায়েত যঈফ, অস্পষ্ট এবং বিশ্লেষণের দাবী রাখে। সুতরাং এগুলো হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহীহ রেওয়ায়েতের মুকাবিলায় দলীলযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর তৃতীয় দলীলের জবাব হল, নবী করীম (সাঃ) সূরা কাওসারে বিসমিল্লাহ পড়েছিলেন মূলত সূরার অংশ হিসেবে নয়; বরং তিনি বিসমিল্লাহ বলেছিলেন তিলাওয়াত শুরু করার জন্য।

আর চতুর্থ দলীল হিসেবে তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে যে দলীলটি পেশ করেছেন, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ)

ইরশাদ করেন- **الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ**

(شرح معاني الآثار ج ١ ص ١٠٠، مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٤١١)

অর্থাৎ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়া বেদুঈনদের কেৱাত।

* অথবা, কখনো কখনো নবী করীম (সাঃ) তালীমের নিমিত্তে উচ্চস্বরে “বিসমিল্লাহ” পড়তেন।

* অথবা, যতগুলো হাদীস দ্বারা উচ্চস্বরে “বিসমিল্লাহ” পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, আসলে সবই ছিল জায়েয বর্ণনা করার জন্য। উত্তম বুঝানোর জন্য নয়।

(درس مشکوة ج ٢ ص ٦٠-٦٢، درس ترمذي ج ١ ص ٤٩٩-٥٠٨)

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَوَتِهِ ص ١١٨

কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কেৱাত পাঠ ত্যাগ করলে

... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا- (ابو داود ج ١ ص ١١٩، بخاري ج ١ ص ١٠٤ باب وجوب القراءة الخ، مسلم ج ١ ص ١٦٩ باب وجوب قراءة الفاتحة الخ، ترمذي ج ١ ص ٦٩-٧٠ باب قراءة خلف الامام، نسائي ج ١ ص ١٤٥ ايجاب قراءة فاتحة الكتاب الخ، ابن ماجه ص ٦٠)

অনুবাদঃ ... উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ফজরের নামাযের জামাআতে শরীক ছিলাম। নামাযে কুরআন পাঠের সময় তাঁর কেৱাত পড়া কঠিন হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি বলেন, সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে কেৱাত পাঠ করেছ। আমরা বলি, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়বে না। কেননা, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না।

বিশ্লেষণঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যথা-
(ক) ইমামের পিছনে কেৱাত পড়া (খ) নামাযে সূরা ফাতিহার হুকুম।

প্রথম আলোচনাঃ উল্লেখ্য যে, ইমামের পিছনে কেৱাত পড়ার বিধান নিয়ে ইমামদের মাঝে বড় ধরনের মতভেদ রয়েছে। আর বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বিধায় অনেক ফকীহ এ সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে যান। কারণ, ইমামগণের মাঝে যে হাজারো

মতবিরোধ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম জটিল ও কঠিন বিষয়। ইমামগণের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই হল সুন্নত, মুস্তাহাব, মুবাহ, উত্তম-অনুত্তম, অথবা মাকরুহ তানযীহী পর্যায়ে। সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা হয়ত অনেকের জীবনে একবারও সম্মুখীন হতে হয় না বা সম্মুখীন হলেও তা হয়ত জীবনে দু'একবারের জন্য। কিন্তু ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিষয়টি হল নামায নিয়ে- যা বালেগ হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকটি সুস্থ-সবল মুসলিম পুরুষকে দৈনিক পাঁচবার আদায় করতে বাধ্য। তাছাড়া নবী করীম (সাঃ) জামাআতের যে তাগিদ দিয়েছেন তাতে একজন খাঁটি মুমিন কখনো ইমামের পিছনে জামাআত ছাড়া একাকী নামায আদায় করে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর অভিমত তো এই যে, জামাআতে নামায আদায় করা ফরযে আইন। যেহেতু নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত কেরাত তরক করা কারো মতে যেন ফরয তরক করা, তেমনিভাবে কেরাত পড়াও কারো কারো মতে হারাম। বস্তুত ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কেরাত পড়ার মত প্রাত্যহিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইমামগণের এমন বৈপরীত্যপূর্ণ মতামত খুবই দুঃখজনক।

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কুন্তলানী (রহ.) বলেন, “আমি জীবনে কখনো মুক্তাদী হয়ে নামায পড়িনি। কেননা যদি কেরাত পড়ি, তাহলে এক ইমামের মতে আমি হারাম সম্পাদনকারী হিসেবে গণ্য হব। পক্ষান্তরে যদি কেরাত না পড়ি তাহলে অন্য ইমামের দৃষ্টিতে ফরয তরককারী হিসেবে গণ্য হব।” (درس مشكوة ج ۲ ص ۷۲)

যাই হোক, যুগে যুগে এ বিষয়ের উপর উভয় পক্ষ থেকে এত গ্রন্থ রচিত হয়েছে যে, যা একত্র করলে একটি পূর্ণ গ্রন্থাগার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাব হল ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত “জুযউল কেরাত খলফাল ইমাম”, বায়হাকী রচিত “কিতাবুল কেরাত”, আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রচিত “ইমামুল কালাম ফিল কিরাআতি খলফাল ইমাম”, আল্লামা কাসিম নানুতভী রচিত “আদ-দালীলুল মুহকাম ফী তরকিল কিরাআতি লিল মুতাম”, আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রচিত “হিদায়াতুল মুতাদী ফী কিরাআতিল মুকতাদী”, আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) রচিত “ফসলুল খিতাব ফী মাসআলাতি উশ্মিল কিতাব”, আল্লামা সরফরাজ খান সফদার রচিত “আহসানুল কালাম ফী তরকিল কিরাআতি খলফাল ইমাম” ইত্যাদি।

(درس ترمذي ج ۲ ص ۷۱-۷۲)

মাযহাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

* ইমাম মালিক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, জোরে কেরাত বিশিষ্ট নামাযগুলোতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। তবে তাঁদের কোন কোন রেওয়ায়েতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরুহ, কোনটিতে জায়েয

এবং কোনটিতে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাযগুলো সম্পর্কে তাঁদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে। যথা- (১) ওয়াজিব, (২) মুস্তাহাব, (৩) মুবাহ বা অনুমোদিত। (المغني ج ১ ص ১০৯)

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُتَارِعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَاثْتَمَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— (ابو داود ج ১ ص ১২০
باب من رأى القراءة الخ، ترمذي ج ১ ص ৭১ باب في ترك القراءة خلف الإمام الخ، نسائي ج ১ ص ১৪৬، ابن ماجه ص ৬১)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উচ্চস্বরে কেরাত পাঠের মাধ্যমে নামায আদায়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ এখন আমার সাথে (নামাযের মধ্যে) কেরাত পাঠ করেছে কি? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, এজন্যই বলি, কি ব্যাপারে আমার সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে?

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে একরূপ শোনার পর সাহাবায়ে কিরাম উচ্চস্বরে কেরাতবিশিষ্ট নামাযে তাঁর পিছনে কেরাত পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক নামাযেই ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব তথা ফরয। উচ্চস্বর কেরাত বিশিষ্ট নামায হোক বা আস্তে কেরাত বিশিষ্ট নামায হোক। (فتح الملهم ج ২ ص ২০)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ— قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ فَغَمَزْ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيَّ فِي نَفْسِكَ الخ (ابو داود ج ১ ص ১১৯، مسلم ج ১ ص ১৭০، ترمذي

ج ১ ص ৭১ باب في ترك القراءة الخ، نسائي ج ১ ص ১৪৬، ابن ماجه ص ৬১)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন সূরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বলেন, হে ফারসী! তখন তুমি তোমার মনে মনে তা পাঠ করবে।

দলীল (৩): ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرِجُ فَنَادَى فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ-

(ابو داود ج ١ ص ١١٨)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি মদীনার রাস্তায় বের হয়ে ঘোষণা দাও যে, কুরআন পাঠ ব্যতীত নামাযই শুদ্ধ হয় না; অন্তত সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সংক্ষিপ্ত কোন সূরা বা আয়াত অবশ্যই মিলাতে হবে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমামের পিছনে কেবল তথা সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে। (এছাড়াও শাফেঈদের আরো অনেক দলীল রয়েছে।)

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন ও জমহুর সাহাবাগণের মাযহাব হল, মুকতাদী কোন নামাযেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন কিরআত পড়বে না, উচ্চস্বরে কেবল বিশিষ্ট নামায হোক বা আস্তে কেবল বিশিষ্ট নামায হোক। ইমামের পিছনে কেবল পড়া সর্বাবস্থায় মাকরুহ তাহরিমী।

(فتح الملهم ج ٢ ص ٢٠، تعليق الصبيح ج ١ ص ٣٦٢)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-

অর্থাৎ, আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগের সাথে শোন এবং তোমরা নিশ্চুপ থাক। যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (আল-আরাফঃ ২০৪)

সুতরাং উক্ত আয়াতে দুটি হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি কুরআন শোনার, অপরটি নীরবতার। সুতরাং সশব্দে কেবল বিশিষ্ট নামাযে কুরআন শ্রবণ করবে এবং আস্তে কেবল বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদী নীরব থাকবে। আর সূরা ফাতিহা যে কুরআন এটা সর্বসম্মত বিষয়। অতএব, এর দ্বারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠও নিষিদ্ধ বুঝা যায়।

* কেউ কেউ উক্ত আয়াতে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, এই আয়াতটি নামায সম্পর্কে নয়; বরং জুমআর খুতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ, যখন ইমাম খুতবা পাঠ করেন, যাতে কুরআনের আয়াতও বিদ্যমান থাকে, তখন তোমরা নীরব থাক। কিন্তু এই প্রশ্ন উত্থাপন যথাযথ নয়। কেননা, (১) ইমাম বায়হাকী হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যামানায় কোন কোন সাহাবী ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। (كتاب الفراءه ص ৮৭)

(২) উক্ত আয়াতটি মক্কী, আর জুমআর নামাযের প্রবর্তন হয় মদীনায়।

(৩) আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে। অথচ খুতবাতে সম্পূর্ণটুকু কুরআনের আয়াত হয় না। পক্ষান্তরে নামাযের কেরাত সম্পূর্ণ কুরআন। সুতরাং, অবশেষে আল্লামা ইবন জারীর ও সুযুতী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থে নামায অন্তর্ভুক্ত।

(درس ترمذي ج ২ ص ৮৮، روح المعاني ج ৫ ص ১৫০، اعلاء السنن ج ৪ ص ৪৩)

অতএব, হানাফীদের দলীলের জন্য একটি আয়াতই যথেষ্ট। এর মুকাবিলায় যত হাদীস পেশ করা হবে সবগুলোকে এই আয়াতের আওতায় ব্যাখ্যা করা হবে।

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا-

অর্থাৎ, যেদিন রুহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য কথা বলবে।

(নাবাঃ ৩৮)

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল, আমাদের নামাযের সারিসমূহকে আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের সারিসমূহের সাথে তুলনা দেয়া যায়। যেভাবে ফেরেশতাদের সারিসমূহের মধ্য থেকে আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্য কেউ কোন কিছু বলতে পারবে না। অনুরূপভাবে, নামাযেও আল্লাহর সাথে কিছু বলার অনুমতি নেই, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত আল্লাহ তাআলা যাকে অনুমতি দিয়েছেন। আর তিনি হলেন ইমাম। সুতরাং কেরাত একমাত্র ইমামেরই হক। অন্য কারো নয়। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ৭৫)

দলীল (৩): আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আয়াত এসেছে-

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً-

প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। (আহকাফঃ ১২)

উক্ত আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর কিতাবকে ইমাম বলা হয়েছে। সূতরাং আমাদের জন্য ইমাম হবে পবিত্র কুরআনুল কারীম। আর প্রকৃত সামঞ্জস্য তো এই যে, ইমাম (কুরআন)-কে ইমামের নিকটই রাখা চাই। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ৭৬)

দলীল (৪): হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا جُعِلَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا - (ابو داود ج ১ ص ৮৭ باب الامام يصلي من تعود، نسائي ج ১ ص ১৬৭ تاويل قوله واذا قرئ القرآن الخ، ابن ماجه ص ৭১)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ইমামকে এজন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে, যেন তার অনুসরণ করা হয়। অতএব, ইমাম যখন তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তাকবীর বল। আর ইমাম যখন কেরাত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাক।

উক্ত হাদীসে ইমামের কেরাতের সময় শর্তহীনভাবে নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা সূরা ফাতিহা ও অন্য কেরাত উভয়টির জন্য ব্যাপক। এই দুটির মাঝে পার্থক্য করা কোন ক্রমেই জায়েয নয়। কেননা, উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এক একটি আমল খুলে খুলে বাতলে দিয়েছেন। যদি ফাতিহা ও সূরা পাঠের হুকুমে কোন পার্থক্য হত, তাহলে তিনি অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন।

দলীল (৫): ইমাম মালিকের পক্ষে দলীল হিসেবে পূর্বে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীসে এমন কিছু দলীল ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যদ্বারা ইমামের পিছনে কিরআত না পড়ার কথা প্রমাণিত হয়। যেমন-

(১) যখন নামাযান্তে নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের মধ্যে কি কেউ কেরাত পড়েছে?” এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার হুকুম ছিল না, নতুবা তিনি (সাঃ) এরূপ প্রশ্ন করতেন না।

(২) যদি ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার হুকুম থাকত, তাহলে তো সবাই বলতেন যে, জি হুজুর! আমরা কেরাত পড়েছি, শুধু এক ব্যক্তি বলতেন না।

(৩) নবী করীম (সাঃ) তাঁর পিছনে কেরাত পড়াকে বাদানুবাদ (ملازمة) সাব্যস্ত করেছেন। আর বাদানুবাদ হয় যখন অন্যের হকে অংশ নেয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কেরাত ইমামেরই হক, মুক্তাদীর হক নয়।

(৪) কিছু সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁরা এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন। এই ঘটনার পর আর কেউ ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন না। যা উক্ত

হাদীসের শেষে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) উল্লেখ করেছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, ইমামের পিছনে কেরাত পড়া জায়েয নয়।

দলীল (৬): عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ - (ابن ماجه ص ৬১, মুطا امام محمد ص ৯৮, مصنف ابن ابی شیبہ ج ১ ص ৩৭৬, شرح معاني الآثار ج ১ ص ১০৬, يبيحي سنن كبرى ج ২ ص ১৬০, دار قطني ج ১ ص ২২৩)

অর্থাৎ, হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যার ইমাম আছে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত।

আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধ সূত্রে এ হাদীসটি মারফূ। (روح المعاني ج ৫ ص ১০১) সুতরাং উক্ত হাদীসটিও হানাফীদের অভিমতের জন্য একটি স্পষ্ট দলীল। কেননা, এখানে একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের কেরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অতএব, মুক্তাদীর কেরাতের প্রয়োজন নেই। অতঃপর এই হাদীসে ব্যাপক কেরাতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (ابو داود ج ১ ص ১৩৫, باب التامين وراء الامام, بخاري ج ১ ص ১০৮, باب جهر المأمون بالتأمين, مسلم ج ১ ص ১৭৬, باب التسميع والتحميد والتأمين, ترمذي ج ১ ص ৫৮, باب فضل التأمين, نسائي ج ১ ص ১৪৭, جهر الامام بأمين, ابن ماجه ص ৬১)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, যে ব্যক্তির আমীন শব্দ ফেরেশতার আমীন শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্ব জীবনের সমস্ত গোনাহ মার্জিত হবে। হাফেয ইবন আব্দুল বার (রহ.) ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কেরাত না পড়ার দলীল এভাবে প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত হাদীসে মুক্তাদীকে আমীন বলার ব্যাপারে ইমামের অনুসরণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুক্তাদীকে ইমামের ফাতিহা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর অপেক্ষাকারী হবে চুপ থেকে শ্রবণকারী।

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এই হাদীস দ্বারা এভাবে দলীল পেশ করেছেন যে, যদি কোন মুক্তাদী ফাতিহার মাঝখানে এসে জামাআতে শরীক হয়, এমতাবস্থায় ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শেষ করবে তখন তো সে ব্যক্তি স্বীয়

ফাতিহার মাঝখানে আমীন বলতে হবে। যা কখনো যুক্তিসঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে, ঐ ব্যক্তি যদি নিজের ফাতিহা শেষ করে আমীন বলে, তাহলে তা হবে উল্লিখিত হাদীসের বিপরীত। কেননা তথায় ইমামের আমীনের সাথে আমীন বলার কথা বলা হয়েছে। (درس مشکوٰۃ ج ۲ ص ۷۵)

সূতরাং, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, মুক্তাদীর ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়া জায়েয নয়।

ইজমাঃ ইমামের পিছনে কেরাত না পড়ার ব্যাপারে অনেক সাহাবীর অভিমত ও রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারীতে ইমামের পিছনে কেরাত পরিহারের মাযহাব ৮০ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে অনেক সাহাবী এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। (مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۱۳۹)

ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হবে, এমন ব্যক্তির মুখে মাটি নিক্ষেপ করা উচিত। (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۱০-১১১)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এমন ব্যক্তি ফিতরতের উপর নেই। (সূত্রঃ ঐ)

হযরত সাআদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, এমন ব্যক্তির মুখে আগুনের টুকরো ঢেলে দেয়া উচিত। (موطا امام محمد ص ১০১-১০২)

হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন, এমন ব্যক্তি বেওকুফ।

এছাড়া য়ায়েদ ইবন সাবিত, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণও ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিপক্ষে অভিমত পোষণ করতেন।

(شرح معاني الآثار ج ১ ص ১০৮، موطا امام مالك ص ১৬)

আকলী দলীলঃ কিয়াস তো এই যে, ইমাম কওমের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি। মুক্তাদীগণের পক্ষ থেকে মহান রাক্বুল আলামীনের দরবারে দরখাস্ত পেশ করবেন। কিন্তু রুকু ও সিজদা এর বিপরীত। কেননা এগুলো হল নামাযের আদবসমূহ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার তাজীম করা, যা সবারই আদায় করা উচিত। আর কেরাত হল দরখাস্ত। যা সবার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি সেজে আল্লাহর নিকট পেশ করবেন। আর তিনি হলেন ইমাম। যদি সবাই একই কথা একই সাথে বলে, তাহলে সেটা হবে বেয়াদবী। তাই কিয়াসেরও দাবী হল এই যে, কেরাত শুধু ইমাম পড়বেন, আর মুক্তাদী তা মনোযোগ সহকারে শুনবে বা চুপ থাকবে। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ৭৫، تنظيم ج ১ ص ৩২৩، فتح الملهم ج ২ ص ২৬)

হানাফীদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেঈ (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবঃ

(১) যদিও শাফেঈদের নিকট উক্ত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী, কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসটিকে সনদ ও মতনের দিক দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ (ইযতিরাব) বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বান, হাফেয ইবন আব্দুল বার, ইবন তাইমিয়াহ উক্ত হাদীসটিকে মালূল বা ক্রটিযুক্ত বলেছেন।

(فتاوى ابن تيمية ج ٢ ص ١٧٨، معارف السنن ج ٣ ص ٢٠٣-٢٠٥)

কেননা, উক্ত হাদীসের কোন কোন সনদ এভাবেও বর্ণিত হয়েছে-

عن مكحول عن عبادة ابن الصامت (دار قطني ج ١ ص ٣١٩)

আর মাকহুল সর্বসম্মতিক্রমে উবাদা (রাঃ) থেকে শ্রবণ করেননি।

কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة- (ابو داود ج ١ ص ١١٩)

কোন কোন সূত্রে বর্ণিত আছে-

مكحول عن محمود ابي نعيم انه سمع عبادة- (دار قطني ج ١ ص ٣١٩)

এমনিভাবে সনদের অসঙ্গতির সাথে মাকহুল থেকে বিভিন্ন কিতাবে আটটি প্রকার বর্ণিত আছে। সুতরাং এতো অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও হাদীসটি কিভাবে দলীলযোগ্য হতে পারে? তাই অনেকেই মনে করেন, মাকহুল দু'তিনটি রেওয়ায়েত মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র রেওয়ায়েত বানিয়ে ফেলেছেন। অথবা, রেওয়ায়েতে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। (فتاوى ابن تيمية ج ٢ ص ١٧٨)

(২) যদি এ হাদীসটিকে সহীহও মেনে নেয়া হয়, তবুও এর দ্বারা শাফেঈদের প্রমাণ যথার্থ হতে পারে না। কারণ, হাদীসে সূরা ফাতিহা ও কেরাত ছাড়া নামায শুদ্ধ না হওয়ার যে হুকুম এসেছে, তা মূলত ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর (مفرد) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, মুক্তাদীর ক্ষেত্রে নয়। স্বয়ং ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর উস্তাদ সুফিয়ান (রহ.) এ ব্যাপারে বলেন- (ابو داود ص ١١٩) ... لَمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

অর্থাৎ, এই নির্দেশ কেবলমাত্র একাকী নামায আদায়কারীর বেলায় প্রযোজ্য।

(৩) হতে পারে যে, হাদীসে কেরাতের দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক। প্রকৃতভাবেও হতে পারে (যেমন ইমাম ও মুনফারিদের কেরাত) বা হুকুমের দিক দিয়েও হতে পারে। আর উক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে আমরা (হানাফীগণ) মুক্তাদীকে পাঠকারী বলে গণ্য করতে পারি।

যেমন হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً-

(৪) উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতেই বর্ণিত। অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে-
... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

فَصَاعِدًا- (ابو داود ج ১ ص ১১৯, بخاري ج ১ ص ১০৪ باب وجوب القراءة الخ, مسلم ج ১ ص ১৬৯,

نسائي ج ১ ص ১৪৫)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত আয়াত পাঠ না করবে, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সূরা ফাতিহার যে হুকুম, ঠিক সূরা মিলানোর একই হুকুম। অথচ ইমাম শাফেঈ (রহ.) মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর প্রবক্তা নন। তাই আমরা (আহনাফগণ) বলব, সূরা মিলানোর ক্ষেত্রে আপনাদের যে উত্তর, সূরা ফাতেহা পড়ার ক্ষেত্রেও আমাদের সেই একই জবাব।

(فتح الملهم ج ২ ص ২০, تعليق الصحيح ج ১ ص ৩৬২)

(৫) হযরত উবাদাহ (রাঃ) থেকে এভাবেও হাদীস বর্ণিত আছে-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- (ابو داود ج ১ ص ১১৯)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না।

আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে নাই (নিষেধ) থেকে ইসতিসনা (ব্যতিক্রমভুক্তি) করা হয়েছে। আর যখন নাই থেকে ইসতিসনা করা হয়, তখন মুসতাসনার (যা ব্যতিক্রম করা হয়েছে) বৈধতা প্রমাণিত হয়, আবশ্যিকতা বা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। (درس ترمذي ج ২ ص ৭৮)

তাই উক্ত হাদীসের পর কিছু সংখ্যক সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়তেন। পরে যখন নবী করীম (সাঃ) একে বাদানুবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এরপর থেকে সাহাবীগণ তা আর করতেন না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায অসম্পূর্ণ। উক্ত হুকুমটি অন্যান্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ইহা ইমাম এবং একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর দ্বিতীয় অংশে যে মনে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে, প্রথমত তো এটা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। যা মারফু হাদীসের বিপরীতে প্রমাণযোগ্য

নয়। দ্বিতীয়ত, উক্ত অংশটির অর্থ এও হতে পারে যে, উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়বে অথবা فِي نَفْسِكَ শব্দটি এখানে “একাকী” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ হল- যখন তুমি নামায একাকী পড়বে। যেমন হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ রয়েছে-

فَمَنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ- (بخاري ج ১১ ص ১১০ باب قول الله ويذكركم الله الخ، مسلم ج ২ ص ৩৪৩ باب فضل الذكر والدعاء)

অর্থাৎ, যে আমাকে মনে মনে (একাকী) স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে (একাকী) স্মরণ করি। আর যে আমাকে কোন মজলিশে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিশে স্মরণ করি।

উক্ত হাদীসে فِي نَفْسِهِ শব্দটি فِي مَلَأٍ শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা একথা প্রমাণ করছে যে, এর দ্বারা একাকী অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসেও কেরাতে হুকুমী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম কেরাত পড়লে মুক্তাদীর পক্ষ থেকেও কেরাত আদায় হয়ে যাবে। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ৭১)

কেননা সবার নিকটই মুদরিক ব্যক্তি (যে পরে এসে নামাযে মিলিত হয়েছে) যদি ইমামের রুকু পায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ঐ রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। অথচ উক্ত ব্যক্তি তো প্রকৃতপক্ষে কেরাতই পাঠ করেনি। সুতরাং এর দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামের কেরাতের দ্বারা মুক্তাদীরও আইনতঃ কেরাত হয়ে যাবে।

(৩) অথবা, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস প্রথমে ঠিকই ছিল, কিন্তু যখন ইমামের সাথে মুক্তাদীর কেরাতে সমস্যার সৃষ্টি হল, তখন নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা দিলেন-

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً-

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদীসের সনদে জাফর ইবন মায়মূন নামে একজন রাবী রয়েছেন। যিনি সমালোচনার উর্ধ্বে নন। ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাঁর ব্যাপারে বলেন- ليس بثقة অর্থাৎ, তিনি আস্থাভাজন ব্যক্তি নন।

(২) উক্ত হাদীসে নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা আয়াত মিলানোর কথাও বলা হয়েছে। শাফেঈগণ শুধু ফাতিহার কথা বলে থাকেন, অন্য সূরা মিলানোর কথা বলেন না। অথচ একই হাদীসের নিজেদের মনমত একটি অংশ গ্রহণ করা এবং অন্য অংশ নিজেদের মনমত না হলে বাদ দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

(৩) মূলতঃ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য। ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, ইহা বুঝানোর জন্য নয়।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ নামাযে সূরা ফাতিহার হুকুম।

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। ইহা তরক করলে নামায সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের মতে, সূরা মিলানো মাসনুন বা মুস্তাহাব।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, ফাতিহা না পড়লে নামাযই শুদ্ধ হবে না। সুতরাং বুঝা গেল ইহা ফরয। (এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস ইতিপূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়; বরং ওয়াজিব। আর ফরয হল সাধারণ কেরাত পাঠ করা। উল্লেখ্য যে, ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব; স্মৃতি বা মুস্তাহাব নয়। অতএব, সূরা ফাতিহা বা সূরা মিলানো এগুলোর মধ্যে থেকে যেকোন একটি তরক করলে কেরাতের ফরযিয়াত আদায় হলেও ওয়াজিব তরক করার কারণে নামায দোহরানো ওয়াজিব হবে।

দলীল (১)ঃ আব্বাহ তাআলার বাণী- **فَأَقْرَءُوا مَا تَسْرَرُ مِنَ الْقُرْآنِ** - অর্থঃ, কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, তোমরা ততটুকু পাঠ কর। (মুযযাম্মিলঃ ২০)

উক্ত আয়াতে **مَا تَسْرَرُ** তথা যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু পড়া ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন সূরাকে সাব্যস্ত করা হয়নি। আর মুতলাক খবরে ওয়াহিদ দ্বারা শর্তায়িত হতে পারে না।

দলীল (২)ঃ **... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَوةً لَمْ يقرأَ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَفِيهِ خِذَاجٌ فَفِيهِ خِذَاجٌ غَيْرُ تَمَامِ الْخِذَاجِ**

(ابو داود ج ١ ص ١١٩)

(উক্ত হাদীসটি প্রথম আলোচনায় শাফেঈদের দ্বিতীয় দলীল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।) এই হাদীসে সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযকে অসম্পূর্ণ বলা হয়েছে, কিন্তু আসলেই নামায হবে না একথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত মূল নামায সত্তা সম্পন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু এর গুণাবলীতে ত্রুটি থেকে যাবে।

জবাবঃ (১) শায়খ ইবন হুমাম বলেন, শাফেঈদের দলীল হিসেবে প্রদত্ত হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ত সংযোজন হতে পারে না। অতএব, আমরা (হানাফীগণ) সাধারণ কেরাতকে ফরয বলেছি; কিন্তু সূরা ফাতিহাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছি।

(২) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে ﴿﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেরাত না পড়া অবস্থায় নামায সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যায় একথা বুঝানো। এখানে কেরাত দ্বারা শুধু ফাতিহা পড়া নয়; বরং সাধারণ কেরাত উদ্দেশ্য। যা অন্যান্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এ ব্যাপারে আরেকটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন- قَرَأَ يَقْرَأُ সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে সক্রমক ক্রিয়া (مُتَعَدِّي) হয়। যেমন- قَرَأْتُ الْكِتَابَ বলা হয়, কিন্তু قَرَأْتُ بِالْكِتَابِ বলা হয় না। সুতরাং যেসব ক্রিয়া (فَعْل) প্রত্যক্ষভাবে সক্রমক (متعدي) হয় সেগুলোকে কখনো কখনো ب (হরফ)-এর মাধ্যমে মুতাআদী (সক্রমক) করা হয়। কিন্তু উভয় অবস্থাতে অর্থগত পার্থক্য হয়। এ কারণে যখন ب-এর মাধ্যম থাকে না তখন অর্থ হয়, কৃত বিষয়ের (مَفْعُولِيَّت) সাথে অন্য কিছু অংশীদার নেই। আর যখন ب-এর মাধ্যম হয় তখন অর্থ হয় মাফউলে বিহী (مَفْعُول) মাফউলের অংশ। মাফউলিয়াতে অন্য কোন কিছুও তার সাথে শরীক থাকে। এজন্য قَرَأَ-কে যখন প্রত্যক্ষভাবে মুতাআদী করা হয়, তখন এর মাফউলে বিহী পরিপূর্ণ বিষয় পঠিত হবে। আর অর্থ হবে শুধু এটাকেই পড়া হয়েছে, অন্য কোন জিনিস পড়া হয়নি। আর যখন ب-এর সাথে মুতাআদী করা হবে তখন মাফউলে বিহী হবে পঠিত বিষয়ের কোন অংশ। অর্থ এই হবে যে, মাফউলে বিহীও পড়া হয়েছে এবং এর সাথে আরো কিছুও। আর আলোচ্য হাদীসে قَرَأَ মুতাআদীর সাথে ب প্রবিষ্ট হয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও পড়া উদ্দেশ্য। (درس ترمذي ج ١ ص ٥٠٨-٥١٢، درس مشکوٰة ج ٢ ص ٧١-٧٢) উদ্দেশ্য।

بَابُ التَّهْوِضِ فِي الْفَرْدِ ص ١٢٢

প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম

... عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لِأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ فَقَعَدَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجْدَةِ الْآخِرَةِ- (بخاري ج ١ ص ١١٣ باب المكث بهن السجدين، نسائي ج ١ ص ١٧٣ باب الاستواء للجلوس الخ)

অনুবাদঃ ... আবু কিলাবা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু সুলায়মান মালিক ইবনুল হুআয়রিছ (রাঃ) আমাদের মসজিদে এসে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি নামায আদায়ের মাধ্যমে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করতে দেখেছি তা প্রদর্শন করতে চাই। রাবী বলেনঃ অতঃপর তিনি প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করে একটু বসেন।

বিশ্লেষণঃ প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সিজদা থেকে ফারেগ হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে অল্পক্ষণ বিশ্রামের বৈঠক (جلسة استراحت) সুলত কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, বিশ্রামের বৈঠক সুলত।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا- (ابو داود ج ١ ص ١٢٢,

بخاري ج ١ ص ١١٣ باب من استوى قاعدا في وتر الخ، ترمذي ج ١ ص ٦٤ باب كيف النهوض من

المسجد، نسائي ج ١ ص ١٧٣)

অর্থাৎ, ... মালিক ইবনুল হুওয়ারিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে “বিতর নামাযের”* মধ্যে দ্বিতীয় সিজদা আদায়ের পর একটু বসে অতঃপর দাঁড়াতে দেখেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, ইসহাক (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ (রহ.)-এরও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হল, বিশ্রামের বৈঠক মাসনুন নয়; বরং এর পরিবর্তে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তম।

* টীকাঃ এছলে “বিতর” শব্দের অর্থ- প্রথম রাকাত ও চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকাত এবং তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম রাকাত।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي (১) দলীল
الصلوة على صدور قدميه - (ترمذي ج ١ ص ٦٤ باب كيف النهوض من السجود، مصنف ابن أبي
شعبة ج ١ ص ٣٩٤، مصنف عبد الرزاق ج ٢ ص ١٧٨)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'পায়ের
পিঠের উপর ভর করে নামাযে দাঁড়াতেন। (অর্থাৎ, বিশ্রামের বৈঠক না করে সোজা
দাঁড়িয়ে যেতেন।)

দলীল (২)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) হযরত
খাল্লাদ ইবন রাফি (রাঃ)-কে নামাযের সহীহ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে সিজদা শিক্ষা
দেয়ার পর বলেছেন-

ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَوَتِكَ كُلِّهَا - (بخاري ج ٢ ص ٩٨٦ باب
اذا حنك ناسيا في الايمان ، فتح الهاري ج ٢ ص ٢٣١)

অর্থাৎ, অতঃপর ওঠ এবং ভাল করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর তুমি তোমার
পুরো নামাযের অনুরূপ কর।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্রামের বৈঠক না করাই উত্তম।

জবাবঃ (১) হযরত মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে
বলা যায় যে, এটি জায়েয বর্ণনা করার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু মতানৈক্য তো
কেবল উত্তমতা নিয়ে।

(২) অথবা, অপরাগতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমনটি করেছিলেন। কেননা নবী
করীম (সাঃ)-এর দেহ মোবারক শেষ বয়সে একটু ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া
বিশ্রামের বৈঠক যদি সুস্থতাই হত, তাহলে সাহাবাগণ এই আমলকে ছেড়ে দিতেন
না। (تنظيم ج ١ ص ২৯৯-৩০০)

بَابُ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ص ١٢٢

দুই সিজদার মধ্যবর্তী উপবেশন পদ্ধতি

... عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي
الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السَّجُودِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ قَالَ قُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مسلم ج ١ ص ٢٠٢ باب جواز
الاقعاء على المقبين، ترمذي ج ١ ص ٦٣ باب الرخصة في الاقعاء)

অনুবাদঃ ... ইবন জুরায়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যুবায়ের তাউস হতে শ্রবণ করে আমাদের বলেছেন, আমরা হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে ইকআ (গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন, তা সুন্নত। অতঃপর আমরা বলি যে, এটাকে আমরা তো পায়ের উপর যুলুম মনে করি। জবাবে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটা তোমার নবী (সাঃ)-এর সুন্নত।

বিশ্লেষণঃ ইকআ (اقعاء)-এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথাঃ

(১) হযরত তাহাবী (রহ.)-এর ব্যাখ্যাঃ নিতম্বকে জমিনের সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট করে বসা যে, উভয় রান খাড়া করে রাখবে এবং উভয় হাঁটুকে বুকের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় হাতকে জমিনের মধ্যে রাখবে আর এ ধরনের ইকআ মাকরুহ তাহরীমী হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(২) ইমাম কারখী (রহ.) হতে ইকআ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, উপর পা-কে খাড়া করে উভয় গোঁড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা। (تَظْهِيمُ الْأَشْفَاتِ ج ১ ص ২৮৭) আর এই দ্বিতীয় প্রকার নিয়েই ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে যে, ইহা সুন্নত কিনা।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, দুই সিজদার মাঝখানে উক্ত ইকআ সুন্নত।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইকআও সুন্নত।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, দুই সিজদার মাঝখানে ইকআ অবশ্যই বসা মাকরুহ তানযীহী।

দলীল (১)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ... وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقَبِ الشَّيْطَانِ (১)

الخ (ابو داود ج ১ ص ১১৬ باب من لم يرا لجهر بيسم الله الخ، مسلم ج ১ ص ১৭০ باب ما يجمع صفة الصلوة الخ، ابن ماجه ص ৬৫)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেন, ... তিনি (সাঃ) শয়তানের মত উপবেশন করা তথা উভয় গোঁড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসতে নিষেধ করতেন।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ

... لَا تَقْعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - (ترمذي ج ১ ص ৬৩ باب كراهية الاقعاء الخ، ابن ماجه ص ৬৫، معارف السنن ج ৩ ص ৬২-৬৫)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন, হে আলী! ... তুমি দুই সিজদার মাঝে ইকআ করে বসো না।

জবাবঃ (১) আল্লামা খাতাবী (রহ.) এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে মানসূখ বলেছেন। যেমন- মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে মুগীরা ইবন হাকাম থেকে বর্ণিত আছে-

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى عَقْبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْذُ اسْتَكَيْتُ— (মুতা امام محمد ص ১১৩)

অর্থাৎ, ... আমি ইবন উমর (রাঃ)-কে নামাযে দুই সিজদার মাঝে গোড়ালীদ্বয়ের উপর বসতে দেখেছি। ফলে এ বিষয়টি তার নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, এটা কেবল তখন থেকে করেছি যখন থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

এতে বুঝা যায় যে, এ আমলটি আসলে সুন্নতের খেলাফ। কিন্তু ইবন উমর (রাঃ) ওয়রের কারণে এমনটি করেছেন।

(২) অথবা, ইকআ নবী করীম (সাঃ) জায়েয বর্ণনা করতে হয়ত কখনো এমনটি করেছেন। কেননা জায়েয বিষয়টি বর্ণনা করাও নবীদের দায়িত্ব।

(৩) সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে হযরত আব্বাস (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ইকআ-এর প্রবক্তা নন। তাছাড়া একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত ইবন উমর (রাঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) অপেক্ষা সুন্নতের অধিক সংরক্ষণকারী ছিলেন। তাছাড়া ইবন আব্বাসের উক্তিতে এই ব্যাখ্যাও করা যায় যে, সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওয়র অবস্থায় সুন্নত। (درس ترمذي ج ২ ص ৫২-৫৩)

بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ ص ১৩৬

নামাযরত অবস্থায় হাঁচির জবাব দেয়া (নামাযে কথা বলার হুকুম)

... عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلْمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَأَكْمَلُ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُونِي قَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيْدِي وَأُمِّي مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَنِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْخ (মসলম জ ১০৩ বাব تحریم الكلام في الصلوة الخ، نسائي ج ১ ص ১৭৭-১৮০)
باب الكلام في الصلوة

অনুবাদঃ ... মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করি। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলি। তখন অন্যান্য লোকেরা আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায়। তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বলি, তোমরা আমার প্রতি এরূপ বক্রদৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের রানের উপর হাত মারছিল, ফলে আমি বুঝতে পারি যে, তারা আমাকে চুপ করতে বলছে।

রাবী উসমান (রহ.) বলেন, আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি চুপ করে থাকলাম। নামায সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মারেননি, ধমক বা গালিও দেননি। অতঃপর তিনি (সাঃ) বলেন, মনে রাখবে এটা নামায। এর মধ্যে কথামার্ভা বলা অনুচিত। বরং নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআনের আয়াত পাঠ করা যেতে পারে।

বিশ্লেষণঃ উল্লেখ্য যে, নিম্ন বর্ণিত দুটি বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই।

(১) নামায শুদ্ধ করার নিয়তে নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি নামাযে কথা বলে, তাহলে তার নামায ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যাবে।

(২) ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযে ইচ্ছাকৃত, কম বা বেশি কথা বলা জায়েয ছিল, কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

অত্র অনুচ্ছেদে যে বিষয়ে আলোচনা করা হবে তাহল, নামাযে কথা বললে, নামায ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা। এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে এবং মালিক (রহ.)-এরও এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, কথা যদি নামায সংশোধনের জন্য হয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না, যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে। (تنظيم الاشتات ج ১ ص ৩৪৮)

* ইমাম শাফেঈ, মালিক, আবু সাওর, হাসান বসরী ও আতা (রহ.)-এর মতে, কথাবার্তা যদি ভুলের কারণে অথবা বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে হয়ে থাকে (অর্থাৎ, নামাযে কথা বললে যে নামায নষ্ট হয়ে যায় সে ব্যাপারে যদি অবহিত না থাকে) এবং কথা যদি অল্প হয়, তাহলে নামায নষ্ট হবে না। (فتح الملم ج ২ ص ১২৭)

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে চারটি মত পাওয়া যায়।

(ক) ইমাম আওয়াঈ (রহ.)-এর অনুরূপ।

(খ) ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর অনুরূপ।

(গ) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুরূপ।

(ঘ) যদি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কথা বলে যে, নামায শেষ হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে সে জানতে পারল যে, এখনও তার নামায পূর্ণ হয়নি, তাহলে এরূপ কথাবার্তার দ্বারা তার নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু যদি সে বুঝতে পারে যে, নামায এখনো শেষ হয়নি, তাহলে কথা বলার কারণে নামায ফাসেদ হবে। (شرح المذهب ج ٤ ص ١٧)

উপরোল্লিখিত সকল ইমাম (হানাফী ব্যতীত) দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ النَّعْشِيِّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْذَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ قَالَ بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَأَوْمَأُوا أَيْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ... (ابو داود ج ١ ص ١٤٤ باب في

سجدة السهو، بخاري ج ١ ص ١٦٤ باب يكبر في سجدة السهو، مسلم ج ١ ص ٢١٣ من ترك ركعتين الخ، ترمذي ج ١ ص ٩١ باب الرجل يسلم في الركعتين الخ، نسائي ج ١ ص ١٨١-١٨٢ ما يفعل من سلم الخ، ابن ماجه ص ٨٦)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে যুহর অথবা আসরের নামায আদায় করেন। তিনি (সাঃ) দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি (সাঃ) মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের নিকট গিয়ে তার উপরে এক হাত অন্য হাতের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান হন। ঐ সময় তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তখন লোকেরা মসজিদ হতে নির্গমনকালে বলছিল, নামায কসর করা হয়েছে, নামায কসর করা হয়েছে। (অর্থাৎ আল্লাহ চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত করে দিয়েছেন।) এ সময় সমবেত মুসল্লীদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ)ও ছিলেন এবং তাঁরা এ ব্যাপারে

তাঁর সাথে আলোচনা করতে ভয় পাচ্ছিলেন। ঐ সময় নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক যুল-ইয়াদাইন (লম্বা বাহুবিশিষ্ট) উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক সাহাবী (খিরবাক) দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুল করেছেন, নাকি নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে? জবাবে তিনি (সাঃ) বলেনঃ না, আমি ভুল করিনি এবং নামায কসরও করা হয়নি। তখন ঐ সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমবেত জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেনঃ আচ্ছা, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? জবাবে সাহাবাগণ এশারায় বলেনঃ জি-হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে বাকী দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান।

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, যুল ইয়াদাইনের এই কথাবার্তা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হয়েছিল। আর নবী করীম (সাঃ)-এর এই কথাবার্তা হয়েছিল বিস্মৃতির ভিত্তিতে।

ইমাম মালিক ও আওযাই (রহ.) বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিল নামায সংশোধনের জন্য। আর ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিল নামায পূর্ণ হয়েছে মনে করে। নবী করীম (সাঃ) তো ইহা মনে করেই কথাবার্তা বলেছেন যে, চার রাকাত নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যুল ইয়াদাইন (রাঃ) ইহা মনে করেই কথাবার্তা বলেছিলেন যে, হয়ত নামাযের রাকাতের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। সুতরাং নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এ সকল কারণেই কথাবার্তা সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ) নামাযকে পুনরায় নতুন করে না পড়ে উক্ত নামাযের উপর ভিত্তি করেই বাকি নামায শেষ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থান্তরে নামাযে কথা বলা নামায ফাসেদের কারণ নয়। (درس ترمذي ج ٢ ص ١٥١)

কিয়াসী দলীলঃ যারা বলেন, ভুলে কথাবার্তা বললে নামায নষ্ট হবে না, তারা যুক্তি দেখান, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রমযান মাসে দিনে রোযা রাখার পর ভুলে খেয়ে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। অনুরূপভাবে ভুলে নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বললেও নামায নষ্ট হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, নামাযে কথা বলার যে প্রচলন ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত বা জেনে হোক, কম হোক বা বেশি হোক, সর্বাবস্থায় নামাযে কথা বললে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা হিসেবে (নামাযে) দণ্ডায়মান হও। (বাকারাঃ ২৩৮)

উক্ত আয়াতে **قُوت**-এর অর্থ নীরবতা। বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নামাযে কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার জন্য নাযিল হয়েছে। এতে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। সুতরাং এর আলোকে সব ধরনের কথাবার্তাই নিষিদ্ধ হবে।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে-
... **إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْخ**

উক্ত হাদীসে **شَيْءٌ** (কোন কিছু) শব্দটি না-বোধক বাক্যের আওতায় ব্যবহৃত হয়েছে। যা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। সুতরাং নামাযের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলা জায়েয নয়।

দলীল (৩): ... **عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَزَلَّتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْتَنَا عَنِ الْكَلَامِ** (আবু দাউদ জ ১৮৮, باب الله في الكلام في الصلوة، بخاري ج ২ ص ২৫০ كتاب التفسير، مسلم ج ১ ص ২০৬)

ترمذي ج ১ ص ৯২ باب في نسخ الكلام في الصلوة، نسائي ج ১ ص ১৮১

অর্থাৎ, ... যাকেদ ইবন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইসলামের সূচনাকালে) আমরা নামাযের মধ্যে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতাম। এ সময় আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়, “তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা হিসেবে (নামাযে) দণ্ডায়মান হও।” এ সময় আমাদেরকে নামাযে নীরবতা পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়।

দলীল (৪): ... **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَتَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَّثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ** (আবু দাউদ জ ১৮৩, باب رد السلام في الصلوة)

অর্থাৎ, ... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের প্রয়োজনের কথা বলতাম। পরবর্তীকালে আমি হাবশা হতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম দিলে তিনি এর উত্তর দেননি। ফলে আমার মনে পুরাতন ও নতুন কথা স্মরণ হয় এবং সালামের জবাব না পাওয়ায় আমি শংকিত হয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শেষে আমাকে বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, তখন তাই নির্দেশ প্রদান করেন। এখন আল্লাহ নামাযের মধ্যে কথা না বলার নির্দেশ জারী করেছেন।” একথা বলার পর তিনি আমার সালামের জবাব দেন।

অতএব, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলা জায়েয নয়, বরং হারাম। এতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) সহ অন্যান্য ইমামগণ যুল ইয়াদাইনের হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর বিস্তারিত জবাব হল-

(১) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসটি হযরত যাবেদ ইবন আরকামের হাদীস দ্বারা মানসূখ। কেননা, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ছিল নামাযের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আর নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হয় মদীনাতে বদর যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে। আর যুল-ইয়াদাইন বদর যুদ্ধে শহীদ হন। সুতরাং এ ঘটনাটি বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল।

(২) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। উক্ত হাদীসটির রাবী হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। আর এ সময় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কেননা, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং হাদীসটি মুরসাল। আর উল্লিখিত তিন ইমামের মতেই মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা শুদ্ধ নয়। তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে, দলীল হিসেবে তাঁরা এ হাদীসটি কিভাবে উল্লেখ করলেন?

(৩) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসে লক্ষ্য করলে অনেক বিষয়ই দৃষ্টিগোচর হয়, যা আমলে কাসীর হওয়ার কারণে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর নিকটও নামায ভঙ্গের কারণ। যেমন- নামাযের স্থান থেকে সরে গিয়ে মিস্বরের উপর আরোহণ করা, কওমের দিকে চলে যাওয়া, মসজিদ থেকে বের হওয়া, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুজরায় গমন করা ইত্যাদি। (ابو داود ج ١ ص ١٤٦) এতে প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনাটি ঐ সময়ের, যখন নামাযে আমলে কাসীরসহ অনেক কিছুই জায়েয ছিল।

(৪) যুল-ইয়াদাইনের হাদীসের মধ্যে পাঁচটি অসঙ্গতি (اضطراب) রয়েছে। যথাঃ প্রথমত, কোন ওয়াক্তের নামায ছিল তা নিয়ে অসঙ্গতি। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটি যুহরের ঘটনা। (مسلم ج ١ ص ٢١٤ باب السهو في الصلوة الخ)

কোন রেওয়ায়েতে আছে এটি আসরের ঘটনা। (মসলম ১ জ ২১৩)

কোন কোন রেওয়ায়েতে মাগরিব ও এশার কোন একটি নামাযের কথা উল্লেখ রয়েছে। (بخاري ১ জ ১৬৬, مسلم ১ জ ২১৩)

দ্বিতীয়ত, রাকাত নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে অসঙ্গতি। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) তিন রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। (মসলম ১ জ ২১৬)

তৃতীয়ত, সিজদা সাহুর ব্যাপারে অসঙ্গতি। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাঃ) সিজদা সাহু করেছেন। (بخاري ১ জ ১৬৬, مسلم ১ জ ২১৬) আবার কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সিজদা সাহু করেননি।

(ابو داود ১ জ ১৬৫, نسائي ১ জ ১৮৩)

চতুর্থত, সিজদা সাহুর ধরণ ও প্রকৃতির ব্যাপারে অসঙ্গতি। কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) সালামের পূর্বে সিজদা সাহু আদায় করেছেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, সিজদা সাহু সালামের পর আদায় করেছেন।

(ابو داود ১ জ ১৬৬-১৬৫)

পঞ্চমত, অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, তিনি মসজিদে অবস্থিত কাঠ পর্যন্ত তাশরীক নিয়ে গিয়েছিলেন। (بخاري ১ জ ১৬৬) আর ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হুজরায় প্রবেশ করেছিলেন। (মসলম ১ জ ২১৬, ابو داود ১ জ ১৬৬) সুতরাং যে হাদীসের মধ্যে এত অসঙ্গতি রয়েছে, যেগুলোর মাঝে কোনক্রমেই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়, এমন হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করা মোটেই ঠিক নয়।

(معارف السنن ৩ জ ৫৩৬-৫৩৭, فتح المغيٓث ১ জ ২২৫)

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ নামাযকে রোযার সাথে কিয়াস করা আদৌ সমীচীন নয়। কেননা, রোযায় পুনরাবৃত্তি করার কোন সুযোগ নেই। সেজন্য রোযাতে ভুল হওয়াটা একপ্রকার ওযর। পক্ষান্তরে, নামাযে ভুল হয়ে গেলে তাতে পুনরায় আদায় করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অতএব, এখানে ভুল হওয়াটা কোন ওযর নয়।

(درس مشکوٰۃ ২ জ ১২২)

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ (রহ.) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসটি সহীহ প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, যুলইয়াদাইনের ঘটনাটি কথাবার্তার হুকুম রহিত হওয়ার পরবর্তীকালের। অতএব, এটি উপরিউক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা রহিত হতে পারে না।

কেননা, উপাধিপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তি আলাদা আলাদা। একজন যুল-ইয়াদাইন এবং অপরজন হলেন যুশ-শিমালাইন। বদর যুদ্ধে যিনি শহীদ হয়েছেন, তিনি যুল-ইয়াদাইন নন, বরং যুশ-শিমালাইন। যুল-ইয়াদাইনের নাম হল খিরবাক ইবন আমর, যিনি বনু সুলাইম গোত্রের। আর যুশ-শিমালাইনের নাম হল উবায়দুল্লাহ ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু খুযাআ গোত্রের। হযরত যুল-ইয়াদাইন উসমান (রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর এ ঘটনাটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পর ঘটেছিল। আর নামাযে কথাবার্তা বলা রহিত হয়েছে এর অনেক পূর্বে। সুতরাং যুল-ইয়াদাইনের হাদীসকে মানসূখ বলা ঠিক নয়। (معارف السنن ج ৩ ص ৫২২)

জবাবঃ যুল-ইয়াদাইন এবং যুশ-শিমালাইন মূলত একই ব্যক্তির দুটি উপাধি। বাস্তব ঘটনা হল, তাঁর আসল নাম হল উবায়দ ইবন আমর। জাহেলী যুগে তাঁর উপাধি ছিল খিরবাক। ইসলাম যুগে তিনি যুল-ইয়াদাইন ও যুশ-শিমালাইন দুটি উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বনু সুলাইম যেহেতু বনু খুযাআরই একটি শাখা, এজন্য তাকে উভয় গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর হাত খুব লম্বা ছিল, সেহেতু ইসলামের শুরুর দিকে তাঁর উপাধি হয়েছিল যুশ-শিমালাইন। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) ইহা পরিবর্তন করে যুল-ইয়াদাইন রাখেন। (درس ترمذي ج ১ ص ১০০)

তাই হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) একই রেওয়াজেতে দুটি উপাধি একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

... فَقَالَ ذُو الشَّمْلَيْنِ بَنَ عَمْرُو أُنْقِصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ الْخ - (نسائي ج ১ ص ১৮৩، مصنف ابن أبي شيبة ج ২

ص ৩৭)

অর্থাৎ, ... তখন যুশ-শিমালাইন ইবন আমর বললেন, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে, নাকি আপনি ভুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যুল-ইয়াদাইন কি বলছে?

উপরউক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একই ব্যক্তির দুটি উপাধি।

এবার প্রশ্ন থেকে যায়, যদি যুল-ইয়াদাইন বদর যুদ্ধে শহীদ হয়ে থাকেন, তবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যুল-ইয়াদাইনের ঘটনায় কিভাবে বললেন-

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিয়ে নামায পড়েছেন।

এবং অন্য রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে-

أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مسلم ج ১ ص ২১৬)

অর্থাৎ, আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে নামায পড়ি।

অথচ তিনি তো ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ৭ম হিজরীর পরে ঘটেছিল।

জবাবঃ যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি নিশ্চিত বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তবে ঐ সকল হাদীসসমূহের জবাব হল, ঐ সকল হাদীসসমূহ মুরসাল। এর দ্বারা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাদের সাথে শরীক থাকার কথা প্রমাণিত হয় না। কেননা, কুরআন-হাদীসে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, কোন এক গোত্র কোন এক কাজ করেছে বা কোন এক গোত্রের সাথে কোন ঘটনা সম্পৃক্ত; অথচ ইহা একক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে- **وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا** অর্থাৎ, “যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে।” (বাকারঃ ৭২)

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে হত্যাকারী এবং উক্তিকারী নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ের ইহুদী ছিল না। বরং হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ের ইহুদী ছিল। কিন্তু এরপরেও নবী করীম (সাঃ)-এর সময়কালের ইহুদীদের প্রতি তা আরোপিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল এই বলা যে, তোমাদের গোত্র হত্যা করেছে।

* হাদীসসমূহেও এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেগুলোতে বর্ণনাকারী স্বয়ং উপস্থিত থাকেন না, তা সত্ত্বেও উত্তম পুরুষ বহুবচন (**جمع متكلم**)-এর শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন- ইমাম তাহাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, তাওস (রহ.) বলেন- **قَدِمَ عَلَيْنَا** অর্থাৎ, আমাদের নিকট মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) আসলেন। অথচ হযরত মুআয (রাঃ) যখন ইয়ামনে আগমন করেছেন, তখন তাউস (রহ.) জন্মলাভ করেননি। অতএব, **قَدِمَ عَلَيْنَا** দ্বারা উদ্দেশ্য- **قَدِمَ عَلَى قَوْمِنَا** তথা আমাদের কওমে আগমন করেছেন। (شرح معاني الآثار ج ١ ص ٢١٨)

তাছাড়া অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

... **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَبِينَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودٍ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ الْخ (ابو داود ج ٢ ص ٤٢٣ باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة)**

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন,

ইহুদীদের সাথে মোকাবিলার জন্য বের হও। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে বের হয়ে ইহুদীদের নিকট পৌঁছাই।

এটি ৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। উক্ত হাদীসের রাবী হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। অথচ তিনি ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বাণী- “صَلَّى بِنَا”-এর অর্থ হল-

صَلَّى بِالنَّبِيِّ أَيْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ صَلَّى بِقَوْمِنَا- অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের জামাআত নিয়ে নামায পড়েছেন বা আমাদের কওমের সাথে নামায পড়েছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে- اَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

এখানে স্পষ্ট انا বা ‘আমি’ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং উক্ত ঘটনায় শরীক ছিলেন। এখানে তো আর কোন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না।

এর উত্তরে আল্লামা আনোয়ার শাহ (রহ.) বলেন, উত্তম পুরুষ একবচনের (وَاحِدٌ) শব্দ শুধু শায়বানের একক বিবরণ। সুতরাং এমন রেওয়ায়েত করার মূল কারণ হল, রাবী যখন অন্যান্য হাদীসে صَلَّى بِنَا দেখলেন, তখন তিনি ভেবে নিলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) স্বয়ং উক্ত ঘটনায় ছিলেন। আর এ জন্যই তিনি “انا” দ্বারা রেওয়ায়েত করে দিলেন। যা ছিল বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপ (تَصَرُّفٌ)। যেমন সহীহ সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

دَخَلْتُ عَلَى رُقِيَّةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (مسندك حاكم ج ٤ ص ٤٦)

অর্থাৎ, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কন্যা রুকাইয়্যাহ (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম।

অথচ হযরত রুকাইয়্যাহ (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ৫ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। অতএব, আবু হুরায়রার (রাঃ) তাঁর নিকট যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এর ব্যাখ্যা হল, আসলে হাদীসে ছিল, “মুসলমানগণ প্রবেশ করেছেন”। রাবী তাতে হস্তক্ষেপ করে “আমি প্রবেশ করেছি” (دَخَلْتُ) বলেছেন।

۱۳۴ : بَابُ التَّامِينِ وَرَاءَ الْإِمَامِ ص ১৩৪ ইমামের পিছনে আমীন বলা

... عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ-

অনুবাদঃ ... ওয়াইল ইবন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) “ওয়ালাদ্বাল্লীন” পাঠ করার পর জোরে “আমীন” বলতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

(ابو داود ج ۱ ص ۱۳۵، بخاری ج ۱ ص ۱۰۸ باب جهر الامام بالتأمين، مسلم ج ۱ ص ۱۷۶ باب التسميع والتحميد والتأمين، ترمذي ج ۱ ص ৫৮، نسائي ج ১ ص ১৪৭ جهر الامام بامين، ابن ماجه ص ৬১)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন ইমাম “আমীন” বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা যে ব্যক্তির “আমীন” শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্ব-জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-

(১) আমীন কে বলবে, (২) আমীন জোরে বলবে, না আস্তে।

প্রথম আলোচনাঃ ফেরকায়ে ইমামিয়াদের মতে, নামাযে সূরা ফাতিহার পর আমীন উচ্চারণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

দলীলঃ আমীন কুরআনের কোন অংশ নয়। এবং বিশেষ কোন দোয়ায় মাছুরার অন্তর্ভুক্তও নয়।

* ইবন হুজম-এর মতে, আমীন বলা শুধু মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব।

* আহলে যাহিরের মতে, আমীন বলা ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের উপর ওয়াজিব।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস। এতে নবী করীম (সাঃ) বলেন- إِذَا

الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا এখানে আমরের সীগা ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমর আসে ওয়াজিব বুঝানোর জন্য।

* জমহুর ইমামদের মতে, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কে আমীন বলতে হবে। আমীন বলা উভয়ের জন্য সুন্নত। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও একটি রেওয়ায়েত অনুরূপ।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, আমীন বলা শুধু মুক্তাদীর কর্তব্য, ইমামের নয়। এবং আন্তে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে ইমাম, মুক্তাদী কাউকেই আমীন বলতে হবে না।

দলীল: ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ- (ابو داود ج ১ ص ১৩০, بخاري ج ১ ص ১০৮,

نسائي ج ১ ص ১৪৭)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম “গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদাল্লীন” বলবে, তখন তোমরা আমীন বল।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে কর্ম বন্টন করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ইমামের কাজ হল الضالين ولا বলা, আর মুক্তাদীর কাজ হল আমীন

বলা। (تنظيم الاشتات ج ১ ص ৩৩২)

জবাবঃ (১) ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ বস্তুত হাদীসে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে কর্ম বন্টন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে আমীন বলার নির্দিষ্ট জায়গা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন ওয়ালাদাল্লীন বলে অবসর হবেন তখন মুক্তাদী তৎক্ষণাৎ আমীন বলবে, যাতে উভয়ের আমীন এক সাথে বলা হয়। কারণ ইমামও তখন আমীন বলবে।

(২) আহলে যাহিরের দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে আমরের যে সীগা বর্ণনা করা হয়েছে তা ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং এখানে আমরের দ্বারা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে।

(৩) আর ইমামিয়াদের কিয়াস সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। কারণ ইহা সহীহ রেওয়ায়েতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আমীন জোরে এবং আন্তে উভয় পন্থায়ই বলা জায়েয। কিন্তু মতানৈক্য হচ্ছে শুধু উত্তম পন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, আমীন জোরে বলা উত্তম। তবে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর নতুন অভিমত হল ইমাম আন্তে আমীন বলবে, কিন্তু তাঁদের ফাতওয়া হচ্ছে প্রথম অভিমতের উপর।

(تعلیق الصبیح ج ১ ص ৩৭৬)

দলীল (১)ঃ সুফিয়ান সাওরী সূত্রে বর্ণিত-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ- (ترمذي ج ১ ص ০৭ باب ما جاء في التامين)

অর্থাৎ, ... ওয়াইল ইবন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি নবী করীম (সাঃ) “গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাল্লীন” পাঠ করলেন এবং আমীন বললেন। এই আমীন তিনি টেনে পড়েছেন।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস। উক্ত হাদীসে ইমামের আমীনের সাথে মুক্তাদীকে আমীন বলার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর ইমামের আমীন জোরে বলা ব্যতীত বুঝা যাবে না। তাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম জোরে আমীন বলবে আর মুক্তাদীরাও ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে জোরে আমীন বলবে।

দলীল (৩): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিকের (রহ.) প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী- ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য “আমীন” আন্তে বলা উত্তম। (فتح الملهم ২ ج ص ৪৯، درس ترمذي ج ১ ص ১১৫)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- **فَذُحِبَتْ دُعَاؤُكُمْ**

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের দোআ কবুল করা হয়েছে। (ইউনুসঃ ৮৯)

অথচ হারুন (আঃ) দোআ করেননি, বরং মুসা (আঃ) দোআ করেছেন আর হারুন (আঃ) শুধু “আমীন” বলেছেন। এর পরেও তার পক্ষ থেকে দোআ কবুল হওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, “আমীন”ও এক প্রকার দোআ, আর দোআ চুপে চুপে পড়াই উত্তম। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী- **ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً** অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে ও সংগোপনে। (আরাফঃ ৫৫)

দলীল (২): হযরত শুবা সূত্রে বর্ণিত হাদীস-

... **عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ**— (ترمذي ج ১ ص ৪৮)
অর্থাৎ, আলকামা ইবন ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** পাঠের পর আন্তে আমীন বলেছেন।

দলীল (৩): ... **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ**

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ— (ابو داود ج ১ ص ১৩৫، بخاري ج ১ ص ১০৮، ترمذي ج ১ ص ৪৮)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম “গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্বাল্লীন” বলবে, তখন তোমরা “আমীন” বলবে। কেননা যার “আমীন” শব্দটি ফেরেশতার উচ্চারিত আমীন শব্দের সাথে মিলবে, তার অতীতের যাবতীয় (সগীরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

উক্ত হাদীসের আলোকে আমরা (হানাফীগণ) বলতে পারি যে, নবী করীম (সাঃ) শর্তস্বরূপ বলেছেন যে, ইমাম যখন “ولا الضالين” বলবে, মুক্তাদী তখন আমীন বলবে। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম আমীন আস্তে পড়বে। যদি জোরে আমীন বলা বুঝানো উদ্দেশ্য হত, তবে নবী করীম (সাঃ) এভাবে বলতেন-

”إِذَا قَالَ الْإِمَامُ آمِينَ قُولُوا آمِينَ”

অর্থাৎ, ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল।

তাছাড়া ইমাম শাফেঈ (রহ.) “إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا” হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, আমীন জোরে পড়া উত্তম। কেননা উক্ত হাদীসে ইমামের আমীনের সাথে মুক্তাদীর আমীন বলার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর ইমামের আমীন জোরে বলা ব্যতীত শোনা যাবে না। তাই ইমাম জোরে আমীন বলবে, আর মুক্তাদীরাও ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে জোরে আমীন বলবে। অথচ উক্ত হাদীসেই বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন- مَن وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, আমীন আস্তে বলাই উত্তম। কেননা উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মুক্তাদীর আমীন মিলে যাওয়া। আর ফেরেশতাদের আমীন তো জোরে হয় না, বরং আস্তে হয়। একথা তো সবাই স্বীকার করবে যে, আমরা ফেরেশতাদের আমীন বলার শব্দ শুনতে পাই না। তাই আমাদেরও আস্তে পড়াই উত্তম।

দলীল (৪)ঃ তাছাড়া সাহাবা, তাবীঈন এমনকি চার খলীফাদের পক্ষ থেকেও জোরে আমীন বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত আছে- (رواه الطبراني) انهم كانوا لا يجهرون بها- অর্থাৎ, তাঁরা জোরে আমীন বলতেন না।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ ওয়াইল ইবন হুজরের হাদীসটি দুটি সূত্রে বর্ণিত- হয়রত সুফিয়ান সাওরী সূত্রে যার শব্দগুলো নিম্নরূপ- **ومد بها صوته**

হয়রত শোবা থেকে বর্ণিত- **وخفض بها صوته**

শাফেঈ ও হাম্বলীগণ সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে শুবার রেওয়ায়েত বর্জন করেন এবং শুবার রেওয়ায়েতের উপর একাধিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। যার সন্তোষজনক জবাব উমদাতুল কারীতে বর্ণিত আছে। আর হানাফী ও মালিকীগণ আবু সুফিয়ানের রেওয়ায়েতের চেয়ে শুবার রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা-

(১) হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি হযরত শুবার তরীকা অনুযায়ী। কেননা, সুফিয়ান (রহ.)-এর মতে আমীন আস্তে পড়া উত্তম। এতে বুঝা যায় যে, **مد**-এর অর্থ তাঁর নিকট তা নয়, যা ইমাম শাফেঈ (রহ.) ধারণা করেছেন।

(২) শুবার আমীন বলার পদ্ধতি কুরআন অনুযায়ী। যেমন- কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে- **ادعوا ربكم تضرعا وخفية** আর আমীনও একপ্রকার দুআ, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) **مد**-এর অর্থ উচ্চস্বর বা জোরে বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে আমীনের আলিফ ও ইয়াকে একটু টেনে ও লম্বা (মদ) করে পড়া।

(৪) যদিও **مد**-এর অর্থ উচ্চস্বর বুঝানো মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর দ্বারা তালীম উদ্দেশ্য ছিল। যেমন- আবু বিশর আদ দূলাবী (রহ.) “কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা”তে উল্লেখ করেছেন যে, স্বয়ং ওয়াইল ইবন হুজর হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন- **... مَا رَأَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا** অর্থাৎ, আমার ধারণা, তিনি কেবলমাত্র আমাদের তালীমের জন্য জোরে আমীন পড়েছেন।

(৫) তাছাড়া মু'জামে তিবরানীতে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (সাঃ) তিনবার আমীন বলেছেন। অথচ তিনবার আমীন বলা কারো নিকট সুন্নত নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে জোরে আমীন বলা ছিল শিক্ষা প্রদানের জন্য।

(৬) সুফিয়ান সাওরী সুমহান ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তিনি তাদলীস করতেন। পক্ষান্তরে শুবা এটাকে যিনা অপেক্ষাও জঘন্য মনে করতেন। তিনি আরো বলেন- “তাদলীস করার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।” (**درس ترمذي ج ١ ص ٥٢١**)

(৭) যুক্তিরও চাহিদা এই যে, আমীন আস্তে হওয়াই উচিত। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে আমীন শব্দটি পবিত্র কুরআনের কোন অংশ নয়। সুতরাং “আউযুবিল্লাহ” এবং “সুবহানাকাল্লাহু”-এর মত ইহাও আস্তে হওয়া উত্তম। “বিসমিল্লাহ” কুরআনের অংশ হওয়া সত্ত্বেও যখন ইহা আস্তে ও জোরে বলা নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমীন তো নিঃসন্দেহে কুরআনের অংশ নয়। ফলে তা আস্তে হওয়াই অধিক উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত।

(৮) সর্বোপরি বলা যায়, রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধের সময় সাহাবায়ে কিরামের আমল (কর্ম) একটি ব্যাপক সীমা পর্যন্ত সিদ্ধান্তকারী হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রেও শুব্বার রেওয়ায়েত সাহাবীগণের আমল দ্বারাও সমর্থিত। যেমন, ইমাম তাহাবী (রহ.) আবু ওয়াইলের হাদীস বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لَا يَجْهَرُ أَنْ يَبْسُمَ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ وَلَا بِالتَّعْوِذِ وَلَا بِالثَّائِمِينَ - (شرح معاني الآثار ج ١ ص ٩٩)

অর্থাৎ, তিনি বলেছেন, উমর ও আলী (রাঃ) বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ এবং আমীন কোনটিই জোরে পড়তেন না।

তাছাড়া ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর ন্যায় আরো অনেক ফুকাহায়ে কিরাম থেকেও আমীন আন্তে পড়ার প্রমাণ রয়েছে।

(কنز العمال ج ٤ ص ٢٤٩، مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٠٨، معارف السنن ج ٢ ص ٤١٩)

দ্বিতীয় দলিলের জবাবঃ ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় দলীল।

তৃতীয় দলীললের জবাবঃ (১) رفع بها صوته -তে অনুরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যা مد-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

(২) এটাও সম্ভব যে, আসল রেওয়ায়েত مد بها صوته ছিল। অতঃপর সুফিয়ানের কোন শিষ্য এটাকে জোরে পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে অর্থগতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

(৩) অথবা, আমীন জোরে পড়াও যে জায়েয, তা বর্ণনার জন্যই নবী করীম (সাঃ) কখনো আমীন জোরে পড়েছেন। কেননা, জায়েয বর্ণনা করে দেয়াও নবীদের দায়িত্ব। তাই বলে ইহা উত্তম নয়। (درس ترمذي ج ١ ص ٥٢٢)

১৩৭ : بَابُ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ ص

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - (بخاري ج ١ ص ١٥٠ باب

صلوة القاعد، مسلم ج ١ ص ٢٥٣ باب جواز النافلة قائما وقاعدا الخ، ترمذي ج ١ ص ٨٥ باب صلوة القاعد على النصف الخ، نسائي ج ١ ص ٢٤٥ فضل صلوة القاعد الخ، ابن ماجه ص ٨٧)

অনুবাদঃ ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন, বসে নামায আদায় করার চাইতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা উত্তম এবং বসে নামায আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, শুয়ে নামায আদায় করলে বসে নামায আদায়ের অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

বিশ্লেষণঃ উক্ত হাদীসের আলোকে চারটি অবস্থা খেয়াল রাখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে- (১) সুস্থতা, (২) অসুস্থতা, (৩) ফরয নামায, (৪) নফল নামায।

এই হাদীসের উপর প্রশ্ন জাগে যে, এটি ফরয নামায আদায়কারী সম্পর্কে, নাকি নফল আদায়কারী সম্পর্কে? যদি ফরয আদায়কারী সংক্রান্ত হয়, তাহলে এর দুটি অবস্থা- হয়ত নামাযী সুস্থ থাকবে অথবা অসুস্থ। যদি সুস্থ উদ্দেশ্য হয় তাহলে হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ আছে- “صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ”

কিন্তু হাদীসের অবশিষ্ট দুই অংশ সহীহ নয়। কেননা, ওযর ব্যতীত ফরয নামায বসে বা শুয়ে আদায় করা শুদ্ধই হবে না, অর্ধেক সওয়াবের তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ হাদীসে অর্ধেক সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু যদি ফরয আদায়কারী ব্যক্তি অসুস্থ হয়, তবুও হাদীসের ভাবার্থ সহীহ হবে না। কেননা, অসুস্থতার কারণে কেউ বসে অথবা শুয়ে নামায আদায় করলে সে তো ওযরের কারণে পুরো সওয়াব পাবে। অথচ হাদীসে অর্ধেক সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, এর দ্বারা যদি নফল আদায়কারী উদ্দেশ্য হয় এবং নামাযী অসুস্থ হয়, এমতাবস্থায়ও যদি বসে অথবা শুয়ে নামায আদায় করে, তাহলেও তো পুরো সওয়াব পাওয়া যাবে।

কিন্তু নামাযী যদি সুস্থ হয় এবং ঐ নামাযটি যদি নফল হয়, তাহলে হাদীসের প্রথম দুই অংশ সহীহ আছে। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া উত্তম (পুরো সওয়াব পাবে) এবং বসে পড়লে অর্ধেক সওয়াব পাবে।

কিন্তু হাদীসের তৃতীয় অংশ সহীহ নয়। কেননা, ওযর ব্যতীত নফল নামাযও (হযরত হাসান বসরী রহ. ব্যতীত অন্য কারো নিকট) শুয়ে আদায় করা জায়েয নেই। অথচ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, শায়িত ব্যক্তির নামাযের সওয়াব বসে আদায়কারীর সওয়াবের অর্ধেক।

তাই এ জটিলতাকে দূর করার জন্য কতিপয় উলামা বলেছেন যে, হাদীসে “صَلَاتُهُ

” বাক্যাংশটি হযরত ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন, যা মূল হাদীসের অংশ নয়। অতএব হাদীসের প্রথম দুই অংশ সহীহ। আর তখন

হাদীসটির উদ্দেশ্য হবে সুস্থ ব্যক্তির নফল নামায আদায় করা। ফলে অর্থের কোন সমস্যা হবে না। ওযর ব্যতীত নফল নামায দাঁড়িয়ে আদায় করলে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে, আর বসে আদায় করলে অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সমাধান সঠিক নয়। কেননা, "صَلَاتُهُ نَائِمًا" শব্দটি যে রাবী কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন, এর কোন স্পষ্ট দলীল নেই। তাই সর্বোত্তম সমাধান হল এই, যা আল্লামা খাত্তাবী ও ইবন হাজার (রহ.) প্রদান করেছেন। আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) ও ইহা খুব পছন্দ করেছেন। বস্তুতঃ মায়ুর দুই প্রকার- (১) একেবারেই দাঁড়াতে বা বসতে পারে না, (২) অথবা খুব কষ্ট করে দাঁড়াতে বা বসতে পারে।

অতএব, যে মায়ুরকে শরীয়ত বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, এমন ব্যক্তি যদি কষ্ট স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তখন স্বীয় নামাযের হিসেব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এমন ব্যক্তি যখন বসে নামায পড়বে তখন স্বীয় নামাযের হিসাব অনুযায়ী অর্ধেক সওয়াব পাবে। যদিও এই অর্ধেকও সুস্থদের পূর্ণ সওয়াবের সমান হবে।

এমনিভাবে, যদি কোন মায়ুর ব্যক্তি যাকে শরীয়ত শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু কষ্ট সহ্য করে যদি সে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে, তাহলে সে অধিক সওয়াব পাবে। আর এমন ব্যক্তি যখন শুয়ে নামায পড়বে, তখন স্বীয় নামাযের হিসেব অনুযায়ী অর্ধেক সওয়াব পাবে। যদিও এই অর্ধেকও সুস্থদের পূর্ণ সওয়াবের সমান হবে। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১১২-১১৩، درس ترمذي ج ২ ص ১৪০-১৪১)

উক্ত সমাধানটির সমর্থন পাওয়া যায় মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) এবং মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা। যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদীসটি নবী করীম (সাঃ) তখন এরশাদ করেছিলেন, যখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় বসে নামায আদায় করতে দেখেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির প্রয়োগ ক্ষেত্র ওযর বিশিষ্ট লোকজন। (موطا امام مالك ص ১১৯، معارف السنن ج ৩)

(ص ৪৪৮)

১৩৯ : بَابُ التَّشَهُُّدِ : তাশাহুদে বর্ণনা

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّمَا إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مَنَ الدُّعَاءِ

أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ- (بخاري ج ١ ص ١١٥ باب التشهد في الآخرة، مسلم ج ١ ص ١٧٣ باب التشهد في الصلوة، ترمذي ج ١ ص ٦٥ باب التشهد، نسائي ج ١ ص ١٧٤ كيف التشهد الاول، ابن ماجه ص ٦٤)

অনুবাদঃ ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নামাযে রত থাকা অবস্থায় তাশাহুদদের মধ্যে “ওয়া আলা ইবাদিহীস-সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান”-এর পূর্বে “আসসালামু আলাল্লাহি” বলতাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমরা “আসসালামু আলাল্লাহি” বলো না; কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই ‘সালাম’ বা শান্তি বর্ষণকারী। আর তোমরা যখন তাশাহুদদের সময় বসবে তখন অবশ্যই পড়বে, “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু আস-সালামু আলাইকা আয্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস-সালামু আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন’। তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন এর সাওয়াব আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে সমস্ত নেক বান্দা রয়েছেন তাদের উপর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি (সাঃ) “আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু” পাঠ করতে বলেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় উত্তম দু’আ বেছে নিয়ে তা পাঠ করবে।

বিশ্লেষণঃ হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, নামাযে তাশাহুদ পড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের তাশাহুদ উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, উমর, ইবন উমর, আয়িশা এবং ইবন যুবাইর (রাঃ)-এর তাশাহুদ সহ ২৪ জন সাহাবা থেকে তাশাহুদদের বিভিন্ন প্রকারের শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে। (العيني)

(১৭৮৮ ২৮ সুতরাং সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে কোন একটি (যা সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত হয়েছে) পড়লেই যথেষ্ট হবে। মতানৈক্য শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে। যথা-

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, হযরত উমর (রাঃ)-এর তাশাহহুদ পড়া উত্তম। আর তা হল-

اَللّٰحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالزَّاٰكِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَٰيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ اَلخ (মুতা امام
مالك ص ৭২) (বাকিটুকু ইবন মাসউদ রাঃ-এর তাশাহহুদের মত)

হযরত উমর (রাঃ) লোকদেরকে এই তাশাহহুদ শিখাতেন এবং কারো পক্ষ থেকে যেহেতু এর উপর কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত হয়নি, সুতরাং বুঝা যায় যে, ইহাই উত্তম। (تتظيم ج ১ ص ৩৬০)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের তাশাহহুদ উত্তম। আর তা হল-

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَٰيْكَ اَلخ (ابو داود ج ১ ص ১৬০, ترمذي ج ১ ص ৬০, نسائي ج ১ ص ১৭০ نوع آخر من تشهد، ابن
ماجة ص ৬০)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে কুরআনের মতই তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন, আভাহিয়াতু আল-মুবারাকাতু আস-সালাওয়াতু ওয়াত-তাইয়্যিবাতে লিল্লাহি আস-সালামু আলাইকা (বাকিটুকু ইবন মাসউদ রাঃ-এর তাশাহহুদের অনুরূপ)

উক্ত তাশাহহুদে যেহেতু ‘আল-মুবারাকাতু’ শব্দ অতিরিক্ত রয়েছে, সুতরাং ইহাই উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক এবং ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, হযরত ইবন মাসউদ (রহ.)-এর তাশাহহুদ উত্তম। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ৮২) যা অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর তাশাহহুদ প্রাধান্য লাভের কিছু কারণ নিম্নে দেওয়া হল-

ক. ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবিক হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম। (ترمذي ج ১ ص ৬০)

খ. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন-

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ حَرْفٌ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ - (মুতা امام محمد ص ১১১)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) তাশাহহুদে কোন হরফ বাড়ানো বা কমানোকে অপছন্দ করতেন। এতে বুঝা যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, এই তাশাহহুদ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্বের দাবিদার।

গ. হযরত ইবন মাসউদের (রাঃ) তাশাহহুদ সিহাহ সিন্তায় বর্ণিত আছে। (অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রদত্ত হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই তাশাহহুদের শব্দাবলীতে কোথাও কোন এখতেলাফ নেই। অথচ অন্যান্য সমস্ত তাশাহহুদের শব্দাবলীতে ব্যাপক এখতেলাফ রয়েছে।

ঘ. আল্লামা বাযযার (রহ.) বলেন, এই তাশাহহুদ বিশজন সাহাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ঙ. ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর তাশাহহুদ নির্দেশসূচক শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত। এজন্য হাদীসগুলোতে "فَلْيَقُلْ" "فَوُتُوْا" "فَقُولُوا" শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

(ابو داود ج ١ ص ١٣٩، نسائي ج ١ ص ١٧٣)

কিন্তু এছাড়া অন্যগুলো শুধুমাত্র বিবৃত হয়েছে।

চ. উক্ত তাশাহহুদে وَآؤ হরফ অতিরিক্ত রয়েছে, যা নতুন বাক্যের জন্য প্রত্যেকটি শব্দের স্বতন্ত্র শান সৃষ্টি করে। যেমন, কেউ এভাবে কসম করল-

تَخْنِ وَاللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ তখন শুধু একটি কসম হবে। কিন্তু কেউ যদি وَآؤ-এর সাথে এভাবে বলে- وَاللّٰهُ وَالرَّحْمٰنُ وَالرَّحِيْمُ তখন তিনটি কসম হবে।

ছ. হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এই তাশাহহুদের তালীম দিয়েছেন আমার হাত ধরে। (مسلم ج ١ ص ١٧٤) এটি বিষয়টির গুরুত্ব বহন করে। আর এই রেওয়াজেটি হস্তধারণ পদ্ধতিতে পরস্পরায়ুক্ত (معارف السنن ج ٣ ص ٩١) হাদীস হিসেবে পরিচিত।

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ এই হাদীসটি হযরত উমর (রাঃ)-এর উপর মাওকুফ। সুতরাং এই হাদীসটি মারফু-এর মুকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ অতিরিক্ত শব্দ হওয়াই যদি প্রাধান্য লাভের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তো হযরত জাবির (রাঃ)-এর তাশাহহুদটি সর্বাত্মক প্রাধান্য লাভের দাবিদার। কারণ, তাঁর তাশাহহুদে সবচেয়ে বেশি শব্দ রয়েছে। যেমন, তাতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অতিরিক্ত শব্দও রয়েছে। (نسائي)

(تظهير ج ١ ص ٣٤١) অথচ ইহা সর্বসম্মতিক্রমে প্রাধান্য পায়নি। (١٧٥ ص)

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ ص ১৪২

তাশাহহুদের মধ্যে (আংগুল দ্বারা) ইশারা করা

... عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْأَبْهَامَ وَوَضَعَ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى - (مسلم)

ج ১ ص ২১৬ باب صفة الجلوس الخ، نسائي ج ১ ص ১৮৭ باب قبض الاصابع من اليدي اليمنى

(الخ، ابن ماجه ص ১৬৬)

অনুবাদঃ ... আলী ইবন আব্দুর রহমান আল-মুআবী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) আমাকে নামাযের মধ্যে কংকর নিয়ে অনর্থক খেলতে দেখেন। তিনি নামায শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেরূপে নামায আদায় করতেন, তদ্রূপ করবে। তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেনঃ তিনি (সাঃ) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তাঁর সমস্ত আংগুলগুলো (শাহাদাত আঙ্গুল ব্যতীত) বন্ধ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন।

বিশ্লেষণঃ তাশাহহুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করা নিয়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* খুরাসানবাসী, ইরাকবাসী এবং পরবর্তী কতক ভারতীয় উলামার মতে, তাশাহহুদের সময় তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা বলেনঃ (১) ইহা একটি অতিরিক্ত বিষয়। ফলে ইহা সুন্নত হতে পারে না। বরং তা পরিত্যাগ করাই উত্তম। (২) এটি একটি রাফেযী সম্প্রদায়ের প্রতীক। এজন্যই তাদের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকার নিমিত্তে তা না করাই উত্তম। (৩) তাছাড়া

তাশাহহুদের সময় রানের উপর হাত রাখা সুন্নত। আর তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে গেলে সুন্নত পরিত্যাগ করতে হয়।

* উপরন্তু মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেন, তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার হাদীস অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল। তাই এর উপর আমল না করাই উত্তম। (২০২: ১ জ. تنظيم)

* চার ইমাম, জমহুর উলামা ও মিশরীয় উলামাদের মতে, তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা প্রমাণিত এবং সুন্নত। (২০২: ১ জ. تنظيم)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- **مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ** - অর্থাৎ, রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে আসেন তোমরা তা গ্রহণ কর। (হাশরঃ ৭)

- **وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** - অর্থাৎ, যে লোক রাসূলের অনুসরণ করল, সে আল্লাহরই অনুসরণ করল। (নিসাঃ ৮০)

তাই ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তায় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা সংক্রান্ত একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলই আমরা গ্রহণ করি। আর এটাই ইমাম আবু হানিফার মাহাবাব।” (মুয়াত্তা امام محمد ১০৮-১০৭)

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... **حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... أَشَارَ بِإصْبَعِهِ وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ** - (ابو داود ১৬২: ১)

অর্থাৎ, ... আমের ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ... শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

তাছাড়া কতক মুহাদ্দিস তাশাহহুদে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার হাদীসকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করেন। এমনকি এর উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং সালাফে সালাহীনদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল বার বলেন-

(تنظيم ১ ج. ২০২) - **لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ** - অর্থাৎ, এতে কোন মতানৈক্য নেই।

জবাবঃ যারা বলেন, ইশারা করা একটি অতিরিক্ত ঝামেলা, তাদের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এটি যদি ছেড়ে দেয়াই উত্তম হত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) এমনটি করতেন না।

* যারা তাশাহুদে তর্জনী ইশারাকে রাফেজী সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য মনে করে স্বীকৃতি দেন না, তাদের জবাবে বলা যায়, নিছক সাদৃশ্য নাজায়েয নয়। বরং ঐ সমস্ত কর্মসমূহের সাদৃশ্য নাজায়েয, যেগুলোকে তারা নিজেরা মনগড়াভাবে প্রচলিত করেছে এবং তা তাদের প্রতীক হয়ে গেছে। আর তাশাহুদে ইশারা করা তাদের পক্ষ থেকে নতুন কোন আবিষ্কৃত বিষয় নয়, বরং তা হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ইশারা রাফেজী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন প্রতীক নয়; ইহা ইসলামের প্রতীক।

* তাছাড়া আরেকটি যে অভিযোগ দেয়া হয়, রানের উপর হাত রাখা সুন্নত, যা ইশারা করার দ্বারা তরক হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়, বরং হাত তো রানের উপরেই থাকে। শুধুমাত্র আঙ্গুল উঠানো হচ্ছে। এতে সুন্নত তরক হল কিভাবে? বরং এক সুন্নতের সাথে আরেকটি সুন্নত আদায় হচ্ছে। অথবা বলা যায়, সেক্ষেত্রে হাতের তালু একটু উপরে উঠলেও এক সুন্নতকে তরক করে অন্য সুন্নতের উপর আমল করা হচ্ছে। যা সহীহ হাদীস দ্বার স্বীকৃত।

* মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রহ.) যে ইযতিরাব (অসঙ্গতি)-এর কথা উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রেও আমরা হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, খোদ ইশারার ব্যাপারে কোন ইযতিরাব নেই; বরং ইশারার পদ্ধতির মধ্যে হাদীসের বিভিন্ন ধরন পাওয়া যায়। যাকে তিনি ইযতিরাব বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যে “ইশারা” অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। (درس مشکوٰۃ ج ۲ ص ۸۳، معارف السنن ج ۳ ص ۱۰۵-۱۰۹)

* উল্লেখ্য যে, ইশারার ধরনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের হাদীস পাওয়া যায়। মূলত ইহা সময় ও অবস্থাভেদে হয়েছে। কখনো প্রিয় নবী (সাঃ) ইশারা একভাবে করেছেন, আবার কখনো অন্যভাবে। তাই তন্মধ্যে প্রত্যেকটির উপর আমল করা জায়েয। যেমন, ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলকে বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলিকে শাহাদাত আঙ্গুলির গোড়ায় রেখে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে।

* আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে, উল্লিখিত তিন আঙ্গুলকে বন্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রেখে ইশারা করবে।

* ওয়ায়েল ইবন হুজর (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে, কনিষ্ঠা এবং অনামিকা আঙ্গুলকে বন্ধ করে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। আহনাফদের নিকট এই পদ্ধতিই উত্তম। (تنظيم ج ۱ ص ۳۰۴)

অতঃপর বৃত্ত বা বন্ধন করার সময় নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, তাশাহহুদের শুরু থেকেই বস্তুন করবে, এবং “আশহাদু” বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে এবং “লা ইলাহা” বলার সময় নিচে নামিয়ে ফেলবে।

* অতঃপর কতক রেওয়ায়েতে এসেছে, উপর-নিচে নাড়াবে। এবং কতক রেওয়ায়েতে এসেছে, ডানে-বামে নাড়াবে। এবং কতক রেওয়ায়েতে স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, আঙ্গুলসমূহ তাশাহহুদের প্রথম থেকেই খোলা রাখবে এবং ٱللهُ ٱ বলার সময় বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল উঠাবে এবং ٱللهُ ٱ বলার সময় আঙ্গুল নামিয়ে ফেলবে।

(فتح القدیر ج ١ ص ٢٢١، معارف السنن ج ٣ ص ١٠٥، تنظیم ج ١ ص ٣٠٤، درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ٨٤)

১৪৩ : سَالَامُ سَم্পর্কে : بَابُ فِي السَّلَامِ ص ١٤٣

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ-

(ترمذي ج ١ ص ٦٥ باب التسليم في الصلوة، ابن ماجه ص ١٦٦)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্র অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন।

বিশ্লেষণঃ নামাযের মধ্যে সালামের সংখ্যা কয়টি এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, ইমাম শুধু একবার নিজের সামনের দিকে মুখ তুলে সালাম দেবেন, অতঃপর হালকা ডান দিকে মোড় নেবেন। আর মুক্তাদী তিন সালাম করবে। একটি সামনের দিকে ইমামের সালামের জবাবের জন্য, একটি করে ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে।

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي صَلَوةٍ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تَلْقَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا - (ترمذي ج ১ ص ৬৬ باب التسليم في الصلوة، ابن ماجه ص ৬৬)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে সামনের দিকে একটি সালাম ফিরাতেন। অতঃপর ডান দিকে সামান্য ঝুকতেন।

দলীল (২): হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীস। এতে সালিম ইবন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর সফরের নামাযের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

... فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تَلْقَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيَصِلْ هَذِهِ الصَّلَاةَ - (نسائي ج ১ ص ৯৯ باب الوقت الذي يجمع فيه الخ)

অর্থাৎ, ... অতঃপর তিনি ইশার নামায আদায় করলেন, তাতে তিনি একবার সালাম ফিরালেন চেহারার দিকে। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যা ফওত হওয়ার আশংকা হয়, তখন যেন সে এই নামায আদায় করে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে একটি সালাম করাই উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, নামাযে ইমাম-মুস্তাদী ও মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী) সবার উপর দু'দুটি সালাম ওয়াজিব। একটি ডান দিকে অপরটি বাম দিকে।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ عُلَيْمَةَ بِنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ - (ابو داود ج ১ ص ১৪৩)

অর্থাৎ, ... আলকামা ইবন ওয়ায়েল (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরাবার সময় প্রথমে ডান দিকে ফিরে “আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” বলেন এবং বাম দিকে ফিরে “আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলেন।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে দু'দুটি সালাম ওয়াজিব।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ জমহুর উলামা হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে যঈফ (দুর্বল) সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, উক্ত হাদীসের সনদে যুহাইর ইবন মুহাম্মদ নামক একজন রাবী রয়েছেন। তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, শামবাসী তার সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। আর এ রেওয়ায়েতটিও শামবাসী থেকে বর্ণিত। অতএব, এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ কতক উলামা বলেছেন যে, এটি ওয়রের অবস্থায় প্রযোজ্য। যা রেওয়ায়েতের শেষ বাক্যটিতেও এর সমর্থন রয়েছে। কিন্তু এই উত্তরটি কেবল তাদের মাযহাব মতে তো সঠিক হতে পারে, যারা প্রথম সালামকে ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় সালামকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলেন। এমতাবস্থায় এ উত্তরটি (হানাফীদের পক্ষ থেকে) সহীহ হবে না। কারণ তাঁদের মতে উভয় সালাম ওয়াজিব। তাই আল্লামা আইনী (রহ.) এ ব্যাপারে একটি সুন্দর জবাব দিয়েছেন, “নবী করীম (সাঃ) হযরত কোন সময় এত আন্তে দ্বিতীয় সালাম বলেছিলেন যে, কেউ কেউ এখানে একটি সালামই মনে করেছেন।”

তাছাড়া, অসংখ্য রেওয়ায়েতের মুকাবিলায় কয়েকটি শায বা নগণ্য রেওয়ায়েতকে কিভাবে প্রাধান্য দেয়া যায়? অথচ ইমাম তাহাজ্জী (রহ.) যেখানে অনেক সাহাবা (রাঃ) থেকে দুই সালামের একাধিক মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নামাযে দুই সালাম ওয়াজিব। (درس ترمذي ج ١ ص ٦٤-٦٥)

بَابُ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشُّكَّ ص ١٤٧

যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দিহান হয়েছে

... عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادٍ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيَتِمَّ رُكْعَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهُدُ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ-

অনুবাদঃ ... যাইয়েদ ইবন আসলাম (রাঃ) রাবী মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং তার দৃঢ়ভাবে মনে হয় যে, সে (চার রাকাতের স্থলে) তিন রাকাত আদায় করেছে, তখন সে যেন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে তা সিজদা

সহকারে আদায় করে। অতঃপর তাশাহুদ পাঠের নিমিত্তে বসবে। তাশাহুদ পাঠের পর বসা অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা দেবে এবং সবশেষ পুনরায় সালাম ফিরাবে।

বিশ্লেষণঃ যদি কারো নামাযের মধ্যে এই সন্দেহ হয় যে, সে কত রাকাত নামায পড়েছে, বেশি পড়েছে নাকি কম পড়েছে, তখন নামাযী কি করবে, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম আওযাঈ ও শাবী (রহ.)-এর মতে, মুসল্লী যদি নামাযের রাকাত সংখ্যায় সন্দিহান হয় তাহলে সর্বাবস্থায় নামায দোহরানো ওয়াজিব। ব্যতিক্রম শুধু তখন যখন রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ইয়াকীন হয়ে যায়।

দলীলঃ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي لَا يَذْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ - (مصنف ابن ابى شيبه ج ٢ ص ٢٨)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) যে মুসল্লী তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে তা সে জানে না এরূপ মুসল্লী সম্পর্কে বলেছেন, সে নামায দোহরিয়ে নিবে। যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে মনে আসে।

* হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, সর্বাবস্থায় সিজদা সাহু ওয়াজিব। কমের উপর ভিত্তি করুক অথবা বেশির উপর ভিত্তি করুক।

দলীলঃ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَذْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - (ابو داود ج ١ ص ١٤٧ باب من قال يتم على

أكبر ظله، بخاري ج ١ ص ٥٨، مسلم ج ١ ص ٢١٠ باب السهو في الصلوة والسجود، ترمذي ج ١ ص ٩٠ باب من يشك في الزيادة والنقصان، نسائي ج ١ ص ١٨٥ باب التحري، ابن ماجه ص ٨٦)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার নিকট এসে তাকে ধোঁকা দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যে, সে কয় রাকাত নামায আদায় করেছে, তা স্মরণ করতে পারে না। তোমাদের কারো যখন এমন অবস্থা হবে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সিজদা দেয়।

উক্ত হাদীসে কম বা বেশির কথা উল্লেখ নেই; বরং ব্যাপকভাবে দুটি সাহু সিজদা দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এমন সন্দিহান অবস্থায় কমের উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব। এবং এরূপ প্রতিটি রাকাতে বসা ওয়াজিব যাতে সম্ভাবনা থাকে যে, ইহা শেষ রাকাত হতে পারে এবং সিজদায়ে সাহু দেওয়াও ওয়াজিব।

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَوَتِهِ فَلَمْ يَذَرْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَذَرْ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَذَرْ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ - (بخاري ج ١ ص ٥٨، مسلم ج ١ ص ٢١١، ترمذي ج ١ ص ٩٠-٩١)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ নামাযে ভুলে যায়, ফলে এক রাকাত পড়েছে না দু'রাকাত তা ঠিক করতে না পারে, তখন সে যেন, অবশ্যই এক রাকাতের উপর ভিত্তি করে। যদি দু'রাকাত পড়েছে, না তিন রাকাত পড়েছে তা ঠিক করতে না পারে, তবে দু' রাকাতের উপর ভিত্তি করবে। আর যদি তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত পড়েছে তা ঠিক করতে না পারে, তবে তিন রাকাতের উপর ভিত্তি করবে এবং সালাম দেয়ার পূর্বে দুটি সিজদা করবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এ মাসআলাটিতে বিশ্লেষণ রয়েছে-

(১) যদি মুসল্লীর এই সন্দেহ জীবনে প্রথমবার হয়, তাহলে নামায দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব। (২) আর যদি সন্দেহ বারবার হয়, তাহলে নামায পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব নয়, বরং সে চিন্তা-ফিকির করবে। চিন্তা-ফিকিরের পরে যদিও তার প্রবল ধারণা জন্মিবে তার উপর আমল করবে। (৩) আর এই চিন্তা-ফিকিরের পরে যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না জন্মে তাহলে কমের উপর ভিত্তি করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। উল্লেখ্য যে, কমের উপর ভিত্তি করার ক্ষেত্রে যেসব রাকাতে সর্বশেষ রাকাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোতে বসাও জরুরী।

দলীল (১): عَنْ طَاوُسٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَذَرْ كَمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدْهَا مَرَّةً فَإِنْ أَنْسَيْتَ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَا تُعِدْهَا - (مصنف ابن أبي شيبة ج ٢ ص ٢٨)

অর্থাৎ, তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি নামায পড় আর কত রাকাত পড়েছ তা তোমার মনে না থাকে, তখন এই নামায পুনরায় আদায় কর। যদি আবার তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আর তা পুনরায় পড়বে না।

দলীল (২): ঐ হাদীস, যা ইমাম আওযাঈ (রহ.) দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (উল্লিখিত দলীল দুটি নামায পুনরায় পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

দলীল (৩): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ ... إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ - (مسلم ج ١ ص ٢١٢ باب السهو في الصلوة

السجود، بخاري ج ١ ص ٥٨ باب التوجه نحو القبلة الخ، نسائي ج ١ ص ١٨٤، ابن ماجه ص ٨٦)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের কারো যদি নামাযে সন্দেহ হয়, তবে ভেবে-চিন্তে যেটি সঠিক মনে হবে, তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে নিবে। অতঃপর দুটি সিজদা করবে। (এই দলীলটি চিন্তা-ফিকির করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

দলীল (৪): ঐ হাদীস যা তিন ইমাম দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (উক্ত হাদীসটি কমের উপর ভিত্তি করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

হানাফী মাযহাবের প্রাধান্যের কারণঃ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই মাসআলায় ব্যাপক এখতেলাফ হওয়ার মূল কারণ হল, এখতেলাফপূর্ণ রেওয়ায়েত। কেননা কতক রেওয়ায়েতে নামায আবার পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে চিন্তা-ফিকির করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে কমের উপর ভিত্তি করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে সিজদায়ে সাহুর হুকুম দেয়া হয়েছে।

* তিন ইমাম এসব হাদীসসমূহ থেকে কমের উপর ভিত্তি করার হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন এবং এর সাথে রয়েছে সিজদায়ে সাহুর হাদীস।

* আর ইমাম আওযাঈ ও শাবী (রহ.) নতুনভাবে নামায পড়ার হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন, আর বাকীগুলোকে অগ্রাহ্য করেছেন।

* আর হাসান বসরী (রহ.) শুধু সিজদায়ে সাহুর হাদীস গ্রহণ করেছেন।

* কিন্তু যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামতের দিকে বিচক্ষণতার সাথে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখা যায়, তিনি এ সবগুলো হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের একটি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করে সবগুলো হাদীসের মাঝে এক অপূর্ব ও সর্বোত্তম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

* যে সকল হাদীসে নামায পুনরায় পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার জীবনে প্রথমবার নামাযে সন্দেহ হয়।

* আর যে সকল হাদীসে চিন্তা-ফিকিরের হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার নামাযে প্রায়ই সন্দেহ হয়ে থাকে।

* আর যে সকল হাদীসে কমের উপর ভিত্তি করার হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার চিন্তা-ফিকিরের দ্বারাও নামাযের রাকাতের নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা না জন্মে। (نرس ترمذي ج ٢ ص ١٤٨-١٥٠)

بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى ص ١٥٣

গ্রামাঞ্চলে জুমআর নামাযের বিধান

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٍ جُمِعَتْ بِجَوَائِهَا قَرِيَةً مِّنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرِيَةً مِّنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ - (بخاري ج ١ ص ١٢٢ باب الجمعة في القرى والمدن)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম জুমআ মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মসজিদে (মসজিদে নববীতে) অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য যেখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে তা হল বাহরাইনের আব্দুল কায়েস গোত্রে অবস্থিত “জোওয়াছা” নামক গ্রামে। রাবী উসমান (রহ.) বলেন, তা আব্দুল কায়েস নামীয় গোত্রের বসতি এলাকা।

বিশ্লেষণঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-

(ক) যারা গ্রামে বা শহর থেকে দূরে, তাদের উপর কত দূর থেকে জুমআর নামাযে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব।

(খ) গ্রামে জুমআ আদায় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

প্রথম আলোচনাঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি শহর থেকে এতটুকু দূরে অবস্থান করে যে, শহরে জুমআর নামাযের জন্য এসে সূর্যাস্তের পূর্বেই নিজ বাড়িতে পৌঁছতে পারে, এমন ব্যক্তির জন্য জুমআতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি এর থেকে বেশি দূরে থাকে তার জন্য জুমআতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। কোন কোন হানাফী আলিমের অভিমতও অনুরূপ। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি মতও তাই।

দলীলঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ - (ترمذي ج ١ ص ١١٢ باب من كم يؤدي الى الجمعة)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (জুমআর নামায আদায় করে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারবে, তার উপর জুমআ আবশ্যিক।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জুমআ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে শহর থেকে এতটুকু দূরে অবস্থান করে যেখানে সে আযানের আওয়ায শুনতে পায়। অতএব, যে শহর থেকে এত দূরে থাকে যার ফলে আযানের আওয়ায শুনতে পায় না, তার উপর জুমআ ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর একটি মতও তাই। (معارف السنن ৬ ج ص ৩৫০)

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ— (ابو داود ج ১ ص ১০১ باب من تجب عليه الجمعة)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জুমআর নামায ওয়াজিব, যে আযান শুনতে পায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জুমআ ঐ ব্যক্তির জন্য ফরয যে শহরে বা শহরতলীতে বসবাস করে। (التعليق الصحيح ج ২ ص ১৩৮)

দলীলঃ দ্বিতীয় আলোচনায় কুরআন ও হাদীস দ্বারা হানাফীদের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্রষ্টব্য।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ ইমাম তিরমিযী এবং বায়হাকী (রহ.) উক্ত হাদীসকে যঈফ বলেছেন। এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) উক্ত হাদীসটি শোনার পর এ হাদীসের রাবীকে বললেন-

إِسْتَفْغِرْ رَبَّكَ إِسْتَفْغِرْ رَبَّكَ— (ترمذي ج ১ ص ১১২)

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

সুতরাং এমন একটি দুর্বল হাদীস হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহীহ হাদীসের বিপরীতে দলীলযোগ্য হতে পারে না।

ইমাম আহমদ ও মালিক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

(১) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, একদল মুহাদ্দিস এই হাদীসটি সুফিয়ান থেকে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ)-এর উপর মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং হাদীসটি মারফু নয়।

(২) তাছাড়া, যে ব্যক্তি খুব বড় শহরে অবস্থান করবে, কোন কোন সময় সে হয়ত আযান নাও শুনতে পারে। সুতরাং আযান শোনার উপর জুমআর নামায ভিত্তি করা মোটেই সমীচীন নয়। (تنظيم ج ১ ص ৫০৫-৫০৬)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ গ্রামে জুমআ আদায় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণঃ গ্রামে জুমআর নামায আদায় করা যায় কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, গ্রাম হোক কিংবা শহর হোক, সর্বত্রই জুমআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, গ্রামে জুমআ আদায়ে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে এজন্য সেখানে মসজিদ বা বাজার থাকা শর্ত।

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, জুমআর জন্য শহর হওয়া শর্ত নয়, বরং প্রত্যেক ঐ গ্রামে জুমআ আদায় করা ওয়াজিব যেখানে কমপক্ষে এমন চল্লিশজন পুরুষ রয়েছে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন, বালেগ, মুকীম ও স্বাধীন।

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

অর্থাৎ, জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দৌড়াও (তুরা কর) এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। (জুমআঃ ৯)

উক্ত আয়াতে “فَاسْعَوْا” (দৌড়াও) শব্দটি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে শহর কিংবা গ্রাম উল্লেখ করা হয়নি।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে “জোওয়াছা”কে গ্রাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, গ্রামেও জুমআ হতে পারে।

দলীল (৩): عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمُ لَأَسْعِدِ بْنِ زُرَّارَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ النَّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لَأَسْعِدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ اللَّيْلِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيْضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ

نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ (ابن ماجه ص ১০৩, ابو داود ج ১ ص ১৭৭)

অর্থাৎ, আব্দুর রহমান ইবন কাব ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা কাব (রাঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর চালক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা কাব (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর পিতা যখন জুমআর নামাযের আযান শুনতেন, তখন আসআদ ইবন যুরারা (রাঃ)-এর জন্য দোআ করতেন। তাঁর এরূপ দোআ করার কারণ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেহেতু তিনি যামানের “হায্ম আল-নাবিত” নামক গ্রামে আমাদের জন্য সর্বপ্রথম জুমআর নামায কায়েম করেন। এই স্থানটি নাকী নামক স্থানের “বনু বায়াদার হাররাতে” অবস্থিত এবং তা “নাকী আল-খাদামাত” হিসেবে প্রসিদ্ধ। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, সে সময়ে সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চল্লিশজন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, চল্লিশজন ব্যক্তির এলাকায়ও জুমআ পড়া যায়।

দলীল (৪): এ কথার উপর সকল রাবী একমত যে, নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম জুমআ কুবা থেকে মদীনায় আসার পথে বনু সালিম মহল্লায় আদায় করেছিলেন। আর এটি একটি ছোট গ্রাম ছিল। (آثار السنن ص ২৩২)

দলীল (৫): হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

إِنَّهُمْ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ عُمَرُ جَمَعُوا حَيْثُ كُنْتُمْ - (مصنف ابن أبي شيبة ج ২ ص ১০১-১০২)

অর্থাৎ, তারা উমর (রাঃ)-এর নিকট জুমআর ব্যাপারে জানতে চেয়ে লিখে পাঠাল। উমর (রাঃ) তাদের উত্তরে লিখলেন, তোমরা যেখানে থাক না কেন জুমআ আদায় কর।

হযরত উমর (রাঃ) শতহীনভাবে প্রত্যেক জায়গায় জুমআ কায়েম করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি শহর কিংবা গ্রাম নির্দিষ্ট করেননি। সুতরাং বুঝা গেল জুমআর জন্য শহর শর্ত নয়, বরং গ্রামেও জুমআ আদায় করা শুদ্ধ হবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জুমআ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শহর বা শহরতলী হওয়া শর্ত। যেখানে কমপক্ষে চার হাজার লোক বাস করে। তাঁর মতে, গ্রামে জুমআ জায়েয নয়।

* এখানে উল্লেখ্য যে, শহরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হানাফী-মাশায়েখদের ভিন্ন ভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

* কেউ কেউ শহরের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, “এমন এলাকাকে শহর হিসেবে গণ্য করা হবে, যেখানে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তাঁর প্রতিনিধি বিদ্যমান।”

* কেউ কেউ বলেন, “শহর ঐ এলাকাকে বলা হবে, যেখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদে ঐ এলাকার সকল মানুষের জ্ঞান সংকুলান হয় না।”

* আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যে এলাকায় বাজার আছে, অধিকাংশ লোকের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আছে, যেখানে চার হাজার পুরুষ লোক বসবাস করে, তাকেই শহর বলে। আর যেখানে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক দূর যেতে হয়, তাই গ্রাম। (الكوكب الدرّي ج ১ ص ১৭৭)

মূল কথা হল, শহরের নির্দিষ্ট কোন সমন্বিত ও যথার্থ সংজ্ঞা দেয়া মুশকিল। বরং ইহা প্রচলিত ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। কেননা, সভ্যতা ও তমুদ্দনের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক সময়ের প্রচলিত ঐতিহ্য পরিবর্তন হয়। অতএব, যে সময়ে প্রচলিত ঐতিহ্য যাকে শহর বলে, তাই শহর।

তবে বর্তমানে শহর বলা হবে সাধারণত ঐ সমস্ত জায়গাকে, যেখানে ডাকঘর, যানবাহন, টেলিফোন, পুলিশ স্টেশন, বাজার, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি থাকবে এবং যেখানে সাধারণত সবধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

(درس مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۳۵)

আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমতের দলীলঃ (১) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যখন বিভিন্ন দেশ জয় করেন, তখন জুমআর জন্য শহরে মিস্বর তৈরী করেন কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাঁরা কোন গ্রামাঞ্চলে জুমআ কায়েম করেছেন। তাহলে বুঝা যায়, একথার উপর সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে জুমআ শুদ্ধ হবে না।

তাছাড়া নবী করীম (সাঃ)-এর সময় মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য মসজিদও ছিল, কিন্তু জুমআ শুধু মসজিদে নববীতেই অনুষ্ঠিত হত, না মসজিদে কুবাতে, না অন্য কোন মসজিদে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জুমআর জন্য শহর হওয়া শর্ত। ছোট গ্রাম বা বস্তিতে জুমআ জায়েয নয়।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي - (ابو داود ج ۱ ص ১০১ باب من تجب عليه الجمعة، بخاري ج ১ ص ১২৩ باب من أين تؤتي الجمعة الخ)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নিজ নিজ ঘর হতে (মদীনা শহরে) জুমআর নামায আদায়ের জন্য পালাক্রমে মসজিদে নববীতে আগমন করতেন, এমনকি “আওয়ালীয়ে মদীনা” (অর্থাৎ মদীনার পূর্বে অবস্থিত গ্রামগুলো) হতেও লোকজন আসত।

এতেও বুঝা যায় যে, যদি ছোট বস্তিগুলোতে জুমআ জায়েয হত তাহলে তাদেরকে জুমআর জন্য মদীনায় আগমনের প্রয়োজন ছিল না।

দলীল (৩)ঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর আছার-

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ - (مصنف ابن ابي شيبة ج ২ ص ১০১)

অর্থাৎ, জুমআ ও তাকবীরে তাশরীক বড় শহর ছাড়া অন্যত্র (জায়েয) নেই।

যদিও কেউ কেউ উক্ত আছারটিকে মাওকুফ বলে থাকেন, কিন্তু হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে একথা বলা যায় যে, এর সনদ বিলকুল সহীহ। তাই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক সূত্রে এই আছারটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন- (الدراية في تخريج احاديث الهداية ج ১ ص ২১৬) -

অর্থাৎ, এর সনদ সহীহ।

দলীল (৪)ঃ সহীহ রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিদায় হজ্জে আরাফাতে অবস্থান হয়েছিল জুমআর দিনে। (بخاري ج ১ ص ১১ باب زيادة اليمان ونقصانه)

এ ব্যাপারেও রেওয়াজেতে আছে যে, নবী করীম (সাঃ) আরাফায় জুমআর নামায আদায় করেননি, বরং তিনি যুহরের নামায আদায় করেছেন।

(مسلم ج ١ ص ٣٩٧ باب حجة النبي صلعم)

এর কারণ এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নয় যে, জুমআর জন্য শহর হওয়া শর্ত। কিন্তু আরাফা শহর নয়।

যদিও কতক শাফেঈ মতাবলম্বী জুমআ না পড়ার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) মুসাফির ছিলেন। কিন্তু এ দলীল ঠিক নয়। কারণ, নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বিরাট একটি জামাআত ছিল মুকীমদের। মক্কাবাসী সবাই তো মুকীম ছিলেন। তাঁদের উপর জুমআ ওয়াজিব ছিল। অতএব, প্রশ্ন হয় যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁদের জন্য জুমআর ব্যবস্থা কেন করেননি। যদিও জুমআর নামায মুসাফিরের ওপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু নাজায়েযও নয়। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) যদি তথায় জুমআর নামায পড়তেন, তাহলে তাঁর নামাযও আদায় হয়ে যেত, পাশাপাশি মুকীমদেরও নামায আদায় হত। তা সত্ত্বেও তিনি যে শুধু নিজেই জুমআর নামায পড়েননি তা নয়; বরং মুকীমদেরকেও পড়ার নির্দেশ দেননি। এমনকি তথায় নবী করীম (সাঃ)-এর খুতবা দেওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। অতএব, তাঁর জুমআ না পড়ার ব্যাখ্যা শুধু এটাই হতে পারে যে, তা শহর না হওয়ার কারণে যেখানে জুমআ জায়েয ছিল না।

দলীল (৫): আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ (الجمعة ১)

উক্ত আয়াতে বোচা-কেনা ছেড়ে আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে আসার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জুমআ বাণিজ্যিক এলাকার জন্য নির্ধারিত। আর শহরই হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। সুতরাং সেখানে ছাড়া অন্যত্র জুমআ ওয়াজিব নয়।

(درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ١٣٤)

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে শাফেঈদের প্রথম দলীলের জবাবঃ উল্লিখিত আয়াতে জুমআর দিকে দৌড়ে যাওয়াকে আযানের উপর মাওকুফ বা নির্ভরশীল করা হয়েছে। আর উক্ত আয়াতে ইহা বর্ণনা করা হয়নি যে, আযান কোথায় হওয়া উচিত, আর কোথায় না হওয়া উচিত। সুতরাং গ্রামে যেহেতু জুমআর আযান (ندا) হবে না, সেহেতু জুমআর জন্য দ্রুত যাওয়াও ওয়াজিব হবে না।

আল্লামা কাসিম নানুতভী (রহ.) এই আয়াতের দ্বারা হানাফীদের অভিমত প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, উক্ত আয়াতে জুমআর জন্য সায়ী (দ্রুত যাওয়া)-এর হুকুম

দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হল দৌড়ে যাওয়া, দ্রুত চলা। এটার সুযোগ সেখানেই আসে যেখানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। আর গ্রামাঞ্চলে এমনটা সম্ভব নয়।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে- “وَذَرُوا الْبَيْعَ” অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দাও। এতে বুঝা যায় যে, জুমআর হুকুম এমন স্থানের জন্যই যেখানে কোন বড় বাজার রয়েছে। আর লোকজন সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে। আর গ্রামে এরূপ ব্যস্ততাপূর্ণ বাজার থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে- “فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ-”

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তথা আয়-রোজগার আমদানীর উপকরণ তালাশ কর। (জুমআঃ ১০)

এতেও বুঝা যায় যে, যেখানে জুমআ আদায় করা হবে সেখানে এ ধরনের ব্যাপক ব্যস্ততা থাকা চাই।

(ماهية البلاغ ج ١٦ شماره ٢ صفر المظفر ١٤٠٢ هـ ص ٤١-٤٢ دار العلوم دہرند کی فقہی خدمات)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ قرية (গ্রাম) শব্দটি আরবী বাগধারায় অনেক সময় শহরের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-

“وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ”

অর্থাৎ, তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? (যুখরুফঃ ৩১)

উক্ত আয়াতে দুইটি গ্রাম) দ্বারা উদ্দেশ্য হল মক্কা এবং তায়েফকে বুঝানো।

অথচ মক্কা এবং তায়েফ নিঃসন্দেহে দুটি বড় শহর। (روح المعاني ج ١٣ ص ٧٨)

এমনিভাবে হাদীসে জোওয়াছা বলে যে গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত গ্রাম নয়, বরং শহর। কেননা ইহা একটি বিরাট বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল। যেখানে চার হাজারেরও বেশি বাসিন্দা ছিল। অথচ তৎকালীন যুগে গ্রাম অনুরূপ ছিল না।

(اثر السنن ج ٢٣١)

জোওয়াছা সম্পর্কে ইমাম জাওহারী (রহ.) ‘সিহাহ’-এ এবং আল্লামা যমখশারী ‘কিতাবুল বুলদানে’ লিখেন- “ان جوائى اسم حصن بالبحرين لعبد القيس”-

অর্থাৎ, জোওয়াছা হল, বাহরাইনে অবস্থিত আবুল কায়েস গোত্রের একটি দুর্গের নাম। (আর দুর্গের নামে এই এলাকার নাম হয়ে গেছে জোওয়াছা) আর দুর্গ ছোট গ্রামে থাকে না বরং বড় শহরে থাকে। আর বিষয়টিও তাই, জোওয়াছা এক বড় শহর ছিল।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইমরুল কায়েসও তার এক কবিতায় ‘জোওয়াছা’ শব্দটি উল্লেখ করেন। যা বিশ্লেষণ করলে এটি শহরই প্রমাণিত হয়।

(عمدة القاري ج ٦ ص ١٨٧)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) লিখেন যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময়ে হযরত আলা ইবন হাযরামীকে জোওয়াছার গভর্নর বানানো হয়েছিল এবং আলা (রাঃ) সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গভর্নর হিসেবে অবস্থান করেছিলেন। যদি তা শহরই না হত তাহলে তাতে গভর্নর নিয়োগের প্রয়োজন হত না।

সুতরাং উক্ত হাদীসটি আমাদের (হানাফীদের) বিপরীত নয়, বরং এ রেওয়ায়েতটি স্বয়ং হানাফীদের দলীল।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ “قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ” এই জুমআ সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে পড়েছিলেন। অথচ তখন পর্যন্ত জুমআ ফরয হয়নি এবং এর আহ্‌কামও নাযিল হয়নি। যার প্রমাণ মেলে মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়েত থেকে। সুতরাং এ ঘটনাটি দলীলযোগ্য নয়। (مصنف ابن عبد الرزاق ج ٣ ص ١٥٩-١٦٠)

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ বনু সালিম মহল্লা মূলতঃ মদীনা তায়্যিবার এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সেখানে জুমআ পড়া মদীনা তায়্যিবায জুমআ পড়ার হুকুম।

(اثر السنن ص ২৩২)

পঞ্চম দলীলের জবাবঃ “جمعوا حيث كنتم” আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, “حيث”

“حيثُ كُنْتُمْ مِنَ الْأَمْصَارِ”-এর অর্থ হচ্ছে- “তোমরা যেকোন শহরেই থাক

না কেন। সুতরাং, এখানে “حيثُ” শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়। কেননা এটি যদি

ব্যাপকের অর্থ দেয়, তাহলে জনবসতিহীন ময়দানেও জুমআর নামায জায়েয হওয়া উচিত। অথচ ময়দানে জুমআ জায়েয না হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। তাছাড়া ইমাম শাফেঈ (রহ.) যদিও جمعوا حيث كنتم-এর ব্যাখ্যায় বলেন,

كُنْتُمْ جَمَعُوا فِي أَيِّ قَرْيَةٍ كُنْتُمْ অর্থাৎ যেকোন গ্রামেই থাক না কেন তোমরা জুমআ আদায়

কর। অথচ তাঁর নিকটও প্রত্যেক গ্রামে জুমআ জায়েয নয়। কেননা তিনিও শর্ত দেন

যে, ঐ গ্রামে জুমআ জায়েয যেখানে কমপক্ষে চল্লিশজন পুরুষ রয়েছে। কোন কোন

রেওয়ায়েতে আছে, চল্লিশটি পরিবার হওয়া শর্ত। অতএব, এর দ্বারা স্ববিবোধী

বক্তব্য প্রমাণিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীসের পুরো ঘটনা হল এই, হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)-এর স্থলে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা সেখান থেকে হযরত উমর (রাঃ)-কে পত্র লিখেছিলেন যে, এখানে আমরা জুমআ আদায় করব কিনা। উল্লেখ্য যে, যেখানে গভর্নর নিযুক্ত আছে, সেখানে জুমআ না পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তাই হযরত উমর (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন-
 ”جمعوا حيث ما كنتم“ যার মর্মার্থ এই যে, তোমরা শহরের যেখানেই থাক না কেন, জুমআ আদায় কর। অতএব, যারা ময়দানে-জঙ্গলে, বস্তিতে অথবা অজপাড়াগায়ে জুমআ পড়ার উপর যে প্রমাণ পেশ করে থাকে, তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ যদি জুমআ আদায় করার ক্ষেত্রে এতটা ব্যাপকতা থাকত তাহলে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক এই প্রশ্নের কোন অর্থই ছিল না। সুতরাং এমন প্রশ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সব জায়গায় জুমআ জায়েয মনে করতেন না।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٢٧٧)

بابُ وَقْتُ الْجُمُعَةِ ص ১০০ : জুমআর নামাযের সময়

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ— (بخاري ج ١ ص ١٢٣ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ترمذي ج ١ ص ١١٢)
 باب في وقت الجمعة

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর জুমআর নামায আদায় করতেন।

বিশ্লেষণঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পূর্বে জুমআর নামায আদায় করা জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আহলে যাহির এবং শাওকানীর (রহ.) মতে, জুমআর নামায সূর্য হেলার পূর্বেও আদায় করা জায়েয আছে। (الار السنن ص ২৫২)

... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ— (ابو داود (১) দলীল

ج ١ ص ١٥٥، بخاري ج ١ ص ١٢٨ باب قول الله فإذا قضيت الصلوة الخ، مسلم ج ١ ص ২৮৩ فضل في

وقت صلوة الجمعة، ترمذي ج ١ ص ١١٨ باب في القاعة يوم الجمعة، ابن ماجة ص ৭৮)

অর্থঃ, ... সাহল ইবন সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমআর নামায আদায়ের পরে দিনের প্রথমাংশের খানা খেয়ে ‘কায়লুলা’ (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণের কারণ হল, আরবী ভাষায় “غداً” ঐ খাদ্যকে বলা হয়, যা সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে খাওয়া হয়। আর কায়লূলা বলা হয় দুপুরের শোয়াকে। তাই সাহাবায়ে কিরামগণ যেহেতু এই উভয় কাজটি জুমআর পরে করতেন, সুতরাং বুঝা যায় যে, তাঁরা জুমআ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করতেন।

দলীল (২): কোন কোন হাদীসে জুমআকে ঈদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ঈদের নামাযের সময় হল সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে। সুতরাং জুমআর নামাযও ঐ সময় আদায় করা জায়েয আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফিঈ, মালিক (রহ.) ও জমহুরের মতে-
জুমআর সময় হল, যুহরের নামাযের সময়। অর্থাৎ, যুহরের নামায যেমন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা জায়েয নয়, তেমনিভাবে জুমআর নামাযও জায়েয নয়। (درس مشکوٰۃ ২ ج ص ১৩০)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন-

كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - (مسلم ج ১ ص ২৮৩)
অর্থাৎ, সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে যেত, তখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে জুমআ আদায় করতাম।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যেহেতু খুব সকালেই মসজিদে চলে যেতেন, তাই তাঁরা নাস্তা এবং কায়লূলা করার সময় ও সুযোগ পেতেন না। তাই তাঁরা জুমআ পরে এ দুইটি কাজের আঞ্জাম দিতেন। সুতরাং নাস্তা এবং কায়লূলাকে স্বীয় সময় থেকে দেবী করার অর্থ এই নয় যে, জুমআ সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করতেন। কেননা যদি তা মেনে নেয়া হয়, তাহলে অন্যান্য অনেক হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

(২) যদিও “غداً” শব্দটি আরবী ভাষায় সে খানাকে বলে, যা সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্য হেলার আগে আগে খাওয়া হয়, কিন্তু কেউ যদি দুপুরের খানা সূর্য হেলার পরে খায়, তারপরেও একে রূপকার্থে “غداً” বলা হবে। হাদীসেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, নবী করীম (সাঃ) সেহেরীর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন-

... عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّحُورِ فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ - (ابو داود ج ١ ص ٣٢٠ باب من سمي السحور الغداء، نسائي ج ١ ص ٣٠٤ باب دعوة السحور)

অর্থাৎ, ... আল-ইরবায় ইবন সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে রমযান মাসে সাহরীর সময় আহ্বান করেন এবং বলেন, কল্যাণময় সকালের খাবারের দিকে (সাহরীর দিকে) সত্ত্বর আগমন কর। এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা কারো মতেই জায়েয নয় যে, সূর্যোদয়ের পর সেহেরী খাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ “জুমআকে ঈদ বলা”-এর ব্যাখ্যা হল, কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে তুলনা দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সকল দিক থেকে তার অনুরূপ হতে হবে; বরং অল্প কোন সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেও তুলনা দেয়া যেতে পারে। যেমন, সাদী বাঘের মত। এর অর্থ এই নয় যে, সাদীর বাঘের মত চারটি পা, একটি লেজ এবং সারা শরীর ডোরাকাটা দাগ থাকতে হবে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাঘের গায়ে যেমন প্রচণ্ড শক্তি আছে, তেমনিভাবে সাদীর গায়েও বেশ শক্তি আছে। সুতরাং জুমআর দিনেও যেহেতু ঈদের মত সবাই একত্রিত হয় এবং খুশীর আমেজ সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তাই জুমআকে ঈদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। নতুবা যদি সকল হুকুমের দিক থেকেই এক হওয়া অপরিহার্য হত, তাহলে ঈদের দিনের মত জুমআর দিনও রোযা রাখা হারাম হত এবং জুমআর খুতবা নামাযের পরে হত এবং ঈদগাহে জুমআর আগে ও পরে নফল পড়া মাকরুহ হত। অথচ এই সকল আহকাম জুমআতে নেই। এতে বুঝা গেল যে, জুমআ ও ঈদ এক নয়। এবং এ দুইয়ের সময়ও ভিন্ন। (درس مشکوة ج ٢ ص ١٣٦)

بَابُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ص ١٥٩

ইমামের খুতবা দেয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করলে

... عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتُ يَا فُلَانٌ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَأَرْكَعْ - (بخاري ج ١ ص ١٥٦ باب التطوع مثلي مثلي، مسلم ج ١ ص ٢٨٧ فضل من دخل المسجد الخ، ترمذي ج ١ ص ١١٤ باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب، نسائي ج ١ ص ٢٠٨ مخاطبة الامام الخ، ابن ماجه ص ٧٩)

অনুবাদঃ ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর খুতবা দানকালে সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন। তিনি (সাঃ) তাঁকে বলেন, হে অমুক! তুমি কি নামায পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে নাও।

বিশ্লেষণঃ জুমআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) নামায পড়বে, নাকি চুপচাপ বসে যাবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, জুমআর খুতবা চলাকালে আগন্তুক ব্যক্তির জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়া মুত্তাহাব।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْعُظْفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَحْوَزُ فِيهِمَا-

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুতবা দানকালে সেখানে সুলাইক আল-গাতফানী (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেনঃ তুমি কি কিছু (নামায) পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে নাও। (সূত্রঃ ঐ) উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, খুতবা দেয়ার সময় সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায পড়া জায়েয আছে। নতুবা নবী করীম (সাঃ) নামাযের জন্য হুকুম দিতেন না।

দলীল (৩)ঃ হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর একটি বাচনিক (কাওলী) হাদীস-
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- (بخاري ج ١ ص ١٥٦، مسلم ج ١ ص ٢٨٧، ابو داود ج ١ ص ١٥٩)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুতবা প্রদানকালে ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ খুতবা চলাকালে অথবা ইমামের বেরিয়ে আসার পর উপস্থিত হয়, তবে সে যেন দু'রাকাত নামায আদায় করে নেয়।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, জুমআর খুতবা চলাকালে কোন প্রকার কথাবার্তা বলা বা নামায পড়া জায়েয নয়। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেরীর মাহাবও এটাই। (شرح مسلم ج ١ ص ٢٨٧، مغلي ج ١ ص ١٦٥)

দলীল (১): **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** - আল্লাহ তাআলার বাণী-

অর্থাৎ, আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা কান লাগিয়ে শোন এবং নিশ্চুপ থাক। (আরাফঃ ২০৪)

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শাফেঈগণ তো এই আয়াতটিকে শুধু জুমআর খুতবার সাথে নির্দিষ্ট করে থাকেন। অবশ্য হানাফীগণ প্রমাণ করেছিল যে, এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল নামায সম্পর্কে, কিন্তু এর ব্যাপকতায় খুতবাও অনেকটা শামিল। কেননা, খুতবাতে কুরআনের অনেক আয়াত পাঠ করা হয়। অতএব, বলা যায় যে, যেখানে খুতবা শোনা ওয়াজিব এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া মুস্তাহাব, সেক্ষেত্রে একটি মুস্তাহাব আদায়ের জন্য ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে?

দলীল (২): **... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ**

أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ - (ابو داود ج ১ ص ১০৮ باب الكلام والامام يخطب، مسلم

ج ১ ص ২৮১ فضل في عدم ثواب من تكلم الخ، ترمذي ج ১ ص ১১৬ باب كراهية الكلام الخ، نسائي ج ১

ص ২০৮ باب الانصات للخطبة الخ، ابن ماجه ص ৭৭)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ ইমামের খুতবা দেয়ার সময় যদি তুমি কাউকে চুপ থাকতেও বল, তবে তুমি বেহুদা কাজ করলে।

উক্ত হাদীসেও দেখা যাচ্ছে যে, খুতবা চলাকালে সৎ কাজের আদেশ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ সৎ কাজের আদেশ করা ফরয। আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ মুস্তাহাব। সুতরাং, এ সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ অকাট্যভাবেই নিষিদ্ধ হবে।

দলীল (৩): মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হযরত নুবাইশা হুযালী (রাঃ)-এর হাদীস-

... وَإِنْ وَجِدَ الْإِمَامُ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ

الخ - (مجمع الزوائد ج ২ ص ১৭১)

অর্থাৎ, ... আর ইমামকে যদি বেরিয়ে আসা অবস্থায় পায়, তখন সেখানে বসে যাবে। অতঃপর গভীরভাবে শুনবে এবং নীরব থাকবে। যতক্ষণ না ইমাম তার জুমআ শেষ করবে।

উক্ত হাদীসে পরীক্ষারভাবে বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হবে, তখন চুপ করে বসে যাওয়া এবং খুতবা শোনা উচিত।

দলীল (৪): আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে এক মারফু হাদীস-

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ— (مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٨٤)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন ইমামের মিম্বরে অবস্থিত অবস্থায় তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন কোন নামায নেই, কথাও নেই, যতক্ষণ না ইমাম (জুমআ থেকে) অবসর হবেন।

দলীল (৫): সুলাইক ইবন হুদবা আল-গাতফানী (রাঃ)-এর ঘটনা ব্যতীত নবী করীম (সাঃ) থেকে আর কোথাও এ বিষয়টি প্রমাণিত নেই যে, তিনি খুতবার মাঝখানে আগত ব্যক্তিকে নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন।

আরো দেখা যায় যে, এক বেদুইন দুর্ভিক্ষের অভিযোগ নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসেছিল। অতঃপর এক সপ্তাহ পরে আবার প্রবল বৃষ্টির অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। আর এই দুই ঘটনাতে লোকটি খুতবার মাঝখানে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাঁকে নামাযের নির্দেশ দেননি।

(بخاري ج ١ ص ١٣٧ باب الاستئناء في المسجد الجامع)

তাছাড়া আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর খুতবার মাঝখানে হযরত উসমান (রাঃ) তাশরীফ আনলে, উমর (রাঃ) উসমান (রাঃ)-কে মসজিদে বিলম্ব পৌঁছা ও গোসল না করার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু নামাযের নির্দেশ দেননি। (مسلم ج ١ ص ٢٨٠ باب في الاغتسال في يوم الجمعة)

সুতরাং এই সমস্ত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, খুতবার মাঝখানে কোন নামায পড়া জায়েয নয়।

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত সুলাইক ইবন হুদবা আল-গাতফানী (রাঃ)-এর বিষয়টি ছিল খাস। এ বিশেষ ঘটনাটিকে ব্যাপক মূলনীতির বিপরীতে পেশ করা যায় না। যার বিস্তারিত বিবরণ হল- একবার নবী করীম (সাঃ) খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করলেন। কিন্তু তখনো খুতবা শুরু করেননি। এমতাবস্থায় সুলাইক ইবন হুদবা নামক এক সাহাবী খুবই জীর্ণশীর্ণ পুরনো পোশাক পরিধান করে মসজিদে প্রবেশ করেন। (ترمذي ج ١ ص ٩٣، نسائي ج ١ ص ٢٠٨)

তাঁর এই দুরবস্থা অন্যান্য সাহাবীদেরকে দেখানোর জন্য নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার হুকুম দিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নামাযে ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) নীরব ছিলেন, খুতবা আরম্ভ করেননি। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

أَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ - (মসনদ ابن ابی شیبہ ج ২ ص ১১০)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) তার এ দু'রাকাত থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত খুতবা থেকে বিরত থাকেন।

অতঃপর তিনি (সাঃ) আগন্তুককে দান করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে উদ্বুদ্ধ করেন।

وَحَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ -

فَالْقَوْمُ ثِيَابَهُمُ الْخ - (নসائی ১ জ ২০৮ باب حث الامام على الصدقة)

অর্থাৎ, এবং নবী করীম (সাঃ) লোকজনকে সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তাঁরা তাঁদের কাপড় নিষ্ক্ষেপ (দান) করলেন।

(২) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সুলাইক (রাঃ) যখন আসেন, নবী করীম (সাঃ) তখনো খুতবা আরম্ভ করেননি। যেমন হাদীসে এসেছে-

جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ - (মসল ১ জ ২৮৭)

অর্থাৎ, সুলাইক আল-গাতফানী (রাঃ) জুমআর দিন এমন সময় উপস্থিত হয়েছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিন্বরের উপর বসা ছিলেন।

এটা জানা কথা যে, নবী করীম (সাঃ) সর্বদা দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসে বসে থাকার উদ্দেশ্য হল, তিনি তখনো খুতবা শুরু করেননি।

(معارف السنن ج ৪ ص ৩৭০-৩৭১)

(৩) হাদীসে বর্ণিত আছে, "قُمْ فَارْكَعْ" (তুমি দাঁড়াও, অতঃপর নামায পড়)।

উল্লিখিত শব্দদ্বয় হতে বুঝা যায় যে, হযরত সুলাইক (রাঃ) মসজিদে এসে বসে পড়েছিলেন। নতুবা তিনি (সাঃ) তাঁকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিতেন না। তাছাড়া সহীহ মুসলিমে তো এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট উল্লেখ আছে-

فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْخ - (মসল ১ জ ২৮৭)

অর্থাৎ, অতঃপর সুলাইক নামায পড়ার পূর্বেই বসে গেছেন।

আর স্পষ্ট বিষয় হল, শাফেঈদের মতে বসার পর তাহিয়াতুল মসজিদের সুযোগ থাকে না।

তৃতীয় দলীল তথা বাচনিক হাদীসের জবাবঃ আসলে উক্ত হাদীসটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ দ্বারা উদ্দেশ্য হল - يُرِيدُ الْإِمَامُ أَنْ

كَادَ الْإِمَامُ أَنْ يُخْطَبَ- (ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য মনস্থ করেন) অথবা- يُخْطَبُ- (ইমাম যখন খুতবা দেয়ার নিকটবর্তী হন)।

তাছাড়া আরো বেশ কিছু কারণে হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার রেওয়াজেতসমূহ প্রাধান্য পাবে। যেমন-

ক. শাফেঈদের হাদীস দ্বারা নামাযের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে হানাফীদের কুরআন ও হাদীস দ্বারা নামায পড়া হারাম সাব্যস্ত হয়। আর নিয়ম হল, হারাম ও বৈধতার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলে হারাম প্রাধান্য পাবে।

খ. নিষেধাজ্ঞার রেওয়াজেতগুলো কুরআন কর্তৃক সমর্থিত।

গ. এগুলো সাহাবা ও তাবেঈগণের আমল দ্বারা সমর্থিত।

(مسلم ج ١ ص ٢٨٧، مصنف ابن أبي شيبة ج ٢ ص ١١١، شرح معاني الآثار ج ١ ص ١٧٨-١٨١)

সর্বোপরি বলা যায় যে, আহনাফদের বর্ণিত অভিমতে সতর্কতা বেশি। কেননা তাহিয়্যাতুল মসজিদ কারো মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা ছেড়ে দেয়াতে কারো মতেই গুনাহের আশংকা নেই। পক্ষান্তরে নামায পড়া ও কথা বলা নিষেধের হাদীসগুলো পরিহার করলে গুনাহের আশংকা রয়েছে।

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ص ١٥٩

যে ব্যক্তি জুমআর নামাযের এক রাকাত পায়

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ- (بخاري ج ١ ص ٨٢ باب من ادرك من الصلوة، مسلم ج ١ ص ٢٢١، ترمذي

ج ١ ص ١١٨ باب من يدرك من الجمعة ركعة/ ٤٥، نسائي ج ١ ص ٩٠ من ادرك الخ، ابن ماجه ص ٨٠)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল, সে যেন সম্পূর্ণ নামায পেল।

বিশ্লেষণঃ ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, লাইস (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর এক মত অনুসারে, যদি কোন ব্যক্তি জুমআর পুরো এক রাকাত ইমামের সাথে না পায় অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় রাকাতের রুকু'র পরে এসে নামাযে শরীক হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর যুহরের চার রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব। (تنظيم ج ١ ص ٤٦٥)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। অতএব, উক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায়, যে ব্যক্তি এক রাকাতও পায়নি, সে যেন নামাযই পেল না।

দলীল (২): নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَوةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ- (نسائي ج ١ ص ٢١٠ باب من ادرك ركعة الخ)

অর্থাৎ, যে জুমআর নামাযের এক রাকাত পেল সে জুমআ পেল।

উক্ত হাদীসে সরাসরি জুমআর কথা উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, ইবরাহীম নাখঈ, দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, যদি কোন ব্যক্তি সালামের পূর্ব মুহূর্তেও ইমামের সাথে শরীক হয়, তবুও ঐ ব্যক্তি জুমআর দুই রাকাত নামাযই আদায় করবে। যুহরের চার রাকাত আদায় করবে না।

(بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٦٧)

দলীল (১): হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফু হাদীস। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا- (بخاري ج ١ ص ١٢٤ باب المشي الى الجمعة)

অর্থাৎ, তোমরা যখন নামাযে উপস্থিত হও তখন অবশ্যই ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। যতটুকু পাও তা আদায় কর, আর যতটুকু বাদ পড়েছে তা পূর্ণ কর।

দলীল (২): ইবন আবী শায়বা কিতাবে ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত-

مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ- (تنظيم ج ١ ص ٤٦٥)

অর্থাৎ, যে তাশাহুদ পেল, সে নামায পেল।

উপরোল্লিখিত হাদীস দুটিতে জুমআ অথবা অন্য কোন নামাযের বিশ্লেষণ নেই। এতে বুঝা যায় যে, সালামের পূর্বেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারলে না পাওয়া দুই রাকাত জুমআর নামায আদায় করলে জুমআ আদায় হয়ে যাবে। চার রাকাত যুহর পড়তে হবে না।

দলীল (৩): হযরত মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত-

إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ-

অর্থাৎ, যদি কেউ জুমআর নামাযে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় শামিল হয়, তাহলেও সে জুমআ পেয়ে গেল। (সূত্রঃ ঐ)

উক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে জুমআর কথা উল্লেখ রয়েছে।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবঃ

(১) হানাফীগণ বলেন, তিন ইমাম যে দলীল পেশ করেছেন, তা আমাদের বিপরীত নয়। কেননা আমরাও বলি, যে ব্যক্তি এক রাকাত পেল, সে জুমআ পেয়ে যাবে। বাকী কথা হল, এর চেয়ে কম পেলে জুমআ পাওয়া যাবে কিনা, এ ব্যাপারে উক্ত হাদীসে কিছু বলা হয়নি। আর অন্যান্য হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সালামের পূর্বে ইমামের সাথে শরীক হলেও জুমআ পাওয়া যাবে।

(২) এখানে **مُخَالَفٍ** তথা বিপরীত অর্থ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর হানাফীদের নিকট ইহা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার উপর কেউই আমল করে না। কারণ, হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ এ কথাই প্রমাণ করে যে, শুধু এক রাকাত নামায যে পাবে, পূর্ণ নামায সে পেয়ে যাবে। যার দাবি হল এই যে, দ্বিতীয় রাকাত পড়ার প্রয়োজন নেই। অথচ এর উপর কেউ আমল করে না।

সুতরাং হাদীসে বর্ণিত **الصَّلَاةُ** দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নামাযের ফযীলত পেয়ে যাবে। (درس ترمذي ج ২ ص ৩০১-৩০২)

১৬১ : **بَابُ صَلَاةِ الْعَبْدَيْنِ** দুই ঈদের নামায

... عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ—

অনুবাদঃ ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দুটি দিন (নায়মুক ও মিহিরজান) খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, এই দুটি দিন কিসের? তারা বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুটি দিনে খেলাধুলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই দুটি দিনের বিনিময়ে অন্য দুটি উত্তম দিন দান করেছেন। আর তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন।

বিশ্লেষণঃ ঈদের নামায সুন্নতে মুআক্কাদা নাকি ওয়াজিব- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ (রহ.) ও সাহেবাইনের মতে, ঈদের নামায সুন্নতে মুআক্কাদাহ। আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি অভিমতও তাই। (১০৭৮ ২৮ ১০৭৮) (تعلیق الصبیح ج ২ ص ১০৭৮)
দলীলঃ বেদুঈনের প্রসিদ্ধ হাদীস-

... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ الْخ (ابو داود ج ১ ص ১০৭৮ باب فرض الصلوة)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তাছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ না, তবে যদি তুমি অতিরিক্ত (নফল) কিছু আদায় কর।

সুতরাং বুঝা গেল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত সকল নামায নফলের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল (২)ঃ ঈদের নামাযে যেহেতু আযান এবং ইকামত নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামায, জানাযার নামাযের মত ফরযে কিফায়াহ।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَصَلْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- অর্থাৎ, অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। (কাওসারঃ ২)

উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা ওয়াজিব (ফরয) প্রমাণিত হয়। আর বেদুঈনের প্রসিদ্ধ হাদীসটির দ্বারা নফল প্রমাণিত হয়। সুতরাং দুই অবস্থার মাঝখানে ফরযে কিফায়াহর বিধান নির্ধারণ করাই সমীচীন। (تنظيم ج ১ ص ১৭২)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, ঈদের নামায ওয়াজিব এবং এর উপরই ফাতওয়া। (فتح الملم ج ২ ص ১২৩)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- فَصَلْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- প্রসিদ্ধ তাফসীর অনুযায়ী এতে صَلْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- “صَلَّ صَلَاةَ الْعِيدِ” অর্থাৎ আপনি ঈদের নামায আদায় করুন। (معارف السنن ج ১ ص ১২৬، روح المعاني ج ৩ ص ২৮৪)

সুতরাং উক্ত আয়াতে যেহেতু ঈদের নামাযের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই ইহা ওয়াজিব।

দলীল (২)ঃ মুতাওয়াতিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সাঃ) ঈদের নামায নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করেছেন, কখনো তরক করেননি। যেমন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْخ (نسائي ج ١ ص ٢٣٣ استقبال الامام بالناس الخ)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে বেরিয়ে আসতেন, সেখানে লোকজনদের নিয়ে নামায পড়তেন।

দলীল (৩): সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে আজ অবধি এর উপর আমল অব্যাহত থাকাও ইহা ওয়াজিব হওয়ার দলীল।

দলীল (৪): আল্লাহ তাআলার বাণী- وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ- অর্থাৎ, তোমাদের হেদায়েত দান করার কারণে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। (বাকারাঃ ১৮৫) কতিপয় আলেম বলেন, উক্ত আয়াতটি ঈদুল ফিতরের নামাযেরই প্রত্যয়ন করে। কেননা, এই আয়াতটি রোযার আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। আর আয়াতে যেহেতু নির্দেশের (আমর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামায ওয়াজিব। সূরা হজেজ ৩৭ নং আয়াতেও এর ইঙ্গিত রয়েছে যার দ্বারা ঈদুল আযহার নামায ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ মেলে। (درس ترمذي ج ٢ ص ٣٠٧)

জবাবঃ বেদুঈনের হাদীসের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

- (১) উক্ত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যখন ঈদের হুকুম নাযিল হয়নি।
- (২) অথবা, হাদীসে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত ফরযসমূহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। আর ঈদের নামায তো ফরয নয়; বরং ওয়াজিব।
- (৩) অথবা, কোন বিষয় অনুল্লেখের দ্বারা ইহা ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয় না।
- (৪) বেদুঈনের উপর তো ঈদের নামায ওয়াজিব নয়, তাই তা উল্লেখ করা হয়নি।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আযান এবং ইকামত শুধু ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর দুই ঈদের নামায ফরয নয়, বরং ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ তাঁর প্রদত্ত নিজস্ব অভিমতটি বিলকুল অগ্রহণযোগ্য। কারণ, ইহা প্রকাশ্য দলীলের বিপরীত। কেননা, যে বিষয়টি দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, তা কিভাবে ফরযে কিফায়াহ সাব্যস্ত হতে পারে? (تنظيم ج ١ ص ٤٧٢)

بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ص ১৬৩

ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأَوَّلَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا- (ترمذي ج ১ ص ১২০ باب التكبير في العيدين، ابن ماجه ص ৭২)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার প্রথম রাকাতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন।

বিশ্লেষণঃ উভয় ঈদে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি বলা হবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদেই অতিরিক্ত তাকবীর হল ১১টি। ৬ তাকবীর প্রথম রাকাতে। (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত) অপর ৫টি তাকবীর দ্বিতীয় রাকাতে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদেই অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে ১২টি। ৭টি প্রথম রাকাতে (তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত) আর ৫টি দ্বিতীয় রাকাতে।

তবে মালিকী এবং শাফেঈগণ এ কথার উপর একমত যে, উভয় রাকাতেই তাকবীরগুলো হবে কেরাতের পূর্বে। উভয় ইমামের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শাফেঈগণ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীতই সাতটি তাকবীরের দাবিদার। আর মালিকীগণ তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি তাকবীরের দাবিদার।

উমর ইবন আব্দুল আযীয, যুহরী (রহ.), আয়িশা, আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবন সাবেত, আবু আইউব ও আলী (রাঃ)-এর অভিমতও তাই। (بذل المجهود ج ২ ص ২০৬)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأَوَّلَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ الْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهِمَا- (ابو داود ج ১ ص ১৬৩)

অর্থাৎ, ... আমার ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর এবং উভয় রাকাতে তাকবীরের পরে কেরাত পাঠ করতে হবে।

... عَنْ كَبِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ - (ترمذي ج ١ ص ١١٩-١٢٠، ابن ماجه ص ٩٢)

অর্থাৎ, ... কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ-এর দাদা থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) দুই ঈদে প্রথম রাকাতে কেরাতে পূর্বে সাত তাকবীর দিয়েছেন। আর শেষ রাকাতে কেরাতে পূর্বে দিয়েছেন পাঁচ তাকবীর।

* ইমাম আবু হানিফা এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, উভয় ঈদেই অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে ৬টি। ৩টি হচ্ছে প্রথম রাকাতে কেরাতে পূর্বে। আর বাকি ৩টি দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতে পরে। ইবন মাসউদ, আবু মূসা আশআরী ও আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) সহ প্রমুখের অভিমতও অনুরূপ।

(تنظيم ج ١ ص ٤٧٥، درس ترمذي ج ٢ ص ٣١٣، درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ١٤٣)

... عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحَذِيفَةَ بْنَ الْيَمَانَ (١) : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حَذِيفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أَكْبَرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ - (ابو داود ج ١ ص ١٦٣)

অর্থাৎ, ... সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আবু মূসা আল আশআরী (রাঃ)-কে এবং হুযায়ফা ইবনুল যামান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার তাকবীর কিরূপে আদায় করতেন? আবু মূসা (রাঃ) বলেন, তিনি জানাযার নামাযের (ন্যায়) চার তাকবীর আদায় করতেন। (অর্থাৎ তিনি জানাযার নামাযের অনুরূপ ঈদের নামাযেও প্রতি রাকাতে চারটি তাকবীর বলতেন এবং তা তাহরীমা ও রুকু তাকবীর সহ)। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আবু মূসা আল-আশআরী (রাঃ) সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বসরার আমীর থাকাকালে এইরূপ তাকবীর দিয়েছি।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর ছয়টি। তিনটি তাকবীর প্রথম রাকাতে কেরাতে পূর্বে এবং অপর তিনটি তাকবীর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতে পরে। আর উপরোল্লিখিত হাদীসটি দুটি হাদীসের স্থলাভিষিক্ত। কেননা এখানে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর কথাকে সত্যায়নের উল্লেখ রয়েছে।

দলীল (২): তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ لَا تَنْسُوا كَثِيرَ الْجَنَائِزِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ— (تلظيم الاشتات ج ١ ص ٤٧٦، درس مشکوة ج ٢ ص ١٤٣)

অর্থাৎ, কাসিম ইবন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর কতক সাহাবী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ঈদের নামায পড়ালেন, তাতে তিনি চার চারটি করে তাকবীর বললেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা ভুলে যেও না (ঈদের নামাযের তাকবীর হল) জানাযার তাকবীরের ন্যায়। (এই বলে) তিনি তাঁর আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে নিলেন।

উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) কথা ও কর্মের দ্বারা ইশারা করেছেন যে, ঈদের তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা এবং রুকূর তাকবীর সহ প্রতি রাকাতে চারটি করে। সুতরাং অতিরিক্ত তাকবীর হল মোট ৬টি।

দলীল (৩): হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় দুই ঈদে অতিরিক্ত ৬টি করে তাকবীর হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (شرح معاني الآثار ج ١ ص ٢٣٩)

জবাবঃ (১) শাফেঈ ও অন্যান্য মনীযীবন্দ তাঁদের পক্ষে যেসব হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, সেগুলো যাচাই করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম এগুলোকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এগুলোতে কতক রেওয়ায়েত ও রাবী এমন রয়েছে যারা খুবই যঈফ। যেমন সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম হাদীসে ইবন লাহীআ, দ্বিতীয় হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান এবং তৃতীয় হাদীসে কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ নামক রাবী রয়েছেন। যাদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অভাবনীয় নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। যেমন তাদের কারো কারো সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, “মিথ্যার একটি স্তম্ভ”। আবু দাউদ (রহ.) বলেন, “বড় মিথ্যক”। নাসায়ী ও দারা কুতনী (রহ.) বলেন, “তার (কাসীর ইবন আব্দুল্লাহর) হাদীস বর্জনীয়। আহমদ (রহ.) বলেন, “তার হাদীস মুনকার”। ইবন মাজীন (রহ.) বলেন, “তিনি (আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান) যঈফ। নাসায়ী (রহ.) বলেন, “তিনি মজবুত রাবী নন।” এমনিভাবে ইবন লাহীআ-এ সম্পর্কে এরূপ অনেক নেতিবাচক মন্তব্য রয়েছে। তাই এসকল হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

(سنن الكبرى للبيهقي ج ٣ ص ٢٨٥، معارف السنن ج ٤ ص ٤٣٦، ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٤٥٢)

(২) হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় এর বিপরীত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা এ সকল হাদীস রহিত হয়ে যায়। প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লামা ইবন রুশদ “বিদায়াতুল মুজতাহিদ”-এ লিখেছেন যে, ঈদের তাকবীর সংখ্যার ব্যাপারে কোন মারফু হাদীস বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর উক্তিটি বর্ণনা করেছেন-

لَيْسَ يَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ - (بذل المجهود ج ২ ص ২০৭-২০৮)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) থেকে দুই ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই।

যার ফলে বিভিন্ন সাহাবাদের বিভিন্ন আমলের কারণে এরকম মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। তবে একথা সত্য যে, নামায সর্বাবস্থায় আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এই মতানৈক্যটি উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে। তাই ফুকাহায়ে কিরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, যদি ইমাম ৬-১৩ পর্যন্ত তাকবীর বলেন, তাহলে তা অনুসরণ করা মুক্তাদীর উপর আবশ্যিক হবে। বরং কারো কারো মতে ১৬ তাকবীর পর্যন্ত অনুসরণের অবকাশ রয়েছে। তবে এর বেশি অনুসরণ করা যাবে না। (فتح القدير ج ১ ص ২৮৮)

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ ص ১৬৬

ঈদের নামাযের পর অন্য নামায

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا - (بخاري ج ১ ص ১৩৫ باب الصلوة قبل العيد وبعدها، مسلم ج ১ ص ২৮৯ فضل في الصلوة قبل الخطبة الخ، ترمذي ج ১ ص ১২০ باب لا صلوة قبل العيدين ولا بعدها، نسائي ج ১ ص ২৩৫ الصلوة قبل العيدين وبعدها، ابن ماجة ص ৭৩)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়ে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন। তিনি তার আগে বা পরে কোন নামায আদায় করেননি। অতঃপর তিনি বিলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন। মহিলাগণ তাদের কানের দুল ও গলার হার দান-খয়রাত করেন।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, উভয় নামাযের পূর্বে ও পরে কোন সুন্নত নামায নেই। তবে ঈদের পূর্বে এবং পরে নফল নামায পড়া জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যা সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে চলে আসছে-

* ইমাম আহমদ, যুহরী ও ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরে নফল নামায পড়া সাধারণত মাকরুহ। (১১১৬ জ ১) (معارف السنن ج ১ ص ১১১৬)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরে ঈদগাহে নফল নামায পড়া সাধারণভাবে মাকরুহ।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরেও নফল নামায পড়া সাধারণভাবে জায়েয। অবশ্য তিনি ইমামের ক্ষেত্রে মাকরুহ হওয়ার প্রবক্তা।

(معارف السنن ج ১ ص ১১১৬)

* হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামাযের পরে মাকরুহ, কিন্তু পূর্বে নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওয়াঈ (রহ.) ও অন্যান্য কূফাবাসীর মতে, ঈদের পূর্বে মাকরুহ, পরে নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এক্ষেত্রে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেন, ঈদের পরে নিজ গৃহে মাকরুহ নয়, ঈদগাহে মাকরুহ। (فتح الملهم ج ২ ص ১৩৩, بطل المجهود ج ২ ص ২১১)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ - (ابن ماجه ص ১৭২)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের পূর্বে কোন নামায আদায় করতেন না। তবে ঘরে প্রত্যাবর্তনের পর দু'রাকাত নামায আদায় করতেন।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর আমল বর্ণিত আছে-

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعًا - (مصنف ابن أبي شيبة ج ২ ص ১৭৭)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ যখন ঈদের দিন প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তাঁর ঘরে চার রাকাত আদায় করতেন।

দলীল (৩)ঃ আবু মাসউদ (রাঃ)-এর আছার-

لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الصَّلَاةُ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ - (مجمع الزوائد ج ২ ص ২০২)

অর্থাৎ, ঈদের দিন ইমামের বের হওয়ার পূর্বে কোন সুন্নত নেই।

জবাবঃ যে সকল রেওয়াজেতে ঈদের পূর্বে নামায পড়া নিষেধ বর্ণিত আছে, সেগুলো তো হানাফী ও অন্যান্যদের বিপরীত নয়। কেননা তাঁরাও বলেন যে, ঈদের নামাযের পূর্বে নামায নিষেধ। কিন্তু যে সকল রেওয়াজেতে ঈদের পরে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হল, ঈদের পরে ঈদগাহে যেন নামায না পড়ে। আর এটাই হানাফীদের অভিমত।

* আর শাফেঈ ও হাসান বসরী (রহ.) কিয়াস ও মাওকুফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে যে মত দিয়েছেন তা মারফু হাদীসের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

(معارف السنن ج ٤ ص ٤٤٤، تنظيم ج ١ ص ٤٧٣)

بَابُ مَتَى يَقْصُرُ الْمَسَافِرُ ص ١٧٠

মুসাফির কখন নামায কসর পড়বে

... عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمَّانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ شُعْبَةَ شَاكٍ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ - (مسلم ج ١ ص ٢٤٧ صلوة المسافرين وقصرها)

অনুবাদঃ ... ইয়াহইয়া ইবন ইয়াযীদ আল-হানানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রাঃ)-কে সফরের সময় নামাযে কসর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ দূরত্ব অতিক্রম করতেন, তখন তিনি চার রাকাত ফরয নামাযের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়তেন।

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصَرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رُكْعَتَيْنِ - (ابو داود ج ١ ص ١٧٠، بخاري ج ١ ص ١٤٨)

باب يقصر اذا خرج من موضعه، مسلم ج ١ ص ٢٤٧، ترمذي ج ١ ص ١٢٢ باب التقصير في السفر، نسائي ج ١ ص ٨٣ باب صلوة العصر في السفر)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে (সফরে রওয়ানা হয়ে) মদীনাতে চার রাকাত যুহরের নামায আদায় করেছি এবং যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে আসরের নামায দুই রাকাত আদায় করি।

বিশ্লেষণঃ কতটুকু রাস্তা অতিক্রম করলে কসর (চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত) পড়া জায়েয হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* কতক আহলে যাহিরের মতে, সফরের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন নেই, বরং সাধারণ সফরেও কসর করা জায়েয। তবে, ইবন হাযিম সাধারণ সফরকে এক মাইল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (معارف السنن ج ১ ص ১৭৩)

* কোন কোন আহলে যাহিরের মতে, কসর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শুধু তিন মাইল পরিমাণ পথ অতিক্রম করাই যথেষ্ট। (فتح الهاري ج ২ ص ১৭৬)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত উভয় হাদীস। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় হাদীসে মদীনা ও যুল-হুলায়ফার কথা বর্ণিত আছে। আর যুল-হুলায়ফা মদীনা থেকে তিন মাইলের ব্যবধান।

সুতরাং উভয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিন মাইলের দূরত্বের ব্যবধানে কসর করা যাবে। (بذل المجهود ج ২ ص ২৩১)

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, ১৬ ফরসখের ব্যবধানে নামায কসর করা যাবে। উল্লেখ্য যে, এক ফরসখ=৩মাইল। সুতরাং ১৬ ফরসখ=৩x১৬=৪৮ মাইল। মোট কথা হল, শরঈ ৪৮ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে নামায কসর করা হবে। (معارف السنن ج ১ ص ১৭৩, درس مشکوة ج ২ ص ১২৭)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কমপক্ষে তিন মনযিলের সফর কসর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়। আর একদিন একরাতের দূরত্বকে এক মনযিল বলে। আর একদিন একরাত সাধারণভাবে চললে ১৬ মাইল অতিক্রম করা যায়। এ হিসেবে ৩ দিনে (৩x১৬=) ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে তার উপর কসর ওয়াজিব হবে। আর এরই ভিত্তিতে বলা যায় যে, চার ইমামের মাঝে এক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা শুধু শব্দগত, দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নয়। (فتح الملهم ج ২ ص ২০২)

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (১) :

وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ بَنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مَعَهَا - (ابو داود ج ১ ص ২৪২)

باب في المرأة تحج بغير محرم، بخاري ج ১ ص ১৪৭ باب في كم يقصر الصلوة

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মুহরিম ব্যক্তি না থাকে।

... عَنْ حُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ (২) :
عَلَى الْخَفَيْنِ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْمَقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً - (ابو داود ج ১ ص ২১ باب التوقيت

في المسح، ترمذي ج ১ ص ২৭ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم)

অর্থাৎ, ... খুযাইমা ইবন সাবিত (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঃ) ইরশাদ করেন, মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ করার নির্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের (নিজ বাড়িতে অবস্থানকারী) জন্য একদিন একরাত।

হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, সফরের সময়সীমা শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত। আর তা হল তিন দিন তিন রাত। কেননা, এর দ্বারা ব্যক্তির হুকুম ও অবস্থা পরিবর্তন হয়। (فتح الملهم ج ২ ص ২০৩)

জবাবঃ আহলে যাহিরের প্রথম দলীলের জবাবে ইমামগণ বলেন- উক্ত হাদীসে তিন মাইলের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে ‘অথবা’ (أو) বলে তিন ফারসাখের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং খোদ হাদীসেই যখন সন্দেহ, তখন তা দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ যদিও উক্ত হাদীসে ‘যুল-হুলাইয়া’ স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে। মূলতঃ নবী করীম (সাঃ) মক্কা শরীফ সফর করার ইচ্ছায় বের হন। আর পথিমধ্যে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছার পর আসরের সময় হয়ে যায়। যুল-হুলায়ফা সফরের শেষ মনযিল ছিল না, বরং তা ছিল সফরের পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থান। সুতরাং তাতে কসর পড়াতে এটা জরুরী নয় যে, সফরের দূরত্ব হল তিন মাইল। কারণ স্বীয় আবাসস্থল থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই কসর শুরু হয়ে যায়। যদিও তা এক মাইল হোক না কেন। সুতরাং উক্ত হাদীসটি দ্বারা দলীল দেয়া সহীহ নয়।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ ص ১৭০

দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা

... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ

دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا - (مسلم ج ١ ص ٢٤٦ باب جواز الجمع بين الصلوتين في السفر، ترمذي ج ١ ص ١٢٤ باب الجمع بين الصلوتين، ابن ماجة ص ٧٦)

অনুবাদঃ ... মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফরে বের হলে তিনি তখন যুহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। একদিন তিনি যুহরের নামায বিলম্ব করে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়েন। অতঃপর তিনি মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেন।

বিশ্লেষণঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে, একত্র করা দুই প্রকার।

(১) جمع حقيقي (বাস্তবে একত্রিত করা)

(২) جمع صوري (বাহ্যিক অর্থে একত্রিত করা)

جمع حقيقي হল, দুই নামাযকে একই ওয়াক্তে আদায় করা। যেমন, যুহর ও আসরকে অথবা মাগরিব ও এশাকে কোন এক ওয়াক্তে একসাথে আদায় করা।

جمع صوري হল, দুই নামাযের মধ্য থেকে একটিকে তার শেষ সময়ে এবং দ্বিতীয়টিকে তার প্রথম সময়ে আদায় করা। যেমন, যুহরকে দেরি করে একেবারে যুহরের শেষ সময়ে আদায় করা এবং আসরকে একেবারে আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা। এমনিভাবে মাগরিবকে দেরি করে একেবারে শেষ ওয়াক্তে আদায় করা এবং এশাকে আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করা। (تنظيم ج ١ ص ٤٤٣)

এই দুই প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার তথা جمع صوري সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে। কেননা, এমতাবস্থায় প্রত্যেক নামাযই নিজ নিজ সময়ে আদায় হচ্ছে, যদিও একটু পূর্বাপর করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রকার তথা جمع حقيقي জায়েয কিনা, এ নিয়ে তিন ইমামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমামত্রয়ের মতে, ওযর অবস্থায় جمع حقيقي জায়েয আছে। তবে ওযরের ব্যাখ্যায় তাঁদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর নিকট সফর এবং বৃষ্টিপাত ওযর। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর নিকট অসুস্থতাও একটি ওযর।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ - (ابو داود ج ١ ص ١٧١، مسلم ج ١ ص ٢٤٦، نسائي ج ١ ص ٩٩ الجمع بين الصلاتين في الحضر)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়াই যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেছেন।

দলীল (৩): ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَحْرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(ابو داود ج ١ ص ١٧٢، بخاري ج ١ ص ١٥٠ باب إذا ارتحل بعد الخ، مسلم ج ١ ص ٢٤٥، نسائي ج ١ ص ٩٨)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুপুরের পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের নামাযকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। তিনি (সাঃ) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে যুহরের নামায আদায়ের পর বাহনে সওয়ার হতেন।

দলীল (৪): অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

... حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَوَتَيْنِ جَمِيعًا - (ابو داود ج ١ ص ١٧٢، مسلم ج ١ ص ٢٤٦، ترمذي ج ١ ص ١٢٤)

অর্থাৎ, ... অতঃপর যখন ‘শাফাক’ বিদূরিত হল এবং তারকারাজির আলো স্পষ্ট হল, তখন তিনি (উমর রাঃ) অবতরণ করে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, **جمع حقيقي** বৈধ।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.), সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, ইবন সীরীন ও ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত আর কোথাও কোন সময়ই **جمع حقيقي** জায়েয নয়। (بذل المجهود ج ١٢ ص ٢٣٢)

দলীল (১): **إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا** -

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (নিসাঃ ১০৪)

নামায শুরু করার সময় যেমন নির্দিষ্ট রয়েছে, ঠিক তেমনি এর শেষ সময়ও নির্দিষ্ট রয়েছে। সুতরাং নামায সময়ের আগেও আদায় করা যাবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের

পরেও পড়া যাবে না। সময় যেহেতু নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তাই সুনির্দিষ্ট সময়েই তা আদায় করতে হবে।

দলীল (২): পবিত্র কুরআনের আয়াত- **فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ**

অর্থাৎ, অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর। (মাউনঃ ৪, ৫)
যদিও উক্ত আয়াতদ্বয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু যারা নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং নামাযকে যারা যথাসময়ে আদায় করে না, তারাও উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল (৩): আল্লাহ তাআলার বাণী- **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى**

অর্থাৎ, সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। (বাকারাহঃ ২৩৮)

উক্ত আয়াতে সুনির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

দলীল (৪): হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لَوْفَتْهَا إِلَّا يَجْمَعُ فَإِنَّهُ

جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - (আবু দাউদ জ ১ ص ২৬৭ باب الصلوة بجمع، بخاري ج ১ ص ২২৮)

باب متى يصلي الفجر بجمع

অর্থাৎ, ... আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোন নামায এর (জন্য নির্ধারিত) সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযের সময় সুনির্দিষ্ট। সুতরাং সময়ের বাইরে নামায শরীয়তসম্মত নয়।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবে হানাফীগণ বলেন,

(১) ঐ সকল রেওয়ায়েত যেখানে নবী করীম (সাঃ) থেকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা **جمع حقيقي** উদ্দেশ্য নয় বরং **جمع**

صوري উদ্দেশ্য। এর বিভিন্ন দলীলও রয়েছে। যেমন-

... **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ سِرْسِرَ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَبَهَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي**

صَنَعْتُ فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ - (আবু দাউদ জ ১ ص ১৭১)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াকিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর মুআযযিন নামাযের সময় আস-সালাত (নামায) শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাঁকে ডাকলে তিনি বললেন, চল, চল। অতঃপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি এশার নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলে এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন। (অর্থাৎ, তিনি তড়িঘড়ি পথ অতিক্রম করেন)

উক্ত হাদীস দ্বারা **جمع صوري** প্রমাণিত হয়। আর এমন উদাহরণ হাদীসের কিতাবসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

(২) **جمع حقيقي** অর্থ নিলে অনেক হাদীসকেই পরিত্যাগ করতে হয়। আর **جمع صوري** অর্থ নিলে সকল হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব হয়।

(৩) যে সকল হাদীসে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ রয়েছে, সে সকল প্রত্যেক হাদীসেই যুহরের সাথে আসরের কিংবা মাগরিবের সাথে এশার কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, একত্র দ্বারা **جمع صوري**-ই উদ্দেশ্য। কেননা অন্যান্য ওয়াক্তে একত্র করা সম্ভব নয়।

(৪) হানাফীদের যে সকল দলীল রয়েছে, তা সবই পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মারফু হাদীস। খবরে ওয়াহিদের দ্বারা এগুলোর মুকাবিলা করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে ‘শাফাক’ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর ‘শাফাক’-এর দুটি অর্থ রয়েছে-

ক. সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশের লালিমা।

খ. পশ্চিমাকাশের লালিমা অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শুভ্রতা। আর হযরত উমর (রাঃ) **جمع صوري** করতে গিয়ে মাগরিবের নামাযকে লালিমা অস্ত যাওয়ার পর শুভ্রতা পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। আর হানাফীদের মতে, শুভ্রতা পর্যন্ত মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত থাকে। সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা **جمع حقيقي**-এর উদাহরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর হানাফীদের এই অভিমতটির পুরোপুরি সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় ইতিপূর্বে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াকিদের বর্ণিত হাদীসে। (نظم ج ١ ص ٤٤٥)

بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ ص ১৭২

সফরে সুন্নত ও নফল নামায

... عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (بخاري ج ١ ص ١٤٩ باب من لم يتطوع في السفر الخ، مسلم ج ١ ص ٢٤٢ صلوٰۃ المسافرين وقصرها، نسائي ج ١ ص ٢١٣ ترك التطوع في السفر، ابن ماجه ص ٧٦)

অনুবাদঃ ... হযরত হাফস ইবন আসিম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাঃ)-এর সাথে সফরে গেলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাদের সাথে দুই রাকাত (ফরয) নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আমি নফল আদায় করতে পারতাম তবে ফরয নামায চার রাকাতই আদায় করতাম। অতঃপর তিনি বলেন, বহু সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। কিন্তু আমি কখনো তাঁকে তাঁর ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায আদায় করতে দেখিনি। আমি (বহু সফরে) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁকেও তাঁর ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আমি উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তাঁদেরকেও তাঁদের ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে।”

বিশ্লেষণঃ সফর অবস্থায় সুন্নত নামায আদায়ের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের সুচিন্তিত অভিমত হল, সুন্নতে কোন কসর নেই। তবে এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, সফর অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ সুন্নতে যায়েদাহ হয়ে যায়। যদি সুযোগ হয় তাহলে

পড়ে নিবে, যদি সুযোগ না হয় তাহলে পড়া জরুরী নয়। তবে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত। কেননা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে সফর অবস্থায়ও ফজরের সুন্নত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়-

وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ - (بخاري ج ١ ص ١٤٩ باب من تطوع في السفر الخ)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) সফরে ফজরের দু'রাকাত আদায় করেছেন।

* আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) বলেন-

لَا تَدْعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدْتَكُمُ الْخَيْلُ - (ابو داود ج ١ ص ١٧٩ باب في تخفيفها)

অর্থাৎ, ফজরের সুন্নত ত্যাগ করবে না, যদিও তোমাকে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিক।

উল্লেখ্য যে, ঘোড়া হাঁকানো অধিকাংশ সময় সফরে হয়ে থাকে, অন্যত্র নয়।

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, “উলামাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সফর অবস্থায় সাধারণ নফল তথা ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন এবং তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল নামায পড়া জায়েয। কিন্তু সুন্নতে মুয়াক্কাদার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইবন উমর (রাঃ) প্রমুখ এসব সুন্নতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতী। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) এবং জমহূরের অভিমত হল, সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করা মুস্তাহাব। (شرح مسلم ج ١ ص ٢٤٢)

আর এ ব্যাপারে হানাফীগণ বলেন, যদি সুযোগ হয় তাহলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করার মধ্যে ফযীলত রয়েছে। তবে তরক করাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সফর অবস্থায় এগুলোর তাকীদ অনেকখানি কমে যায়। (اعلاء السنن ج ٧ ص ٢٨٩)

بَابُ مَتَى يَتِمُّ الْمُسَافِرُ ١٧٢

মুসাফির কখন পুরা নামায আদায় করবে?

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْنَا هَلْ أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا - (بخاري ج ١ ص ١٤٧ باب ما جاء في التقصير وكم يقم الخ،

مسلم ج ١ ص ٢٤٣ صلوٰۃ المسافرین وقصرها، ترمذی ج ١ ص ١٢٢ باب في كم تقصر الصلوة، نسائي ج ١ ص ٢١٢ باب المقام الذي يقصر الخ، ابن ماجه ص ٧٦-٧٧)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মদীনা হতে মক্কায় রওয়ানা করলাম। আমরা পুনরায় মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নামায (চার রাকাত ফরয) দুই রাকাত করে আদায় করেন। রাবী বলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা সেখানে কতদিন অবস্থান করেন? তিনি বলেন, দশ দিন মাত্র।

বিশ্লেষণঃ সফরে কতদিন ইকামত বা অবস্থান করার নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যায়, এ ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা আঈনী (রহ.) উমদাতুল কুরী গ্রন্থে এ ব্যাপারে ২২টি মত উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রথমে সংক্ষেপে কয়েকটি অভিমত দেয়া হল। অতঃপর চার ইমামের মতামত বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

রবীয়াতুর রায়ের মতে, একদিন একরাত ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে।

* সাঈদ ইবন যুবাইর (রাঃ) বলেন, তুমি যখন তোমার পা অন্য কোন কওমের জমিতে রাখ, তখন নামায পূর্ণ কর। (معارف السنن ج ১ ص ১৭১)

* ইমাম আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, ১২ দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (مصنف عب الزقاق ج ২ ص ৫৩১)

* ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর মতে, ১৯ দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (ترمذي ج ১ ص ১২৩)

* হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসাফির ব্যক্তি ওয়াতনে আসলী তথা মূল আবাসস্থলে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি কসর করতে পারবে। চাই অন্যান্য জায়গায় যত দীর্ঘ সময়ই অবস্থান করুক না কেন।

(طحاوي ج ১ ص ২০২)

* ইমাম আহমদ ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, চার দিনের অতিরিক্ত অবস্থানের নিয়ত করার দ্বারা কসর বাতিল হয়ে যাবে। (فتح الملهم ج ২ ص ২০১)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ) যেহেতু মক্কায় চারদিন পর্যন্ত সফর অবস্থায় হজ্জ পালন করেছেন, এতে বুঝা যায় যে, চারদিন (২০ ওয়াক্ত নামায) পর্যন্ত কসর করা যায়। এর অধিক নয়।

* ইমাম শাফেঈ ও মালিক (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার দিনের অবস্থানের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (معارف السنن ج ১ ص ১৭১)

দলীলঃ সাঈদ ইবন মুসায়্যিবের আছার। তিনি বলেন-

إِذَا قَامَ أَرَبَعًا صَلَّى أَرَبَعًا- (ترمذي ج ١ ص ١٢٢-١٢٣)

অর্থাৎ, যখন চারদিন অবস্থান করবে, তখন (কসর না করে) চার রাকাত নামায পড়বে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, পনের দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। আর ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করলে কসর আদায় করবে। (بذل المجهود ج ٢ ص ٢٤٢)

দলীলঃ আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর আছার। তিনি বলেন-

إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا فَوَطَنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةِ عَشْرَةَ يَوْمًا فَاتِمِّ الصَّلَاةَ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَذَرِي فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ- (كتاب الآثار ص ٣٤)

অর্থাৎ, যখন তুমি মুসাফির হও এবং ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত কর, তাহলে নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় কর। আর যদি এ সম্পর্কে তোমার জানা না থাকে তাহলে নামায কসর কর।

জবাবঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ প্রদত্ত দলীলটি খুবই দুর্বল। কেননা, উক্ত দলীলে শুধু চারদিনের অবস্থা জানা যায়। যেহেতু তিনি চারদিন ছিলেন। কিন্তু চারদিনের বেশি অবস্থান করলে এর হুকুম কি হবে, তা জানা যায়নি। অথচ অন্য হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

শাফেঈ ও মালিকীগণের দলীলের জবাবঃ সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ.)-এর পক্ষ থেকেই হানাফীদের অনুকূলে আছার বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-

إِذَا قَدِمْتَ بِلَدَةٍ فَاقِمْتَ خَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا فَاتِمِّ الصَّلَاةَ- (آثار السنن ص ٢١٧)

অর্থাৎ, যখন তুমি কোন শহরে এসে সেখানে ১৫ দিন অবস্থান করবে, তখন তুমি নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে।

সুতরাং সাঈদ ইবন মুসায়্যিব-এর আছারদ্বয়ে অসামঞ্জস্য (تعارض) দেখা যাচ্ছে। আর নিয়ম হল, إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا, অর্থাৎ যখন দুটি রেওয়াজে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উভয়টি পরিত্যাজ্য হবে। আর এই ভিত্তিতে যদি উভয়টি পরিত্যাজ্যও হয়, তবুও আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর আছারের দ্বারা হানাফীদের অভিমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন রেওয়াজেতে ১৭ দিনের কথা, কোনটিতে ১৮ দিনের, কোনটিতে ১৯ দিনের,

কোনটিতে ২০ দিনের এবং কোনটিতে ১৫ দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে হানাফীগণ অধিক সতর্কতাবশত সবচেয়ে কম ১৫ দিনকে সাব্যস্ত করেছেন।

(تنظيم الاشتات ج ١ ص ٤٤٢)

ইসহাক (রহ.)-এর অভিমতের জবাবঃ যত রেওয়াযেতে ১৫ দিনের চেয়ে বেশি সময়ের কথা উল্লেখ রয়েছে, এগুলো ঐ অবস্থার হিসেবে বিবেচিত হবে, যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাসের নিমিত্তে অবস্থানের নিয়ত করা হয়নি। যার প্রবক্তা হানাফীগণও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ কসরের নামায আযীমত (আবশ্যিক), নাকি রুখসত (ঐচ্ছিক)ঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সফরের দরুন দুই ও তিন রাকাত (ফজর, মাগরিব) বিশিষ্ট নামাযে (এবং সুন্নত নামাযে) কোন কসর নেই এবং এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, সফরের কারণে চার রাকাত বিশিষ্ট নামায কসর অবস্থায় দুই রাকাত পড়তে হয়। কিন্তু এই কসর আযীমত (আবশ্যিক), নাকি রুখসত (ঐচ্ছিক), এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক মত অনুযায়ী, কসর করা রুখসত তথা এর অবকাশ রয়েছে এবং সম্পূর্ণ আদায় করা শুধু জায়েযই নয়, বরং উত্তম। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি চার রাকাত নামায পড়ে এবং এতে যদি প্রথম বৈঠকে নাও বসে, তবুও তার নামায আদায় হয়ে যাবে। (شرح المهدب ج ٤ ص ٣٣٥، درس مشکوٰة ج ٢ ص ١٢٤)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

অর্থাৎ, তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর কর, তখন তোমাদের নামাযে কসর করাতে কোন দোষ নেই। (নিসাঃ ১০১)

উক্ত আয়াতে “لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হল, তোমাদের কোন দোষ নেই। এই শব্দটি মুবাহ বা বৈধ (রুখসত) হওয়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস-

إِنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيِّ أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَاتَّمَمْتَ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتَ

قَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَاعَبَ عَلِيٍّ - (নসائي ج ১ ص ২১৩ باب المقام الذي يقصر بمثله،

بمقي ج ৩ ص ১৪২)

অর্থাৎ, তিনি (আয়িশা রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কায় এসে উমরা করলেন। মক্কায় আসার পর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি তো কসর করেছেন, আর আমি পূর্ণ নামায পড়েছি। আপনি রোযা রাখেননি। আর আমি রোযা রেখেছি। উত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন, হে আয়িশা! বেশ তো ভালই করেছে। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সফরে নামায পূর্ণ করা জায়েয, তদুপরি উত্তম।

দলীল (৩): হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে অপর একটি হাদীস-

”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيَتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ”-

(دار قطني ج ২ ص ১৮৯)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) সফরে কসর করতেন এবং পূর্ণও আদায় করতেন। রোযা রাখতেন, আবার কখনো কখনো ছেড়েও দিতেন।

দলীল (৪): হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমল। তিনি মক্কা মুকাররামায় পূর্ণ নামায আদায় করতেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনেই এই আমল করেছেন। অথচ কেউই এতে বাধা দেননি। যদি ইহা জায়েযই না হত, তাহলে তিনি ইহা কিভাবে করতেন? (بخاري ج ১ ص ১৪৭)

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, হাসান বসরী, হাম্মাদ (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, কসর আযীমত তথা ওয়াজিব। অতএব, ইহা ছেড়ে পূর্ণ নামায আদায় করা জায়েয নয়। তাই হানাফীদের মতে, মুসাফির অবস্থায় যদি চার রাকাত ফরয নামায পড়ে এবং এতে যদি প্রথম বৈঠক না করে, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, তার উপর দুই রাকাতে বসা ফরয ছিল, কিন্তু সে তা তরক করেছে।

(بذل المجهود ج ২ ص ২২৯، تعليق الصبيح ج ২ ص ১২১، درس مشکوة ج ২ ص ১২৪)

দলীল (৫): عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فِي الْخَصْرِو السَّفَرِ فَأَقْرَبَتْ

صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ - (ابو داود ج ১ ص ১৬৯ باب صلاة المسافرين، بخاري ج ১ ص ১৪৮ باب يقصر اذا خرج من موضعه الخ، مسلم ج ১ ص ২৪১، نسائي ج ১ ص ৭৭ باب كيف فرضة الصلاة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথমে) সফরে ও আবাসে দুই দুই রাকাত নামাযই ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সফরের সময়ের নামায ঠিক রাখা হয়েছে এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যায় যে, সফর অবস্থায় চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামায পড়া তা সফরের উপর ভিত্তি করে কমানো হয়নি। বরং আসল ফরযের উপর ভিত্তি করেই তা আদায় করা হয়। সুতরাং ইহা আযীমত তথা ওয়াজিব, রুখসত বা ঐচ্ছিক নয়।

দলীল (২): হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرَبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ - (نسائي ج ١ ص ٢١٢ كتاب تقصير الصلوة في السفر)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর ভাষায় মুকীম অবস্থায় চার রাকাত নামায ফরয করেছেন। আর সফর অবস্থায় দুই রাকাত।

দলীল (৩): হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالْحَجَرُ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرُ رَكْعَتَانِ (نسائي ج ١ ص ২১১)

অর্থাৎ, জুমআর নামায দুই রাকাত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাকাত, কুরবানীর নামায দুই রাকাত, সফরের নামায দুই রাকাত।

দলীল (৪): মুআররিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ - (مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٥٤-١٥٥، طحاوي ج ١ ص ২০৫)

অর্থাৎ, আমি ইবন উমর (রাঃ)-কে সফরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, দু'রাকাত করে (চার রাকাত ফরযের ক্ষেত্রে)। যে সুন্নতের (নিয়মের) বিরোধিতা করল সে কুফরী করল।

এ সকল রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, সফর অবস্থায় কসর আযীমত, রুখসত নয়।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে শাফেঈ ও হাম্বলীদের দলীলের জবাবঃ

(১) **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ** শব্দের দ্বারা কসর ওয়াজিব না হওয়া বুঝায় না। যেমনিভাবে সাফা এবং মারওয়াহতে দৌড়ানোর ব্যাপারে **لَا جُنَاحَ** (গোনাহ হবে না) শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ইমাম শাফেঈ (রহ.)-সহ সবার মতে, সাফা-মারওয়াহ সাঈ করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا-

অর্থাৎ, কেউ যদি বায়তুল্লায় হজ্জ অথবা উমরা করে, তাহলে তার জন্য সাফা-মারওয়াহতে (পাহাড়দ্বয়) তাওয়াফ করতে কোন দোষ নেই। (বাকারঃ ১৫৮)

* এ ব্যাপারে আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, কসর ওয়াজিব। আর কুরআনে যে এভাবে বলা হয়েছে, তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। যদ্বারা সন্দেহ হয়, কসর না করাও জায়েয। এর প্রকৃত কারণ এই যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সর্বদা পূর্ণ নামায আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তাঁরা সফর অবস্থায় কসর করাকে বাহ্যত গুনাহের ওয়াসওয়াসা হত। তাই তাঁদের সন্দেহ দূর করার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) বক্তৃতঃ এই আয়াতটি সফরের কসর সংক্রান্ত নয়, বরং সালাতুল খাওয়াফ তথা শংকার নামায সংক্রান্ত। কেননা উক্ত আয়াতেই উল্লেখ আছে যে-

— اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا— অর্থাৎ, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে।

সূতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা কসর না করা যে জায়েয আছে, এর দলীল দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, এ আয়াতে শংকাকালীন নামাযে কসর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ধরনের ক্ষেত্রে কসর, পরিমাণের ক্ষেত্রে কসর নয়। (৬১১) (معارف السنن ج ১ ص ৬১১)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) প্রথমত হাফিজ যায়লাঈ (রহ.) এই হাদীসটির মূল পাঠকে (মতন) মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। কারো কারো মতে হাদীসটি মুযতারিব।

(نصب الرأية ج ২ ص ১৭১، يهني ج ৩ ص ১৬২)

তাছাড়া আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ— (بخاري ج ১ ص ২৩৭ باب كم اعتمر النبي صلعم، مسلم ج ১ ص ৬০৭)

باب بيان عدد عمر النبي صلعم

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) একবার হজ্জ করেছেন। আর উমরা করেছেন চারবার। সবগুলোই যিলকাদ মাসে। শুধুমাত্র হজ্জের সাথে কৃত উমরা ছাড়া।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) রমযানে কখনো উমরা করেননি। অথচ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে রমযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে কোন কোন শাফেঈ বলেন, এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনা। আর মক্কা বিজয় হয়েছিল রমযানে। তদুপরি তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মক্কা বিজয়ের সফরে আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন না। (فتح الباري ج ৩ ص ৩৭৬)

বরং এই সফরে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং হযরত যয়নব (রাঃ) অথবা হযরত মায়মুনা (রাঃ)। (معارف السنن ج ٤ ص ٤٦٠)

* অগত্যা যদি এই হাদীসটিকে বিপ্লব স্বীকৃতি দিয়ে ইহা মেনে নেয়া হয় যে, মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আয়িশা (রাঃ)ও নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন, তাহলেও এর উত্তরে বলা হবে যে, এই সফরে নবী করীম (সাঃ) পনের দিন অথবা এর চেয়ে বেশি দিন মক্কায় মুকীম ছিলেন। (معارف السنن ج ٤ ص ٤٦٠)

কিন্তু এ সময় নবী করীম (সাঃ) অবস্থানের নিয়ত করেননি। কেননা তিনি (সাঃ) হুনাইন যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। আর এদিকে হযরত আয়িশা (রাঃ) মনে করলেন যে, নবী করীম (সাঃ) হয়ত দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করবেন। এর ভিত্তিতেই হযরত আয়িশা (রাঃ) নামায পূর্ণ আদায় করেছিলেন এবং রোযাও রাখতে লাগলেন। ফলে নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর কাজ ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

কতক সাহিত্যিক তো একথাও বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সমস্ত গুণের অধিকারী। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও রহমতের নবী ছিলেন। তাই তিনি কাউকে কোন বিষয়ে সরাসরি কষ্টদায়ক কথা বলতেন না। বরং হেকমতের মাধ্যমে কাজ হাসিল করে নিতেন। এমনিভাবে উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে **أَخَسَّنْتَ** (তুমি ভাল করেছ) বলে সূক্ষ্ম পন্থায় তাঁর আমলের অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। নবী করীম (সাঃ) **أَخَسَّنْتَ** বলে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমি হলাম অনুসৃত (متبوع) আর তুমি হলে অনুসারী (تابع)। তুমি আমার নিকট জিজ্ঞেস না করে নিজে নিজেই ইজতিহাদ করে আমল করা শুরু করে দিয়েছ। বাহ! বেশতো! ভালই করেছ! (**أَخَسَّنْتَ**)

আসলে প্রত্যেকটি ভাষাতেই এমন প্রচলন রয়েছে যে, শাব্দিক অর্থে যদিও ইতিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর মূল লক্ষ্য হল নেতিবাচক বুঝানো। উক্ত হাদীসেও তাই ঘটেছে।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হল এই যে, নবী করীম (সাঃ) যখন সংক্ষিপ্ত সফর তথা ৪৮ মাইল থেকে কম দূরত্বের ব্যবধান সফর করতেন। তখন তিনি (সাঃ) পূর্ণ নামায আদায় করতেন। আর তিনি যখন ৪৮ মাইল বা এর চেয়ে বেশি দূরত্বের সফর করতেন, তখন তিনি কসর করতেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকটও এ ব্যাপারে কোন মারফু হাদীস নেই। বরং সবই ছিল তাঁর ইজতিহাদ। আর তাই ইমাম যুহরী যখন উরওয়ায়ে প্রশ্ন করলেন-

فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تَتَمُّ - (بخاري ج ١ ص ١٤٨)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ)-এর কি হল যে, তিনি নামায পূর্ণ পড়েছেন?

উত্তরে উরওয়া বলেন- تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُمَانُ অর্থাৎ, যে ব্যাখ্যার দ্বারা হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় পূর্ণ নামায পড়তেন, এমনি ধরনের কোন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আয়িশা (রাঃ)ও নামায পূর্ণ করতেন। এতে বুঝা যায় যে, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট কোন মারফু হাদীস নেই। নতুবা উরওয়া এমন কথা বলতেন না। বরং সরাসরি হাদীস বলতেন।

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ (১) হযরত উসমান (রাঃ) মক্কা মুকাররামায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। আর তাঁর ইজতিহাদ ছিল, যে শহরে মানুষ ঘর তৈরি করে নিবে, তাতে পরিপূর্ণ নামায পড়া ওয়াজিব। (ابو داود ج ١ ص ٢٧٠ باب الصلاة في المني)

(২) কতক মুহাদিস বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় অবস্থানের নিয়ত করেছিলেন।

(৩) কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) মুসাফিরই ছিলেন। কিন্তু হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় বেদুঈনদের সমাবেশ হত। এমতাবস্থায় যদি তিনি কসর করতেন, তাহলে বেদুঈনরা হয়ত মনে করে বসত যে, পূর্ণ নামাযই দুই রাকাত। তাই তাদেরকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইকামত বা অবস্থানের নিয়ত করে পূর্ণ নামায আদায় করা সঙ্গত মনে করেছেন। (فتح الهاري ج ٢ ص ٤٧١)

بَابُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّيْ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ ص ١٨٠

ফজরের সুন্নত পড়ার পূর্বেই ইমাম জামাআতে দাঁড়িয়ে গেলে

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ - (ترمذي ج ١ ص ٩٦ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ابن ماجه ص ٨١)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ফরয নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ফরয ব্যতীত আর কোন নামায পড়া দুরন্ত নয়।

বিশ্লেষণঃ ফরয নামাযের জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সুন্নত আদায় করা যাবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

তবে যুহর, আসর ও এশা এই তিন ওয়াক্তের নামাযের ব্যাপারে সকল ইমামের অভিমত এই যে, জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সুন্নত পড়া নাজায়েয। কিন্তু ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরেও এই হুকুম যে, জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ফজরের সুন্নত পড়া জায়েয নয়।

দলীলঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীস।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জামাআত দাঁড়িয়ে গেলেও শর্তসাপেক্ষে ফজরের সুন্নত আদায় করা জায়েয আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট দুটি শর্ত- (১) সুন্নত মসজিদের বাইরে পড়তে হবে, মসজিদ ছোট হোক কিংবা বড় হোক। (২) সুন্নতের পর যদি উভয় রাকাত জামাআতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট দুটি শর্ত- (১) কমপক্ষে এক রাকাত জামাআতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (যদিও দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে হোক না কেন) (২) মসজিদ যদি ছোট হয় তাহলে জামাআত শুরু হয়ে গেলে সুন্নত বাইরে পড়বে। আর মসজিদ বড় হলে সুন্নত মসজিদের কোন এক কোণে বা বারান্দায় আদায় করে নেবে। যাতে কাতারের সাথে মিলে না যায়।

দলীলঃ ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.) দলীল হিসেবে ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত পেশ করেন, যাতে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। যেমন-

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوهُمَا وَإِنْ

طَرَدْتَكُمُ الْخَيْلُ - (ابو داود ج ১ ص ১৭৭ باب في تخفيفها)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কোন সময় ঐ দুই রাকাত নামায (ফজরের সুন্নত) ত্যাগ করবে না, যদিও তোমাদেরকে ঘোড়া হাঁকিয়ে নেয়।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْئٍ مِنَ التَّوَاتُلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ

الصُّبْحِ - (ابو داود ج ১ ص ১৭৮ باب ركعتي الفجر، بخاري ج ১ ص ১০০ باب تعاهد ركعتي الفجر،

مسلم ج ১ ص ২০১ باب الاستحباب ركعتي سنة الفجر الخ)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করেছেন তা অন্য কোন নামাযের (সুন্নত বা নফল) ব্যাপারে পালন করেননি।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ - (ابو داود ج ১ ص ১৭৮, মুসলিম ج ১ ص ২৫০)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি ধারণা করতাম, তিনি কি তাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন?

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - (মুসলিম জ ১ ص ২৫১, তرم্দি জ ১ ص ৯০, বাব রকعتي الفجر من الفضل، نسائي ج ১ ص ২৫৩) المحافظة على الركعتين قبل الفجر

অর্থাৎ, ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

এছাড়া বহু ফকীহ সাহাবা (রাঃ) থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা ফজরের সুন্নত আদায় করতেন। যেমন-

(১) হযরত নাফি বলেন-

أَيَقَطُّ ابْنُ عُمَرَ لَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ - (طحاوي ج ১ ص ১৮৩)

অর্থাৎ, আমি ইবন উমর (রাঃ)-কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলাম। তখন নামাযের ইকামত হয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত (সুন্নত) নামায পড়লেন।

(২) আবু উসমান আনসারী বলেন-

جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الرُّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ - (طحاوي ج ১ ص ১৮৩)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) এমন সময় এলেন, যখন ইমাম ফজরের নামায শুরু করে দিয়েছেন। অথচ ইবন আব্বাস (রাঃ) দু'রাকাত (সুন্নত) আদায় করেননি। তখন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ইমামের (থেকে একটু) পিছনে (গিয়ে) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর তাঁদের সাথে নামাযে शामिल হলেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল (আহার) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে জামাআত শুরু হওয়ার পরেও কিছু শর্তসাপেক্ষে আদায় করা জায়েয।

আকলী দলীলঃ হাদীসে সাধারণত ফজরের নামাযে বড় সূরা পাঠ করার তাকীদ এসেছে। এতে এ হেকমতেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ফজরের জামাআত শুরু হলে গেলেও কোন মুসল্লী সুন্নত পড়েও যাতে জামাআতে শরীক হতে পারে।

জবাবঃ শাফেঈদের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(১) উল্লিখিত হাদীসটির উপর পরিপূর্ণরূপে শাফেঈগণও আমল করেন না। কারণ যদি কেউ জামাআত দাঁড়ানোর পর স্বীয় ঘরে সুন্নত পড়ে রওয়ানা দেয়, তাহলে এটা ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতেও জায়েয। অথচ সাধারণভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের হুকুমে এটিও অন্তর্ভুক্ত। এতে ঘরে এবং মসজিদের কোন পার্থক্য নেই।

(২) প্রকৃতপক্ষে হাদীসটির উদ্দেশ্য হল, ফরয নামাযের তাগিদ প্রদান। যাতে ফরয নামাযের পূর্বেই সুন্নতসমূহ সময় থাকতে আদায় করে নেয়, যাতে জামাআতের সময় তাড়াহুড়া করতে না হয়। (১০১-১০০ ج ٢ درس مشکوة ١٨٨-١٨٦، درس ترمذي ج ٢ ص ١٨٨-١٨٦)

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا ص ١٨٠

যদি কারো ফজরের সুন্নত বাদ পড়ে তবে সে তা কখন পড়বে?

... عَنْ قَبْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رُكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رُكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّيْتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— (ترمذي ج ١ ص ٩٦ باب نفوته الركعتان قبل الفجر، ابن

ماجة ص ٨٢)

অনুবাদঃ ... কায়েস ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখতে পান যে, এক ব্যক্তি ফজরের ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করছে। মহানবী (সাঃ) বলেন, ফজরের নামায দুই রাকাত। তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করতে পারিনি, তা এখন আদায় করছি। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নীরব থাকেন।

বিশ্লেষণঃ যদি কোন ব্যক্তি জামাআতের পূর্বে ফজরের সুন্নত না পড়ে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি তা কখন আদায় করবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, যদি কোন ব্যক্তি ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত আদায় না করে থাকে, তাহলে ফরযের পর সূর্য উঠার পূর্বেই আদায় করতে পারবে।

দলীল (১)ঃ উপরিউক্ত হাদীস।

দলীল (২)ঃ কায়েস (রাঃ) বলেন-

... يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَلَا إِذْنَ- (ترمذي ج ١ ص ٩٦)

باب فيمن تغويته الركعتان الخ

অর্থাৎ, ... ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ফজরের দু'রাকাত (সুন্নত) পড়তে পারিনি। এতদশ্রবণে নবী করীম (সাঃ) বলেন- "فَلَا إِذْنَ"

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ "فَلَا بِأَسْ إِذْنَ" শব্দে বিশ্লেষণ করেছেন।

অর্থাৎ, যদি ছুটে যাওয়া এ দু'রাকাত তখন পড়ে নেয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, ফজরের ফরযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নত পড়া জায়েয নয়। বরং তা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করবে। (তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শুধু সুন্নতের কোন কাযা নেই। হাঁ, যদি ফরযের সাথে সুন্নত কাযা হয়, তাহলে কাযা করতে পারে। তাঁর এ রেওয়ায়েতটিই প্রাধান্য লাভ করেছে।)

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ

يُصَلِّ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهُمَا بَعْدَمَا تَطْلُعَ الشَّمْسُ- (ترمذي ج ١ ص ٩٦ باب في اعادتهما

بعد طلوع الشمس)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ফজরের দু'রাকাত সুন্নত পড়ল না, সে যেন অবশ্যই এ দু'রাকাত সূর্যোদয়ের পর আদায় করে নেয়।

দলীল (২)ঃ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى

تَطْلُعَ الشَّمْسُ- (بخاري ج ١ ص ٨٢ باب الصلوة بعد الفجر الخ، نسائي ج ١ ص ٩٦ النهي عن الصلوة

بعد العصر، ابن ماجه ص ٨٩)

অর্থাৎ, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। অনুরূপ, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আর কোন নামায নেই।

দলীল (৩): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ : (৩) بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ—

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং সকালের (ফজর) পর সূর্যোদয় পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (সূত্রঃ ঐ) সুতরাং উপরোল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের সুন্নত আদায় করা জায়েয নয়।

জবাবঃ শাফেঈ ও হাম্বলীগণ কয়েস (রাঃ)-এর যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী (রহ.) উক্ত হাদীসটি মুরসাল সাব্যস্ত করেছেন। আর শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে মুরসাল হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ إِذْنٌ فَلَا بَأْسَ إِذْنٌ অর্থ আহনাফদের নিকট إِذْنٌ নয় বরং এর অর্থ হল إِذْنٌ تُمْلُ فَلَا তথা তখন নামায পড়ো না।

* এমতাবস্থায় নামায পড়ার জন্য অনুমতি দিয়েছেন- এ সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম এবং সেগুলো ক্রিয়ামূলক (فعلي)। কিন্তু নামায না পড়ার হাদীস সংখ্যা অনেক এবং মুতাওয়াতির ও বাচনিক (قولی)। সুতরাং সংখ্যায় আধিক্য, মুতাওয়াতির ও বাচনিক হাদীসসমূহই প্রাধান্য পাবে। (درس ترمذي ج ٢ ص ١٨٩-١٩١)

بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ص ١٩٤

রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ—

(بخاري ج ١ ص ٢٦٩ باب فضل من قام رمضان، مسلم ج ١ ص ٢٥٩ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ترمذي ج ١ ص ١٦٦-١٦٧ باب الترغيب في قيام شهر رمضان الخ، نسائي ج ١ ص ٢٣٨ باب ثواب من قام رمضان الخ/٣٠٩، ابن ماجه ص ٩٥)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের রমযান মাসের (রাতে) নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন; তবে তিনি (সাঃ) তা আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব (ফরয-ওয়াজিবের ন্যায়) আরোপ করতেন না। তিনি (সাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি রমযান মাস ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় দশায়মান হয়ে তারাবীহ নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইত্তিকালের পরেও এই নামাযের (তারাবীহ) বিধান একইরূপ থাকে। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও তদ্রূপ থাকে এবং উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও এরূপ ছিল।

বিশ্লেষণঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন, কিয়ামে রমযান দ্বারা তারাবীহর নামায বুঝানো উদ্দেশ্য।

আল্লামা কিরমানী (রহ.) ইজমা নকল করে বলেন-

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةَ التَّارَوِيحِ - (فتح الهاري ج ٤ ص ٢١٧)

অর্থাৎ, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কিয়ামে রমযান দ্বারা উদ্দেশ্য সালাতুত তারাবীহ।

এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্য হচ্ছে, তারাবীর নামায সুন্নতে মুআক্কাদাহ এবং পুরুষদের মসজিদে জামাআতে আদায় করা উত্তম।

(البحر الرائق ج ٢ ص ٦٦، معارف السنن ج ٦ ص ٢٢١، فتح الهاري ج ٤ ص ٢١٩)

* তারাবীর নামাযে রাকাত সংখ্যা কত, এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* আহলে যাহির, ইবন হুমাম এবং ইবন তাইমিয়ার (রহ.) মতে, তারাবীর নামায মাত্র আট রাকাত এবং তা মুস্তাহাব।

(تحفة الاحودي ج ٢ ص ٧٢-٧٦، فتح القدير ج ١ ص ٣٣٤، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ١ ص ١٧٦)

... عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (١) دَلِيلَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ

رَكْعَةُ الْخ (ابو داود ج ١ ص ١٨٩ باب في صلوة الليل، بخاري ج ١ ص ١٥٤، مسلم ج ١ ص ٢٥٤ باب صلوة الليل الخ، ترمذي ج ١ ص ٩٩ باب وصف صلوة النبي صلعم بالليل، نسائي ج ١ ص ٢٤٨ باب كيف الوتر بثلاث، ابن ماجه ص ٩٧)

অর্থাৎ, ... আবু সালামা হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাস ও অন্যান্য সময়ের রাক্বিতে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন।...

তঁারা বলেন, এই এগার রাকাতের মধ্যে তিন রাকাত হল বিতির। আর বাকী চার রাকাত করে মোট আট রাকাত হল তারাবীর নামায।

দলীল (২): হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ... فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسُ فَقَامَ بِنَا ... ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بِقِيَةِ الشَّهْرِ- (ابو داود ج ١ ص ١٩٥، ترمذي ج ١ ص ١٦٦ باب قيام شهر رمضان، نسائي ج ١ ص ٢٣٨، ابن ماجه ص ٩٥)

অর্থাৎ, ... আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রমযানমাসে রোযাব্রত পালন করেছি। তিনি (সাঃ) রমযান মাসের প্রথম দিকে (তারাবীহ) নামায আমাদের সাথে আদায় করেননি। অতঃপর উক্ত মাসের মাত্র সাতটি রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে (তারাবী) নামায আদায় করেন। এভাবে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি (সাঃ) ষষ্ঠ রাতে (অর্থাৎ পরের রাত) আমাদের সাথে (তারাবীহ) নামায আদায় করেননি। পরে পঞ্চম রাতে তিনি আমাদের সাথে নামায আদায়কালে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন। ... অতঃপর তৃতীয় রাতে তিনি তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে এবং অন্যান্য লোকদেরকে একত্রিত করে জামাআতের সাথে (তারাবীহর) নামায আদায় করেন। ... অতঃপর তিনি উক্ত মাসের বাকি দিনগুলোতে (২৯ ও ৩০) আমাদের সাথে জামাআতে আর তারাবীহ আদায় করেননি।

উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) মাত্র তিন দিন তারাবীহ পড়েছেন। যদ্বারা তারাবীহ মুস্তাহাব বুঝা যায়, সুন্নতে মুআক্কাদাহ প্রমাণিত হয় না।

* চার ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, তারাবীহ নামায বিশ রাকাত। এবং ইহা সুন্নতে মুআক্কাদা।

(البحر الرائق ج ২ ص ৬৬, معارف السنن ج ৬ ص ২২১, فتح الباري ج ৬ ص ২১৭)

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারে, ইমাম মালিক (রহ.) থেকে তো ৩৬ এবং ৪১ রাকাতেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত প্রশ্নের নিরসন হল এই যে, ৪১ রাকাতবিশিষ্ট রেওয়ায়েতে ৩ রাকাত বিতির এবং বিতরের পরে ২ রাকাত নফল নামায शामिल রয়েছে। অর্থাৎ ৩ রাকাত বিতির এবং ২ রাকাত নফল মোট ৫ রাকাত নামায ৪১ রাকাত নামায থেকে বাদ দিলে ৩৬ রাকাত নামায থাকে। সুতরাং তাঁর থেকে মোট রেওয়ায়েত পাওয়া যায় দুটি- (১) ২০ রাকাত এবং (২) ৩৬ রাকাত।

আর ৩৬ রাকাতের মূল ঘটনা হল এই, মদীনা এবং মক্কাবাসীরা ২০ রাকাত তারাবীহ নামাযের উপরই আমল করত। কিন্তু মক্কাবাসীরা প্রত্যেক ৪ রাকাত অন্তর তওয়াফ করত। কিন্তু মদীনাবাসীরা যেহেতু তওয়াফ করার কোন সুযোগ পেত না, তাই তারা সওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তওয়াফের পরিবর্তে ৪ রাকাত নামায নফল হিসেবে অতিরিক্ত আদায় করত। এভাবে মদীনাবাসীরা মক্কাবাসীদের মোকাবেলায় ১৬ রাকাত নামায অতিরিক্ত আদায় করত। ফলে তাদের সর্বমোট (২০+১৬)=৩৬ রাকাত হত। সুতরাং এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তারাবীহ নামায বিশ রাকাতই ছিল।

(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ১ ص ১০২, المغني ج ২ ص ১৬৭, ركعات تراويح ص ৬০-৬১)

চার ইমামের দলীলঃ (১) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মারফু হাদীস, যা ইবন হুমাঈদ সূত্রে বর্ণিত।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوُتْرَ-

(المطالب العالیه ج ১ ص ১৬৬)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানে ২০ রাকাত নামায পড়তেন আবার বিতরও পড়তেন। এ হাদীসটি যদিও সনদগতভাবে দুর্বল, কিন্তু ইজমা ও এর উপর ব্যাপক আমলের দ্বারা এতে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

(২) ইয়াযীদ ইবন রুমান থেকে বর্ণিত- زَمَانَ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً- (موطا امام مالك ص ৭৮)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর সময়ে লোকজন রমযানে ২৩ রাকাত নামায পড়ত (২০ রাকাত তারাবীহ এবং ৩ রাকাত বিতির)।

(৩) আল্লামা ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) এক জায়গায় স্বীয় ফাতওয়ায় লিখেন-

قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ ... (مجمع فتاوى ابن تيمية ج ٢٣ ص ١١٢)

অর্থাৎ, একথা প্রমাণিত যে, উবাই ইবন কাব (রাঃ) লোকজনকে নিয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন।

অতএব, প্রচুর সংখ্যক আলিম এ মত পোষণ করেন যে, এটাই সুন্নত। কারণ তিনি এই সুন্নত আদায় করেছেন মুহাজির ও আনসারদের মাঝে। আর এটা কোন প্রত্যাখ্যানকারী প্রত্যাখ্যান করেননি।

(৪) বিশ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর সময়ে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) মাত্র তিন রাত জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায আদায় করেছেন। কিন্তু তিনি একা একা স্বীয় গৃহে অধিক নফল নামায তথা তারাবীহ আদায় করতেন। যার প্রমাণ অনেক রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে অন্যান্য মাসের রাতের ইবাদতের তুলনায় বেশি ইবাদত করতেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তারাবীর প্রতি অধিক গুরুত্ব না দেয়ার কারণ হিসেবে তিনি নিজেই বলেন-

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ-

(ابو داود ج ١ ص ١٩٤-١٩٥، بخاري ج ١ ص ٢٦٩، مسلم ج ١ ص ٢٥٩، نسائي ج ١ ص ٢٣٨)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি এ কারণেই নামায জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য আসিনি যে, আমার ভয় হচ্ছিল তোমাদের উপর ফরয করা হয় কিনা। এটা রমযান মাসের (তারাবীহ নামায আদায়ের) ঘটনা।

এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল তারাবীহ নামায জামাআতের সাথেই আদায় করা হোক। আর তাই দেখা যায় যে, কিছু লোক যখন উবাই ইবন কাবের (রাঃ) পিছনে কুরআন শুনার জন্য মুক্তাদী হয়ে তারাবীর নামায আদায় করছিলেন, তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন-

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا وَنِعَمَ مَا صَنَعُوا-

(ابو داود ج ١ ص ١٩٥)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তারা ঠিকই করেছে এবং উত্তম কাজ করেছে।

এমতাবজ্জায় নবী করীম (সাঃ)-এর ইত্তিকাল হয়ে গেল যে, তারাবীর কোন নিয়মিত জামাআত কায়েম করেননি। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগ আসল। তিনিও এ ব্যাপারে কোন এন্তেজাম করেননি। কেননা তাঁর উপর তখন মুসলিম খিলাফত টিকিয়ে রাখার এক গুরুদায়িত্ব ছিল। একদিকে উসামা (রাঃ)-এর বাহিনী প্রেরণ করা, অন্য দিকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, অপরদিকে নবুওয়াতের দাবিদারদের প্রতিহত করা এবং যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করা- এগুলো সবই ছিল নিঃসন্দেহে তারাবীর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্বোপরি তাঁর খেলাফতকাল ছিল খুবই স্বল্প সময়ের। যার ফলে তিনি তারাবীর সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি।

অতঃপর এল হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগ। তাঁর প্রাথমিক অবস্থা এমনিভাবেই চলতে লাগল। অবশেষে যখন রাষ্ট্রের বিশৃংখলা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসল, তখন তিনি খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে এদিকে মনোযোগ দিলেন। একদিন তিনি মসজিদে গিয়ে দেখেন যে, লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী তারাবীর নামায আদায় করছে। তখন তিনি আফসোস করে বললেন-

... إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَفْضَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ الْخ (بخاري ج ١ ص ٢٦٩/١٥٢)

অর্থাৎ, ... আমি ভাবছি যদি এদেরকে একজন কারীর আওতায় একত্রিত করে দিতে পারতাম, তবে উত্তম হত। অতঃপর তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উবাই ইবন কাব (রাঃ)-এর ইমামতিতে তাদেরকে একত্রিত করেন।

এভাবেই হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে গুরুত্ব সহকারে তারাবীর বিশ রাকাত নামায নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) থেকে শুরু করে তাবিঈন ও সকল হক্কানী আলিম এর উপর আমল করে আসছেন।

সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের এক বড় জামাআত জীবিত থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এর উপর আমল করতে অস্বীকার করেননি, তাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারাবীর নামায বিশ রাকাতের উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৬) সর্বোপরি বলা যায় যে, যদিও মেনে নেয়া হয় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে তারাবীর বিশ রাকাতের ব্যাপারে কোন কিছুই বর্ণিত এবং প্রমাণিত নেই। তবুও হযরত উমর (রাঃ)-এর নিজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী সুন্নত হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ-

অর্থাৎ, তোমরা আমার সুন্নত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত আঁকড়ে ধর।

* হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ-
(سنن ترمذي ج ٢ ص ٢٢٩)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার পরে আবুবকর ও উমর (রাঃ)-এর অনুসরণ কর।

জবাবঃ (১) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর এগার রাকাত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকেই তের রাকাত নামাযের রেওয়াজেত সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَ رَكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْهَا ... (ابو داود ج ١ ص ١٨٩، بخاري ج ١ ص ١٥٣ كيف صلوة الليل، ترمذي ج ١ ص ١٠٠، ابن ماجه ص ٥٨)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে বিতির সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন।

আরো বর্ণিত আছে যে-

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَ رَكْعَةً يُؤْتِرُ بِتِسْعٍ ... (ابو داود ج ١ ص ١٩١)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তিনি (সাঃ) নবম রাকাতে বিতির পাঠ শেষ করতেন।

এই সকল একাধিক বিপরীত রেওয়াজেতের পরিপ্রেক্ষিতে ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন যে, আহলে যাহিরের আট রাকাতের মধ্যে তারাবীকে সীমাবদ্ধ করার দাবি বাতিল হয়ে যায়।

তাছাড়া আব্দুর রহমান মোবারকপুরী আহলে যাহিরের এক বড় ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তার থেকেই তের রাকাতের রেওয়াজেত প্রমাণিত। সুতরাং বুঝা যায় যে, তারাবীহ আট রাকাত নয়।

(২) যে হাদীসের দ্বারা আহলে যাহিরের তারাবীহ চার চার রাকাত করে মোট আট রাকাত আদায় করা এবং এক সালামে তিন রাকাত বিতির আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাও আহলে যাহিরের আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা আহলে যাহিররা

বিত্তির এক রাকাত আদায় করে থাকে অথবা তিন রাকাতই আদায় করে, তবে দুই সালামে এবং তারাবীর নামাযও দুই দুই রাকাত করে আদায় করে থাকে। সুতরাং উক্ত হাদীস তাদের দলীল হতে পারে না।

(৩) মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর এগার, তের প্রভৃতি বর্ণিত হাদীসসমূহকে তাহাজ্জদের নামায হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণিত এগার রাকাতের হাদীসটিকে তারাবীর অনুচ্ছেদে উল্লেখ না করে তাহাজ্জদের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

যদিও আহলে যাহিররা বলেন যে, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ উভয়টি একই বিষয়, কিন্তু তাদের দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা নবী করীম (সাঃ) কখনো আনুষ্ঠানিকতার সাথে জামাআতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেননি। অথচ আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) আনুষ্ঠানিকতার সাথে জামাআতে তারাবীর নামায আদায় করেছেন।

* আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা আরো জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) তারাবীর জামাত অধিক রাত তথা সেহেরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন-

فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ-

অর্থাৎ, তিনি আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ সময় নামায পড়েন, আমাদের আশংকা হচ্ছিল যে, হয়ত আমরা ফালাহ (সেহেরী খাওয়া)-এর সুযোগ হারিয়ে ফেলব।

কিন্তু তাহাজ্জুদের ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন-

لَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يَتِمُّهَا إِلَى الصُّبْحِ- (ابو داود ج ١ ص ١٩٠)

باب في صلوة الليل، سنن دارمي ج ١ ص ٢٨٥)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সারা রাত জেগে থেকে কোন সময়ই ইবাদত করেননি।

অথচ আয়িশা (রাঃ) থেকে অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, নবী করীম (সাঃ) রমযানে অনেক রাত্র পর্যন্ত ইবাদত করতেন এমনকি কোন কোন রাত বিছানায় শয়ন করতেন না।

অতএব, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যদি রমযান এবং রমযান ব্যতীত অন্যান্য সকল মাসের রাতের নামায একই রকম হয় (এগার রাকাত), তাহলে রমযানে রাতে না ঘুমিয়ে এত বেশি চেষ্টা-পরিশ্রম এবং ইবাদত করার তাৎপর্য কি?

প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের মূল লক্ষ্য হল এই যে, রমযানে এবং রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও নবী করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায সর্বদা আট

রাকাতই আদায় করতেন। এতে তো তারাবীর বিশ রাকাত আদায়ে নিষেধ প্রমাণিত হয় না।

হযরত আবু যার (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা আহলে যাহিরের তারাবীর নামায মুস্তাহাব প্রমাণ করার জবাবঃ

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَلَّطْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ الْخ (نسائي ج ١)

ص ৩০৮, ابن ماجه ص ৭৫)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের উপর সুন্নত করেছি এ তারাবীহ।

সুতরাং উক্ত হাদীসে যেখানে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক সরাসরি সুন্নতের কথা বিদ্যমান, ইহাকে কিভাবে মুস্তাহাব বলা হবে? তাছাড়া ইতিপূর্বে তো আমরা জেনেছি, ইহা যাতে আমাদের উপর ফরয বা ওয়াজিব সাব্যস্ত না হয়, এজন্য তিনি জামাআতে নিয়মিত শরীক হতেন না।

كَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ ص ১৭৭

কুরআন মজীদে সিজদায়ে তিলাওয়াত কয়টি?

... عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً

فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ - (ابن ماجه ص ৭৫)

অনুবাদঃ ... আমার ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজদা আছে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। এর তিনটি মুফাস্সালের মধ্যে (সূরা নাজম, ইনশিকাক ও আলাক), সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একটি)।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবেঃ

(১) তেলাওয়াতের সিজদা সুন্নত না ওয়াজিব?

(২) পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতের সিজদা কয়টি?

প্রথম আলোচনাঃ তেলাওয়াতের সিজদা সুন্নত না ওয়াজিব এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, আওয়াঈ ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, তেলাওয়াতের সিজদা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। (بذل المجهود ج ২ ص ৩১৫)

... عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (১) : دَلِيلٌ وَسَلَّمُ النَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا - (ابو داود ج ١ ص ١٩٩ باب من لم ير السجود في المفصل، بخاري ج ١ ص ١٤٦ باب من قرأ السجدة ولم يسجد، مسلم ج ١ ص ٢١٥ باب السجود التلوة، ترمذي ج ١ ص ١٢٧ باب من لم يسجد فيه، نسائي ج ١ ص ١٥٢ ترك السجود في النجم)

অর্থাৎ, ... যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে 'সূরা নাজম' পাঠ করি। এই সূরা পাঠের পর তিনি সিজদা করেননি।

নবী করীম (সাঃ) যেহেতু সিজদা করেননি, এতে বুঝা যায় যে ইহা ওয়াজিব নয়।

দলীল (২): একদা হযরত উমর (রাঃ) মিসরের উপর একটি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর নেমে সিজদা করলেন। অতঃপর এ আয়াতটি দ্বিতীয় জুমআতে তিলাওয়াত করলেন। ফলে লোকজন সিজদার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি বলেন-
إِنَّهَا لَمْ تَكُتَبْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوا - (بخاري ج ١ ص ١٤٧ باب من رأى أن الله عز وجل الخ، ترمذي ج ١ ص ١٢٧)

অর্থাৎ, আমাদের ইচ্ছা ব্যতীত সিজদা আমাদের উপর ফরয করা হয়নি। তাই তিনি সিজদা করলেন না এবং অন্যান্যরাও সিজদা করল না।

হযরত উমর (রাঃ)-এর বাণী ও আমল থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব- সুন্নত নয়। আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যদি নামাযে পড়া হয়, তাহলে ওয়াজিব। আর নামাযের বাইরে পড়া হলে সুন্নত।
(معارف السنن ج ٥ ص ٥٥)

দলীল (১): পবিত্র কুরআনের সিজদার আয়াত যেগুলোতে নির্দেশসূচক শব্দ এসেছে। আর নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। যেমন-
كَلَّا تُطِئْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

অর্থাৎ, কখনোই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন। (আলাকঃ: ১৯)
কতক আয়াতে সিজদা না করার ক্ষেত্রে কাফেরদের অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন-
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

অর্থাৎ, যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না।
(ইনশিকাকঃ: ২১)

সুতরাং এমতাবস্থায় এর বিপরীতে একজন মুসলমানের উপর সিজদা ওয়াজিব হওয়ারই কথা।

কোন কোন আয়াতে পূর্ববর্তী নবীগণের সিজদার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণের হুকুমও দেয়া হয়েছে। (সোয়াদঃ ২৪, আনআমঃ ৯০) * সুতরাং যদি সিজদা করা হয়, তাহলে কাফেরদের বিরোধিতাও হয় এবং আস্থিয়া (আঃ)-এর অনুসরণও হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যার নির্দেশ রয়েছে। (فتح القدير ج ১ ص ২৮২)

দলীল (২): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ : مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ الخ (بخاري ج ১ ص ১৬৬ باب سجود المسلمين/ ج ২ ص ৭২১, مسلم ج ১ ص ২১৫)

باب سجود التلاوة، ترمذي ج ১ ص ১২৭، نسائي ج ১ ص ১০২ السجود في اللجم

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) সূরা নজম পাঠান্তে সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে মুসলমানগণও সিজদা করেন।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) সিজদা করেছেন। সুতরাং যাকে ইবন সাবিতের হাদীসে বর্ণিত **فلم يسجد**-এর অর্থ হবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেননি। আর আহনাফদের মতেও তাৎক্ষণিক সিজদা করা ওয়াজিব নয়।

নবী করীম (সাঃ)-এর তাৎক্ষণিক সিজদা না করার আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, এই সময় তিনি অযুবিহীন ছিলেন অথবা তাৎক্ষণিক সিজদা না করাও যে জায়েয তা বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর আছারের উত্তর হল এই যে, মারফু হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবীদের আছার দলীলযোগ্য নয়। অথবা, তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন।

অথবা এর অর্থ হল, জামাআতের সাথে সিজদা আমাদের উপর ফরয করা হয়নি।

(درس ترمذي ج ২ ص ৩৬১)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও তাউস (রহ.)-এর মতে, তিলাওয়াতের সিজদা এগারটি। তাঁদের মতে, হানাফীদের যে প্রসিদ্ধ চারটি সিজদা আছে, সেখান থেকে মুফাসসালের তিনটি সিজদা নেই। [সূরা হুজুরাত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত

সূরাগুলোকে মুফাসসিলাত বলা হয়। অতএব, সূরা নজম, ইনশিফাক ও আলাকে কোন সিজদা নেই। [معارف السنن ج ٥ ص ٥٨]

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي (১) দলীল
شَيْئٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - (ابو داود ج ١ ص ١٩٩)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায আসার পর মুফাসসালের কোন আয়াত পাঠের পর সিজদা করেননি।

দলীল (২): عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّحْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا -

(ইতিপূর্বে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, মুফাসসিলাতে কোন সিজদা নেই। ফলে তিলাওয়াতের সিজদা এগারটি।

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, লাইছ ও ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতের সিজদা পনেরটি। তাঁদের মতে, হানাফীদের যে প্রসিদ্ধ ১৪টি সিজদা রয়েছে, তা ছাড়াও সূরা হজেজ অতিরিক্ত আরেকটি সিজদা প্রমাণিত আছে।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... إِنَّ عَقِبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأَهُمَا - (ابو داود ج ١ ص ١٩٩ باب كم سجدة في القرآن، ترمذي ج ١ ص ١٢٨ باب السجدة في الحج)

অর্থাৎ, ... উকবা ইবন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলি যে, সূরা হজেজের মধ্যে কি দুটি সিজদা আছে? তিনি (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ। যে এই দুটি সিজদা আদায় করে না সে যেন এই সূরা তিলাওয়াত না করে।

* ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতের সিজদা মোট চৌদ্দটি। কিন্তু ইহা নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, সূরা সোয়াদ (ص)-এ কোন সিজদা নেই। আর সূরা হজেজ দুটি সিজদা রয়েছে। আর আহনাফের মতে, সূরা হজেজ শুধু একটি সিজদা এবং সূরা সোয়াদ-এ একটি সিজদা রয়েছে। (بذل المجهود ج ٢ ص ٣١٤)

[ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী তেলাওয়াতের সিজদার সূরা ও আয়াত নং প্রদান করা হলঃ আরাফ- ২০৬, রাদ- ১৫, নহল- ৫০, বনী ইসরাঈল- ১০৯, মরিয়ম- ৫৮, হজ্জ- ১৮, ফুরকান- ৬০, নমল- ২৬, আলিফ-লাম সিজদাহ- ১৫, সোয়াদ- ২৫, হা-মীম আস্ সিজদাহ- ৩৮, নজম- ৬২, ইনশিকাক- ২১, আলাক- ১৯।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, সূরা সোয়াদ-এ সিজদা না হওয়ার দলীল-

... عَنْ أَبِي عُبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২০০ باب

السجود في ص، بخاري ج ১ ص ১৬৬ باب سجدة ص، ترمذي ج ১ ص ১২৭ باب السجدة في ص)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের মধ্যে যে সিজদাটি আছে তা আবশ্যিক নয়।

পক্ষান্তরে সূরা হজ্জ দুটি সিজদা হওয়ার ব্যাপারে দলীল হিসেবে ঐ দুটি হাদীস পেশ করা যায়, যা ইমাম আহমদ (রহ.) দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (সূরা হজ্জের দুটি সিজদার মধ্যে একটি হল যা হানাফীদের মতানুযায়ী ১৮ নং আয়াত, আর দ্বিতীয়টি হল ৭৭ নং আয়াত।)

হানাফীদের দলীলঃ সূরা সোয়াদে সিজদাঃ

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى

الْمِنْبَرِ ص فَلَمَّا بَلَغَ السُّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২০০)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিশরের উপর অবস্থানকালে সূরা সোয়াদ তিলাওয়াত করেন। তিনি সিজদার আয়াতে পৌঁছে মিশর হতে অবতরণ করে সিজদা আদায় করেন। ঐ সময় লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা আদায় করে।

দলীল (২)ঃ হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি সূরা সোয়াদে কি সিজদা আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

(بخاري ج ২ ص ১১৬ كتاب التفسير)

এ সমস্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা সোয়াদে সিজদা রয়েছে।

সূরা হজ্জে এক সিজদা হওয়ার ব্যাপারে আহনাফদের দলীলঃ

(১) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর আছর-

قَالَ فِي سُجُودِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَزِيمَةٌ وَالْآخِرِ تَعْلِيمٌ- (طحاوي ج ১ ص ১৭৭)

অর্থাৎ, তিনি বলেছেন, সূরা হজ্জের প্রথম সিজদা হল আযীমত তথা আবশ্যিক, আর দ্বিতীয়টি হল শিক্ষামূলক।

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى فِي سُورَةِ الْحَجِّ إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً الْأُولَى - (২) দলীল
(মوطা محمد ص ১৪৮)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) সূরা হজ্জের শুধু প্রথম সিজদার মত পোষণ করতেন।

উপরোল্লিখিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা হজ্জে একটি সিজদা রয়েছে।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে মালিকীদের প্রথম দলীলের জবাবঃ যদিও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে সিজদা না করার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

... قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - (ابو داود ج ১ ص ১৭৭ باب السجود في اذا السماء انشقت، مسلم ج ১

ص ২১০، ترمذي ج ১ ص ১২৭ باب في السجدة اذا السماء انشقت، نسائي ج ১ ص ১০২ باب السجود في اذا

السماء انشقت)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, আমরা সূরা ইয়াস-সামাউন শাক্কাত ও ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাকা পাঠের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সিজদা আদায় করেছি।

সূরা ‘নজম’-এর ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ ... (بخاري ج ১

ص ১৪৬، مسلم ج ১ ص ২১০، ترمذي ج ১ ص ১২৭) [অর্থ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে]

যাই হোক, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা সিজদা না করার কথা বুঝা গেলেও আবু হুরায়রা (রাঃ) (মুসলিম শরীফে ইবন মাসউদ)-এর হাদীস দ্বারা সিজদা করার কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর এক্ষেত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসই প্রাধান্য লাভ করা স্বাভাবিক। কেননা, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা ইবন আব্বাসের হাদীস রহিত হয়ে গেছে।

* অথবা, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর এ ব্যাপারে জানা ছিল না, তাই তিনি স্বীয় এলেম অনুযায়ী ‘না’ বলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী।

* ইবন আব্বাসের সনদে “মাতারুল ওয়াররাক” নামক একজন রাবী রয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন এবং আবু হাতেমের মতে তিনি হলেন যঈফ রাবী। (بذل المجهود ج ২ ص ৩১৬)

ইমাম মালিক (রহ.)-এর দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা একেবারেই সিজদা না করার কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। হতে পারে কোন ওয়রবশত তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা আদায় করেননি, পরে আদায় করেছেন।

(২) অথবা, তখন ছিল মাকরুহ সময়। ফলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা আদায় করেননি। (تنظيم ج ١ ص ٣٦٥)

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ লক্ষণীয় যে, তিনি সূরা হজ্জের যে আয়াতটি দ্বারা দ্বিতীয় সিজদা প্রমাণ করতে চান সে আয়াতটিতে রুকু এবং সিজদার হুকুম একই সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا**

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর। (হজ্জঃ ৭৭)

অথচ পবিত্র কুরআনে যেখানে তেলাওয়াতের সিজদা রয়েছে, সেখানে শুধু সিজদা অথবা শুধু রুকুর কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং যেখানে উভয়টি একত্রিত করা হয়েছে, সেখানে সিজদায়ে তেলাওয়াত নেই। যেমন-

يَمْرِمُ افْتَنِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

অর্থাৎ, হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সিজদা ও রুকু কর। (আল-ইমরানঃ ৪৩)

উক্ত আয়াতে যেমন সিজদায়ে তিলাওয়াত নেই, তেমনিভাবে “সূরা হজ্জ”-এর ৭৭ নং আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত নেই।

তবে এতটুকু বলা যায় যে, বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে যেহেতু সিজদার কথা পাওয়া যায়, তাই ফাতহুল মুলহিমের গ্রন্থকারসহ হানাফী মাযহাবের অভিজ্ঞ আলিমদের অভিমত হল, সতর্কতামূলক সিজদা করে নেয়াই ভাল। (فتح المليم ج ٢ ص ١٦٧)

* হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী খানবী (রহ.) বলেন, যদি তিলাওয়াতকারী নামাযের বাইরে হয়, তাহলে তার হজ্জের দ্বিতীয় সিজদার আয়াতেও সিজদা করে নেয়া উচিত। যদি নামাযের মধ্যে হয়, তাহলে এই আয়াতে রুকু করে নেয়া উচিত এবং রুকুতেই সিজদার নিয়ত করে নেবে, যাতে এর আমল সকল ইমামের অনুযায়ী হয়ে যায়। (المعارف ج ٥ ص ٨٣)

∴ তাছাড়া তাঁর প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবে আব্দুল হক ও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন, হাদীসটি যঈফ। কেননা এতে হারিস ইবন সাঈদ এবং আব্দুল্লাহ ইবন মুনাইন দু'জন রাবী রয়েছেন যারা অজ্ঞাত। (تنظيم ج ١ ص ٣٦٥)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উকবা ইবন আমের (রাঃ)-এর সনদেও ইবন লাহীআহ এবং মুশাররিহ ইবন হাআন নামক যে দু'জন রাবী রয়েছে উভয়েই দুর্বল। তাই ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়। (بذل المجهود ج ২ ص ৩১০)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীল হিসেবে প্রদত্ত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের জবাব স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক রেওয়ায়েতে সূরা সোয়াদে সিজদার প্রমাণ মিলে। (এজন্য ইমাম আবু হানিফার প্রদত্ত দলীল দ্রষ্টব্য) সুতরাং স্ববিরোধী রেওয়ায়েত দলীলযোগ্য নয়।

* আর সূরা হজ্জে তিনি যে দু'সিজদার দাবীদার এর জবাব তাই, যা আহমদ (রহ.)-এর অভিমতের জবাবে প্রদান করা হয়েছে।

২০০ : بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُتْرِ ص ২০০ বিতিরের নামায সুন্নত

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتُرَّ يُحِبُّ الْوُتْرَ- (ابو দাউদ জ ১ ص ২০১, তرم্‌যি জ ১ ص ১০৩, باب ان الوتر ليس بحتم, نسائي ج ১ ص ২৪৬, باب الامر بالوتر, ابن ماجه ص ৮৩)

অনুবাদঃ ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আল্লাহ তাআলা বেজোড় (একক), কাজেই তিনি বেজোড় (বিতির)-কে ভালবাসেন।

বিশ্লেষণঃ বিতিরের নামায ওয়াজিব না সুন্নত- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও সাহেবাইনের মতে, বিতিরের নামায সুন্নত, ওয়াজিব নয়। (هداية ج ১ ص ১৪৪, تنظيم ج ১ ص ৪১৭)

... فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَفَسُ صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِمْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ الخ (ابو দাউদ জ ১ ص ২০১)

অর্থঃ, ... উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং অলসতাবশতঃ কিছুই পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য অঙ্গীকার করেছেন।

দলীল (২): হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ إِفْتَرَضَ عَزُّ وَجَلُّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ إِفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسٌ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا؟ قَالَ إِفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ

خَمْسٌ الْخ (নসائي ج ১ ص ৮০ باب كم فرضت في اليوم والليلة، بخاري ج ১ ص ২০৫ كتاب الصوم باب وجوب الصوم)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর পূর্বে বা পরে কোন কিছু আছে কি? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

অতএব, বিতির যদি ওয়াজিব হত, তাহলে নামাযের সংখ্যা হয়ে যেত ছয়।

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوُتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سَنٌ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخ (ترمذي ج ১ ص ১০৩، نسائي ج ১ ص ২৫৬)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিতির তোমাদের ফরয নামাযের মত আবশ্যিক নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটিকে সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকেই ফরয হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বিতির নামায সুন্নত।

আকসী দলীলঃ বিতির নামাযে না আযান আছে, না ইকামত আছে এবং না ইহা আদায়ের জন্য আলাদা কোন সময় আছে। আর এসব হচ্ছে সুন্নতের আলামত। তাই বিতিরের নামায সুন্নত।

* ইমাম আবু হানিফা, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)-এর মতে, বিতিরের নামায ওয়াজিব, সুন্নত নয়। (هداية ج ১ ص ১৫৫، تنظيم ج ১ ص ৫২০)

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا (ابو داود ج ১ ص ২০১ باب فيمن لم يوتر)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বিতিরের নামায একটি দায়িত্ব। যে ব্যক্তি এটা আদায় করবে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এই উক্তিটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

সুন্নত ত্যাগকারীর উপর একাধিকবার এমন কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হতো না। সুতরাং বিতিরের নামায ওয়াজিব, সুন্নত নয়।

... عَنْ خَارِجَةَ بِنِ حُذَافَةَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّكُمْ بِالصَّلَاةِ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوُتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ- (ابو داود ج ১ ص ২০১, তرمذি ج ১ ص ১০৩ باب فضل الوتر, ابن ماجه ص ৪২)

অর্থাৎ, ... খারিজা ইবন হুযাফা আল-আদাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের ঘোড়া (অতি মূল্যবান সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম একটি নামায নির্ধারণ করেছেন এবং এটাই হল বিতির। এই নামাযের আদায়কাল হল এশার নামাযের পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।

উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় যে, বিতিরের নামাযকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ সাধারণত ফরযের ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। আর সুন্নতের সম্বন্ধ নবী করীম (সাঃ)-এর দিকে করা হয়ে থাকে। সুতরাং কিয়াসের চাহিদা ছিল তো এই যে, বিতিরের নামায ফরয হোক। কিন্তু খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে আমরা (হানাফীগণ) বিতিরকে ফরয না বলে ওয়াজিব বলে থাকি।

দলীল (৩): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে বিতির আদায়ের ক্ষেত্রে আমর (নির্দেশ)-এর ছীগা বর্ণিত হয়েছে। আর আমর ব্যবহৃত হয় ওয়াজিব বুঝানোর জন্য। সুতরাং বিতিরের নামায ওয়াজিব। (আইনী রহ. বলেন, যার একটি আয়াতও মুখস্থ আছে, সেও আহলে কুরআন। সুতরাং আহলে কুরআন বলতে শুধু হাফেজই নন)

দলীল (৪): হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ-

(আবু দাউদ জ ১৩৩ ব ২০৩ বাব ফি الدعاء بعد الوتر، ترمذي ج ১ ص ১০৬ باب الرجل ينام عن الوتر او ينسى، ابن ماجه ص ৮৫)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলের কারণে বিতিরের নামায আদায় করেনি, সে যেন তা সুরণ হওয়ার পরপরই আদায় করে নেয়।

উক্ত হাদীসে বিতিরের কাযা আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কাযার হুকুম ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুন্নতের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, বিতির ওয়াজিব- সুন্নত নয়।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন, তাঁদের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্বারা এতটুকু বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত আর কোন ফরয নামায নেই। আর বিতিরকে তো আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত ফরয মনে করি না এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফেরও বলি না। সুতরাং এর দ্বারা তো বিতির নামায ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

* অথবা উক্ত হাদীসসমূহ বিতির ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের হাদীস।

আকলী দলীলের জবাবঃ আযান-ইকামত শুধু فرض اعتقادي বা দৃঢ় বিশ্বাস সম্পন্ন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিতির যেহেতু ওয়াজিব এবং এশার নামাযের অধীন, তাই এশার আযান-ইকামতই এর জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এর দ্বারা বিতির ওয়াজিব না হওয়ার দলীল হতে পারে না। (تنظيم ج ১ ص ২১১، درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১১৫)

বাস্তবতা হল, এই এখতেলাফ কার্যত শুধু শব্দগত পার্থক্যের পর্যায়ে। এর উদ্দেশ্য হল, তিন ইমামের মতে সুন্নত এবং ফরযের মাঝে আদিষ্ট বিষয়ের কোন স্তর নেই। তাই তাঁরা এর জন্য সুন্নত শব্দ ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এ দুটির মাঝে ওয়াজিবের একটি স্তর রয়েছে। তাই তাঁরা এর জন্য ওয়াজিব শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিন ইমামও বিতিরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত মনে করেন। আর হানাফীগণও এর ফরযিয়াতের প্রবক্তা নন। ফলে এতে অস্বীকারকারীকে তাঁরা কেউই কাফির বলার প্রবক্তা নন। অতএব, উভয়ের মাঝে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। (درس ترمذي ج ২ ص ১১১)

بَابُ كَمْ الْوُتْرُ ص ২০১

বিতিরের নামাযের রাকাত সংখ্যা কত

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِاصْبَعْ يَهْ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى وَالْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ - (মসল জ ১৮৭)
 ২০৭ বَاب صَلَاةُ اللَّيْلِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِ اللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ (মসল জ ১৮৭)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা এশারা করে বলেন, দুই, দুই এবং শেষ রাতে এক রাকাত বিতির। (অর্থাৎ দুই ও এক রাকাত, মোট তিন রাকাত বিতির)

বিশ্লেষণঃ বিতির নামায কয় রাকাত, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, বিতিরের নামায এক থেকে তের রাকাত পর্যন্ত পড়া জায়েয আছে। তবে তাঁদের সাধারণ নিয়ম হল এই যে, দুই সালামের দ্বারা তিন রাকাত পড়া। প্রথম দুই রাকাত এক সালামে এবং অবশিষ্ট এক রাকাত এক সালামের দ্বারা। উল্লেখ্য যে, একমাত্র ইমাম শাফেঈ (রহ.) বিতিরের নামায এক রাকাত হওয়ার উপর অধিক জোর দেন। তাঁর নিকট বিতির তাহাজ্জুদ নামাযের অধীনে। এছাড়া ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) থেকে এক রাকাতের ব্যাপারে তেমন সমর্থন পাওয়া যায় না। (معارف السنن ৪: ২২০)

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ الْخ (আবু দাউদ জ ১৮৮ বَاب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، بخاري ج ১ ص ১০৫، مسلم ج ১ ص ২০৩ بَاب صَلَاةُ اللَّيْلِ الْخ، ترمذي ج ১ ص ১০০ بَاب وَصْفُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، نسائي ج ১ ص ২৫৮ بَاب كَيْفَ الْوُتْرُ بَفَلَاث) অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (সাঃ) রাত্রিতে এক রাকাত বিতিরসহ মোট এগার রাকাত নামায আদায় করতেন।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ

يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ وَاحِدَةً فَلْيَفْعَلْ - (ابو داود ج ١ ص ٢٠١، نسائي

ج ١ ص ١٤٩، ابن ماجه ص ٨٤)

অর্থাৎ, ... আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বিতিরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। যে ব্যক্তি ইহা পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে; যে ব্যক্তি তিন রাকাত আদায়ের ইচ্ছা করে, সে ঐরূপ করবে এবং যে ব্যক্তি এক রাকাত আদায় রকতে চায়, সে এক রাকাত আদায় করবে।

উক্ত হাদীস পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, হানাফীগণ যে আগের দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে মোট তিন রাকাত বিতির আদায় করার কথা বলতেন, উক্ত হাদীসের ফলে এখন আর এই অবকাশ নেই। কারণ এই হাদীসে স্পষ্টভাবে পাঁচ, তিন ও এক রাকাত পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

দলীল (৪): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

بَيْنَ الْوُتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيَسْمَعُهَا - (اثر السنن ص ১০৮, طحاوي ج ১ ص ১৩৬)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতির ও জোড় দু'রাকাতের মাঝে সালাম দিয়ে ব্যবধান করতেন। আর এই সালাম আমাদেরকে শুনাতেন।

উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, দুই সালামে বিতির তিন রাকাত।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, বিতিরের নামায দু বৈঠকে এক সালামের সাথে তিন রাকাত। ইহা তাহাজ্জুদের অধীনে নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র নামায। আর এক রাকাত বিশিষ্ট কোন নামায নেই।

(تنظيم الاشتات ج ١ ص ٤٢١، درس ترمذي ج ٢ ص ٢١٦)

... عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِسَبْعِ

اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ - (ابو داود ج ১ ص ২০১ باب ما

يَرَأَى فِي الْوُتْرِ، ترمذي ج ১ ص ১০৬ باب ما يقرأ في الوتر، نسائي ج ১ ص ২৪৮، ابن ماجه ص ৮৩)

অর্থাৎ, ... উবাই ইবন কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতিরের নামাযে সূরা সাক্বিহিসমা রক্বিকাল আলা, কুল ইয়া আয্যুহাল কাফিরুন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।

দলীল (২): ... عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَوةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا ... ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا - (ابو داود ج ১ ص ১৮৭ باب في صلوة الليل، بخاري ج ১ ص ১০৫ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الخ، مسلم ج ১ ص ২০৫، ترمذي ج ১ ص ১৭৭، نسائي ج ১ ص ২৪৮)

অর্থাৎ, ... আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাস ও অন্যান্য সময়েও রাত্রিতে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। প্রথমে তিনি চার রাকাত আদায় করতেন ... এবং সবশেষে তিনি বিতিরের তিন রাকাত নামায আদায় করতেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শেষের তিন রাকাত বিতিরের নামায এক সালামে আদায় করেছেন।

দলীল (৩): ... عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْئٍ كَانَ يُؤْتَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِي الثَّلَاثَةِ يَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّدَتَيْنِ - (ابو داود ج ১ ص ২০১، তرمذي ج ১ ص ১০৬، ابن ماجه ص ৮৩)

অর্থাৎ, ... আব্দুল আযীয ইবন জুরাইজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিতিরের নামাযে কোন সূরা পড়তেন? উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ (অর্থাৎ, তিনি বলেন, তিনি সাঃ প্রথম রাকাতে সূরা সাক্বিহিসমা রাক্বিকাল আলা, দ্বিতীয় রাকাতে কুল ইয়া আয্মাহাল কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।) রাবী বলেন, তিনি (সাঃ) তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস, নাস ও ফালাক পাঠ করতেন।

দলীল (৪): ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَرُ قَالَتْ كَانَ يُؤْتَرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ الخ - (ابو داود ج ১ ص ১৭৩ باب في صلاة الليل)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন কায়েস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রিতে বিতিরসহ কত রাকাত নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, তিনি (সাঃ) চার রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনো ছয় রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনো আট রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং (কোন কোনসময়) তিনি মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন।

এই হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের রাকাতের সংখ্যা পরিবর্তন হতো, কিন্তু বিতিরের তিন রাকাতের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বরং বিতির সর্বদাই তিন রাকাতেই নির্দিষ্ট আছে।

দলীল (৫): ইমাম আহমদ (রহ.) নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنَزِلَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ أَطْوَلَ مِنْهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ - (آثار السنن ص ১৬২)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এশার নামায পড়তেন তখন ঘরে প্রবেশ করতেন। তারপর দু'রাকাত নামায পড়তেন। এরপর এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ আরো দু'রাকাত আদায় করতেন। তারপর একত্রে ব্যবধান ব্যতীত তিন রাকাত বিতির পড়েছেন।

দলীল (৬): হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوُتْرِ - (نسائي ج ১ ص ২৪৮ باب كيف الوتر بثلاث)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বিতিরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।

দলীল (৭): হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ - (مجمع الزوائد ج ২ ص ২৪২)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, বিতির মাগরিবের ন্যায় তিন রাকাত।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন- (মوطা امام محمد ص ১৪৬) - الْوُتْرُ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ -

অর্থাৎ, বিতির মাগরিবের নামাযের মত।

উক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, বিতিরের তিন রাকাত নামাযকে মাগরিবের তিন রাকাত নামাযের ন্যায় এক সালামে আদায় করা হবে।

জবাবঃ প্রথম দুই দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে, দুই রাকাতের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে মোট তিন রাকাত আদায় করে নিবে। এ উদ্দেশ্য নয় যে, পৃথকভাবে এক রাকাত পড়ে নিবে।

হানাফীদের অভিমতের সমর্থন এই কথার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)ও উক্ত হাদীসের রাবী। (২০৭৮ মুসলিম ১৮)

তিনি (রাঃ) বিতিরের নামায এক সালামে তিন রাকাত হওয়ার দাবিদার। কেননা, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর রাতের নামায বর্ণনা করার পর বলেন-

ثم اوتر بثلاث (মুসলিম ১৮৮১)

সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) "الوتر ركعة من اخر الليل" দ্বারা এই কথাই বুঝেছেন, যা হানাফীগণ বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া শরীয়তে এক রাকাত বলতে কোন নামায নেই। (মুতা মুহম্মদ ১৪৬)

বরং নবী করীম (সাঃ) এক রাকাত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইবন আব্দুল বার হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبَيْتَرَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُؤْتِرُ بِهَا - (نصب الرأية ২৮ ১২০)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বুতায়রা থেকে নিষেধ করেন। আর বুতায়রা অর্থ হল, এক রাকাত বেজোড় নামায পড়া।

সুতরাং এক রাকাত বিতির নামায শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসটি রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (شرح معاني الآثار ১ ১৪২)

এবং তিন রাকাত বিতির নামাযের ইজমা হওয়ার ব্যাপারে হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন-

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ - (مصنف ابن أبي شيبة ২৮ ২৭৬)

অর্থাৎ, মুসলমানরা একথার উপর একমত হয়েছেন যে, বিতিরের নামায তিন রাকাত এবং সালাম শুধু (একটিই) তৃতীয় রাকাতের শেষে।

এখানে "اجمع المسلمون" বলতে সাহাবায়ে কিরাম তথা আবুবকর, উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, হুযায়ফা, আনাস, উবাই ইবন কাব, আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী ও তাবিঈনদের বুঝানো হয়েছে।

তাছাড়া একথা তো সহজেই বোধগম্য যে, একই নামায কখনো পাঁচ রাকাত, কখনো সাত রাকাত, কখনো তিন রাকাত, আবার কখনো এক রাকাত হওয়া কিভাবে সম্ভব?

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-এর আছারের ব্যাপারে মূল কথা হল, ইবন উমর (রাঃ) স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-কে এমনিভাবে নামায পড়তে দেখেননি এবং নবী করীম (সাঃ) থেকেও এই আমল শেখেননি। সুতরাং এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ।

উক্ত হাদীসের প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, নবী (সাঃ) যখন তাশাহুদের মধ্যে যে সালাম রয়েছে “السلام عليك ايها النبي” উচ্চারণ করলেন, এটাকে তিনি নামায ভঙ্গের সালাম মনে করেছেন।

* তিন রাকাত বিতিরে দু’রাকাতে সালাম দিয়ে মাঝখানে পৃথককরণের হাদীস বর্ণনাকারী শুধু হযরত ইবন উমর (রাঃ)। পক্ষান্তরে, ইবন মাসউদ, উবাই ইবন কাব, আনাস (রাঃ) সহ বিশিষ্ট সাহাবীগণ এক সালামে তিন রাকাত বিতির আদায়ের প্রবক্তা। সর্বোপরি নবী করীম (সাঃ) এভাবেই আদায় করতেন।

তাছাড়া পৃথক করে যদি নামায পড়া হয়, তাহলে শেষের নামায হচ্ছে এক রাকাত, যা হাদীসে বুতায়রার (এক রাকাত নিষেধাজ্ঞার) বিপরীত। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়ায় উসূলে হাদীসের ফায়সালা হল, হাদীসে বুতায়রা হচ্ছে বাচনিক। আর ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ক্রিয়ামূলক হাদীসের উপর বাচনিক হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে।

ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস হচ্ছে হালাল সম্পর্কিত, আর হাদীসে বুতায়রা হচ্ছে হারাম সম্পর্কিত। আর যখন হালাল এবং হারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন হারাম সম্পর্কিত হাদীস প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং এ সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইবন উমরের রেওয়ায়েত দলীলযোগ্য নয়।

তাছাড়া বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর রাত্রের নামায এবং বিতিরের রেওয়ায়েতকারী সাহাবা অনেক। যাঁদের মধ্যে হযরত আয়িশা (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ), হযরত ইবন উমর (রাঃ) এবং হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ অন্যতম। এখন দেখতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে কার রেওয়ায়েত অধিক গ্রহণীয় এবং ফায়সালাযোগ্য।

সুতরাং যিনি সর্বদা সন্নিহিত থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর নামায সচক্ষে দেখেছেন, তাঁর রেওয়ায়েতই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর বিতির সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা, তিনি দীর্ঘ সময় নবী করীম (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও

মেধার পূর্ণতা, ইলমের প্রতি আগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয়। বিতিরের সময় তিনিই নবী করীম (সাঃ)-কে ডেকে দিতেন। আর অন্য সাহাবীগণ ঘটনাচক্রে হয়ত দু'একবার নবী করীম (সাঃ)-এর বিতিরের নামায দেখেছেন। সুতরাং বিবেকের দাবি হল এই যে, হযরত আয়িশা (রাঃ) যে রেওয়ায়েত করেছেন, তাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর তা হল এক সালামে তিন রাকাত নামায আদায় করা। যা সাহাবায়ে কিরামের আমলও তাঁর রেওয়ায়েতকে শক্তিশালী করে। সুতরাং রেওয়ায়েত এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হল, হানাফী মাযহাবই অধিক যুক্তিসঙ্গত। (১১৭-১১৮ ص ২৮ مشکوٰۃ)

بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ ص ২০১

বিতিরের নামাযে দুআ কুনূত

... عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ الْخ (ترمذي ج ১ ص ১০৬ باب القنوت في الوتر، نسائي ج ১

ص ২০২ باب الدعاء في الوتر، ابن ماجه ص ৮৪)

অনুবাদঃ ... আবুল হাওরা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হাসান ইবন আলী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বিতিরের নামাযে পাঠ করি।

বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুআ কুনূতের ব্যাপারে দুইটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) বিতিরে দুআ কুনূত সারা বছরই পড়তে হবে নাকি রমযানের শেষ অর্ধেক।

(খ) দুআ কুনূত রুকুর আগে না পরে?

প্রথম আলোচনাঃ ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনূত সারা বছর নয়, বরং শুধু রমযানের শেষ অর্ধেক পড়া হবে। আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, শুধুমাত্র পুরা রমযানে পড়া হবে। (معارف السنن ج ৪ ص ২৪২)

দলীল (১) عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ يَعْنِي فِي

رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النَّصَبِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (ابو داود ج ২ ص ২০২)

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (রহ.) থেকে তাঁর কোন কোন বন্ধুর সূত্রে বর্ণিত, উবাই ইবন কাব (রাঃ) রমযানে তাদের ইমামতি করতেন এবং শেষার্ধে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

দলীল (২): عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بَنِ كَعْبٍ ... وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النُّصْفِ الْبَاقِي الْخ (ابو داود ج ১ ص ২০২)

অর্থাৎ, হাসান বসরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) লোকদেরকে উবাই ইবন কাবের পিছনে তারাবীর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন। ... এবং তিনি রমযানের বাকী শেষ দশদিন বিতিরের নামাযে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

দলীল (৩): হযরত আলী (রাঃ)-এর আছার-

إِنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النُّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (ترمذي ج ১ ص ১০৬)

অর্থাৎ, তিনি রমযানে শুধু শেষ অর্ধাংশেই কুনূত পড়তেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, বিতিরের কুনূত রমযানসহ সারা বছরই পড়তে হবে।

(معارف السنن ج ১ ص ২৪১، تنظيم ج ১ ص ২৪৮)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে রমযান বা রমযানের অর্ধেক সময় পড়া হবে এমন কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং বিতিরের কুনূত সারা বছরই পড়তে হবে।

দলীল (২): হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর আছার-

إِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوُتْرِ وَأَخْتَارَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ - (ترمذي ج ১ ص ১০৬)

(مجمع الزوائد ج ২ ص ২৪৪، مصنف ابن أبي شيبة ج ২ ص ৩০৬)

অর্থাৎ, তিনি সারা বছরই বিতিরে রুকু পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে শাফেঈদের প্রথম ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত উবাই ইবন কাব (রাঃ)-এর রমযানের কুনূত দ্বারা বিতিরের কুনূত উদ্দেশ্য নয় বরং কেবল পাঠে দীর্ঘ কিয়াম বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা দীর্ঘ কিরাতকেও কুনূত বলা হয়। এমনিভাবে তৃতীয় দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর উত্তরও তাই। অর্থাৎ, তাঁরা রমযানের শেষার্ধে যতটুকু দীর্ঘ কিয়াম করতেন, সাধারণত অন্যান্য দিনে তা করতেন না।

তাছাড়া প্রথম হাদীসের সনদে বলা হয়েছে, হাদীসটি “তাঁর কোন কোন বন্ধুর সূত্রে” বর্ণিত। আর ইহা একটি অজ্ঞাত ব্যাপার। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। কেননা, হাদীসের সনদে হাসান দ্বারা হাসান বসরীকে বুঝানো হয়েছে। অথচ তাঁর সাথে উমর (রাঃ)-এর

সাক্ষাৎ ঘটেনি, কেননা হাসান বসরী (রহ.) হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং দুই বছরের বাচ্চা কিভাবে হাদীস বর্ণনা করেন? সুতরাং এই হাদীসটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। আর মুনকাতি হাদীস দলীলযোগ্য নয়। (بذل المجهود ২ ج ص ২২৭، تنظيم ج ১ ص ২৮৪)

* যেখানেই কুনূতের কথা উল্লেখ রয়েছে সেখানেই **كَانَ يَقْنُتُ** শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

যা অব্যাহত চলমানের (استمرار) নির্দেশক। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, দুআ কুনূত নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন বা মাস হিসেবে পড়া হবে না। বরং সারা বছরই পড়তে হবে। তাছাড়া কিয়াসের চাহিদাও এই যে, দুআ কুনূত সারা বছরই পড়া হোক। কেননা বিতির যেহেতু সারা বছর, তাই দুআ কুনূতও সারা বছর হওয়াই উচিত।

(التعليق ২ ج ص ১০২)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ দুআ কুনূত রুকুর আগে না পরে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা-

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও ইবন সীরীন (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনূত পড়তে হবে রুকুর পরে।

দলীল (১)ঃ দারা কুতনীতে বর্ণিত। হযরত সুয়াইদ ইবন গাফলাহ বলেন-

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَقُولُونَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْوُتْرِ - (تنظيم ج ১ ص ২৮৭)

অর্থাৎ, আমি আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সাঃ) বিতিরের শেষের দিকে দুআ কুনূত পাঠ করেছেন।

দলীল (২)ঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর আছার-

وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ - (ترمذي ج ১ ص ১০৬)

অর্থাৎ, ... হযরত আলী (রাঃ) রুকুর পরে দুআ কুনূত পড়তেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনূত রুকুর পূর্বে পড়তে হবে। ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) থেকে অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

দলীল (১)ঃ উবাই ইবন কাব-এর হাদীস-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ - (ابن ماجه ص ৪১)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বিতিরের রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন।

দলীল (২)ঃ মুসান্নাফ ইবন আবু শায়বাতে হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত আছে-

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ - (اثار السنن ص ১৬৮)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) এবং নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য সাহাবীগণ বিতিরের রুকুর পূর্বে দুআ কনূত পড়তেন।

জবাবঃ আহনাফগণ শাফেঈদের প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবে হেদায়া প্রণেতার ভাষায় বলেন, বিতিরের শেষের দিক বলতে রুকুর পরে হওয়া বুঝানো আবশ্যিক নয়। বরং এর দ্বারা তৃতীয় রাকাত বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, কোন জিনিসের অর্ধেকের বেশি হলেই তাকে আখের বা শেষ বলা যাবে। অতএব, রুকুর পূর্বেও যদি কনূত পড়া হয়, তবে একেও আখের বলা সহীহ হবে। আর হানাফীদের হাদীসে তাই বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ রুকুর পরে কনূত পড়া ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে শুধুমাত্র এক মাস কনূতে নাযিলা (যা মুসলমানদের বিপদের সময় পড়া হয়) পড়তে দেখেছেন। আর এর উপরই তিনি (রাঃ) বিতিরের কনূতকে কিয়াস করেছেন। যা হানাফীদের মারফু হাদীসের মুকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়। কনূতে নাযিলাতে আমরাও (আহনাফগণ) রুকুর পরে কনূত পড়ার প্রবক্তা। (درس ترمذي ج ২ ص ২৩৬-২৩৭)

كِتَابُ الزَّكَاةِ : যাকাত অধ্যায়

بَابُ مَا تَحِبُّ فِيهِ الزَّكَاةُ ص ২১৭

যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয়

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ دَوْدَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوَاتٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ - (بخاري ج ١ ص ١٩٦ باب ليس فيما دون خمسة الخ، مسلم ج ١ ص ٣١٥ كتاب الزكاة، ترمذي ج ١ ص ١٣٦ باب صدقة الزرع والتمر والحبوب، نسائي ج ١ ص ٣٤٤ القدر الذي تجب فيه الصدقة، ابن ماجه ص ١٢٩)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, রূপার পরিমাণ দুই শত দিরহামের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

যাকাতের আভিধানিক অর্থঃ زَكَاةٌ শব্দটি تَزْكِيَةٌ-এর ইসমে মাসদার। এর মূল ধাতু হল - ز - ك - و থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ হল- পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা।

* “লিসানুল আরব” গ্রন্থকারের মতে, যাকাত শব্দের অর্থ হল-

(১) التَّمَاء - বৃদ্ধি পাওয়া, পরিমাণে বেশি হওয়া।

(২) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - পবিত্রতা। যেমন, পবিত্র কুরআনের আয়াত-
অর্থাৎ, যে নিজেকে শুদ্ধ (পবিত্র) করে, সেই সফলকাম হয়। (আশ-শামসঃ ৯)

(৩) الْبَرَكَةُ - বরকত, প্রাচুর্য।

(৪) الْمَذْحُ - গুণকীর্তন বা প্রশংসা।

* আবু আলী বলেন, যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, খাঁটি, নিখুঁত বা নির্ভেজাল।

* কেউ কেউ বলেন, যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে- الْمَصَدَقَةُ বা দান।

* কারো কারো নিকট এর অর্থ হচ্ছে- صَفْوَةُ الشَّيْءِ বা উত্তম বস্তু।

প্রকৃত অর্থে যাকাতের মাধ্যমে যেহেতু সম্পদ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, বরকত ও খাঁটিত্ব লাভ করে, তাই যাকাতের এরূপ অর্থ করা হয়েছে।

যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

تَمْلِيكَ جُزْءٍ مَالٍ عَيْنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمُنْفَعَةِ عَنِ الْمَمْلُوكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى - (تنوير الابصار ج ٢ ص ٢)

অর্থাৎ, শরীয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী মালের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম দরিদ্রকে নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করা যাতে কোন উপকারের আশা না থাকে। গরীব লোকটি হাশেমী বা তাদের গোলাম হবে না।

* ইউসুফ আল কারযাভী বলেন-

الرَّكُوءَةُ تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمَقْدَرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ -

অর্থাৎ, প্রকৃত অধিকারীকে শরীয়ত নির্ধারিত সম্পদ দেয়াকে যাকাত বলে।

* আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন- الرَّكُوءَةُ حَقٌّ يَجِبُ فِي الْمَالِ -

অর্থাৎ যাকাত এমন দায়িত্ব যা মালের উপর ওয়াজিব হয়।

* লুবাব গ্রন্থকার বলেন- تَمْلِيكَ جُزْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ -

مَخْصُوصٌ لِلَّهِ تَعَالَى - (اللباب ج ١ ص ١٣٩)

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টকালের একটি নির্ধারিত অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া।

* আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার সম্পদ থেকে নির্ধারিত কিছু অংশ গরীবদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া, তবে তা হতে হবে হাশেমী পরিবার ব্যতীত।

মূল কথা হল, কোন সাহেবে নিসাব মুসলমান নিজ পরিবার-পরিজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর পর বহরান্তে যদি ন্যূনতম পক্ষে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

* যাকাত কখন কোথায় ফরয হয়ঃ যাকাত কখন, কোথায় ফরয হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা-

* ইবন খুযাইমা বলেন, اِنْ قَرَضَ الزَّكَاةَ كَانَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ -

অর্থাৎ যাকাত হিজরতের পূর্বেই (মক্কায়) ফরয হয়েছিল।

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী - **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**

অর্থাৎ, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। (মুয্যাস্মিলঃ ২০)

আর সূরা মুয্যাস্মিল ইসলামের শুরুর দিকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

দলীল (২): উম্মে সালামা (রাঃ) হতে সাহাবীদের আবিসিনীয়া হিজরতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, হযরত জাফর ইবন আবু তালিব (রাঃ) কর্তৃক নাজ্জাশীর রাজদরবারে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছেন-

وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে নামায ও যাকাতের আদেশ করেন।

* জমহুরগণের মতে, হিজরতের পরে মদীনাতেই যাকাত ফরয হয়েছিল। তবে কত হিজরীতে যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হয় তা নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রদান করেন। যেমন-

* কেউ কেউ ধারণা করেন, ১ম হিজরীতে যাকাত ফরয হয়।

* ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হিজরী দ্বিতীয় সালে যাকাত ফরয হয়।

* আল্লামা ইবন আছীর (রহ.) বলেন, যাকাত নবম হিজরীতে ফরয হয়।

(فتح الهاري ج ٣ ص ٢١١)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ) জনৈক সাহাবীকে যাকাত সংগ্রহে পাঠালে সালাবা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে। আর এ ঘটনা ঘটে নবম হিজরীতে। সুতরাং যাকাত নবম হিজরীতে ফরয হয়েছিল।

* হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, নবম হিজরীর পূর্বে তথা পঞ্চম হিজরীরও পূর্বে যাকাত ফরয হয়।

দলীলঃ যিমাম ইবন সালাবা (রাঃ)-এর হাদীস-

أَشْهَدُكَ بِاللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقَرَانِنَا-

(بخاري ج ١ ص ١٥ باب القراءة والعروض)

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদেব নিকট থেকে এই সদকা উসূল করে আমাদের ফকীরদের মাঝে তা বন্টন করতে?

আর হযরত যিমাম ইবন সালাবা (রাঃ) মদীনা তায়িযায় এসেছিলেন পঞ্চম হিজরীতে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায় করা এবং বন্টনের বিধান পঞ্চম হিজরীর পূর্বেই হয়েছিল।

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, বিশুদ্ধতম উক্তি হল-

إِنَّ الزُّكُوتَ نَزَلَ بِمَكَّةَ مَقَادِيرُ الصَّيْبِ وَالْمَخْرُجُ لَمْ تُبَيَّنْ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ-

অর্থাৎ, যাকাত তো (হিজরতের পূর্বে) মক্কাতেই নাযিল (ফরয) হয়েছিল। তবে এর নিসাব ও বিস্তারিত নিয়ম-বিধি মদীনায় নাযিল হয়েছে। মূলতঃ যাকাত, রোযা, জুমআ এবং ঈদের নামায ইত্যাদি হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই ফরয হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে এবং সাহাবীদের মন-মানসিকতা তখনো সেভাবে গড়ে না ওঠার কারণে এর বাস্তব কার্যকারিতা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। (معارف السنن ج ٥ ص ١٥٩، فتح الباري ج ٣ ص ٢١١)

যাকাত কার উপর ফরয?

যাকাতের বিধান সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ কিছু শর্তাবলীর বিবেচনায় যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে। যথাঃ

(১) মুসলমান হওয়া। কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়। কারণ, কাফের ইসলামের বিধি-বিধান পালনে বাধ্য নয়।

(২) স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া। সুতরাং কোন পরাধীন গোলামের উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়।

(৩) বালেগ হওয়া। সুতরাং নাবালেগের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

(৪) জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং কোন অজ্ঞান, মাতাল বা পাগলের ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়।

(৫) পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া। যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত ওয়াজিব হবে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অর্থাৎ, যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ নগদ অর্থ বা সম্পদের মালিক হওয়া।

(৬) নিসাব এক বছর স্থায়ী হওয়া। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

... لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ - (ابو داود ج ١ ص ٢٢١ باب في زكاة

الساعة، ترمذي ج ١ ص ١٣٨ باب لا زكاة على المال الخ، ابن ماجه ص ١٢٩)

অর্থাৎ, ... যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নেই।

(৭) ঋণগ্রস্ত না হওয়া। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয নয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতঃ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাবঃ ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ একথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কারো গৃহে যদি ২০ মিসকাল স্বর্ণ পুরোপুরি এক বৎসরকাল অতিবাহিত হয় তাহলে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে উক্ত সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসেবে আধা মিসকাল যাকাত দিতে হবে। ২০ মিসকাল যার বর্তমান হিসাব

অনুযায়ী ওজন হল সাড়ে সাত তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ। এবং এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, ২০০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ৫২ তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম রূপা কারো গৃহে পূর্ণ এক বৎসরকাল থাকে, তাহলে তার উপর ৪০ ভাগের ১ ভাগ তথা ৫ দিরহাম বা এর সমপরিমাণ সম্পদ যাকাত দিতে হবে। এর কমে কারো মতে যাকাত ওয়াজিব নয়। (معارف السنن ج ৫ ص ১৭০-১৭১)

... عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَةٌ (১) دَلِيلُ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْئٌ يَعْنِي فِي الدَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابُ ذَلِكَ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২২১)

باب في زكوة السائمة

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম থাকে, তবে বৎসরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। আর বিশ দীনারের কম পরিমাণ স্বর্ণে যাকাত ওয়াজিব নয়। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশি হয়, তবে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

[উল্লেখ্য যে, এক দীনারের স্বর্ণমুদ্রার ওজন এক মিসকাল। সুতরাং বিশ দীনার সমান ২০ মিসকাল।]

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। এছাড়াও এ ব্যাপারে অনেক মারফু হাদীস রয়েছে।

* নিসাবের অতিরিক্ত স্বর্ণ ও রূপার যাকাতঃ কারো নিকট যদি ২০ মিসকালের অতিরিক্ত স্বর্ণ এবং ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত রৌপ্য থাকে, তবে এর যাকাতের বিধান কি হবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ২০ মিসকালের অতিরিক্ত যদি এক মিসকালও থাকে এবং ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত এক দিরহামও থাকে, তাহলে সেই অতিরিক্ত প্রতি মিসকাল ও প্রতি দিরহামের জন্য হিসেব মতে ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে। (تنظيم الاثنتان ج ২ ص ১৮)

দলীলঃ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীস- فَمَا زَادَ فَحِسَابُ ذَلِكَ

উক্ত হাদীসে زاد শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কম হোক অথবা বেশি হোক।

* ইমাম আবু হানিফা, হাসান বসরী, আতা, তাউস, যুহরী, আওয়াঈ, শাবী (রহ.) প্রমুখের মতে, ২০ দিনারের পর যদি অতিরিক্ত ৪ দিনার হয়, তাহলে প্রতি ৪ দিনারের জন্য ১ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এমনভাবে ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত যদি ৪০ দিরহাম হয়, তাহলে প্রতি ৪০ দিরহামের জন্য ১ দিরহাম যাকাত দেয়া ওয়াজিব। মূল কথা হল, নিসাবের অতিরিক্ত প্রতি এক পঞ্চমাংশে ঐ হিসাবেই (২.৫%) যাকাত দেয়া ওয়াজিব। (تنظيم الاثنيات ২৮ ص ১৭)

দলীল (১): নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ مَنَاقِيلَ صَدَقَةٌ

অর্থাৎ, কোন যাকাত হবে না চার মিসকালের কম স্বর্ণে।

দলীল (২): মাকহুল হতে বর্ণিত আছে-

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْئٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (ابن أبي شبة)

অর্থাৎ, দুই শতের উপরে আরো চল্লিশ দিরহাম পর্যন্ত না পৌঁছালে তার উপর যাকাত হবে না।

দলীল (৩): নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ (تنظيم ২৮ ص ১৭)

অর্থাৎ, ২০০ দিরহামের উপর বেড়ে গেলে প্রতি ৪০ দিরহামের জন্য ১ দিরহাম পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে হবে।

জবাবঃ (১) ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর প্রদত্ত হাদীসে আসেম ও হারেস দু'জন রাবী রয়েছেন, যারা সমালোচনার উর্ধ্বে নন।

(২) فما زاد দ্বারা নিঃশর্ত অতিরিক্ত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যদি নিসাব থেকে চল্লিশ দিরহাম বেশি হয়। (تنظيم الاثنيات ২৮ ص ১৭)

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কারও নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টি থাকলে এবং এর কোন একটির পরিমাণ এককভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে তখন যাকাত আদায় করতে হবে কিনা, এ নিয়ে সামান্য মতভেদ থাকলেও ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আওয়াঈ, সুফিয়ান সাওরী, সাহেবাইন (রহ.) প্রমুখের মতে, এমতাবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়টি মিলিয়েও যদি কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয়, তবু তাকে যাকাত দিতে হবে। তাঁদের কথা হল, স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই একই জাতের ধাতু। আর উভয়টি মিলে নগদ অর্থে পরিণত হয়। সুতরাং বর্তমানে যেহেতু রৌপ্যের নিসাব ধরলে একজন সহজেই সাহেবে নিসাব হয়ে যায়, তাই সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ টাকা (আনুমানিক আট/দশ হাজার) যদি কারো নিকট বছরের

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে, যদিও মাঝে কম-বেশি হয়, তাহলে উক্ত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। মূল কথা হল, যে নিসাব (পরিমাণ) ধরলে গরীবদের বেশি উপকার হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেননা, যাকাতের মূল উদ্দেশ্যই হল গরীবদের সহায়তা করা। (১৭০ ص ১ ج ৬)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ যে সকল মালের উপর যাকাতের বিধান ওয়াজিব নয়ঃ প্রত্যেক সাহেবে নিসাবের উপর যাকাতের বিধান ফরয করা হয়েছে। এ বিধানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল সম্পদের উপরই মানুষের জন্য যাকাতের বিধান আরোপ করেননি। এক্ষেত্রে যে সকল মালের উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. **আবাসিক গৃহঃ** মানুষ বসবাসের জন্য এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যে গৃহ তৈরি করে তার উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য নয়। তা যতই মূল্যবান হোক না কেন।

২. **পরিধেয় পোশাকঃ** যে সকল বস্ত্র মানুষ নিজের পরিধানের জন্য তৈরি বা ক্রয় করে, উহা যত মূল্যেরই হোক না কেন, আর যে পরিমাণই থাকুক না কেন, তার উপর যাকাত দিতে হবে না। যেমন- কোট, প্যান্ট, শাড়ি, শেরওয়ানী, মুকুট, চাদর, কম্বল, টুপি, জামা, জুতা ইত্যাদি।

৩. **কৃষিপণ্যের যাকাতঃ** কৃষিকাজে ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জামাদির (যেমন- গরু, মহিষ, উট, লাঙ্গল, কোদাল, কুড়াল, কাঁচি ইত্যাদি) উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা, এগুলোর যাকাত ভূমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসল হতেই উশর হিসেবে আদায় হয়ে যায়।

৪. **ব্যবহৃত আসবাবপত্রঃ** নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্রের (যেমন- খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, সোফা, সুকেস, আলমারী, সিন্দুক, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি) উপর যাকাত ফরয নয়।

৫. **শখের বস্তুঃ** কেউ যদি শখ করে হাউজে বা পুকুরে মাছ পুষে অথবা শখের বশে মুরগী বা পাখি পুষে তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে না।

৬. **বাহন হিসেবে ব্যবহৃত পশুঃ** যে সকল পশু বাহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, (যেমন- গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি) এ সকল পশুর উপরে যাকাত দিতে হবে না।

৭. **হাঁস-মুরগীঃ** কেউ যদি হাঁস-মুরগী প্রতিপালন করে ডিম উৎপাদন এবং বিক্রির উদ্দেশ্যে, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। তবে ফার্মের উৎপাদিত বিক্রি করা ডিম বা মুরগীর উপর অন্যান্য ব্যবসায়ী মালের মতই যাকাত দিতে হবে।

৮. **স্ব-ব্যবহৃত বাহনঃ** স্বীয় কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের (যেমন- মোটর সাইকেল, কার, মাইক্রোবাস, টেক্সি ইত্যাদি) উপর যাকাত দিতে হবে না।

৯. উৎপাদন যন্ত্রঃ উৎপাদন যন্ত্র বলতে বুঝায়, কলকারখানায় ব্যবহৃত মেশিন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এগুলোর নিরাপত্তার জন্য যাবতীয় উপকরণের (যেমন- দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি) উপর যাকাত দিতে হবে না।

১০. দুগ্ধ খামারঃ দেশে প্রচলিত যে সকল দুগ্ধ খামারগুলো রয়েছে, সে সকল খামারের দুগ্ধ উৎপাদনকারী পশুগুলো উৎপাদনেরই উপকরণ মাত্র। তবে উৎপাদিত বস্তুর উপর অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

১১. দুস্প্রাপ্য বস্তুঃ যদি কোন ব্যক্তি মহামূল্যবান দুস্প্রাপ্য কোন বস্তু শখ ও আনন্দের বশে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি তা দিয়ে ব্যবসা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

১২. ব্যক্তিগত প্রয়োজনের গৃহপালিত পশুঃ কেউ যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যেমন- দুগ্ধ পানের জন্য গাভী এবং যানবাহনের কাজে ব্যবহার করার জন্য হাতী, ঘোড়া, উট প্রতিপালন করে তবে তার উপর যাকাত দিতে হবে না।

১৩. জিহাদের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামঃ যে সকল সরঞ্জাম যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য মজুদ রাখা হয় (যেমন- ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি), যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামের খিদ্মত লাভ সম্ভব, এ সকল বস্তুর উপর যাকাত দিতে হবে না।

ফিকাহবিদগণ বলেন, উপরোল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে না, কেননা এ সকল সম্পদ নিত্য ব্যবহারযোগ্য। তাছাড়া এগুলো ক্রমবর্ধমান নয়। সুতরাং এদের উপর যাকাত নেই।

بَابُ الْعَرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتَّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ ص ٢١٨

বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

... عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ -

অনুবাদঃ ... সামুরা ইবন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যবসায়ী মালে যাকাতের বিধানঃ ব্যবসা সম্পদের সমারোহ ঘটায়। ব্যবসা এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা ব্যবসায়ীর নিকট বিভিন্ন সম্পদের সমারোহ ঘটে। কোন কোন সম্পদ হয়ত অল্পদিন স্থায়ী হয়, আবার কোন কোন সম্পদ বছরের পর বছর ব্যবসায়ীর ভান্ডারে জমা থাকে। ইসলামী শরীয়ত ব্যবসায়ীদের ঐ সকল সম্পদের

এবং সম্পদ বিক্রয়োত্তর মুনাফার উপর যাকাতের বিধান আরোপ করেছে। এ বিধান নগদ সম্পদের বিধানেরই অনুরূপ।

যাকাতের বিধানঃ ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে সকল পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে ইসলাম সেগুলোকে ব্যবসার পণ্য হিসেবেই গণ্য করে। কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসায়ী পণ্যের মালিক হয়ে নিজের আয়গুণে ঐ সকল সম্পদগুলো পূর্ণ এক বছর সঞ্চয় করে রাখে আর তা যদি বছরান্তে নগদ মূল্যে নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে ব্যবসায়ের এ সকল সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ী সম্পদে যাকাত ফরজ হওয়ার দলিলঃ ব্যবসায়ের সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার বিধান পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক দলিল উপস্থাপন করা হলো।

দলীল (১)ঃ যাকাতের বিধান জারি করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ-

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন এবং ভূমি থেকে যা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেছে তা থেকে খরচ কর।” (বাকারাহঃ ২৬৭)

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ**

অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদে অধিকার রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের। (যারিয়াতঃ ১৯)
এখানে সকল প্রকার সম্পদের উপরই যাকাত ফরয করা হয়েছে।

দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

ইজমা দ্বারা দলীলঃ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্ট প্রমাণের পরও সাহাবী, তাবেঈ এবং পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণ একথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ব্যবসায়ের সম্পদের উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইবনুল মুনযির বলেন, ব্যবসা লব্ধ সকল সম্পদের এক বছর পূর্ণ হলে তার উপর যাকাতের বিধান ফরয। শরীয়তের সকল অভিজ্ঞজনেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। ইবন আব্বাস, ইবন উমর, ফিকাহবিদ হাসান, জাবির ইবন যায়েদ, নাখঈ, আওয়াঈ (রহ.) প্রমুখ একই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে উল্লিখিত আয়াত এবং রাসূলের হাদীসকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ব্যবসায়ী মালে যাকাতের পদ্ধতিঃ কোন ব্যবসায়ী যে দিন থেকে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করবে ঠিক সেই দিন থেকেই ব্যবসার যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন তার জমাকৃত অর্থাৎ মজুদ সম্পদের হিসাব বের করতে হবে, তারপর নগদ অর্থের ভিত্তিতে দেখতে হবে নিসাব পরিমাণ হয় কিনা। যদি নিসাব পূর্ণ হয় তাহলে যাকাত

দিতে হবে। আর যদি মজুদ সম্পদ এবং নগদ অর্থ উভয় মিলেও যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয়, কিন্তু পরবর্তীতে দাম বেড়ে গিয়ে নিসাবে উপনীত হয় তখন যে দিন দাম বেড়েছে সে দিন থেকেই যাকাতের পূর্ণ হিসাব করতে হবে।

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেঃ কোন ব্যবসায় যদি একাধিক অংশীদার থাকে তাহলে সম্মিলিতভাবে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে প্রত্যেক অংশীদার তার অংশের উপর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাতের পরিমাণঃ কোন ব্যবসায়ী যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তখন তাঁকে ঐ সম্পদের উপর ২.৫% হিসেবে প্রতি ২০০ টাকায় ৫ টাকা যাকাত প্রদান করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য পণ্য এ তিনটি মাধ্যমের সব কটিই যদি কোন ব্যবসায়ীর নিকট অবশিষ্ট থাকে অথচ এককভাবে কোনটাই যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সব কটিরই সার্বিক মূল্য একত্রে হিসেব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত প্রদান করবে।

بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةُ الْحُلِيِّ ص ২১৮

গচ্ছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غُلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ ثَارٍ قَالَ فَخَلَعْتَهُمَا فَالْقَتَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ— (ترمذي ج ১ ص ১৩৮ باب زكاة الحلي، نسائي ج ৩ ص ৩৪৩ زكاة الحلي)

অনুবাদঃ ... আমার ইবন শুআইব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাকন ছিল। তিনি (সাঃ) তাকে বললেন, তোমরা কি এর যাকাত দাও? মহিলা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি কি চাও যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোড়া আগুনের কাঁকন পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে

মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী করীম (সাঃ)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য।

বিশ্লেষণঃ মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত প্রসঙ্গে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে অলংকার বানাতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা- সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আয়িশা, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখের মতে-

ব্যবহার্য অলংকারের মধ্যে কোন যাকাত নেই। (المغني ج ٣ ص ١١)

দলীল (১)ঃ হযরত জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ - (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢٢)

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ - (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢٢)

কিয়াসী দলীলঃ পরিধেয় বস্ত্রে যাকাত নেই। অলংকারও অনেকটা পরিধেয় বস্তু। তাই অলংকারেও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, আতা, মুজাহিদ, যুহরী, আওয়াঈ (রহ.), উমর, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের মতে, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য যে আকারেই থাকুক না কেন, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তা মুদ্রা, বিস্কিট, লকেট, চেইন, কঙ্কন, কাপড়ে খচিত সুতা অথবা অন্যান্যভাবে তৈরি অলংকার হোক না কেন।

(المغني ج ٣ ص ١١، تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢٢)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْصَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَكُنْزُ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَرُكِّي فَلَيْسَ بِكُنْزٍ (ابو داود ج ١ ص ٢١٨)

অর্থাৎ, উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতাম। একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এই সকল অলংকার “কানয” (যমীনের অভ্যন্তরে প্রোথিত সম্পদকে ‘কানয’ বলে) হিসেবে গণ্য হবে কি? তিনি (সাঃ) বলেন, যে মালের পরিমাণ যাকাতের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেখান থেকে যাকাত দিতে হবে। তা (ভূগর্ভে) গচ্ছিত ধন নয়।

দলীল (৩): একদা রাসূল (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাতে স্বর্ণের তৈরি বড় অঙ্গুরী পরিহিত দেখে জানতে চাইলেন এটা কি? এতে আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বললেন-
 ... صَنَعْتُهُنَّ اَتَرَيْنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَتَوَدَّيْنِ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا اَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ

قَالَ هُوَ حَسْبُكَ مِنَ الثَّأْرِ - (ابو داود ج ১ ص ২১৮, دار قطني ج ২ ص ১০০)

অর্থাৎ, ... ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা গড়িয়েছি। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

দলীল (৪): ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, অলংকারের মধ্যে যাকাত হওয়াটাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ-

অর্থাৎ, আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে, এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন। (তাওবাহঃ ৩৪)

উক্ত আয়াতে আমভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কোন ব্যতিক্রম করা হয়নি।

কিয়াসী দলীলঃ কিয়াসের চাহিদাও এই যে, অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, এই অলংকার যদি পুরুষের নিকট থাকে, তাহলে সবার মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং যখন মহিলার অধিকারে হবে, তখনও যাকাত ওয়াজিব হওয়া চাই।

জবাবঃ আহনাফগণের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাব-

১. কুরআনের আয়াতের বিপরীতে সাহাবাদের আছার গ্রহণযোগ্য নয়।
২. অলংকারে যাকাত ওয়াজিব প্রমাণকারী হাদীসটি মাশহুর। অন্য হাদীসগুলো (যেমন- জাবিরের হাদীস) খবরে ওয়াহিদ এবং যঈফ। সুতরাং মাশহুর হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে।

৩. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত حلي-এর অর্থ স্বর্ণ নয়; বরং মুক্তা। যেমন, পবিত্র

কুরআনেও حلي দ্বারা মুক্তা বুঝানো হয়েছে। আর মণি-মুক্তার কোন যাকাত নেই।

৪. অলংকারের সাথে পরিধেয় বস্তুর তুলনা অযৌক্তিক। কারণ, পরিধেয় বস্ত্র বর্ধনশীল নয়, বরং অযশীল। আর অলংকার বর্ধনশীল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণালংকার বা রৌপ্যালংকারে যাকাত ওয়াজিব। তাই অলংকারে যাকাত দিতে হবে। (تظلم ج ২ ص ২২-২৩)

بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ : কৃষিজ ফসলের যাকাত

... عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ
النُّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ - (بخاري ج ١ ص ٢٠١ باب العشر فيما يسقى الخ، مسلم ج ١ ص ٣١٦ فيما

سقت الانهار والقيم العصور، ترمذي ج ١ ص ١٣٩ باب الصدقة فيما يسقى الخ، نسائي ج ١ ص ٣٤٤ باب
ما يوجب العشر الخ، ابن ماجه ص ١٣١ باب صدقة الزرع والثمار)

অনুবাদঃ ... সালিম ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে যমীন বৃষ্টি, নদী ও কুয়ার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যেখানে পানি সেচের আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না- এমন ক্ষেতের ফসলের যাকাত হল উশর বা উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে যমীতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত হল নিস্ফে উশর অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ।

عُشْر (উশর)-এর আভিধানিক অর্থঃ

* عُشْر শব্দটি আরবী। এটি عَشْر শব্দ থেকে উৎকলিত। عَشْر অর্থ দশ। আর عُشْر শব্দের অর্থ এক দশমাংশ। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ। عُشْر-এর বহুবচন হল- أَعْشَار বা عُشُور

উশর-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

الْعُشْرُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ زَكَاةِ الْأَرْضِ الَّتِي اسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا - (المعجم الوسيط)
অর্থঃ, উশর হল যা ভূমির যাকাত হিসেবে আদায় করা হয়, যার অধিবাসী হল মুসলমান।

* সায়েদ মুহাম্মদ আলী বলেন, ভূমির ফসলের যাকাতকেই উশর বলা হয়।

* কেউ কেউ বলেন, উশর শব্দের অর্থ এক দশমাংশ। মুসলমানদের কর্ষিত জমির ফসলের এক দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ কর বা রাজস্ব গ্রহণ করাকে উশর বলা হয়।

* ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বলেন- কৃষিজ উৎপাদনের উপর যে যাকাত দিতে হয় তাকে আইনের পরিভাষায় ‘উশর’ বলে। শব্দটির অর্থ ‘এক দশমাংশ’।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধিকৃত ভূ-খণ্ডে প্রাকৃতিক জলসেচে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ ভূমিকর আদায় করাকে উশর বলা হয়।

ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের কোন কোন শস্যে এবং কি পরিমাণ শস্যে উশর ওয়াজিব হবে, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ভূমির উৎপন্ন ফসল ও ফল যদি কাঁচামাল না হয় অর্থাৎ খাদ্য জাতীয় শস্য হয় যা গুদামজাত করে রাখা যায় এবং সহজে নষ্ট না হয় (যেমন- চাল, ডাল, গম ইত্যাদি) এবং এর পরিমাণ যদি কমপক্ষে ৫ ওয়াসাক (প্রায় ২৭ মণ) হয়, বছরের অধিকাংশ সময় স্থায়ী থাকে, তবে বৃষ্টির পানির ক্ষেত্রে এক দশমাংশ এবং কৃত্রিম উপায়ে সেচ করা হলে বিশভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যদি ৫ ওয়াসাক থেকে কম হয় বা অস্থায়ী ফসল হয় (যেমন ফল-মূল, শাক-সবজি) তবে তাতে যাকাত বা উশর দিতে হবে না।

(تنظيم الاشتات ج ২ ص ১০، درس مشکوة ج ২ ص ১৭০، درس ترمذي ج ২ ص ৪৩৮)

দলীল (১)ঃ হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ - (ابو

দাউদ জ ১ ص ২১৭ باب تجب فيه الزكوة، بخاري ج ১ ص ২০১ باب ليس فيما دون خمسة الخ، ترمذي

ج ১ ص ১৩৬ باب صدقة الزرع الخ، نسائي ج ১ ص ৩৪৪، ابن ماجة)

অর্থাৎ, ... ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে সদকা ওয়াজিব হবে না।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ

الْخَضِرَاوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ - (ترمذي ج ১ ص ১৩৮ باب زكوة

الخضروات)

অর্থাৎ, ... মুআয (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সবজি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে পত্র লিখেছিলেন। এর উত্তরে তিনি ইরশাদ করেছিলেন যে, তাতে কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্ট কিছু কৃষিজ ফসলের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব। ঢালাওভাবে সকল ফসলের উপর ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, উমর বিন আব্দুল আযীয, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ এবং ইমাম যুহরী (রহ.) প্রমুখ বলেন, ভূমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের পরিমাণ কম

হোক বা বেশি হোক, বছরের অধিকাংশ সময় স্থায়ী হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সকল ফসল ও ফলের উপর যাকাত বা উশর দিতে হবে।

(تَظْلِيم ج ২ ص ১০، درس مشکوة ج ২ ص ১৭০، درس ترمذي ج ২ ص ৪৩৮)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ-

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর। (বাকারাহ: ২৬৭)

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী- وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

অর্থাৎ, ... এবং ফসল কাটার সময় উহার হক আদায় কর। (আনআম: ১৪১)

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে আমভাবে উশর দিতে বলা হয়েছে। এতে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট কোন পণ্যও নির্ধারণ করা হয়নি। অতএব, ভূমিতে উৎপাদিত সকল প্রকার পণ্যের উপর, কম হোক আর বেশি হোক, উশর ওয়াজিব হবে।

দলীল (৩): ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ-

(بخاري ج ১ ص ২০১، مسلم ج ১ ص ৩১৬، ترمذي ج ১ ص ১৩৯)

অর্থাৎ, আসমান তথা বৃষ্টি এবং খালের পানি অথবা নিজে নিজে শিকড় দ্বারা পানি চুষে নেয়া গাছে এক দশমাংশ উশর। আর হাউজ থেকে কৃত্রিম উপায়ে যা সিঞ্চন করা হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ উশর।

দলীল (৪): নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَا أَخْرَجْتَهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ- (نصب الرأية ج ২ ص ৩৮৪)

অর্থাৎ, জমিন যা উৎপন্ন করে তাতে রয়েছে উশর।

এই দুটি রেওয়ায়েতে ৮ হরফটি ব্যাপক। যা সর্বপ্রকার উৎপন্ন ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দলীল (৫): ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে-

فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةً حَتَّى فِي عَشْرِ دَسْتَجَاتٍ بَقْلٍ- (مصنف ابن

أبي شيبة ج ৩ ص ১৩৯)

অর্থাৎ, জমিনে উৎপাদিত সবকিছুতেই যাকাত রয়েছে। এমনকি তরকারির দশমাংশেও।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, কম-বেশি সব উৎপন্ন ফসলেই শর্তহীনভাবে উশর দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

ইজমাভিত্তিক দলীলঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগে যদিও এই মাসআলায় কিছুটা মতভেদ ছিল, কিন্তু হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগে এর উপর তাবীঈনদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, তিনি তাঁর খিলাফতের যুগে সকল আমলাদের নিকট শাহী ফরমান প্রেরণ করেন যে-

... عَنْ بِنِ الْفَضْلِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ مَا أَتَيْتِ الْأَرْضُ

مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعَشْرُ— (مصنف عبد الرزاق ج ٤ ص ١٢١)

অর্থাৎ, .. ইবন ফজল (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) চিঠি লিখেছেন যে, জমিনের উৎপন্ন ফসল কম বা বেশি হোক তা থেকে যেন উশর নেয়া হয়।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ

(১) হাদীসে উল্লিখিত সদকা দ্বারা উশর বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত বুঝানো উদ্দেশ্য। আর তৎকালে এক ওয়াসাক পণ্য সাধারণত এক উকিয়া তথা ৪০ দিরহামে বিক্রি করা হত। অতএব, পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য হয় ৫x৪০=২০০ দিরহাম। আর চান্দি বা রৌপ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রয়োজন ৫ ওয়াসাক বা ২০০ দিরহাম। এর কমে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

(২) হাদীসে বর্ণিত সদকা দ্বারা যদিও উশর মেনে নেয়া হয়, তখন ৫ ওয়াসাকের কম হলে উশর দিতে হবে না- এর অর্থ হল, বায়তুল মালে না দেয়া। অর্থাৎ, এত কম মালের উশর বায়তুল মালে দেয়ার দরকার নেই। কেননা এতে বায়তুল মালেরই খরচ উঠবে না। বরং মালিক নিজেই গরীবদেরকে দিয়ে দিবে। (درس مشكوة ٢ ج ص ١٧١)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে শাক-সবজির উশর বায়তুল মালে না দেয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা শাক-সবজি হল কাঁচা মাল। আর যাকাত আদায়কারীর অপেক্ষা করার দরুণ মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এ সমস্ত মালের যাকাত মালিক নিজেই আদায় করে দিবে। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর জন্য অপেক্ষা করবে না।

* কিয়াসের দ্বারাও ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অগ্রাধিকারযোগ্য।

(১) উশর কর বা খাজনার অনুরূপ। আর খাজনা সকল উৎপাদিত দ্রব্য থেকেই নেয়া হয়। তা কম হোক বা বেশি হোক, কাঁচা হোক বা পাকা হোক। সুতরাং উশরের ক্ষেত্রেও এমন হুকুমই হওয়া উচিত।

(২) তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করলে গরীবদের অধিক উপকার হয়। আর এটি হল সতর্কতামূলক বিধান।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٤٤١)

(৩) ইমাম তাহাবী ও জাসসাস (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, উশরের মালের ক্ষেত্রে **حولان حول** তথা বছরপূর্তি ধর্তব্য নয়। সুতরাং গচ্ছিত ও গনীমতের মালের ন্যায্য নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকার প্রয়োজন নেই। (معارف السنن ج ٥ ص ٢٠٨)

আর এ সকল কারণেই আল্লামা ইবন আরাবী মালিকী অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ‘শরহে তিরমিযী’ তে লেখেন যে, উক্ত মাসআলায় কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

আবু সাঈদ খুদরী (রহ.) ও ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে দ্বন্দের সমাধান বা ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসটি প্রাধান্য লাভের কারণঃ

১. খুদরীর (রাঃ) হাদীসটি খাস। কারণ ঐ হাদীস নির্দিষ্ট কয়েক প্রকারের উৎপন্ন ফসলের কথা বলা হয়েছে। আর ইবন উমরের হাদীসটি আম। খাস হাদীসের উপর আম হাদীস অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং ইবন উমরের হাদীসই আমলযোগ্য।

২. কুরআনের কয়েকটি আয়াতে ইবন উমরের হাদীসের ব্যাপকতাকে সমর্থন করা হয়েছে। তাই খুদরীর হাদীসের উপর ইবন উমরের হাদীস প্রাধান্য পাবে।

৩. দু’টি হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস প্রাধান্য পায়। ইবন উমরের হাদীসটি দু’জনেই বর্ণনা করেছেন।

৪. যাহ্‌হাক বলেন, খুদরীর হাদীসটি পূর্বের, আর ইবন উমরের হাদীস পরের। সুতরাং ইবন উমরের হাদীস নাসিখ ও খুদরীর হাদীস মানসূখ।

৫. সবচেয়ে সুন্দর সমাধান এই যে, খুদরীর হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের কথা বলা হয়েছে। ৫ ওসাক পরিমাণ শস্যের যে মূল্য তা ব্যবসায়িক দ্রব্যের নিসাবের সমান। জমিতে উৎপন্ন শস্যের উশর বর্ণনা করা হয়নি।

৬. আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস খবরে ওয়াহিদ আর ইবন উমরের হাদীস মাশহুর। সুতরাং ইবন উমরের হাদীস প্রাধান্য পাবে।

৭. আইনী বলেন, আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে উশরের বর্ণনা দেয়া হয়নি। বরং যাকাতের কথা বলা হয়েছে। আর ইবন উমরের হাদীসে উশরের কথা বলা হয়েছে।

(تظلم الاشتات ج ٢ ص ١٠-١١)

পরিশেষে বলা যায় হাদীস দুটির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলেও গভীর পর্যালোচনার পর তা দূরীভূত হয়। খুদরীর হাদীস যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আর ইবন উমরের হাদীস উশরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

* উল্লেখ্য যে, কোন ফসল যদি কিছুটা কৃত্রিম সেচ এবং কিছুটা বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় তবে অনুমান করে দেখতে হবে কোনটির পরিমাণ বেশি। যদি বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে এক দশমাংশ উশর ওয়াজিব হবে। আর যদি সেচের পানি দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ উশর ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ক্ষেতে পানি সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করার জন্য শ্রম খাটানো হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

بابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ ص ২২৬ : মধুর যাকাত

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورٍ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يُحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلْبَةٌ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَدَى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورٍ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلْبَةً وَلَا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يُشَاءُ— (نسائي ج ١ ص ٣٤٦ باب زكاة النحل)

অনুবাদঃ ... আমার ইবন শুআইব (রাঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতআন গোত্রের সদস্য হিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট তাঁর মধুর উশর নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট সালাবাহ নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইবন ওয়াহব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমর (রাঃ) তাঁকে লেখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মধুর যে উশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালাবাহ উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসেবে গণ্য হবে এবং যেকোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।

বিশ্লেষণঃ মধুতে উশর আছে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ, সুফিয়ান, সাওরী, আবু সাওর ও উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.)-এর মতে, মধুর উপর কোন উশর নেই। (معالم للخطابي ج ২ ص ২০৭)

দলীল (১): তাউস থেকে বর্ণিত-

أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أَتَى الْعَسْلُ وَأَوْقَاصُ الْغَنَمِ فَقَالَ لَمْ أَوْمَرْ فِيهَا بِشَيْئٍ - (مصنف ابن أبي شيبة ج ৩ ص ১৪৩)

অর্থাৎ, মুআয (রাঃ) যখন ইয়ামানে এলেন, তখন তার নিকট মধু ও ছাগলের অনেক পাল হাজির করা হল। তখন তিনি বললেন, আমাকে এ সম্পর্কে কিছুই নির্দেশ দেয়া হয়নি।

দলীল (২): হযরত নাফি বলেন-

سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسْلِ أَ فِيهِ صَدَقَةٌ؟ فَقُلْتُ لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسْلٌ - وَلَكِنَّ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْئٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ - فَكُتِبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ تُوَضَعَ يَعْنِي عَنْهُمْ - (مصنف عبد الرزاق ج ৬ ص ৬১, مصنف ابن أبي شيبة ج ৩ ص ১৪২)

অর্থাৎ, উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মধুতে কি যাকাত আছে? আমি বললাম, আমাদের এলাকায় তো মধু নেই। তবে আমি মুগীরা ইবন হাকীমকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তাতে কোন যাকাত নেই। উমর ইবন আব্দুল আযীয (রহ.) বললেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, ক্রটিমুক্ত ও সত্য কথা বলেছেন। অতঃপর তিনি এর সদকা বাদ দিয়ে দেয়ার জন্য মানুষের নিকট পত্র লিখেন।

কিয়াসী দলীলঃ মধু হচ্ছে দুধের মত তরল পদার্থ। যেহেতু দুধে যাকাত নেই, সেহেতু মধুর ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ও যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায় যে, মধুর ক্ষেত্রে কোন উশর নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, যুহরী এবং আওযাই (রহ.) প্রমুখের মতে, মধুর উপর উশর প্রদান করা ওয়াজিব।

(حاشية الكوكب الدرّي ج ১ ص ২৩১, تنظيم ج ২ ص ২১)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ -

অর্থাৎ, আপনি তাদের মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। (তাওবাঃ ১০৩)

সূতরাং, মধুও মালের মধ্যে শামিল বিধায় মধুরও যাকাত দিতে হবে।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُسْرَ - (ابن ماجه ص ১৩২)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মধু থেকে উশর আদায় করেছেন।

দলীল (৪): হযরত আবু সাযারাহ মুতাস্ঈ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত। তিনি বলেন- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لِي نَحْلًا قَالَ أَدُّ الْعُسْرَ - (ابن ماجه ص ১৩২)

অর্থাৎ, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মধুর বাসা আছে। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি উশর আদায় কর।

দলীল (৫): ... عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ أَزُقُّ زُقًّا - (ترمذي ج ১ ص ১৩৭ باب في زكوة العسل)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, মধুতে প্রতি দশ মশকে এক মশক।

দলীল (৬): হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত- كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُسْرُ - (مصنف عبد الرزاق ج ৪ ص ১৩)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইয়ামানবাসীর নিকট পত্র লিখেন, যাতে মধুওয়ালাদের নিকট থেকে উশর আদায় করা হয়।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মধুর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে মালিকী ও শাফেঈদের দলীলের জবাব-

প্রথম দলীল অর্থাৎ لَمْ أَوْمَرْ فِيهَا شَيْئًا -এর জবাবে বলা হয়- (১) কোন বিষয়ে নির্দেশ না দিলে তা ওয়াজিব না হওয়া সুনিশ্চিত নয়। কেননা, অনেক হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, মধুর উশর রয়েছে।

(২) হানাফীদের প্রদত্ত দলীলের হাদীসসমূহ হাঁ-বোধক (مُثَبِّت), পক্ষান্তরে হযরত মুআয (রাঃ)-এর হাদীস না-বোধক (نَفْيِي)। আর পরস্পরবিরোধী (تَعَارُض)-এর ক্ষেত্রে না-বোধক হাদীসের উপর হাঁ-বোধক হাদীস অগ্রাধিকার লাভ করবে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উমর ইবন আব্দুল আযীয হলেন তাবেঈ। তাই মারফু হাদীসের মোকাবেলায় তাঁর উক্তি দলীলযোগ্য নয়।

(২) তাছাড়া আল্লামা ইবন কুদামা উমর ইবন আব্দুল আযীযের এ মাযহাব বর্ণনা করেন যে, তিনি মধু হতে উশর নেয়ার প্রবক্তা ছিলেন। (المغني ج ২ ص ৭১৩)

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ দুধ উৎপাদনের মূল উৎস হল গাভী। আর গাভীর উপর যাকাতের বিধান ফরয। কিন্তু মধুর যে মূল উৎস তার কোন যাকাত নেই। সুতরাং মধু দুধের ন্যায় তরল পদার্থ হলেও মধুর উপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হতে কোন বাধা নেই।

بابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ص ২২৭ : সদকাতুল ফিতর (ফিতরা)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ - (ابن ماجه ص ১৩২)

অনুবাদঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সদকাতুল ফিতর- রোযাকে বেহুদা বা অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ধার্য করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসেবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পরে পরিশোধ করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-খয়রাতের অনুরূপ হিসেবে গণ্য।

بابُ مَتَى تُؤَدَّى ص ২২৭ : সদকাতুল ফিতর প্রদানের সময়

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ - (بخاري ج ১ ص ২০৫ باب فرض صدقة الفطر، مسلم ج ১ ص ৩১৮ باب زكاة الفطر، ترمذي

ج ১ ص ১৫৬ باب تقديمها قبل الصلوة، نسائي ج ১ ص ৩৫৬ فرض زكاة رمضان الخ/ ৩৫৮)

অনুবাদঃ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সদকাতুল ফিতর লোকদের ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে প্রদানের

নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের এক বা দুই দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর প্রদান করতেন।

بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ص ২২৭

কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِّنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ - (بخاري ج ١ ص ٢٠٤، مسلم ج ١ ص ٣١٧،

ترمذي ج ١ ص ١٤٦ باب صدقة الفطر، نسائي ج ١ ص ٣٤٦، ابن ماجه ص ١٣٢)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সদকাতুল ফিতর নির্ধারিত করেছেন (আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, মালিক আমাদের নিকট এক্ষেপে বর্ণনা করেছেন- রমযানের সদকাতুল ফিতর) এক সা খেজুর কিংবা এক সা বার্লি প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং নর-নারী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য বিধেয়।

বিশ্লেষণঃ যে সকল বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হবে-

- (১) সদকাতুল ফিতরের সংজ্ঞা
- (২) সদকাতুল ফিতরের হুকুম
- (৩) সদকাতুল ফিতর কার (কি পরিমাণ মালের) উপর ওয়াজিব?
- (৪) সদকাতুল ফিতর কখন ওয়াজিব হবে?
- (৫) সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়কাল।
- (৬) সদকাতুল ফিতর কোন্ কোন্ ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব?
- (৭) কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে?

(১) সদকাতুল ফিতরের সংজ্ঞাঃ আভিধানিক অর্থঃ "صدقة الفطر" দুটি শব্দযোগে গঠিত হয়েছে। ইহা একটি সম্বন্ধ পদ। যাকে আরবীতে বলা হয় مركب اضافي যার শাব্দিক বিশ্লেষণ হল- صدقة শব্দটি مضاف (সম্বন্ধকৃত বিশেষ্য) আর الفطر শব্দটি مضاف اليه (যে পদের সাথে অন্য বিশেষ্যের সম্বন্ধ করা হয়েছে)।

সুতরাং আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে صدقة শব্দের অর্থ হল দান, কৃপা, অনুগ্রহ, দয়া, অনুকম্পা, সদকা, খয়রাত, যাকাত ইত্যাদি। এর বহুবচন صدقات আর الفطر শব্দের অর্থ হল- ইফতার করা, ভঙ্গ করা, বিরতি দেয়া, অবসান ঘটানো, খুলে ফেলা ইত্যাদি। সুতরাং صدقة الفطر-এর অর্থ হল রোযা অবসানের সদকা। যা সাধারণত রোযার ফিতরা হিসেবে পরিচিত।

صدقة الفطر-কে আরো বেশ কয়েকটি নামে অভিহিত করা হয়। যথা-

১. زكاة الفطر	২. زكاة رمضان
৩. زكاة الصوم	৪. صدقة الصوم
৫. صدقة رمضان	৬. صدقة الرأس
৭. زكاة الابدان (درس ترمذي ج ২ ص ১৭৬)	

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

(১) ইসলামী আইন শাস্ত্রের ভাষায়-

هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الْمُسْلِمُونَ الْأَغْنِيَاءُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ قَدْرَ صَاعٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ إِلَى الْفُقَرَاءِ
অর্থাৎ, মুসলিম ধনবান ব্যক্তিগণ ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে এক সা' বা অর্ধ সা' পরিমাণ যে খাদ্য গরীবদেরকে দান করে থাকে, তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়।

(২) কতিপয় ফিকহ শাস্ত্রবিদ বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন মালদার ব্যক্তির উপর তার নিজের ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে যে সদকা আদায় করতে হয়, তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়।

(৩) ওকীঈ ইবনুল জাররাহ বলেন, সদকায়ে ফিতর হল নামাযের মধ্যে সাহু সিজদার ন্যায়। রোযায় যদি কোন লোকসান বা ঘাটতি হয়, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ হল- সদকাতুল ফিতর। (تَنْظِيمُ ج ২ ص ২৫)

فَإِنَّهَا إِسْمٌ لَمَّا يُعْطَى مِنَ الْمَالِ بِطَرِيقِ الصَّلَةِ تَرْحُمًا مُقَدَّرًا بِخِلَافِ الْهَبَةِ .
فَإِنَّهَا تُعْطَى صَلَةً تَكْرَمًا لَا تَرْحُمًا - (بَدَايَةُ ج ১ ص ১০৭)

অর্থাৎ, সদকাতুল ফিতর হল যে মাল সম্পর্ক বজায়ের পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট আকারে দয়াপূর্বক দান করা হয়। ইহা হেবার পরিপন্থী। কেননা, এটি দেয়া হয় সম্পর্ক বজায়ের উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে। কৃপাবশত নয়।

২. সদকাতুল ফিতরের হুকুমঃ সদকাতুল ফিতরের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয। (আব্দুল হাই আল-লখনভী বলেন, ইমাম মালিকের অভিমতও তাই।)

(شرح مسلم ج ১ ص ৩১৭)

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ (১) دَلِيلِ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّيَامِ الْخ

(অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ... (২) دَلِيلِ

(অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে যেহেতু فرض (ফরয) শব্দ উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং ইহা ফরয হওয়ার দলীল।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা সুন্নতে মুআক্কাদা। তিনিও ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, হাদীসে فرض শব্দের অর্থ হচ্ছে قَدَرٌ অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) সদকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন, কাজেই ইহা দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয় না; বরং ইহা সুন্নতে মুআক্কাদা।

(تنظيم الاشتات ج ২ ص ২৫)

* কেউ কেউ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করা পূর্বে ফরয ছিল। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার কারণে ইহা রহিত হয়ে গেছে। তবে এ মতটি খুবই দুর্বল।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহেবাব্বিনের মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। (عمدة القاري ج ১ ص ১০৮)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ - (ترمذی)

(ج ১ ص ১৫৬ باب في صدقة الفطر)

অর্থাৎ, ... আমার ইবন শুআইবের দাদা থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মক্কার গিরিপথে একজন ঘোষককে (এই ঘোষণা দিয়ে) পাঠালেন, সাবধান! সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। চাই নর হোক বা নারী, স্বাধীন হোক বা দাস, ছোট হোক বা বড় হোক, দুই মুদ গম। অথবা এছাড়া অন্য কিছু হলে এক সা' খাবার।

দলীল (২): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ صَارِحًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِيَنَّ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ - (تنظيم ج ২ ص ২৬)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মক্কার উপকণ্ঠে এক আহ্বানকারীকে এই বলে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন যে, সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

দলীল (৩): ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةٍ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى الْخ () অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়, ফরয বা সুন্নত সাব্যস্ত হয় না।

জবাবঃ আহনাফদের পক্ষ থেকে তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাব- ইমাম শাফেঈ এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয সাব্যস্ত করেছেন। অথচ, ফরয কেবল কুরআন ও মুতাওয়াতিহ হাদীসের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

আর ইমাম মালিক (রহ.) যে **فَرَضَ** এর অর্থ **قَدَر** নিয়েছেন, তার জবাবে আহনাফগণ বলেন, (১) মালিক (রহ.) একে যতটুকু হালকা মনে করেছেন আসলে সদকাতুল ফিতর ততটুকু গুরুত্বহীন নয়। কারণ, নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে **واجب حق** শব্দ ব্যবহার করেছেন। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১৮৬)

(২) দাকীকুল ঈদ বলেন, যদিও **فرض**-এর আভিধানিক অর্থ **تقدير** (নির্ধারণ), কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় এটি ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এখানেও ওয়াজিবের অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম।

অবশেষে আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এতে মৌলিক কোন বিবাদ ও বিরোধ নেই। বরং শাব্দিক এখতেলাফ রয়েছে। কেননা শাফিঈ ও আহমদ (রহ.) সদকাতুল ফিতরকে এই পর্যায়ে ফরয বলেন না যে, এর অস্বীকারকারী কাফের।

আর ইহাকেই আহনাফগণ ওয়াজিব বলে থাকেন। মূল বিষয় হল এই যে, তিন ইমামের নিকট ফরয এবং সুন্নতের মধ্যবর্তী অন্য কোন স্তর নেই। যার ফলে তাঁরা ইহাকে ওয়াজিব না বলে সুন্নত বলেন। কিন্তু আহনাফদের মতে ফরয এবং সুন্নতের মধ্যবর্তী আরো একটি স্তর রয়েছে। আর তা হল ওয়াজিব। সুতরাং ইহা কেবল বিশ্লেষণমূলক পার্থক্য, মৌলিক কোন পার্থক্য নয়। (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢٤)

৩. সদকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিবঃ কি পরিমাণ মাল থাকলে ব্যক্তির উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, যার নিকট নিজের এবং পরিবারের এক দিন, এক রাতের খাবার রয়েছে। সুতরাং ইহা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নিসাব নেই। (درس ترمذي ج ٢ ص ٤٩٧، تنظيم ج ٢ ص ٢٥، درس مشکوة ج ٢ ص ١٨٥)

দলীলঃ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, সদকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোথাও এর নিসাবের পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এতে নিসাবের কোন প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যার নিকট নিজের প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হবে, অর্থাৎ সদকাতুল ফিতরের ঐ নিসাব, যা যাকাতের নিসাব, তবে এতটুকু পার্থক্য যে, এতে যাকাতের মত বর্ধনশীল মাল হওয়া এবং বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٤٩٧، تنظيم ج ٢ ص ٢٥، درس مشکوة ج ٢ ص ١٨٥)

দলীল (১)ঃ সদকাতুল ফিতরের ব্যাপার যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতরকে যাকাতুল ফিতরের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- ইবন আব্বাস, ইবন উমর, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখের হাদীসেও ‘যাকাতুল ফিতর’ শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ইহা দ্বারা একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, যাকাতের নিসাব যা, সদকাতুল ফিতরের নিসাবও তা।

দলীল (২)ঃ পবিত্র কুরআনুল কারীমেও সদকাতুল ফিতরকে যাকাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন-

অর্থাৎ، نِشْئِ سَافِلًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، নিশ্চয় সাফল্য লাভ করে সে, যে (সদকাতুল ফিতর আদায় করে) নিজেকে শুদ্ধ করে করে নিয়েছে এবং তার পালনকর্তার নাম সুরণ করে (ঈদের দিন তাকবীর পড়ে), অতঃপর (ঈদের) নামায আদায় করে। (আলাঃ ১৪-১৫)

হযরত ইবন উমর, আবু সাঈদ খুদরী এবং আমর ইবন আউফ (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতটি সদকাতুল ফিতরের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং সালাত দ্বারা ঈদের নামায এবং তَزَكَّى দ্বারা “সদকাতুল ফিতর” আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

(معارف السنن ج ৫ ص ৩০১-৩০২)

عَنْ عَلِيٍّ "تَزَكَّى" أَيِ تَصَدَّقَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الْخ (روح المعاني ج ১০ ص ১২৬)

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তَزَكَّى মানে সদকাতুল ফিতর আদায় করেছে।

... عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (৩) দলীল

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ... (مسلم ج ১ ص ৩৩২ باب بيان الهد العليا

خير الخ، نسائي ج ১ ص ৩৫১ الصدقة عن ظهر غنى)

অর্থাৎ, ... হাকীম ইবন হিয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, ধনী অবস্থায় যে দান করা হয়, তাই উত্তম সদকা অথবা বলেছেন উৎকৃষ্ট সদকা।

কিয়াসী দলীলঃ তাছাড়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যদি সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করে দেয়া হয়, যে একদিন, এক রাতের খাবারের মালিক, তাহলে দেখা যাবে যে, যদিও ঐ ব্যক্তি সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণে আজ সদকা আদায় করবে বটে, কিন্তু পরদিন সে নিজেই দরিদ্রতার কারণে অন্যের নিকট ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। যা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। (نور الانوار ৫৫-৫৬ مبحث الأمر)

৪. সদকাতুল ফিতর কোন সময় হতে ওয়াজিব হবেঃ সদকাতুল ফিতর কোন সময় হতে ওয়াজিব হবে এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল রমযানের শেষ দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পরপরই অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাত্রি আগমনের সাথে সাথে। অতএব, ঈদুল ফিতরের রাত্রে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে অথবা সামর্থ্যবান হলে তাদের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১৮০)

দলীলঃ যেহেতু এ সদকা “ফিতর” (রোযা ভঙ্গ বা ইফতার)-এর কারণে হয়ে থাকে, আর ইফতারের সময় হল সূর্যাস্ত। সুতরাং এই সময় থেকেই সদকা ওয়াজিব হওয়া উচিত।

* ইমাম মালিক (রহ.) এ ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেন। একটি হল, ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত (যা এইমাত্র বর্ণিত হল)। অপরটি হল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। (যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল)।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদের দিন সকাল বেলা অর্থাৎ সুবেহ সাদিক উদিত হওয়ার পর। অতএব, সুবেহ সাদিকের পূর্বে যে লোক মৃত্যুবরণ করবে কিংবা সম্পদ বিলুপ্তির কারণে অসহায় হয়ে যাবে তার উপর সদকাতুল ফিতর আদায়ের হুকুম বর্তাবে না। পক্ষান্তরে, যে শিশু সুবেহ সাদিকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করবে কিংবা কোন লোক মুসলমান হবে অথবা দারিদ্রতার অবসান ঘটিয়ে সামর্থ্যবান হবে, তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। (درس مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۸۵)

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ
أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ الْخ

(অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

জবাবঃ আহনাফগণ শাফিঈদের জবাবে বলেন, রমযানে সূর্যাস্তের পরে যে “ফিতর” হয়, এটা তো একটি রীতিসিদ্ধ স্বাভাবিক নিয়ম, যা প্রতিদিনই হয়ে থাকে। অতএব, সূত্রমতে এরকম “ফিতর” হওয়া উচিত যা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত হয়। আর এটা হল ঈদের দিনের ফযরের ওয়াক্ত। সুতরাং এসময় থেকে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া উচিত।

(৫) সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়কালঃ চার ইমাম এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। (عمدة القاري ج ১ ص ১০৮، معالم السنن ج ২ ص ২১০)

অতঃপর সদকাতুল ফিতর ঈদুল ফিতরের দিনের আগে বা পরে আদায় সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল, পুরো রমযানের যে কোন দিন সদকাতুল ফিতর প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে তাঁর মতে সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে ঈদের দিন থেকে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কারণ বিলম্ব করা হলে তা আদায় হিসেবে গণ্য না হয়ে কাযা (দায়িত্ব থেকে মুক্তি) হিসেবে গণ্য হবে। এর দ্বারা সওয়াবের আশা করা যাবে না। (المعارف ج ৫ ص ৩১৬، شرح المذهب ج ১ ص ৩২৮)

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন, ঈদুল ফিতরের এক বা দু'দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা জায়েয। এর পূর্বে আদায় করা জায়েয নয়।

(العنبي ৩ ج ১৮) তবে কোন কোন হাম্বলী বলেছেন, মাসের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঈদের আগে আদায় করা জায়েয আছে। উল্লেখ্য যে, ঈদুল ফিতরের পরে আদায় করলে তাঁদের সবার নিকটই তা কাযা হিসেবে গণ্য হবে।

* হাসান বিন যিয়াদ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্ধারিত সময় হচ্ছে একমাত্র ঈদুল ফিতরের দিন। সুতরাং ঐ দিন আদায় না করলে তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা এটা ঐ দিনের সাথেই খাস। (تنظيم الاشتات ২ ج ২০)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই। তাঁর মতে, এক অথবা দু' বছর পূর্বেও তা আদায় করা জায়েয।

(العنبي ১ ج ১০৮)

তবে ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। ঈদের দিন আদায় করতে না পারলে তা কাযা বা রহিত হবে না। সারা জীবনে যেকোন সময় আদায় করলে তা আদায় হিসেবেই গণ্য হবে। বিলম্বের জন্য যতটুকু গোনাহ হবে, আদায়ের দ্বারা তাও মাফ হয়ে যাবে। (تنظيم الاشتات ২ ج ২০)

৬. সদকাতুল ফিতর কোন্ কোন্ ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিবঃ

* স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়।

* মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর তা ওয়াজিব নয়।

* সামর্থ্যবান তথা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অতএব, কেউ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তাহলে তার উপর তা ওয়াজিব হবে না। তবে এই নিসাব পরিমাণ সম্পদ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে অতিরিক্ত হওয়া চাই।

আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, প্রত্যেক স্বাধীন সামর্থ্যবান মুসলমান নিজের এবং স্বীয় নাবালেগ সন্তান ও মুসলমান চাকর-চাকরানী তথা পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার স্বামী যদি সদকাতুল ফিতর প্রদান করে তাহলে স্ত্রীর ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে এবং কোন স্ত্রী যদি নিজেই সামর্থ্যবান হয় তাহলে শুধুমাত্র তার নিজের সদকাতুল ফিতর তার উপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর এমন সামর্থ্যবান সন্তান যাদের পিতামাতা দরিদ্র বা অসহায় হয়ে যায়, এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সদকাতুল ফিতর আদায় করা সন্তানের প্রতি কর্তব্য।

দাদাঃ পরিবারের প্রধান হচ্ছে পিতা। এক্ষেত্রে পিতা যদি দাদা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে ঐ পরিবারের সদকাতুল ফিতর আদায় করার দায়িত্ব দাদার উপর বর্তাবে।

* কাফের গোলামের জন্য তার মালিককে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল, আবু সাওর, হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, কাফের দাস-দাসীর জন্য মুসলিম মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ২৭)

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ... مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

(“كم يؤدي في صدقة الفطر”) অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

উক্ত হাদীসে من-এর শর্ত দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, অমুসলিম গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী এবং ইসহাস (রহ.)-এর মতে, কাফের গোলামের জন্যও মুসলিম মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। আতা, মুজাহিদ, উমর ইবন আব্দুল আযীয, ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (عمدة القاري ج ৯ ص ১১০)

দলীল (১)ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

... لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ (فتح الباري ج ৩ ص ২৭৩)

অর্থাৎ, মুসলমানের গোলামে সদকাতুল ফিতর ছাড়া অন্য কোন সদকা নেই।

উক্ত হাদীসে গোলাম শব্দটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে।

দলীল (২)ঃ হাফেয ইবন হাজার (রহ.) ফাতহুল বারী কিতাবে ইবন মুনযির (রহ.)-এর সূত্রে হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

... إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ حُرَّهُمْ وَعَبْدَهُمْ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ

مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ مِنَ الرِّقِيقِ - (فتح الباري ج ৩ ص ২৭৬)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) তাঁর পরিবারের স্বাধীন, গোলাম, ছোট-বড়, মুসলমান ও কাফির গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতেন।

দলীল (৩): হযরত ইবন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

يَخْرُجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا - (نصب

الراية ২ ج ১১৬, ১১৭, ১১৮)

অর্থাৎ, ... ব্যক্তি তার মালিকানাধীন প্রত্যেকটি গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করত। চাই সে গোলাম ইয়াহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীস ও আছারের দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাফির গোলামের জন্যও মুসলমান মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন-

(১) ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীসে যে "من المسلمين" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে, তা ইমাম মালিক (রহ)-এর সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে পাওয়া যায় না, বরং শর্তহীনভাবে শুধুমাত্র গোলামের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ সনদে যা উল্লেখ রয়েছে তাই প্রাধান্য পাবে।

এ ব্যাপারে ইবন বাযবায় (রহ.) তো বলে ফেলেছেন-

"إِنَّهَا زِيَادَةٌ مُضْطَرِبَةٌ بِلَا شَكٍّ مِنْ جِهَةِ الْأَسْنَادِ وَالْمَعْنَى" - (حاشية الكوكب الدرّي ج ১

১১৬-১১৭)

অর্থাৎ, এটি সনদ ও অর্থগত দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ইয়তিরাব (অসঙ্গতি) বিশিষ্ট অতিরিক্ত অংশ।

(২) লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, তিন ইমাম ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা কাফির দাসের উপর সদকাতুল ফিতর ফরয না হওয়ার দলীল পেশ করেছেন। অথচ ইবন উমর (রাঃ) নিজেই কাফের দাসের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। (দেখুন, হানাফীদের প্রদত্ত দ্বিতীয় দলীল।) সুতরাং এমন মতানৈক্য হাদীস এক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (০০৫ টর্মুজি ২ জ ১১৬)

(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যদিও একথা মেনে নেয়া হয় যে, "من المسلمين" শব্দটি প্রকৃতপক্ষেই সহীহ সনদে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, এর পরেও আমরা বলব যে, "من المسلمين" শব্দটি মূলত গোলামের সাথে সম্পৃক্ত সাব্যস্ত করে না, বরং এর দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, "على من تجب الصدقة" তথা সদকা কার উপর ওয়াজিব। আর এ হিসেবেই "من المسلمين" শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ,

সদকাতুল ফিতর মুসলমানের উপর ওয়াজিব, কাফিরের উপর নয়। আর এজন্যই হযরত ইবন উমর (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রকার গোলামের সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। সুতরাং এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। কেননা, তিনি হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন।

(فتح الباري ج ٣ ص ٢٩٤)

৭. কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবেঃ সদকাতুল ফিতর আদায়ের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতরে গম দেয়া হোক কিংবা যব, খেজুর বা কিসমিস সবগুলোর ক্ষেত্রে মাথাপিছু এক সা ওয়াজিব।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٤٩٨، تنظيم ج ٢ ص ٢٥)

দলীল (১) : ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مَعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مَدِينٍ مِنْ سَعَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَآخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ - (ابو داود ج ١ ص ٢٢٨ باب كم يودي في صدقة الفطر، بخاري ج ١ ص ٢٠٤ باب صاع من زبيب، مسلم ج ١ ص ٣١٨ باب زكاة الفطر، ترمذي ج ١ ص ١٤٥-١٤٦ باب صدقة الفطر، نسائي ج ١ ص ٣٤٧ باب التمر في زكاة، ابن ماجه ص ١٣٢)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা সদকায়ে ফিতর আদায় করতাম প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে এক সা পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সা পরিমাণ পনির বা এক সা বার্লি বা এক সা খোরমা বা এক সা পরিমাণ কিসমিস। আমরা এই হিসাবে সদকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং অবশেষে মুআবিয়া (রাঃ) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অতঃপর তিনি মিসরে আরোহণপূর্বক ভাষণ দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

সিরিয়া থেকে আগত ‘দুই মুদ’* গম এক সা’ খেজুরের সমপরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি যতদিন জীবিত আছি, সদকায়ে ফিতর এক সা হিসেবেই প্রদান করতে থাকব।

উপরোল্লিখিত হাদীসের আলোকে উল্লিখিত তিন ইমাম বলেন যে, উক্ত হাদীসে صَاعًا مِنْ طَعَامٍ (এক সা খাদ্য) শব্দ রয়েছে। আর তাঁদের মতে হাদীসে طعام (খাদ্য) দ্বারা গম বুঝানো হয়েছে। সুতরাং গমের ক্ষেত্রেও সদকাতুল ফিতর এক সা দেয়া ওয়াজিব হবে। তাছাড়া উল্লিখিত ইমাম আরো বলেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা আদায়ের হুকুম করলে হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) তা গ্রহণ করেননি। অতএব বুঝা গেল যে, গমের ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতর ‘অর্ধ সা’ দেয়া যাবে না।

দলীল (২): আবু ইসহাকের সনদে বর্ণিত আছে-

زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ - (درس ترمذي ج ২ ص ৫৭৮، تنظيم ج ২ ص ২০)

অর্থাৎ, সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ হল এক সা খেজুর অথবা এক সা গম।

দলীল (৩): ইবন উমর (রাঃ) ইরশাদ করেন- ... صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرِّ -

অর্থাৎ, গমের ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতর হল এক সা। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ২০)

তঁারা বলেন, উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে স্পষ্টভাবে গমের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, গমের ক্ষেত্রেও এক সা সদকাতুল ফিতর দিতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.), খোলাফায়ে রাশেদীন, ইবন মাসউদ, মুআবিয়া ও জাবির (রাঃ) প্রমুখের মতে, গম বা আটা অর্ধ সা আর অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এক সা প্রদান করা ওয়াজিব।

দলীল (১): ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمَحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ

صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ... (ابو داود ج ১ ص ২২৮ باب من روى نصف صاع من قمح)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন সালাবা অথবা ছা'লাবা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবী সুআয়র (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, ছোট বা বড়, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, নর বা নারী তোমাদের প্রতি দুজনের পক্ষ থেকে এক সা গম নির্ধারিত করা হল।

* দুই মুদ হল অর্ধ সা। সুতরাং পূর্ণ ১ সা হয় ৩.৬ ছটাক, আর অর্ধ সা হয় দেড় সের তিন ছটাক।

উক্ত হাদীসে গমের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতি দু'জনের জন্য এক সা' প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং প্রত্যেকের উপর অর্ধ সা' প্রদান করাইওয়াজিব।

দলীল (২): ... عَنْ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ بَنُ عَبَّاسٍ فِيْ أَخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرٍ الْبُصْرَةِ فَقَالَ ... فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرَ أَوْ أُتْلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২২৭ باب من روى نصف صاع من قمح، نسائي ج ১ ص ৩৪৭ مكملة زكاة الفطر)

অর্থাৎ, ... আল-হাসান (আল-বসরী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেনঃ ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সদকা এক সা' পরিমাণ খেজুর বা বার্লি অথবা অর্ধ সা পরিমাণ গম প্রত্যেক স্বাধীন-ক্বীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার্য করেছেন।

দলীল (৩): হযরত সালাবা ইবন আবু সুআয়র তার পিতা সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদীস-
أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ - (شرح معاني الآثار ج ১ ص ২৭০)

অর্থাৎ, তোমরা সদকাতুল ফিতর আদায় কর জনপ্রতি এক সা খেজুর এবং এক সা যব অথবা অর্ধ সা গম।

দলীল (৪): হযরত আসমা বিনত আবু বকর (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে-
... قَالَتْ كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَيْنٍ مِنْ قَمْحٍ - (طحاوي ج ১ ص ২৬৭)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে দুই মুদ গম সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

দলীল (৫): ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ... مُدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سَوَاهُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ - (ترمذي ج ১ ص ১৪৬ باب في صدقة الفطر)

অর্থাৎ, ... আমরা ইবন শুআইবের দাদা সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মক্কার গিরিপথে একজন ঘোষককে (এই ঘোষণা দিয়ে) পাঠালেন, সাবধান! সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব ... দুই মুদ গম। অথবা এছাড়া অন্য কিছু হলে এক সা খাবার।

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গমের সদকাতুল ফিতর অর্থ সা প্রদান করা ওয়াজিব।

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমাম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, হাদীসে উল্লিখিত طعام দ্বারা গম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা খাদ্য জাতীয় প্রত্যেক বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা যুরকানী (রহ.) শরহে মুয়াত্তায় বলেন, طعام দ্বারা ভুট্টা, বাজরা শস্য বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর সময় গমের প্রচলন ছিল না। যেমন, হাফিয় ইবন হাজার (রহ.) ইবন খুযায়মা সূত্রে হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّيْتُ وَالْعَشِيرُ وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ - (فتح الباري ج ٣ ص ٢٩٦)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে সদকা শুধু খেজুর, কিসমিস ও যব ছিল। গম ছিল না।

অতএব, طعام দ্বারা গম বুঝানো প্রচলন তখন থেকে শুরু হয়েছে, যখন থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর পরে গমের ব্যবহার অধিক হারে বেড়েছে। তৎকালে খাদ্য জাতীয় প্রত্যেক বস্তুকেই طعام বলা হত। যেমন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নিজেই বলেন-

كَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّيْتُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ - (بخاري ج ١ ص ٢٠٤-٢٠٥ باب الصدقة قبل العيد)

অর্থাৎ, আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।

সুতরাং বুঝা গেল, طعام দ্বারা গম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর উক্তি- “আমি যত দিন জীবিত আছি, সদকায় ফিতর এক সা হিসেবেই প্রদান করতে থাকব”-এর জবাবঃ.

(১) এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) প্রথম থেকেই গমের ফিতরা এক সা হিসেবে আদায় করতেন, বরং উদ্দেশ্য হল- প্রথম থেকেই

তিনি সদকাতুল ফিতর গমের দ্বারা আদায় না করে অন্যান্য শস্য দ্বারা এক সা করে আদায় করতেন। আর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) মদীনায় আসার পরেও খুদরী (রাঃ) নিজের আমলের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাননি। যদিও অন্যান্য লোকেরা হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর হুকুমের উপর আমল করতে গিয়ে অন্যান্য শস্যের পরিবর্তে অর্ধ সা গমের দ্বারা ফিতরা আদায় করতেন। কিন্তু খুদরী (রাঃ) গমের পরিবর্তে সর্বদা অন্যান্য শস্যের দ্বারা এক সা' আদায় করতেন। এমন নয় যে, খুদরী (রাঃ) গমের সদকাতুল ফিতর যে অর্ধ সা' তা জানতেন না বা মেনে নেননি। (درس ترمذي ج ٢ ص ٥٠١)

নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা এ ছন্দুর নিরসন ঘটে-

হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর রেওয়ায়েত-

إِنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ
لِلرَّسُولِ إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ صَاعًا مِنْ
تَمَرٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ - (طحاوي ج ١ ص ٢٦٩)

অর্থাৎ, মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, আপনি আপনার গোলামের যাকাত আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বার্তাবাহককে বললেন যে, মারওয়ান জানেন না, আমাদের উপর দায়িত্ব হল, প্রত্যেকের মাথাপিছু এক সা খেজুর অথবা অর্ধ সা গম।

* হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, যদিও মেনে নেয়া হয় যে, হযরত খুদরী (রাঃ) প্রথম থেকেই গমের এক সা সদকা দিতেন। অতঃপর মুআবিয়া (রাঃ)-এর অর্ধ সা-এর আদেশ শুনেও তিনি এক সা দেয়ারই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন- এর জবাবে তিনি বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর প্রথমে একথা জানা ছিল না যে, গমে অর্ধ সা ফিতরা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) নির্ধারণ করেছেন। বরং মুআবিয়া (রাঃ)-এর এই হুকুমকে খুদরী (রাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে কিয়াস ভেবেছিলেন। তাই তিনি প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু জানার পর হযরত খুদরী (রাঃ)-এর কর্মপন্থা ও মাহযাব এটাই ছিল যে, গম অর্ধ সা' ওয়াজিব। (الكوكب الدري ۱ ج ص ۲۴۴)

তিন ইমামের প্রদত্ত অবশিষ্ট দুটি হাদীসের জবাবঃ ইসলামের প্রথম যুগে গমের ফিতরা এক সা দেয়া হত, অতঃপর অর্ধ সা-এর হুকুম দেয়া হয় এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ... صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ الْخ (بخاري ج ١)

২০৫. باب صدقة الفطر على الحر الخ، مسلم ج ১ ص ৩১৭، ترمذي ج ১ ص ১৬৬، باب صدقة الفطر، نسائي ج ১ ص ৩৬৬ (باب فرض زكاة رمضان)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) সদকাতুল ফিতর হিসেবে ... এক সা খেজুর বা এক সা যব আদায় করা ধার্য করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ সা গমকে এক সা খেজুরের সমমান দিতে লাগল।

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ... قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ - (ابو داود ج ১ ص ২২৭، باب كم يودي في صدقة الفطر)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় যখন গমের ফলন অধিক হতে থাকে, তখন তিনি আধা সা গমকে উল্লিখিত বস্তুর এক সা-এর সম পরিমাণ নির্ধারণ করেন। উক্ত হাদীসের রাবী হযরত ইবন উমর (রাঃ) এবং তিন ইমামের পক্ষ থেকে প্রদত্ত তৃতীয় দলীলের রাবীও হলেন হযরত ইবন উমর (রাঃ)। যদিও মেনে নেয়া হয় কোন হাদীস দ্বারাই দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও দেখা যাচ্ছে, এ হাদীস ব্যতীত হানাফীদের এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যার দ্বারা অকাটা দলীল দেয়া সম্ভব। অতঃপর বলা যায়, তিন ইমামের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বায়হাকী গ্রন্থে। আর হানাফীদের সপক্ষে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ এবং নাসায়ী কিতাবে, যা হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়খানা কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। এদিক থেকে বিচার করলেও হানাফীদের প্রদত্ত দলীল অগ্রগণ্য।

* সর্বোপরি বলা যায় যে, গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা দেয়া, এটা ওয়াজিব। আর অতিরিক্ত অর্ধ সা দেয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুত্তাহাব। যা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)ও অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করতেন, ওয়াজিব হিসেবে নয়। (تنظيم الاثنات ج ২ ص ২৬)

بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ص ২২৯

অগ্রিম যাকাত প্রদান করা

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ - (ترمذي ج ১ ص ১৬৬، باب في تعجيل الزكاة، ابن ماجه ص ১২৯)

অনুবাদঃ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট (সময়ের পূর্বে) দ্রুত যাকাত প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সাঃ) তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি দান করেন।

বিশ্লেষণঃ যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়েয কিনা?

এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, নিসাব পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ যাকাত প্রদান করে, তাহলে তার যাকাত আদায় পরিতৃপ্ত হবে না, বরং পরে যখন ঐ ব্যক্তি নিসাবের মালিক হবে, পুনরায় যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হল নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। তবে পূর্বের প্রদত্ত সম্পদ নফল সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।

কিন্তু নিাসব পূর্ণ হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পদের উপর এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করে, তাহলে তার যাকাত আদায় হবে কিনা এক্ষেত্রে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়-

* ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী, লাইস এবং হাসান বসরী (রহ)-এর মতে, বছর পূর্তি হবার পূর্বে অগ্রিম যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হবে না। কেননা, যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে বর্ষপূর্তি হওয়া। (معارف ৫৭ ص ১১)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

... لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ - (ابو داود ج ١ ص ٢٢١ باب في زكاة

السائفة ، ترمذي ج ١ ص ١٣٨ باب لا زكوة على العال الخ ، نسائي ج ١ ص ١٢٩)

অর্থাৎ, ... যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নেই।

কিয়াসী দলীলঃ নামায যেরূপ নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলেই ফরয হয়, সময়ের পূর্বে আদায় করলে তা আদায় হয় না, তদ্রূপ যাকাতও ফরয হয় বছর পূর্তি হলে। সুতরাং বছর পূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না।

(درس ترمذي ج ۲ ص ۵۰۸-۵۰۹)

এ ব্যাপারে হাসান বসরী (রহ.)-এর উক্তি হল-

مَنْ زَكَّى قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ كَالصَّلَاةِ - (عيني ج ٩ ص ٤٧)

অর্থাৎ, কেউ যদি সময় আসার পূর্বে যাকাত আদায় করে তবে তা নামাযের ন্যায় দোহরাবে। (পুনরায় পড়বে)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা জায়েয আছে। (عینی ج ۹ ص ۴۷)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): ... عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ - (ترمذي ج ١ ص ١٤٧)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) উমর (রাঃ) কে বললেন, আমরা আব্বাস (রাঃ)-এর যাকাত এ বছরের যাকাত বছরের প্রথমই আদায় করে নিয়েছি।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবে বলা যায়, উক্ত হাদীসে এমন বলা হয়নি যে, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না, বরং এর দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, যে মালে এক বছর পূর্তি হয়নি, তার উপর যাকাত ফরয নয়। তবে যদি কেউ নিসাবের মালিক হওয়ার পর আদায় করে দেয়, তাহলে আদায় না হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া অন্যান্য হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ ওয়াস্ত নামায ওয়াজিব হওয়ার কারণ। অথচ বছর অতিক্রান্ত হওয়া যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত, ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়। সুতরাং বছর পূর্তিকে নামাযের ওয়াস্তের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। (درس ترمذي ج ٢ ص ٥٠٩)

بَابُ فِي الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ص ٢٢٩

এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া

... عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ ... عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زَيْدًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَيُّ الْمَالِ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অনুবাদঃ ... ইবরাহীম ইবন আতা (রহ.) ... তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ অথবা অন্য কোন শাসক ইমরান ইবন হুসায়েন (রাঃ)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর ইমরান (রাঃ) ফিরে এলে তিনি (আমীর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বলেন, আপনি আমাকে যাকাতের যে মাল আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন, তা আমরা সেই স্থান হতে আদায় করেছি, যেখান থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে আদায় করতাম, আর তা সেই সমস্ত স্থানে খরচ করেছি, যেখানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে ব্যয় করতাম। (অর্থাৎ যেখানে আদায় করা হত সেই এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হত)

বিশ্লেষণঃ যাকাতের সম্পদ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাকাত স্থানান্তর করা জায়েয নয়।

(تنظيم الاثقات ২ ج ص ১৫)

দলীল (১)ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীস। উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগেও যাকাত যেখান থেকে আদায় করা হত সেখানেই ব্যয় করা হত।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ... إِنَّ اللَّهَ

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ الخ (ابو

داود ج ১ ص ২২৩ باب في زكوة السائمة، بخاري ج ১ ص ২০২-২০৩ باب اخذ الصدقة من الاغنياء، ترمذي ج ১ ص ১৩৬ باب في كراهية اخذ الخ، نسائي ج ১ ص ৩৪৮ اخراج الزكوة من بلاد الى بلد، ابن

ماجة ص ১২৮-১২৯)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে যামানে প্রেরণের সময় বলেন, ... (তুমি তাদেরকে বলবে যে) আল্লাহ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে (তাদের) গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে।

সুতরাং উক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, যে শহরে ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করা হবে, ঐ শহরেরই গরীবদের মধ্যে যাকাত বণ্টন করা হবে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাকাত স্থানান্তর করা জায়েয। তবে উত্তম হল, এক এলাকার যাকাত প্রয়োজন ব্যতীত অন্য এলাকায় স্থানান্তর না করা। অর্থাৎ, প্রয়োজন ব্যতীত স্থানান্তর করা মাকরুহ।

‘দুররুল মুখতার’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, অন্য শহরে গরীবদের যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় এবং তা প্রেরণ করলে ঐ শহর বা দেশের মুসলমানদের ব্যাপক উপকার লাভের সম্ভাবনা থাকে অথবা দুই স্থানের মধ্যে যদি বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে অথবা ইলম অর্জনকারী ছাত্রের উদ্দেশ্যে পাঠায় অথবা যাকাতদাতার অসহায় আত্মীয় স্বজন যদি অন্য স্থানে বা অন্য শহরে বসবাস করে, তাহলে যাকাত স্থানান্তর করা মাকরুহ তো নয়ই, বরং উত্তম কাজ এবং সে দুটি সওয়াবের ভাগী হবে।

(تنظيم الاثقات ২ ج ص ১৫، درس ترمذي ج ২ ص ১৭৫)

যেমন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

... لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ (بخاري ج ١ ص ١٩٨ باب الزكاة على الزوج الخ، مسلم ج ١ ص ٣٢٣ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين الخ، نسائي ج ١ ص ١٣٣)

তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব- (ক) নিকটাত্ত্বীয়ের সওয়াব (খ) সদকার সওয়াব।

দলীল: ... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَدْعِي الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَصْرِفُهَا فِي فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ - (درس مشکوة ج ٢ ص ١٦٥)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বেদুঈনদের কাছ থেকে যাকাত এনে মদীনার দরিদ্র মুহাজিরদেরকে দিতেন।

যুক্তিভিত্তিক দলীল: আসলে ব্যাপারটা একটু বাস্তব দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, এরকম স্থানান্তরিত করায় কোন অসুবিধা থাকতে পারে না। বরং অনুমতিই দিতে হয়। কারণ সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেমন, আমাদের দেশের অথবা বিশ্বের কোন এক প্রান্তে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হল। আবার দেখা গেল অন্য কোন এক স্থানে কিছুই উৎপন্ন হল না, বরং সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, এক্ষেত্রে উৎপাদনশীল এলাকায় গরীব না থাকলে যাকাতের সম্পদ আদায় করে যেখানে কোন ফসলই উৎপন্ন হয়নি সেখানে স্থানান্তর করা উচিত। কারণ তারাও এতে হকদার। কিন্তু দেয়া না হলে এটা হবে অবিচার এবং ইসলামী নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী।

জবাব: হানাফীগণের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ ইমরান বিন হুসাইন ছিলেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের যাকাত আদায়কারী। তিনি বিশেষ পরিস্থিতিতে ঐ কথা বলেছিলেন। গ্রহণযোগ্য দলীল তো হবে তাই যা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) আমল করেছেন। (تلازم الاشتات ج ٢ ص ٤، درس مشکوة ج ٢ ص ١٦٥)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসে উল্লিখিত هم এর فرائهم সর্বনামটি اهل اليمن-এর দিকে ফিরেছে, এর দিকে নয়। অর্থাৎ, চাই ইয়ামনবাসী গরীব হোক অথবা অন্য যে কোন শহরের মুসলিম গরীব হোক, সবাইকে দেয়া বৈধ হবে। (معارف ج ٥ ص ٢٥٦)

بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدُّ الْغَنَى ص ২২৭

যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوشٌ فِي وَجْهِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغَنَى قَالَ خُمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ - (ترمذي ج ১ ص ১৪১ باب من حل له

الزَّكَاةُ، نسائي ج ১ ص ৩১৩ حد الغنى، ابن ماجه ص ১৩৩)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার নিকট যা আছে তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কিয়ামতের দিন স্বীয় চেহারায়ে অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষতসহ আগমন করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধনী কে? তিনি বলেন, ৫০ দিরহাম অথবা ৫০ দিরহাম মূল্যের পরিমাণ স্বর্ণ (যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবে না।)

... عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَاَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ

حَقَّكَ - (ابو داود ج ১ ص ২৩০)

অনুবাদঃ ... যিয়াদ ইবন হারিস আস-সুদায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে, আমাকে কিছু যাকাতের মাল দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে বলেন, আল্লাহ তাআলা (সদকার মাল খরচের ব্যাপারে) তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হননি, বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আট শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক প্রদান করব।

বিশ্লেষণঃ زكوة مصارف বা যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহঃ যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

অর্থাৎ, “যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য- এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (তাওবাঃ ৬০)

নিম্নে যাকাত বন্টনের খাতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হল-

১। ফকীর বা দরিদ্রঃ ফকীর বা দরিদ্র বলতে ঐ সকল নারী-পুরুষকে বুঝায়, যারা পুরোপুরি সহায়-সম্বলহীন বা একেবারেই নিঃস্ব নয়। তথাপিও চাহিদা পূরণে যারা অন্যের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। তাছাড়া জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়া অক্ষম, দুর্বল, পঙ্গু, অভাবগ্রস্ত লোকদেরকেও সাময়িকভাবে দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত করে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

২। মিসকীন তথা নিঃস্ব বা সর্বহারাঃ মিসকীন বলতে সহায় সম্বলহীন একেবারে নিঃস্ব ঐ ধরনের পুরুষ ও মহিলাদেরকে বুঝায়, যারা অপরের দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত চলতে পারে না।

৩। যাকাত আদায়কারী ও বন্টনকারীঃ যাকাত বিভাগে কর্মরত যে সকল কর্মচারী রয়েছেন, যারা যাকাত-উশর আদায়, বন্টন ও সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত, এ সকল কর্মচারী যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিকও হয়, তবুও তাদেরকে যাকাতের অর্থ থেকে বেতন-ভাতা প্রদান করা যাবে।

৪। মুআল্লাফাতুল কুলুব বা যাদের মন পাওয়া উদ্দেশ্যঃ মুআল্লাফাতুল কুলুব বলতে সাধারণত সমস্যাগ্রস্ত নও মুসলিমকে বুঝায়। ইসলামের স্বার্থে নও মুসলিমদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এবং তার মন জয়ের উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ খরচ করা যাবে। যদিও সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়।

৫। গোলাম আযাদ বা দাস মুক্তির ক্ষেত্রেঃ মাকাতিব গোলামের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে গোলাম তার মালিকের সাথে চুক্তিতে শৃঙ্খলিত, এরূপ গোলাম আযাদের ক্ষেত্রে যাকাতের মাল ব্যয়িত হতে পারে। কিন্তু সাধারণ দাস-দাসীর বেলায় এই আইন প্রযোজ্য নয়।

৬। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেঃ ঐ সকল ঋণী, যারা ঋণভারে জর্জরিত অথচ ঋণ পরিশোধের জন্য আর্থিক কোন ক্ষমতাই তাদের অবশিষ্ট নেই। এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করে তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করা যাবে।

৭। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদঃ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রাণ-পণ প্রচেষ্টা চালায় তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকলে যুদ্ধাত্ত্র ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনার জন্য যাকাতের টাকা ব্যয়িত হতে পারে।

৮। মুসাফির বা ভ্রমণকারীঃ মুসাফির বা ভ্রমণকারী বলতে বুঝানো হয়েছে যারা স্বস্থানে প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমণের অবস্থায় অর্থের অভাবে পথ চলা খেমে যায়। ঐ সম্পদশালী মুসাফির ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ।

“মুআল্লাফাতুল কুলুব”-এর ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ সাধারণত তারা ছয় শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। উলামাদের নিকট মুআল্লাফাতুল কুলুব তথা নও মুসলিম বা অমুসলিমকে দ্বীনের স্বার্থে চিত্তাকর্ষণের নিমিত্তে যাকাত দেয়ার হুকুম এখনও অবশিষ্ট আছে, নাকি এটা নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং তাঁর ইত্তিকালের সাথে সাথে তা রহিত হয়ে গেছে- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব (রহ.) প্রমুখের মতে, নও মুসলিম বা অমুসলিমকে মন জয়ের জন্য এবং ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য যাকাত প্রদান করার হুকুম এখনও অবশিষ্ট আছে, তা রহিত হয়নি।

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- ... وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ইবন আনাস, হাসান বসরী (রহ.) এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর মতে, নও মুসলিমকে মন জয়ের জন্য এবং ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য যাকাত প্রদান করার হুকুম এখন আর অবশিষ্ট নেই; বরং রহিত হয়ে গেছে। (فتح القدير ج ২ ص ১০، معارف ج ৫ ص ২৮৩)

দলীল (১)ঃ একদল বলেন, উক্ত হুকুম মানসুখ (রহিত) হওয়ার জন্য ঐ আয়াত নাসিখ (রহিতকারী) যা সূরা কাহাফে বর্ণিত হয়েছে-

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ-

অর্থাৎ, “সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।” (কাহাফঃ ২৯)

* আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, মুআল্লাফাতুল কুলুব-এর রহিতকারী আয়াত হল-

فَأَقْضُوا الْفِتْنَةَ لِلَّهِ أَلَمْ تَكُونُوا أَتَقْوُونَ- অর্থাৎ, তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও। (তাওবাহঃ ৫)

* অথবা, সূরা নিসার আয়াত- وَلَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا-

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের কোন পথ রাখবেন না। (নিসাঃ ১৪১)
 উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ‘মুআল্লাফাতুল কুলুব’-এর হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে এবং বুঝা যায় যে, তাদেরকে প্রথম প্রথম এজন্য যাকাত দেয়া হত যাতে তাদের মন পরিতুষ্ট থাকে এবং ইসলামের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অনেকেই বলেন, সাহাবায়ে কিরামের যুগে ইহা রহিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ)-এর সময়কালের একটি ঘটনা- নবী করীম (সাঃ) উয়ায়নাহ ইবন হিসনা নামক এক কাফিরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য উপহার দিতেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর ইত্তিকালের পর যখন ঐ ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট একই উদ্দেশ্যে আসে, তখন তিনি (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তো তোমাকে মন জয়ের জন্য সম্পদ প্রদান করতেন। এখন আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিজয় দান করেছেন। সুতরাং এখন আমাদের নিকট তোমাদের কোন অংশ নেই। চাই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর বা না কর, তাতে কিছু আসে যায় না। (فتح الملقم ج ২ ص ১০، فتح الملقم ج ২ ص ৩৫) অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ -
 কেউ কেউ বলেন, এ হুকুমটি নবী করীম (সাঃ)-এর যুগের সাথে খাস ছিল।

* আল্লামা কুরতুবী ও কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) এ ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রদান করেন, ‘মুআল্লাফাতুল কুলুব’-এ কাফির কখনো অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বরং এর দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঐ সকল নও মুসলিম, যারা দরিদ্র। সুতরাং এ ব্যাখ্যাটি মেনে নিলে রহিতের প্রয়োজন হয় না। আর নবী করীম (সাঃ) কাফিরদের মনোরঞ্জননের জন্য যে মাল দিতেন, তা যাকাত থেকে নয়, গনীমতের মাল থেকে।

(تفسير قرطبي ج ৮ ص ১৭৭، تفسير مظهري ج ১ ص ২৩৪)

যাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়ঃ যাকাতের অর্থ যাদেরকে প্রদান করা যাবে না এবং প্রদান করলেও যাকাত আদায় হবে না। ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাদেরকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন-

১। নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং তাদের পিতামাতা।

২। নিজের সন্তান, নাতি-নাতনী

৩। স্বামী

৪। স্ত্রী

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত ৪টি স্তর ব্যতীত অন্যান্য নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা অধিক সওয়াবের কাজ। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১৮৮، درس ترمذي ج ২ ص ১৭০-১৭১)

৫। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। আবার যাকাতের হকদার এমন কাউকে এত বেশি পরিমাণ যাকাত প্রদানও বৈধ নয় যা দিলে সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

৬। কোন অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (এ ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)

৭। বনু হাশিম (রাসূল সাঃ-এর বংশ) গোত্রের লোকদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

কাকে ধনী বলা যায় এবং কার জন্য সওয়াল করা জায়েযঃ কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ব্যক্তিকে ধনী বলা যাবে এবং অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে-

উল্লেখ যে, ধনী তিন প্রকারঃ

(১) যার নিকট বর্ধনশীল মাল রয়েছে এবং পাশাপাশি সে সাহিবে নিসাব হবে। এমন ধনীর উপর যাকাত, কুরবানী এবং সদকাতুল ফিতর সবই আদায় করতে হবে। তার জন্য সর্বপ্রকার সদকা গ্রহণ করা হারাম।

(২) যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ মাল রয়েছে, তবে বর্ধনশীল মাল নয়, এমন ধনীর উপর যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে তার জন্য যাকাত ও অন্যান্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু কুরবানী করা, সদকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

(৩) যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বর্ধনশীল এবং অবর্ধনশীল কোন মালই নেই, এমন ধনীর উপর যাকাত, কুরবানী এবং সদকাতুল ফিতর কোনটাই আদায় করতে হবে না। তবে এমন ব্যক্তি সওয়াল ব্যতীত যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। (৪৭১-৪৭৫ ص ২ ج ১، درس ترمذي ১৮৮ ص ২ ج ২، درس مشکوٰۃ ২ ج ২)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি ৫০ দিরহাম বা তৎসম মূল্যের সম্পদের মালিক হবে, সে-ই ধনী। তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না। তিব্বী (রহ.) বলেন, ইহা ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এরও উক্তি।

দলীল: ... فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغَنَى قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنْ

الدَّهَبِ - (الغني ج ২ ص ১১১-১১২)

(পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।)

* কেউ কেউ বলেন, আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, যার সব সময় বা অধিকাংশ সময় সকাল-বিকালের খানা জোটে এবং অন্যের মুখাপেক্ষী নয়, সেই ধনী। তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না।

* এ ব্যাপারে হানাফীদের অভিমত হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এক দিন এক রাতের খোরাক থাকে তার জন্য সওয়াল করা জায়েয নয়। তাছাড়া সুস্থ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্যও সওয়াল করা জায়েয নয়। অবশ্য যার নিকট একদিন এক রাতের খাবারেরও ব্যবস্থা নেই, তার জন্য সওয়াল করা জায়েয আছে।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٤٧١)

... قَالَ النَّفِيلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغَنِيُّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدَرٌ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ وَقَالَ النَّفِيلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبْعٌ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ أَوْ لَيْلَةٌ وَ يَوْمٌ— (ابو داود ج ١ ص ٢٣٠)

অর্থাৎ, ... রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়ার সীমা কি, যার কারণে অন্যের নিকট চাওয়া অনুচিত হয়? তিনি বলেন, কারো নিকট এমন কিছু সম্পদ থাকা, যা তার সকাল ও সন্ধ্যার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। অন্য বর্ণনায়, “যা তার রাত-দিন বা দিন-রাতের জন্য যথেষ্ট” উল্লেখ রয়েছে।

قَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ— (ابو داود ج ١ ص ٢٣١، ترمذي ج ١ ص ١٤١ باب من تحل له الصدقة)

অর্থাৎ, ... আতা ইবন যুহাইর বলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, শক্ত, সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়।

* ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, যদি কারো পরিবার-পরিজন না থাকে, তাহলে তার জন্য এক দিন এক রাতের খাবার থাকলে সে সওয়াল করতে পারবে না। আর যদি পরিবার-পরিজন থাকে, তাহলে পঞ্চাশ দিরহাম থাকলে সওয়াল করতে পারবে না।

* অবশেষে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তাহাবী (রহ.) এই এখতিলাফের সমাধানকল্পে বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতি ধর্তব্য হবে। কারো পঞ্চাশ দিরহাম জরুরী, কারো এর থেকে বেশি জরুরী, কারো বা এর থেকে কম প্রয়োজন। সুতরাং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সওয়াল করা জায়েয বা হারাম ধর্তব্য হবে।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٣١، درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ١٨٨)

بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزُّكُوةِ ص ২৩১

এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে

... عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ وَزَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَتْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِعَائَةٍ مِّنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِحَيْبَرَ-

অনুবাদঃ ... বশীর ইবন ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাম সাহল ইবন আবু হাসমাহ নামক জনৈক আনসারী তাঁকে বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দিয়াতের (রক্তমূল্য) হিসেবে একশতটি যাকাতের উট দান করেন, অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়ত (রক্তমূল্য) যিনি খায়বরে নিহত হন।

বিশ্লেষণঃ একজনকে এত বেশি পরিমাণ যাকাত প্রদান করা বৈধ নয় যা দিলে সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এত কম পরিমাণ দেয়াও উচিত নয়, যার দ্বারা সে কিছুই করতে পারবে না।

উপরোল্লিখিত হাদীসে যাকাতের মাল থেকে যে একশতটি উট দেয়া হয়েছে তা মূলতঃ বায়তুল মাল থেকে দিয়াত বা রক্তমূল্য (হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ) হিসাবে দেয়া হয়েছে।

* তবে ইমামদের মধ্যে যে বিষয়ে এখতেলাফ রয়েছে তা হল- পবিত্র কুরআনে **زُكُوهُ** বা যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে যে সকল প্রকার উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক প্রকারকে যাকাত দিতে হবে কিনা-

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে যে আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি খাতে কমপক্ষে তিনজনকে যাকাত প্রদান করা জরুরী। তবে, কোন শহরে যদি প্রত্যেক প্রকারের লোক না পাওয়া যায়, তাহলে যে কয় প্রকারের লোক পাওয়া যাবে তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে। (المعارف ج ৫ ص ২০১، الام ج ২ ص ১৮)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- (التوبة ১০) ... **إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ**

আয়াতটিতে **و** দ্বারা যে **اضافت** (সম্বন্ধকরণ) করা হয়েছে তা মূলতঃ অধিকারের বিবরণের জন্য।

সুতরাং আট প্রকারের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারকেই যাকাত প্রদান করা জরুরী। অতঃপর লক্ষণীয় যে, প্রকারসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আর

আরবী ভাষায় বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হল তিন। সুতরাং প্রতিটি প্রকারের কমপক্ষে তিনজনকে প্রদান করাও জরুরী।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, মালিক, আহমদ, ইবন জাওযী, ইবন হুমাম, হাসান, নাখসি (রহ.), ইবন আব্বাস, হুয়াইফা (রাঃ) প্রমুখের মতে, যাকাতের আট প্রকার ব্যয় খাতের থেকে যেকোন এক প্রকারের একজনকে প্রদান করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। প্রত্যেক প্রকারকে প্রদান করা ওয়াজিব নয়।

(المغلي ج ٢ ص ٢٦٨)

দলীল (১): পবিত্র কুরআনের আয়াত-

إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ-

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান-খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। (বাকারাঃ ২৭১)

উক্ত আয়াতে صدقات-এর উপর الف لام جنسي (শ্রেণী বা জাতি বুঝাতে যে আলিফ লাম ব্যবহৃত হয়) প্রবিষ্ট হয়ে আমভাবে সকল সদকাকে বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে যাকাতও অন্তর্ভুক্ত এবং আট প্রকারের মধ্যে এক প্রকার শুধুমাত্র ফকীরকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এক প্রকারকে দেয়া যথেষ্ট হবে।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا

... إِنْ اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي

فُقَرَائِهِمْ الخ (ابو داود ج ١ ص ٢٢٣ باب في زكوة السائمة، بخاري ج ١ ص ١٩٦ باب لا تؤخذ كرائم،

ترمذي ج ١ ص ١٣٦ باب في كراهية اخذ الخ، نسائي ج ١ ص ٣٣٠، ابن ماجه ص ١٢٨-١٢٩)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বললেন, ... আল্লাহ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে।

উক্ত হাদীসেও এক প্রকারের (ফকীর) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইজমাঃ হযরত উমর, ইবন উমরা, ইবন আব্বাস, হুয়াইফা, সাঈদ ইবন যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ থেকে এই রেওয়াজেতই পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জবাবঃ হানাফীগণ বলেন, “انما الصدقات للفقراء” আয়াতে “ل”-এর দ্বারা যে “اضافت” করা হয়েছে, তা অধিকার প্রমাণের জন্য নয়, বরং নির্দিষ্ট ব্যয় খাতের বিবরণের জন্য। অর্থাৎ এ আট প্রকার ছাড়া অন্যদের দেয়া জায়েয নয়। আর اِنَّمَا তো আসে সীমাবদ্ধতা (حَصْر) বুঝানোর জন্য। (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ১৭০)

* “الف لام” দ্বারা استغراق (সামগ্রিকতা) উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি তা উদ্দেশ্য হয়, তবে দুনিয়ার সকল ফকীর, মিসকীন, মুসাফিরকে দেয়া আবশ্যিক হয়ে পড়বে, কাউকে বঞ্চিত করা জায়েয হবে না- যা কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে “الف لام جنسي” (জাতিজ্ঞাপক) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ফকীর, মিসকীন, মুসাফির জাতি। অতএব, আট প্রকারের মধ্যে যে কোন এক প্রকারের একজনকে যাকাত দিলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

(تنظيم ج ২ ص ৩১، درس ترمذي ج ২ ص ১৩৩-১৩৪، شرح وقاية ج ১ ص ২৩৭)

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ص ২৩৫

অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা

... عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّ رَاغِبَةٍ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصَلِّيْ أُمَّكِ - (مسلم ج ১ ص ৩২৪ باب فضل النفقة والصدقة الخ)

অনুবাদঃ ... আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের বৈরী ও কুরাইশ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন- (কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করিঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, সাধারণ (নফল) দান সদকা অমুসলিমদের প্রদান করা বৈধ আছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হল-

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ—

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসারফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসারফকারীদেরকে ভালবাসেন। (মুমতাহিনাঃ ৮)

এমনকি ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.) যিম্মীদেরকে (ইসলামী রাষ্ট্রে করদাতা অমুসলিম নাগরিক) সদকাতুল ফিতরও প্রদান করা জায়েয মনে করেন। তবে উত্তম হল মুসলমানদেরকেই প্রদান করা। (بدائع الصنائع ج ২ ص ৫৭)

প্রশ্ন হল, অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা জায়েয কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম যুফার, মুহাম্মদ ইবন সীরীন এবং যুহরী (রহ.)-এর মতে, অমুসলিমকে যাকাত দেয়া জায়েয। (كنز الدقائق ص ৭৫)

দলীল (১)ঃ ... اِلْمًا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

উক্ত আয়াতটি ব্যাপক। আয়াতে মুসলমানের কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ নবী করীম (সাঃ) সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে কাফির হওয়া সত্ত্বেও যাকাত (উপহার) প্রদান করেছেন।

* চার ইমাম ও জমহুর উলামাদের অভিমত হল, অমুসলিমদের যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (درس ترمذي ج ২ ص ৫৩)

জমহুরদের দলীল এবং ইমাম যুফার (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ—

(হাদীসটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, “যাকাত উত্তোলন করবে তাদের ধনীদের পক্ষ থেকে”। এখানে তাদের বলতে তো মুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, কোন অমুসলিম তো আর যাকাত প্রদান করবে না। এবং দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, “এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে।” এখানেও তাদের বলতে মুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই যুক্তিযুক্ত।

প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা, যাকাত প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদেরকে অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত- “মুআল্লাফাতে কুলূবে” শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) স্বীয় তফসীরে রাসূলে করীম (সাঃ) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন- (تفسير قرطبي ج ٨ ص ١٨٩) “وَبِالْجُفْلَةِ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كَافِرٌ”

অর্থাৎ, মূলতঃ তারা সবাই ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন-

“لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ اللَّيْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ لِلْإِلَافِ شَيْئًا مِنَ الزُّكُوفِ”
(تفسير مظهري ج ٤ ص ٢٣٤-٢٣٥)

অর্থাৎ, কোন রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদেরকে মন জয়ের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন।

আর সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে কাফির অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) যে সম্পদ দান করেছিলেন, সে সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুনাইন যুদ্ধের গনীমাতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেখান থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, বায়তুল মালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যয় করা সমস্ত ফিকাহবিদগণের নিকট জায়েয।

সর্বোপরি বলা যায়, যদিও এ ব্যাপারে ইমাম যুফার (রহ.)-এর কিছু দলীল বেশ শক্তিশালী, কিন্তু এর বিপরীতে বিপুল সংখ্যক উম্মতের ইজমা এর থেকেও বেশি শক্তিশালী ও মজবুত। অবশেষে ইহাই প্রমাণিত হল যে, অমুসলিমদেরকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (فتح الملقم ج ٣ ص ٧٤-٧٦)

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ : হজ্জ অধ্যায়

হজ্জ ফরয হওয়ার বর্ণনা : بَابُ فَرَضِ الْحَجِّ ص ২৪১

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ - (মসলম ১ জ ১২২) باب فرض الحج مرة في العمرة، نسائي ج ২ ص ১ باب وجوب الحج، ابن

ماجة ص ২১৩)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আকরা ইবন হাবিস (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয, না জীবনে একবার? তিনি বলেন, (জীবনে) একবার (হজ্জ করা ফরয)। এর অধিক যদি কেউ করে তবে তা তার জন্য অতিরিক্ত।

বিশ্লেষণঃ হুসাইন জুফী (রহ.) বলেন, الحج শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। যেমন-

(১) الْحَجُّ (হ-রফ যবরযোগে)

(২) الْحَجُّ (হ-রফ যেরযোগে)

"ح" বর্ণে যবর যোগে الْحَجُّ শব্দটি (বিশেষ্য)। যেমন, কুরআনে এসেছে-

- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ - অর্থাৎ, হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। (বাকারঃ ১৯৭)

আর "ح" বর্ণে যের যোগে الْحَجُّ শব্দটি مَصْدَرٌ (ক্রিয়ামূল)। অন্যদের থেকে এর বিপরীতও বর্ণিত আছে। (معارف السنن ج ১ ص ২৩৭)

যেমন, কুরআনে এসেছে - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

অর্থাৎ, আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের এ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। (আলে ইমরানঃ ৯৭)

حج-এর আভিধানিক অর্থঃ

(১) الْقَصْدُ - ইচ্ছা

(২) الْإِرَادَةُ - সংকল্প

(৩) الزِّيَارَةُ - পরিদর্শন

- (৪) الْقَصْدُ إِلَى مُعَظَم - মহৎ জিনিসের ইচ্ছা
 (৫) পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন ইত্যাদি।

হজ্জের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلِ مَخْصُوصٍ (كلز الدقائق ص ৭২)
 অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু কর্ম আদায় করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট স্থানে যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়।

الْقَصْدُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ - (فتح الهاري ج ৩ ص ২৭৭)
 নির্দিষ্ট কতগুলো আমলসহ বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে গমন করা।

احياء العلوم-এর গ্রন্থকার বলেন-

الْحَجُّ هُوَ الْقَصْدُ إِلَى زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ بِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মাধ্যমে পবিত্র কাবাহর যিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলা হয়।

الْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মাধ্যমে বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে গমন করা।

(৫) কেউ কেউ বলেন-

الْحَجُّ هُوَ قَصْدُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لِأَدَاءِ الرُّكْنِ الْعَظِيمِ -

অর্থাৎ, হজ্জ হচ্ছে, একটি মহান রোকন আদায় করার জন্য পবিত্র কাবা ঘরের যিয়ারতের নিয়ত করা।

হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কালঃ

হজ্জ কখন ফরয হয়েছিল, এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে।

(১) কোন কোন আলিম বলেন, হিজরতের পূর্বে হজ্জ ফরয হয়। (তবে এই উক্তিটি দুর্বল)

(২) আল্লামা কুরতুবী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।

(৩) ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে।

(৪) আল্লামা মাওয়াদী (রহ.) বলেন, ৮ম হিজরীতে।

(৫) কেউ কেউ বলেন, ৭ম হিজরীতে।

(৬) বিশুদ্ধ মত হলো, ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আব্দুল মালিক ইবন আব্দুল্লাহ (মৃত্যু: ৪৭৮ হি.) বলেন, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়।

(عمدة القاري ج ٩ ص ١٢٢، فتح الباري ج ٣ ص ٣٠٠)

দলীলঃ পবিত্র কুরআনে এসেছে-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا- (ال عمران- ৭৭)

আর এ আয়াতটি নবম হিজরীর শেষে অবতীর্ণ হয়েছিল।

حَجُّ বা হজ্জের ফরযসমূহঃ হজ্জের ফরয তিনটি। যথাঃ

(১) ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ এমন কিছু কার্যাবলী নিজের উপর হারাম করে নেয়া, যা মূলতঃ হারাম নয়। কিন্তু হজ্জের সম্মানার্থে হাজীর জন্য হারাম ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ-

অর্থাৎ, যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করার ইচ্ছা করে, তার জন্য উক্ত সময়ে স্ত্রী সন্তোষ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। (বাকারঃ ১৯৭)

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন- রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

لَا يُجَاوِزُ أَحَدُ الْمِيَقَاتِ إِلَّا مُحْرَمًا-

অর্থাৎ, কেউ যেন ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম না করে।

(২) وَقُوفُ عَرَفَةَ তথা যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسْمُوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يَقِضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ أَقِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ- (ابو داود ج ١ ص ٢٦٦ باب الوقوف بعرفة، بخاري ج ١ ص ٢٢٦ باب الوقوف بعرفة، ترمذي ج ١ ص ١٧٧ باب الوقوف بعرفات الخ، نسائي ج ٢ ص ٤٤ باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) বলেন, কুরায়েশরা তাদের ধর্মের অনুসরণ করে মুযদালিফাতে অবস্থান করত এবং একে বীরত্বের (প্রকাশ) হিসাবে আখ্যায়িত করত। আর আরবের অন্যান্য সমস্ত লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করত। তিনি

(আয়িশা রাঃ) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর, আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ)-কে আরাফাতে গমনের এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেখান হতে প্রত্যাবর্তনেরও নির্দেশ দেন। যেমন, আল্লাহ তাআলার বানী, “আর তোমরা সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর, যে স্থান হতে লোকেরা ফিরে আসে।”

* অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, এক লোক নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হজ্জ কিরূপ? তখন নবী করীম (সাঃ), জনৈক ব্যক্তিকে এতদসম্পর্কে ঘোষণা দিতে বললে, সে বলে-

... الْحَجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ (ابو داود ج ١ ص ٢٦٩ باب من لم يدرك عرفه، ترمذي ج ١ ص ١٧٨، نسائي ج ٢ ص ٤٤-٤٥ فرض الوقوف العرفة، ابن ماجه ص ٢٢٣)

অর্থাৎ, ... হজ্জ হল, আরাফাতে অবস্থান করা

(৩) طَوَافُ الزُّبَارَةِ তথা যিলহজ্জের ১০, ১১ অথবা ১২ তারিখ বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَالْيَطُوفُوا بِأَيْمَنِتِ الْعَتِيقِ

অর্থাৎ, এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে। (হজ্জঃ ২৯)

* হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ- (ابو داود ج ١ ص ٢٥٩ باب الطواف الواجب، مسلم ج ١ ص ٤١٣

باب جواز الطواف على بعير الخ، نسائي ج ٢ ص ٣٨ استلام الركن بالمخجن، ابن ماجه ص ٢١٧)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উটে সাওয়ার হয়ে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং রুকনে ইয়ামানীকে (খানায় কাবার যে কোণায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত তাকে রুকনে ইয়ামানী বলে) তাঁর হাতের লাঠির দ্বারা (ইশারায়) চুম্বন করেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে- •

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِئْتَى يَمِينِي رَاجِعًا- (ابو داود ج ١ ص ٢٧٤ باب الافاضة في الحج، مسلم ج ١ ص ٤٢٢ باب

استحباب طواف الافاضة يوم النحر)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাওয়াফে ইফাদা (অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত) দশই যিল-হজ্জের দিন সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি (মক্কা হতে) প্রত্যাবর্তন করে মিনাতে যুহরের নামায আদায় করেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, মাথা মুণ্ডানো এবং সাঈ করাও ফরয।

وَأَحْبَاتُ الْحَجِّ - হজ্জের ওয়াজিবসমূহঃ হজ্জের মধ্যে ওয়াজিব কাজ পাঁচটি। যথা-

(১) সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে ৭ বার সায়ী করা (سعى) বা দৌড়ানো। আল্লাহ তাআলা বলেন-
 إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ - فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا -

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্জ বা উমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (বাকারঃ ১৫৮)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ ... ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ (ابو داود ج ১ ص ২৬১ باب امر الصفا والمروة)

অর্থাৎ, ... ইসমাইল ইবন আবু খালিদ থেকে বর্ণিত। ... অতঃপর তিনি (সাঃ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন এবং পরে স্বীয় মস্তক মুন্ডন করেন।

(২) মুযদালিফায় অবস্থান করা।

... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اللَّيْلِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلَى قُرْحٍ فَقَالَ هَذَا قُرْحٌ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ - (ابو داود ج ১ ص ২৬৭ باب الصلوة بجمع)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) মুযদালিফাতে প্রভাতে কুযাহ নামক স্থানে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটাই 'কুযাহ' এবং এটাই অবস্থানের স্থান। আর মুযদালিফার সব স্থানই মাওকিফ (অবস্থানস্থল)। আর আমি এ স্থানে ও মিনার সর্বত্র কুরবানী করেছি, যা কুরবানীর স্থান। আর তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুকে মিনায় কুরবানী করবে।

(৩) জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنَى فَمَكَثَ بِهَا لَيْلًا يَبِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ الْخ (ابو داود ج ১)

ص ২৭১ باب في رمي الجمار)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় যুহরের নামায আদায়ের পর দিনের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতিরিক্ত তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে গমন করেন এবং সেখানে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। আর তিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর কংকর নিষ্ক্ষেপ করেন। নবী করীম (সাঃ) প্রতি জামরাতে সাতটি কংকর নিষ্ক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিষ্ক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দেন।

(৪) মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা। আল্লাহ তাআলার বাণী-

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ-

অর্থাৎ, আল্লাহ চান তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। (ফাতহঃ ২৭)

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ-

(ابو داود ج ١ ص ٢٧٢ باب الحلق والتقصير، بخاري ج ١ ص ٢٣٣ باب الحلق والتقصير عند

الاحلال، مسلم ج ١ ص ٤٢١ باب تفضيل الحلق على التقصير الخ)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় স্বীয় মস্তক মোবারক মুণ্ডন করেন।

(৫) তাওয়াফে বিদা বা বহিরাগতদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ-

(ابو داود ج ١ ص ٢٧٤ باب الوداع، ابن ماجه ص ٢٢٧)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনের পর তার হুকুম আহকাম সমাপনান্তে তাওয়াফে যিয়ারতের পর) প্রত্যাবর্তন করত। তখন নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মত তাওয়াফ (অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা) পালন না করে প্রত্যাবর্তন না করে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

. فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ

حِينَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ-

(ابو داود ج ١ ص ٢٧٥ باب طواف الوداع)

অর্থাৎ, ... তখন তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে গমনের জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফযরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লায় গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন।

بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ص ২৪১

মাহরাম* ব্যতীত মহিলাদের হজ্জে গমন

... أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مَعَهَا— (بخاري ج ١ ص ٢٥١ باب حج النساء، مسلم ج ١ ص ٤٣٣ باب سفر المرأة مع محرم الخ، ترمذي ج ١ ص ٢٢٠ باب كراهية ان تسافر المرأة وحدها)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা বৈধ নয়।

বিশ্লেষণঃ বিতশালী মুসলিম মহিলা মাহরাম না থাকা অবস্থায় সে হজ্জ করবে কিনা- এ বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, মহিলার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মাহরাম সাথে থাকা শর্ত নয়। এছাড়াও হজ্জ আবশ্যিক হবে। তবে শর্ত হল, পথ নিরাপদ হতে হবে এবং হজ্জের সফর এরূপ নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হতে হবে, যাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মহিলাও থাকবে।

(بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٥، فتح القدير ج ٢ ص ٣٣٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا—

অর্থাৎ, আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য (ফরয); যে লোকের এ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। (আলে-ইমরানঃ ৯৭)

উক্ত সম্বোধন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শামিল করে। সুতরাং মহিলার যখন যাতায়াত খরচসহ অন্যান্য শর্ত পূরণ হবে, তখন তাকে সামর্থ্যবান বলে গণ্য করা হবে। আর তার সাথে যদি কোন নির্ভরযোগ্য মহিলা থাকে, যার পক্ষ থেকে ফেতনার আশংকা নেই, তখন সে মহিলা মাহরাম ছাড়াই হজ্জ আদায় করতে পারবে।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٧٣)

দলীল (২)ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন-

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَاجُّوا— (مسلم ج ١ ص ٤٣٢ باب فرض الحج مرة في العمر)

* শরীয়তের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম তাকে মাহরাম বলে। যেমনঃ পিতা, পুত্র, দাদা, চাচা, ভাই, ভতিজা প্রভৃতি।

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে, অতএব, তোমরা হজ্জ কর।

দলীল (৩): আদী ইবন হাতিম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর ইরশাদ রয়েছে-

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَتَمَّمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظُّعَيْنَةُ مِنَ الْحَبِيرَةِ فَتَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جَوَارٍ أَحَدٍ- (مسند احمد ج ٤ ص ٢٥٧)

অর্থাৎ, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জীবন তাঁর (আল্লাহর) কসম, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এ (দীনের) বিষয়টি পূর্ণ করে ছাড়বেন। এমনকি একজন মুসাফির মহিলা হিয়ারা থেকে বের হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করবে কারো সহযোগিতা ব্যতীত।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহিলা যদি মক্কা-মুকাররমা থেকে সফরের পরিমাণ দূরত্বে থাকে তাহলে হজ্জের সফরে স্বামী অথবা কোন মাহরাম সাথে থাকা জরুরী। আর এই শর্ত ছাড়া তাঁদের মতে হজ্জ ওয়াজিব হবে না। বরং হজ্জের সফরই জায়েয হবে না।

(بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٥، فتح القدير ج ٢ ص ٣٣٠، تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٧٣)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبَوْهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مَعَهَا- (ابو داود ج ١ ص ٢٤٢ باب في المرأة تحج بغير محرم، بخاري

ج ١ ص ٢٥١، مسلم ج ١ ص ٤٣٤ باب سفر المرأة مع محرم الخ، ترمذي ج ١ ص ٢٢٠، ابن ماجه ص ٢١٤)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মাহরাম ব্যক্তি না থাকে।

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ-

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, কোন মহিলা যেন তিন দিনের পথ কোন মাহরাম সাথী ব্যতীত সফর না করে। (সূত্রঃ ঐ)

দলীল (৪): হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- (دار قطني ج ২ ص ২২৩) لَا تَحْجُّنِ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ - অর্থাৎ, মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা হজ্জ না করে।

দলীল (৫): যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারাও হানাফীদেবর মতের সমর্থন হয়। কেননা, মাহরাম ছাড়া সফরে ফিতনার আশংকা রয়েছে। আর সাথে যদি অন্যান্য মহিলাকে তাহলে তো ফেতনার আশংকা আরো বেশি প্রবল হয়। এ কারণে পরনারীর সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা হারাম যদিও অন্য কোন মহিলাও উপস্থিত থাকে। (فتح القدير ج ৩ ص ৩৩৩)

জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীলসমূহের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে,

(১) আল্লাহ তাআলা হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, “مَنْ” “تَحْجُّنِ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ” তথা “যে সَيْبِل বা পাথেয়ের সামর্থ্য রাখে।” তার উপর হজ্জ ফরয। আর মহিলার জন্য সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা সাবীল তথা পাথেয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন কোন মহিলার মাহরাম থাকবে না, তখন সে হজ্জের পাথেয়ের উপর সামর্থ্যবান না হওয়ার কারণে তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

(২) শাফেঈ ও মালিকীগণ দলীলের যে ব্যাপকতার কথা বলেছেন, তা আসলে ঠিক নয়। বরং সামগ্রিকভাবে তা কোন কোন শর্তের সাথে শর্তায়িত। যেমন, রাস্তা নিরাপদ হওয়া শর্ত। অতএব, উপরিউক্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে অতিরিক্ত শর্তারোপ করা হবে এবং খাস করা হবে এবং বলা হবে যে, স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত মহিলার উপর হজ্জ আবশ্যিক নয়। (درس ترمذي ج ৩ ص ৪০৮، تنظيم الاشتات ج ২ ص ৭৩)

২৪২ : আবেকটি অনুচ্ছেদ (অবিলম্বে হজ্জ সম্পন্ন করা)

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ - (ابن ماجه ص ২১৩)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে সে যেন অবিলম্বে তা সম্পন্ন করে।

বিশ্লেষণঃ কারো উপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব, নাকি অবকাশের সাথে বিলম্বে আদায় করা যাবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মদ, আওয়ামী এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে- হজ্জ তাৎক্ষণিক আদায় করা ফরয নয়। বিলম্বে আদায় করার অবকাশ রয়েছে।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٦٩)

দলীল (১): হজ্জের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ) দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। সুতরাং হজ্জ যদি তাৎক্ষণিকই ওয়াজিব হতো তাহলে রাসূল (সাঃ) একে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করতেন না।

দলীল (২): হজ্জ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, (أَتِمُّوا الْحَجَّ اَرْتِثَا) অর্থাৎ তোমরা হজ্জ আদায় কর) তা (أَمْرٌ مُطْلَقٌ) (সাধারণ নির্দেশ) যা তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় নয়।

দলীল (৩): সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়, অনুরূপ হজ্জকেও সময়-সুযোগ পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে। কেননা, হজ্জ হচ্ছে সারা জীবনের একটি করণীয়। (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٦٩)

* ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হজ্জ তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হতে বিলম্ব এবং তাৎক্ষণিক উভয় রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে, তাৎক্ষণিকের রেওয়ায়েতটিই অধিক সহীহ।

(درس ترمذي ج ٣ ص ٤٤، معارف السنن ج ٦ ص ٢٣٨)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): হজ্জ পালন করার জন্য আল্লাহ তাআলা কেবল সক্ষম মুসলমানদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করার মাঝেই সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত।

দলীল (৩): হজ্জ বছরে একবার এক নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস। আর এক বছরের মধ্যে মৃত্যু এসে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সবসময় আশঙ্কা থাকে যে, বিলম্বকারী ব্যক্তিটি আগামী বছর জীবিত নাও থাকতে পারে। সুতরাং ফরয হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা উচিত। (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٦٩)

জবাবঃ প্রতিপক্ষের প্রথম দলীলের জবাবে আহনাফ ও অন্যান্য ইমামগণ বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) হজ্জকে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে- (১) হয়ত তখন রাসূল (সাঃ) নবুয়তের দায়িত্বে ব্যস্ত ছিলেন, (২) অথবা বিশেষ কোন ওয়রের কারণে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। অর্থাৎ বর্বরতার যুগে আরবের কাফিরদের মধ্যে হজ্জে নাসী তথা যুদ্ধ করার প্রয়োজনে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী হারাম মাসগুলোকে আগে-পিছে করার প্রচলন ছিল। যেহেতু ১০

হিজরীতে যিলহজ্জ মাস যথার্থ সময়ে এসেছিল, তাই তিনি দশম হিজরীর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (درس ترمذي ج ৩ ص ১১১)

(৩) অথবা হজ্জ মৌসুমে তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন (যেমন- উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা ইত্যাদি) সমাবেশকে নবী করীম (সাঃ) এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই লক্ষ্য করা যায়, নবী করীম (সাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না। (৪) অথবা, অন্য কোন তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নবী করীম (সাঃ) দশম হিজরী পর্যন্ত হজ্জ বিলম্ব করেছিলেন। (المغني ج ৩ ص ২১২)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আসলে দ্বিতীয় দলীলটি হানাফী ও অন্যান্য ইমামগণের দলীল। কেননা আয়াতে (اتموا الحج)-এ নির্দেশের (امر)-এর ছীগা আনা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ যতদূর সম্ভব তাৎক্ষণিক আদায় করা উচিত। আর অবহেলা করতে গিয়ে কেউ যদি হজ্জ না করে মারা যায়, তবে ইজমা অনুযায়ী সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহের দণ্ডে দণ্ডিত হবে। (التبيين ج ২ ص ৩)

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হজ্জকে সালাতের সাথে কিয়াস করা যৌক্তিক নয়। কেননা, প্রতিটি সালাতের সময় সীমাবদ্ধ। ঐ সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে সালাতের দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভ ঘটবে। পক্ষান্তরে হজ্জের সীমাবদ্ধ কোন সময় নেই। সুতরাং, বিলম্বের ফলে মৃত্যুজনিত কারণে হজ্জ অসমাপ্ত থাকলে এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। অতএব, সতর্কতা হিসেবে হজ্জ তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব হবে।

২১৩ : بَابُ فِي الصَّيِّ يَحُجُّ ص ২১৩

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّوحَاءِ فَلَقِيَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا فَمَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزَعَتْ أَمْرًا فَآخَذَتْ بِعَصَدِ الصَّيِّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مُحَقَّتْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ— (مسلم ج ১ ص ১৩১; باب صفة حج الصبي

و اجر الخ، ترمذي ج ১ ص ১৮৫ حج الصبي، ابن ماجه ص ২১১)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাওহা নামক স্থানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে একদল সাওয়ারীর সাক্ষাত হয়। তিনি

তাঁদের সালাম করেন এবং বলেন, তোমরা কারা? তাঁরা বলেন, আমরা মুসলিম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর রাসূল। তা শুনে এক মহিলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার ছোট বাচ্চার বাহু ধরে স্বীয় হাওদা হতে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ছেলে কি হজ্জ করতে পারে? তিনি বলেন হাঁ, এবং তোমারও সওয়াব হবে।

বিশ্লেষণঃ যাদের উপর হজ্জ ফরযঃ হজ্জ একটি শারীরিক ও আর্থিক ব্যয়বহুল ইবাদত। তাই সালাত ও সাওমের ন্যায় সার্বজনীনভাবে হজ্জ ফরয নয়; বরং কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সামর্থ্যবান ধনাঢ্য মুমিন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকে। শর্তগুলো হলো-

১. মুসলমান হওয়া। যেহেতু ইহা ইসলামের মৌলিক একটি ইবাদত। সুতরাং অমুসলিমের উপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।
২. স্বাধীন হওয়া। তাই দাস-দাসীর উপর ইহা ফরয নয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেন-

أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ وَلَوْ عَشْرَ حَجَجٍ ثُمَّ عَتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ - (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٧١)

অর্থাৎ, যদি কোন গোলাম দশবারও হজ্জ আদায় করে, অতঃপর আযাদ হয়, তবুও তাকে (সামর্থ্যবান হলে) পুনরায় ইসলামের হজ্জ আদায় করতে হবে।

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা ছোট বাচ্চার উপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেন-

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ أُخْرَى (دار قطني، مستدرک حاکم)

অর্থাৎ, যে শিশু নাবালেগ অবস্থায় হজ্জ আদায় করেছে, বালেগ হওয়ার পর তাকে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে।

৪. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগলের উপর হজ্জ ফরয নয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الثَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ - (ابن

ماجة ص ١٤٨)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছেঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হয়; আর পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়।

৫. সুস্থ হওয়া। তাই রুগ্ন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- **فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَذِيَّةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ**-

অর্থাৎ, যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা রাখবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে।

(বাকারাহঃ ১৯৬)

৬. আর্থিক সামর্থ্যবান হওয়া। অর্থাৎ, ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধের পর পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত হজ্জে রওয়ানা থেকে শুরু করে হজ্জের কাজ সম্পাদনপূর্বক বাড়ি ফেরা পর্যন্ত খরচপত্র বহন করার ক্ষমতা থাকা। কেননা,

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

৭. হজ্জের রাস্তা নিরাপদ থাকা। সুতরাং রাস্তা নিরাপদ না থাকলে হজ্জ ফরয হবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী- **فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ**-

অর্থাৎ, আর যদি (তোমরা হজ্জ করতে) বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কুরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। (বাকারাহঃ ১৯৬)

৮. মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত শর্ত হচ্ছে, হজ্জের সফরে স্বামী বা অন্য কোন মাহরাম পুরুষ তার সঙ্গে থাকা। (শরীয়তের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম তাকে মাহরাম বলে। যেমনঃ পিতা, পুত্র, দাদা, চাচা, ভাতিজা প্রভৃতি)। যেমন, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-

لَا تَحُجُّنَّ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ-(সন দারুত্বী ২/২২৩)

অর্থাৎ, কোন মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া হজ্জ না করে।

... **أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ**

تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِّنْهَا-(আবু দাউদ ১/২৪১) **باب فِي الْمَرْأَةِ**

তহজ্জু বগের মাহরাম, بخاري ج ١ ص ٢٥١ **باب حج النساء، مسلم ج ١ ص ٤٣٣** **باب سفر المرأة مع محرم الخ، ترمذي ج ١ ص ٢٢٠** **باب كراهية ان تسافر المرأة وحدها**

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ দূরত্বও সফর করা বৈধ নয়।

নাবালেগ শিশুর হজ্জঃ দাউদ যাহেরী বলেন, শিশুর হজ্জ শুদ্ধ হবে এবং উক্ত হজ্জের মাধ্যমেই তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে, সুতরাং বালেগ হওয়ার পর নতুনভাবে তার যিম্মায় কোন হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস। তথায় নবী করীম (সাঃ) শিশু হজ্জের প্রশ্নের উত্তরে نعم (হ্যাঁ) বলেছেন।

* দাউদ যাহেরী ব্যতীত সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, নাবালেগ শিশুর উপর হজ্জ ফরয নয়। অতএব, কোন নাবালেগ শিশু হজ্জ করার পর যদি বালেগ হয় এবং পরবর্তীতে তার মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার অন্যান্য শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে পুনরায় তার হজ্জ আদায় করা ফরয।

(درس ترمذي ج ٣ ص ١٩٨، درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ٢٢٢)

দলীলঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন-

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرًا ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ (مسندك حاكم)

অর্থাৎ, যে বাচ্চা দশ বার হজ্জ করেছে, অতঃপর বালেগ হয়েছে, তাকে পুনরায় ইসলামের হজ্জ আদায় করতে হবে।

জবাবঃ (১) তাহাবী (রহ.) বলেন, স্বয়ং হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে এর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে যে, শিশু অবস্থায় হজ্জ করার পর পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

(২) নবী করীম (সাঃ) “হ্যাঁ” বলার দ্বারা তার ফরয আদায় হয়ে যাবে এমনটি বুঝাননি; বরং হ্যাঁ বলে তিনি (সাঃ) শিশুকে প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٧١)

* আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, জমহুর উলামা এবং ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, শিশু যদি হজ্জ করে তবে তা দূরন্ত হয়ে যাবে এবং তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর যদি হজ্জ ফরয হয়, তাহলে এ হজ্জ যথেষ্ট নয়, বরং তাকে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, শিশু যদি হজ্জ করে তবে তা শুদ্ধ হবে না; বরং এটি একটি বাড়তি ঝামেলা। তিনি আরো বলেন, নাবালেগ শিশুর উপর ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে একটিও তার জন্য আবশ্যিক নয়। অতএব, সে ইহরাম বাঁধার উপযোগী না হওয়ার কারণে তার ইহরামই শুদ্ধ হয়নি। তার হজ্জ শুধু এক ধরনের প্রশিক্ষণ। (شرح نووي ج ١ ص ٤٣٢)

কিন্তু আল্লামা বিম্বৌরী (রহ.) লিখেন, এই সম্বোধন সহীহ নয়; বরং ইমাম আবু হানিফা ও সমস্ত আহনাফ এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুর হজ্জ গ্রহণযোগ্য এবং তার ইহরাম কার্যকর। অর্থাৎ, হানারীদে মায়হাবও জমহুরের অনুরূপ। অবশ্য যদি সে ইহরামে নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে কোনটিতে লিপ্ত হয়, তাহলে শিশু বা অভিভাবক কারো উপর দম (পশ) বা ফিদ্যা ইত্যাদি দেয়া ওয়াজিব নয়। (معارف السنن ج ١ ص ٥٤٦)

উল্লেখ্য যে, শিশুর যদি ভাল বুঝা জ্ঞান থাকে, তাহলে সে নিজেই হজ্জের আহকাম আদায় করবে, নতুবা অভিভাবক তার পক্ষ থেকে নিয়ত, তালবিয়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী সম্পন্ন করবে।

তাছাড়া, কোন বাচ্চা যদি বালেগ হওয়ার পূর্বেই ইহরাম বাঁধে, অতঃপর তাওয়াফ করার পূর্বে অথবা আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সে বালেগ হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় সে হজ্জ পরিপূর্ণ করে ফেলে, তাহলেও হানাফিদের মতানুসারে তাকে পুনরায় আলাদাভাবে ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, উক্ত হজ্জের দ্বারা সে ফরযিয়াত থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে পিছনের ইহরাম বাদ দিয়ে নতুন করে দ্বিতীয়বার ইহরাম বাঁধে এবং আরাফায় অবস্থান করে তাহলে হানাফিদের মতেও তার ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।

(مبسوط سرخسي ج ٤ ص ١٧٣-١٧٤)

মীকাত সমূহের বর্ণনা : بَابُ فِي الْمَوَاقِيتِ ص ٢٤٣

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلَ نَجْدِ الْقَرْنِ وَبَلْغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْفَلَمَ— (بخاري ج ١ ص ٢٠٦ باب ميقات اهل المدينة الخ، مسلم ج ١ ص ٣٧٤ باب مواقت الحج، ترمذي

ج ١ ص ١٧١ باب مواقيت الاحرام الخ، نسائي ج ٢ ص ٥ المواقيت ميقات اهل المدينة، ابن ماجة ص ٢١٥)
অনুবাদঃ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কার্ন নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার) মীকাত নির্দিষ্ট করেন। রাবী বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্ধারণ করেন।

মীকাত (مِيقَات) শব্দের আভিধানিক অর্থঃ

مِيقَات শব্দটি مِفْعَال-এর ওজনে وقت মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলঃ

১. الْوَقْتُ - সময়

২. اِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا - যেমন- প্রতিশ্রুতি।

৩. **مَوَاقِيتُ** - নির্দিষ্ট স্থান। এর বহুবচন হল **أَلْمَكَانُ الْمَعِينُ**

শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআনেও পাওয়া যায়- **إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا**

অর্থাৎ, নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (নাবাঃ ১৭)

মীকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। শরীয়তের পরিভাষায় মীকাত বলা হয়-

هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْرُمُ الْحُجَّاجُ وَالْمُعْتَمِرُونَ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ التَّجَوُّزُ عَنْهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

অর্থাৎ, মীকাত বলা হয় ঐ স্থানকে যে স্থান হতে হজ্জ ও উমরাকারীগণ ইহরাম বেঁধে থাকেন এবং যে স্থানটি ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না।

২। কেউ কেউ বলেন, যে স্থান হতে হজ্জে গমনেচ্ছু লোকদেরকে ইহরাম বাঁধতে হয় সে স্থানকে মীকাত বলে।

৩। কারো কারো মতে, যে পাঁচটি স্থান ইহরাম বাঁধার জন্য নির্দিষ্ট, তাকেই মীকাত বলা হয়।

৪। হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে।

মীকাতের সংখ্যাঃ যারা মক্কার বাইরে থেকে হজ্জ ও উমরা করার জন্য ইচ্ছা করবে তাদের জন্য নবী করীম (সাঃ) ৫টি স্থানকে মীকাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

১. **যুল তুলাইফাঃ** ইহা মদীনাবাসী এবং মদীনার পথে আগমনকারী লোকদের জন্য। ইহা সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত। মদীনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

২. **জুহফাঃ** সিরিয়াবাসী এবং সিরিয়ার পথে (যেমন মিসর) আগমনকারী লোকদের জন্য।

৩. **কারনুল মানাযিলঃ** ইহা নজদবাসী এবং নজদের পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

৪. **ইয়ালামলামঃ** ইহা ইয়ামান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান তথা পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের জন্য।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

৫. **যাতে ইরাকঃ** ইরাকবাসী এবং ইরাকের পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

দলীলঃ ... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمِرَاقِ

ذَاتَ عِرْقٍ - (ابو داود ج ١ ص ٢٤٣، بخاري ج ١ ص ٢٠٧ باب ذات عرق لاهل العراق، مسلم ج ١

ص ٣٧٥، نسائي ج ٢ ص ٦ ميقات اهل العراق، ابن ماجه ص ٢١٥)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

* তাছাড়া আরো দুই প্রকার মীকাত রয়েছে-

১. হিল্ল (حِلٌّ): যারা হারামের বাইরে অথচ মীকাতসমূহের ভিতরে বসবাস করে, তাদের মীকাত হচ্ছে “হিল্ল”।

২. হারাম শরীফ: যারা মক্কাবাসী তথা হারামের অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদের জন্য হজ্জের মীকাত হল হেরেম শরীফ। আর উমরার মীকাত হল হিল্ল।

* ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে:

ইমাম শাফেঈ, মালিক, যহুরী, হাসান বসরী এবং আহলে যাহিরের মতে, যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা করার নিয়ত করবে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা জায়েয নয়। কিন্তু যে হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে না তার জন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। বিনা ইহরামে প্রবেশ করা জায়েয। (تنظيم الاشتات ২ ج ص ৭৩)

দলীল (১): হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَنْ لَهْنٌ وَلَمَنْ آتَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ لَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - (بخاري ج ১ ص ২০৬ باب مهل اهل الشام، مسلم ج ১ ص ৩৭৬ باب مواقيت الحج)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও উমরার নিয়তকারী সে স্থানের অধিবাসী এবং সে সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান।

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে না তাদের ক্ষেত্রে মীকাত প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তাদের ইহরাম বাঁধারও প্রয়োজন নেই।

দলীল (২): ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ - (مسلم ج ১ ص ৪৩৭ باب جواز دخول مكة بغير احرام، نسائي ج ২ ص ২৭ دخول مكة بغير احرام)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। মহানবী (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বিনা ইহরামে কালো পাগড়ী মাথায় মক্কায় প্রবেশ করেন। এতেও বুঝা যায় যে, সেদিন যেহেতু মহানবী (সাঃ) মক্কায় হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে নয় বরং মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন এজন্য তিনি ইহরাম বাঁধেননি।

(تنظيم الاشتات ২ ج ص ৭৬)

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, লাইস, আতা (রহ.) ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈগণের মতে, হজ্জ বা উমরার নিয়ত করুক বা না করুক সর্বাবস্থায়

ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করা ওয়াজিব। ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয নয়। দলীল-

... عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَجَاوِزُ أَحَدُ الْمَيْقَاتِ إِلَّا مُحْرِمًا-

(مصنف ابن أبي شيبة)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, কেউ যেন ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম না করে।

দলীল (২): أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمَيْقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ-

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করবে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। (সূত্রঃ ঐ)

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে ইহরামের কথা হজ্জ বা উমরাকারীকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি।

দলীল (৩): তাছাড়া মীকাতের নির্দেশটি মূলতঃ কাবা ঘরের সম্মান প্রদর্শনে বলা হয়েছে। সুতরাং হজ্জ অথবা উমরা পালনের নিয়ত করুক বা না করুক সবার উচিত কাবা ঘরের সম্মান করা। (تظهير الاشتقاق ج ২ ص ৭৬)

জবাবঃ আহনাফগণ প্রতিপক্ষের জবাবে বলেন-

(১) -একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা হজ্জ বা উমরা করতে চায় তাদের জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ফরয। কিন্তু যারা হজ্জ বা উমরা করতে ইচ্ছা পোষণ করবে না তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে না এমন কোন কথাও হাদীসে উল্লেখ নেই। সুতরাং مَفْهُومٌ مُخَالَفٍ (বিপরীত অর্থ)-কে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না।

(২) দ্বিতীয় হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي إِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا يَغْنِي الدُّخُولَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ - (درس مشکوٰۃ ج ২ ص ২২৬)

অর্থাৎ, মক্কা হারাম নগরী। ইহা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল ছিল না। আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। কেবল মক্কা বিজয়ের দিনে কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছে। আবার হারাম হয়ে গেল। অর্থাৎ ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা হারাম।

অতএব ঐ দিনের উপর অনুমান করা সঠিক নয়। কেননা এটা ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য খাস।

হজ্জে ইফরাদ : بَابُ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ ص ২৬৭

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ وَأَهْلٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَمَّا مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ - (بخاري ج ১)

ص ২১২ باب التمتع والاقراء والافراد (الح)

অনুবাদঃ ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে (মদীনা হতে) রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহরাম বাঁধে, কেউ হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বাঁধে এবং কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। আর যাঁরা শুধু হজ্জের অথবা একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধে তারা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারেনি।

হজ্জের প্রকারভেদঃ ইসলামী শরীয়তে হজ্জ তিন প্রকার। যথা-

১। হজ্জে ইফরাদ (الْحَجُّ الْإِفْرَادُ)

২। হজ্জে তামাত্তা (الْحَجُّ التَّمَتُّعُ)

৩। হজ্জে কিরান (الْحَجُّ الْقِرَانُ)

ইফরাদ হজ্জের বর্ণনাঃ إِفْرَادُ শব্দটি فرد থেকে বাবে অفعال-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- একাকী হওয়া, কোন শরীক না হওয়া, পৃথককরণ, চিহ্নিতকরণ, আলাদাকরণ ইত্যাদি। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে- رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। (আম্বিয়াঃ ৭৯)

পরিভাষায় ইফরাদ হচ্ছে- هُوَ الْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فِي أَشْهُرِهِ অর্থাৎ, হজ্জের মাসে মীকাত হতে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে এর কাজ সমাধা করাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

الْمَفْرُودُ بِالْحَجِّ هُوَ الَّذِي يَحْرُمُ بِالْحَجِّ لَا غَيْرَ - (بدائع الصنائع ج ২ ص ১৬৭)

অর্থাৎ, হজ্জে ইফরাদকারী হলেন, যিনি শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, অন্য কিছু নয়।

কিরান হজ্জের বর্ণনা: قِرَان শব্দটি قرن থেকে বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- هُوَ الْجَنَعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ তথা দুটি বস্তুকে একত্রিত করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি। এজন্যই আরবীতে সঙ্গীকে قَرِين বলা হয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে এসেছে- نُقِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ -এর অর্থ, “আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।” (যুখরুফঃ ৩৬)

পরিভাষায় কিরান হচ্ছে-

هُوَ أَنْ يُحْرِمَ الْحَاجُّ مِنَ الْمَيْمَاتِ لِلْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا- (بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٦٧)

অর্থাৎ, মীকাত হতে হজ্জ ও উমরা উভয়টির নিয়তে ইহরাম বেঁধে মাঝখানে হালাল হওয়া ব্যতীত উভয়টির কাজ সম্পন্ন করা।

এর আরেকটি পদ্ধতি হলঃ মীকাত হতে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে, কিন্তু উমরার কার্যাবলী হতে ফারোগ হওয়ার পূর্বেই যদি হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়, তাহলে তাও হজ্জে কিরান হিসেবে পরিগণিত হবে।

তামাতু হজ্জের বর্ণনা: تَمَتُّع শব্দটি منع থেকে বাবে تَفَعَّلَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উপকৃত হওয়া, উপভোগ করা, কোন বস্তু হতে ফায়দা গ্রহণ করা। যেমন, কুরআনে এসেছে- كُلُوا وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا অর্থাৎ, (কাফেরগণ!) তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। (মুরসালাতঃ ৪৬)

আর পরিভাষায় তামাতু হচ্ছে-

هُوَ أَنْ يُهْلَ مِنَ الْمَيْمَاتِ لِلْعُمْرَةِ أَوَّلًا ثُمَّ أَنْ يُحِلَّ ثُمَّ أَنْ يُحْرِمَ لِلْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ-

অর্থাৎ, মীকাত হতে প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরার কাজ সমাপ্ত করা। অতঃপর হালাল হয়ে যাওয়া এবং যিলহজ্জ মাসের ৮ম তারিখে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করাকে হজ্জে তামাতু বলা হয়।

উত্তম হজ্জ সংক্রান্ত মতবিরোধঃ উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে সব কয়টিই জায়েয। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, তামাতু হজ্জ সর্বোত্তম, অতঃপর ইফরাদ, অতঃপর কিরান হজ্জ। (شرح المذهب ج ٧ ص ١٦٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ-

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও উমরা একত্রে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করবে। (বাকারাঃ ১৯৬)

... عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২৫১ باب في الاقتران، بخاري ج ১ ص ২২৭ باب من سقع الهدن معه، مسلم ج ১ ص ৪০৩ باب جواز الدم على التمتع الخ، نسائي ج ২ ص ১৪ التمتع)

অর্থাৎ, ... সালিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে তামাত্তু হজ্জ করেন, অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে উমরা করেন।

দলীল (৩):

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ - (بخاري ج ১ ص ২১৩ باب التمتع على عهد النبي، مسلم ج ১ ص ৪০৩ باب جواز التمتع، نسائي ج ২ ص ১৫)

অর্থাৎ, ইমরান ইবন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তামাত্তু হজ্জ করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে তামাত্তু হজ্জ করি।

সুতরাং নবী করীম (সাঃ) যেহেতু তামাত্তু হজ্জ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাঃ) যা করেছেন তাই উত্তম।

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ (8) دَلِيل

أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لِمَا سَقْتُ الْهَدْيَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَحَلْتُ مَعَ الدِّينِ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ ... وَفِي رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا هَذَا لَحَلْتُ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২৪৭ باب في افراد الحج، بخاري ج ১ ص ২২৪، باب تقضي الحائض المناسك كلها، مسلم ج ১ ص ৩৭২ باب بيان وجوه الاحرام الخ، نسائي ج ২ ص ১৩)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যা আমি পরে জানতে পেরেছি যদি তা আগে জানতে পারতাম তবে আমার সাথে কুরবানীর পশু আনতাম না। রাবী মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া বলেন, আমার ধারণা (আমার শায়খ উসমান ইবন উমর) বলেছেন, যারা উমরা সমাপনের পর হালাল হয়েছে, আমিও তাদের সাথে হালাল হতাম ... অন্য রেওয়াজেতে হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তবে আমিও হালাল হতাম।

সুতরাং উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ) তামাত্তু হজ্জের আশা পোষণ করেছেন। সুতরাং, তাই উত্তম।

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, ইফরাদ হজ্জ সর্বোত্তম। অতঃপর তামাত্তু, তারপর কিরান হজ্জ। (فتح الباري ج ৩ ص ২৪০)

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ - (ابو) (১) দলীল

দাওদ জ ১ ص ২৪৭ باب افراد الحج، مسلم ج ১ ص ৩৮৯ باب وجوه الاحرام وانه يجوز افراد الحج النخ،

ترمذي ج ১ ص ১৬৯ باب افراد الحج، نسائي ج ২ ص ১২ افراد الحج، ابن ماجه ص ২১৭)

অর্থাৎ, আশিষা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজ্জে ইফরাদ আদায় করেন।

.. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَهْلُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا ... (ابو داود ج ১ ص ২৪৯، مسلم ج ১ ص ৪০৪ باب في الافراء والقران)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কেবলমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَهْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ - (৩) দলীল

(كنز العمال ج ৫ ص ৮৩)

অর্থাৎ, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন, এর সাথে উমরা ছিল না।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইফরাদ হজ্জ উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ও ইবন মুনিয়র (রহ.)-এর মতে, হজ্জে কিরান সর্বোত্তম। অতঃপর তামাত্তু, তারপর ইফরাদ।

(المغلي ج ৩ ص ২৩২، شرح المذهب ج ৭ ص ১০৭، المعارف للهورি ج ৬ ص ২৭২)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী - اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ - অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন পালন কর। (বাকারাঃ ১৯৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْبِي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةٌ وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةٌ وَحَجًّا - (ابو داود ج ১ ص ২৫০ باب في الافراء، بخاري ج ১ ص ২৩১ باب نحر الهدن قائمة، مسلم ج ১ ص ৪০৪ باب في الافراء

والتره، ترمذي ج ১ ص ১৬৯ باب الجمع بين الحج والعمرة، نسائي ج ২ ص ১৪৬ القرآن)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা (ইয়াহইয়া, আব্দুল আযীয প্রমুখ) তাকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, لَبَّيْكَ - আমি হজ্জ ও উমরার জন্য (হে আল্লাহ) তোমার সমীপে হাজির।

দলীল (৩): ... عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصَّبِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ (৩): عُمَرُ هَدَيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ابو داود ج ১ ص ২০, نسائي ج ২ ص ১৩, ابن ماجة ص ২১৭)

অর্থাৎ, ... আবু ওয়ায়েল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল সুবাই ইবন মাবাদ বলেছেন, আমি একত্রে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধি। উমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নত পেয়ে গেছ।

দলীল (৪): عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَهْلُوا يَا أَلْ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ - (شرح معاني الآثار ج ১ ص ৩২১, مجمع الزوائد ج ৩ ص ২৩৫)

অর্থাৎ, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, হে মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন! তোমরা হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধ।

এতে বুঝা যায়, মহানবী (সাঃ) যেহেতু স্বীয় পরিবার-পরিজনকে কিরানের হুকুম দিয়েছেন, অতএব তিনি নিজেও কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন।

দলীল (৫): হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ - (بخاري ج ১ ص ২২৭, باب من ساق البدن معه, مسلم ج ১ ص ৪০৬, باب وجوب الدم على الممتع, ابن ماجة ص ২১৭)

অর্থাৎ, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধি।

দলীল (৬): হযরত বারা ইবন আযিব এবং আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন- وَلَكِنِّي سُنْتُ الْهَدْيَ وَقَرَأْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - (نسائي ج ২ ص ১৩২)

অর্থাৎ, তবে আমি কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছি এবং কিরান করেছি।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। আর তিনি যা করেছেন, তা উত্তম হিসেবেই আদায় করেছেন। সুতরাং হানাফী মতানুযায়ী কিরান হজ্জ যে উত্তম তা প্রমাণিত হল। উল্লেখ্য যে, উদারহণস্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা নবী করীম (সাঃ) যে কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন তা বিশ জনেরও অধিক

সাহাবা (রাঃ) দ্বারা প্রমাণিত আছে। এমনকি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে ১৬ জন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন যে, বিদায় হজ্জ নবী করীম (সাঃ) কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। (২৮৫-২৮৩ ص ১ معارف السنن ج)

আকলী দলীলঃ ইবন কুদামা বলেন, হজ্জ কিরান পালন করা অধিক কষ্টকর। কেননা, এতে একই ইহরামে একই সফরে দুটি ইবাদত করা হয়- যা তামাত্ত বা ইফরাদে নেই। তাই বলা হয়, أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَشَقُّهَا, উত্তম আমল তাই, যা অধিক কষ্টকর। অপরদিকে নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-

أَجْرُكُمْ عَلَى قَدَرِ نُصْبِكُمْ- (بخاري ج ১ ص ২৫০ باب أجر العمرة على قدر النصب)

অর্থাৎ, তোমাদের কষ্ট অনুপাতে তোমাদের সওয়াব হবে।

জবাবঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবঃ

(১) শায়খ ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআন শরীফ ও সাহাবায়ে কিরামের পরিভাষায় তামাত্ত শব্দটি দ্বারা কিরানই উদ্দেশ্য। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ৮০)

(২) আল্লামা তিব্বী (রহ.) বলেন, যে সকল হাদীসসমূহে তামাত্ত শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তথায় তামাত্ত দ্বারা تمتع لغوى বা আভিধানিক তামাত্ত উদ্দেশ্য, تمتع شرعي উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ, উমরার সাথে হজ্জকে মিলিয়ে উভয়টিকে একই সফরে আদায় করে সুবিধা লাভ করা, যাতে প্রত্যেকটি আলাদাভাবে আদায় করতে না হয়। কেননা, তামাত্ত শব্দের অর্থই হল অন্য বস্তু থেকে সুবিধা পাওয়া। (درس مشكوة ج ২ ص ২২৭)

ইমাম আহমদ (রহ.) যে আয়িশা (রাঃ) ও ইমরান বিন হুছাইন থেকে তামাত্ত-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয় থেকেই কিরানের রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের রেওয়ায়েতে تمتع-এর যে শব্দ রয়েছে, এর দ্বারা কিরান হজ্জ বুঝানো হয়েছে। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ৮০)

(৩) তাছাড়া আরো বলা যায় যে, রাবী নবী করীম (সাঃ)-কে "بَيْتُكَ بِعُمْرَةٍ" বলতে শুনে এ ধারণা করে নিলেন যে, নবী করীম (সাঃ) তামাত্ত হজ্জ সম্পন্নকারী ছিলেন। অথচ لَبَيْتُكَ بِعُمْرَةٍ কিরান হজ্জ সম্পন্নকারীরও তালবিয়া। কেননা, কিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্য তিন ধরনের তালবিয়া পাঠ করা জায়েয-

ক. لَبَيْتُكَ بِحَجَّةٍ

খ. لَبَيْتُكَ بِعُمْرَةٍ

গ. (معارف السنن ج ٦ ص ٢٨٣) لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ عُمْرَةٍ

(৫) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ৪র্থ দলীলের জবাবে বলা যায়, জাহেলি যুগে হজ্জের মাসসমূহে উমরা করার প্রচলন ছিল না। তাই নবী করীম (সাঃ) তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুপ্রথাকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত প্রত্যাশাটি করেছেন। সুতরাং ইহা সর্বোত্তম হওয়ার দলীল হতে পারে না।

ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবঃ

(১) আয়িশা (রাঃ) ও প্রমুখ রেওয়ায়েত হতে ইফরাদ হজ্জের যে বর্ণনা এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- হজ্জ ফরয হওয়ার পর নবী করীম (সাঃ) মাত্র একবার আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি (সাঃ) উমরা আদায় করেছেন চারবার।

(২) অথবা, হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-

فَعَلَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ - (العرف ص ৩১৪ والفتح ج ৩ ص ২৬০)

অর্থাৎ, উমরা ও হজ্জের মাঝখানে হালাল হওয়া ব্যতীত একই ইহরামে তিনি আদায় করেছেন, যা পবিত্র কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৩) অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নবী করীম (সাঃ) ইফরাদ হজ্জের অনুমোদন দিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে নয় যে, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন।

(৪) অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, فَعَلَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ مُسْتَقِلًّا অর্থাৎ, পৃথকভাবে তিনি হজ্জের কার্যাদি সম্পাদন করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, হজ্জে ইফরাদ করেছেন।

(৫) অথবা, বর্ণনাকারী "لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ" শুনে ধারণা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) ইফরাদের নিয়ত করেছেন। বাস্তবে এ তালবিয়া কিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্যেও পড়া বৈধ। সুতরাং নবী করীম (সাঃ) কিরান হজ্জই আদায় করেছেন।

(৬) ইমাম শাফেঈ ও মালিক (রহ.) হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে আহনাফগণ বলেন, “উক্ত হাদীস দ্বারাও ইফরাদ প্রমাণিত হয় না। কারণ উক্ত হাদীসেই পরের অংশে বর্ণিত আছে, “যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হই এবং তাওয়াফ ও সায়ী করি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।”

(ابو داود ج ١ ص ২৬৭)

কিরান হজ্জ উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে আরো কতিপয় কারণ-

১. কিরান হজ্জের রেওয়ায়েত ইফরাদ ও তামাত্তু-এর তুলনায় অনেক বেশি।

২. যে সকল সাহাবী (রাঃ) হতে ইফরাদের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তাঁদের থেকে কিরানেরও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যেমন হযরত ইবন উমর, হযরত আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ। কিন্তু এরূপ সাহাবীর সংখ্যা অনেক, যাদের থেকে শুধু কিরান বর্ণিত আছে। যেমন- হযরত আনাস, উম্মে সালামা (রাঃ) প্রমুখ।

৩. ইফরাদের সকল হাদীস **فَعْلِيّ** (কর্মমূলক), পক্ষান্তরে কিরানের হাদীসসমূহ **فَعْلِيّ** এবং **قولي** (বাচনিক) উভয়টি আছে। আর **قولي** হাদীস **فَعْلِيّ** হাদীসের মোকাবিলায় প্রাধান্য লাভ করে।

৪. ইফরাদ এবং তামাত্তুর ক্ষেত্রে সহজেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু কিরানের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন সম্ভাবনা নেই।

৫. কোন রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত নেই যে, তিনি ‘ইফরাদ করেছি’ (**افردت**) অথবা ‘তামাত্তুর করেছি’ (**تمتعت**) বলেছেন। কিন্তু হযরত বারা বিন আযেব ও আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে ‘কিরান করেছি’ (**قرنت**) শব্দ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে।

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, ইফরাদের হাদীস না-সূচক আর কিরানের হাদীস হাঁ-সূচক। অতএব পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় হাঁ-সূচক হাদীস অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং কিরান হজ্জ যে সর্বোত্তম তা প্রমাণিত হলো।

(درس ترمذي ج ৩ ص ৭৬، تنظيم الاشتات ج ২ ص ৮০)

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ - ص ২৫২

যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَشَعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَرِّفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُثْبِتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - (بخاري ج ۱ ص ۲۵۰ باب الحج المرأة عن الرجل، مسلم ج ۱ ص ۴۳۱ باب الحج عن

العاجز الخ، ترمذي ج ١ ص ١٨٥ باب الحج عن الشيخ الكبير والمهت، نسائي ج ٢ ص ٣ الحج عن الحي الذي لا يستمسك عن الرجل، ابن ماجة ص ٢١٤)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফাযল ইবন আব্বাস (রাঃ) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাসআম গোত্রের জনৈক মহিলা তাঁর নিকট ফাতওয়া গ্রহণের জন্য আসে। তখন ফাযল (রাঃ) মহিলার প্রতি এবং মহিলা ফাযলের প্রতি তাকাতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাযলের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলার বান্দাদের উপর তাঁর ফরযকৃত হজ্জ আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় ফরয হয়েছে যে, বার্ষিকের কারণে তার পক্ষে বাহনে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি কি তার পক্ষে (বদলী) হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন, হাঁ। আর এটা ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

বিশ্লেষণঃ ইবাদত তিন প্রকার। যথা-

(১) عِبَادَتٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ শুধুমাত্র শারীরিক ইবাদত। যেমন- নামায, রোযা। সুস্থ বা অসুস্থ কোন অবস্থাতেই এতে نِيَاةٌ বা প্রতিনিধিত্ব জায়েয নয়।

(২) عِبَادَتٌ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ শুধুমাত্র আর্থিক ইবাদত। যেমন, যাকাত। এতে সুস্থ ও অসুস্থ সর্বাবস্থায় প্রতিনিধি বানানো জায়েয আছে।

(৩) عِبَادَتٌ بَدَنِيَّةٌ وَمَالِيَّةٌ শারীরিক এবং আর্থিক সংশ্লিষ্ট ইবাদত। যেমন, হজ্জ। শক্তি-সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এতে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নয়, কিন্তু আমৃত্যু অক্ষমতা বা অতিশয় বৃদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব জায়েয আছে।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٤٩١-٤٩٣، الهداية ج ١ ص ٢٩٧)

প্রথম আলোচনাঃ

বদলী হজ্জের বিধানঃ বদলী হজ্জ আদায় করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও লাইস (রহ.)-এর মতে, যদি মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে হজ্জের ওসিয়ত করে থাকে, তাহলে তার এই ওসিয়তকৃত হজ্জ এক তৃতীয়াংশ সম্পদে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু কোন জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ আদায় করা জায়েয নয়। (عمدة القاري ج ١٠ ص ٢١٣)

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ (১) دَلِيلِ

أَيُّهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكَ - (نسائي ج ٢ ص ٣ ابهج عن الميت الذي لم يحج)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তার পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে, তিনি হজ্জ না করেই ইস্তেকাল করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

দলীল (২): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوَهَا النَّبِيَّ (২): صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَخِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ - (নসানি ج ২ ص ৩ الحج عن الميت

الذي نذر ان يحج)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন মহিলা হজ্জ মামুত করেছিল, কিন্তু সে মৃত্যুবরণ করল (হজ্জ আদায় করতে পারল না)। এরপর তার ভাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার বোনের দেনা থাকত তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাহলে আল্লাহর হকও আদায় কর, কেননা তা আদায় করার অধিক দাবি রাখে।

* ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, হজ্জে কোন স্ফাভিষিক্ততা নেই। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার উপর কিয়াস করেছেন।

দলীলঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ - (البيهقي ج ৬ ص ২০৭)

অর্থাৎ, কেউ কারো পক্ষ থেকে নামায পড়বে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ও সাওরী (রহ.)-এর মতে, অতিশয় বৃদ্ধ, আমৃত্যু অক্ষমতা (যেমন পক্ষাঘাত) অথবা মৃত লোকের পক্ষ থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা জায়েয। তবে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের দ্বারা হজ্জ আদায় করা আদৌ জায়েয নয়।

এ ব্যাপারে তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ হল- যদি মৃত ব্যক্তির যিম্মায় হজ্জ ফরয হয়ে থাকে এবং সে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের ওসিয়ত না করে থাকে, তবে উত্তরাধিকারীগণের যিম্মায় তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো অপরিহার্য নয় এবং মৃত ব্যক্তি ফরয আদায় না করার এবং মৃত্যুর সময় ওসিয়ত না করার কারণে গুনাহগার হবে। অবশ্য যদি কোন উত্তরসূরী বা অন্য কেউ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করে, তাহলে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন-

“وَأَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى”

অর্থাৎ, আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ সে এর ফল পাবে।

কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ করানোর ব্যাপারে ওসিয়ত করে থাকে, তাহলে তার ওসিয়ত এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা পুরা করতে হবে। এবং এই এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা ওসিয়ত পূরণ করা সম্ভব হলে তার ওসিয়তকে পুরা করা উত্তরসূরীর জন্য অপরিহার্য হবে। তখন মৃত ব্যক্তির দেশ থেকে কাউকে বদলী হজ্জের জন্য পাঠানো হবে। যদি এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা স্বীয় দেশ থেকে হজ্জ করানো সম্ভব না হয়, তাহলে কিয়াসের দাবী তো এই ছিল যে, ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে এবং এক তৃতীয়াংশ সম্পদ উত্তরসূরীদের মধ্যে বন্টিত হবে। কিন্তু ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে এই ফরয থেকে নিষ্কৃতি দানের লক্ষ্যে এমন কোন এলাকা বা দেশ থেকে বদলী হজ্জ পাঠানো হবে, যেখান থেকে এক তৃতীয়াংশ সম্পদই হজ্জের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। (بدائع الصلائع ج ২ ص ২২১-২২২)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, ওসিয়ত করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো ওয়ারিসদের জন্য আবশ্যিক। এই হজ্জ করানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় হয়ে গেলেও। (شرح نووي ج ১ ص ৪৩১)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ أَبِي رَزَيْنٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٍ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ - (ابو داود ج ১ ص ২০২, তرمذি ج ১

ص ১৮৬ باب منه، نسائي ج ২ ص ৩-৪ العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، ابن ماجه ص ২১৪)

অর্থাৎ, ... আবু রায়ীন (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমের গোত্রের এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, আর তিনি হজ্জ ও উমরা আদায় করতে অসমর্থ এবং সওয়ার হতেও অপারগ। তিনি বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

দলীল (৩): মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের দলীল। হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দলীল যথেষ্ট।

জবাবঃ

১. ইমাম মালিক (রহ.)-এর হাদীস দ্বারা কেবল نَبَايَتٌ عَنْ الْمَيِّتِ তথা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের বৈধতার কথা বুঝানো হয়েছে। ইহা نَبَايَتٌ عَنْ الْمَاعِزِ তথা অতিশয় বৃদ্ধ ও অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বকে নিষেধ করে না। নিয়ম

হল- **ذَكَرُ الشَّيْءِ لَا يَنْفِي غَيْرَهُ** - অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কোন বস্তুর উল্লেখ ইহা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডন করে না।

২. ইবরাহীম নাখসির কিয়াস সহীহ এবং স্পষ্ট হাদীসসমূহের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। (عيني ج ٤ ص ٤٨١، هداية ج ١ ص ٤٠٣، الفتح ج ٣ ص ٣٧)

* তাছাড়া, তাঁর কিয়াস যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কেননা, নামায ও রোযা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত, আর হজ্জে আর্থিক ভূমিকাও অন্যতম। সুতরাং এটা কিয়াসসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ যে ব্যক্তি নিজে (কখনো) হজ্জ করেনি, সে অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ, ইসহাক ও আওয়ামীর (রহ.) মতে, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ আদায় করেনি, অন্যের পক্ষ হতে তার হজ্জ করা জায়েয হবে না।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِبَيْتِكَ عَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ أَخْ أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ - (ابو داود ج ١ ص ٢٥٢ باب الرجل يحج عن غيره، ابن ماجه ص ٢١٤)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনে, “লাব্বায়কা আন শুবরামাতা (আমি শুবরামার পক্ষে হাজির)।” তিনি জিজ্ঞাসা করেন শুবরামা কে? সে ব্যক্তি বলে, আমার ভাই অথবা আমার বন্ধু। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ আচ্ছা, তুমি কি হজ্জ করেছ? সে বলে, না। তিনি বলেন, প্রথমে তুমি নিজের হজ্জ আদায় কর, পরে শুবরামার হজ্জ সম্পন্ন কর।

উক্ত হাদীসে প্রথমে নিজে হজ্জ আদায়ের জন্য নির্দেশ (امر)-এর ছীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় না করবে, তার জন্য অন্যের পক্ষে হজ্জ আদায় করা জায়েয নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি সে ব্যক্তি অন্যের হজ্জ করলে মাকরুহ তানযীহিসহ জায়েয হবে, তবে মোল্লা আলী কারী (রহ.) একে মাকরুহ তাহরিমী বলে আখ্যায়িত করেছেন। (شرح نفاية)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। যেহেতু নবী করীম (সাঃ) ঐ মহিলাকে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা এবং না

করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা ব্যতীতই বদলী হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, বদলী হজ্জ সহীহ হওয়ার জন্য প্রথমে নিজের হজ্জ জরুরী নয়।

দলীল (২): দারা কুতনীতে আছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُكَلِّمِي عَنْ نُبَيْشَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا الْمُبَلِّغِي هَذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ ثُمَّ عَنْ نَفْسِكَ-

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নুবাইশার পক্ষ থেকে তালবিয়া পড়তে দেখে বললেন, হে তালবিয়া পাঠকারী! ইহা তো নুবাইশার পক্ষ থেকে। অতঃপর তুমি নিজের হজ্জ আদায় করে নেবে।

উক্ত হাদীসে নিজের পক্ষ থেকে প্রথমে হজ্জ আদায়ের পূর্বে, অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

জবাবঃ

১. ইমাম শাফেঈ ও ইসহাকের দলীলের জবাবে হানাফী মাযহাবের ইমাম তাহাবী বলেন, শুবরামার হাদীসটি মালুল (معلول) এবং ইবন হুমাম বলেন, উক্ত হাদীসটি মারফু না মাওকুফ এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

২. অথবা, শুবরামার হাদীস দ্বারা উত্তম বুঝানো হয়েছে। আর খাসআমী মহিলার হাদীস দ্বারা বৈধ বুঝানো হয়েছে।

আহনাফরাও একথাই বলেন যে, যে পূর্বে নিজে হজ্জ আদায় করেছে, তার দ্বারা বদলী হজ্জ করানোই উত্তম। (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٧٢)

২৫৫ : بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ص

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ-

(بخاري ج ١ ص ٢٤٨ باب تزويج المحرم/ج ٢ ص ٧٦٦ باب نكاح المحرم، مسلم ج ١ ص ٤٥٤ باب تحريم اللكاح المحرم الخ، ترمذي ج ١ ص ١٧٢ باب الرخصة في ذلك، تسانني ج ٢ ص ٢٦ باب الرخصة في اللكاح للمحرم، ابن ماجة ص ١٤٢ باب المحرم يتزوج)

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মায়মূনা (রাঃ)-কে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেন।

বিশ্লেষণঃ মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, আওয়াঈ এবং সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (রহ.) প্রমুখের মতে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা বা কাউকে করানো অথবা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া কোনটিই জায়েয নয়। যদি বিবাহ করে তবে বাতিল হয়ে যাবে। (৩৫০৮ ম. ১৮৮)

... عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ ... وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يَخْطُبُ - (ابو داود ج ১ ص ২০০, مسلم ج ১ ص ৫০৩, ترمذي ج ১ ص ১৭১ باب كراهية تزويج المحرم، نسائي ج ২ ص ৭৮ اللهم عن النكاح المحرم/ج ২ ص ২৬, ابن ماجه ص ১৫২)

অর্থাৎ, ... হযরত উসমান ইবন আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিবাহ করতেও পারবে না এবং (কাউকে) বিবাহ দিতেও পারবে না। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না। (পূর্বোক্ত হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য।)

... عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ بْنِ أَخِي مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرَفٍ - (ابو داود ج ১ ص ২০০, مسلم ج ১ ص ৫০৪, ترمذي ج ১ ص ১৭৩, ابن ماجه ص ১৫২)

অর্থাৎ, ... ইয়াযিদ ইবন আসিম মায়মূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সারিফ নাম স্থানে বিবাহ করেন এবং এই সময় আমরা উভয়েই হালাল অবস্থায় ছিলাম।

দলীল (৩):

.. عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ فِيمَا بَيْنَهُمَا - (ترمذي ج ১ ص ১৭২)

অর্থাৎ, ... আবু রাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মায়মূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়। তাঁর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেছেন হালাল অবস্থায়। আর আমি ছিলাম তাদের উভয়ের মাঝে বার্তাবাহক।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ এবং আতা (রহ.) প্রমুখের মতে, মুহরিমের জন্য ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা এবং করানো উভয়টিই জায়েয আছে। তবে ইহরাম অবস্থায় সহবাস বা সহবাস সংক্রান্ত কার্যাবলী জায়েয নয়। (معارف السنن ج ১ ص ৩৫৬)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- النَّسَاءُ- অর্থাৎ, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নাও। (নিসাঃ ৩) উক্ত আয়াতে বিয়ের কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩): عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرَمٌ- (طحاوي ج ١ ص ٣٧٥، مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٧)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীকে মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

দলীল (৪): হযরত ইবন মাসউদ সম্পর্কে ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) বলেন,

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ (طحاوي ج ١ ص ٣٧٦)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) মুহরিমের বিয়েতে কোন অসুবিধা মনে করতেন না।

দলীল (৫): হযরত আনাস (রাঃ) সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবুবকর বলেন سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هَلْ هُوَ إِلَّا كَالْبَيْعِ-

(طحاوي ج ١ ص ٣٧٦)

অর্থাৎ, আমি আনাস ইবন মালিক (রাঃ)-কে মুহরিমের বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। এতো কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়।

উপরোল্লিখিত বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুহরিমের জন্য বিবাহ করা বা করানো উভয়ই জায়েয। (যদিও এমতাবস্থায় বিবাহ করা সঙ্গত নয়, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবে।)

জবাবঃ ইমামত্রয়ের প্রথম দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(ক) উক্ত হাদীসে এই বিশ্লেষণ করা হবে যে, মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করা এবং বিবাহ করানো তার শানের বিপরীত। কেননা, সে ইহরাম বেঁধে সৃষ্টিকর্তার ইশকে মহব্বতে নিবিশ্ট হওয়ার পরেও সৃষ্টির ইশকে লেগে যাওয়া আদৌ সমীচীন নয়। তাই নবী করীম (সাঃ) বিবাহ করা এবং করানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে গিয়ে এ উক্তিটি করেছেন।

(খ) অথবা, এই নিষেধ মাকরুহ তানযিহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না এবং সহবাসে জড়িয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে।

(المعارف ج ٦ ص ٣٤٨، إعلاء السنن ج ١١ ص ٤٩)

(গ) হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে মূলতঃ نِكَاح (বিবাহ) দ্বারা وَطِئ (সঙ্গম) বুঝানো হয়েছে। তখন হাদীসটির অর্থ হবে মুহরিম ব্যক্তির ইহরাম অবস্থায় সঙ্গম করতে পারবে না। (هداية ج ٢ ص ٣١٠، البحر الرائق ج ٣ ص ١٠٤، لسان العرب ج ٢ ص ١٢٦)

(ঘ) উল্লিখিত তিন ইমাম আবু রাফে এবং ইয়াযিদ বিন আসিম-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাব হল- আসর বিন দিনার বলেন, ইয়াযিদ বিন আসিম হলেন যঈফ রাবী। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়। যদি ইহাকে সহীহ বলেও মেনে নেয়া হয়, তবুও এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং حَلَالٌ এর অর্থ হল, ظَهَرَ أَمْرُ التَّزْوِيجِ بَعْدَ حَلَالٍ অর্থাৎ, বিয়ে তো ইহরাম অবস্থাতেই হয়েছে, কিন্তু হালাল অবস্থায় বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা ইহরাম অবস্থায় তো আর কোন মধুরাত্রি উদযাপন করা যায় না এবং ওলীমাও করা যায় না। যার ফলে বিয়ে করা সত্ত্বেও তা প্রকাশ পায়নি। (درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ٢٤٩، درس ترمذي ج ٣ ص ٩٨)

* আবু রাফে-এর হাদীসের জবাব হল, উক্ত হাদীসটি اتصال এবং انقطاع উভয় দিক দিয়ে সামঞ্জস্যহীন এবং মতবিরোধপূর্ণ। তাই এই হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

* তাছাড়া, উক্ত হাদীসটির সনদে মাতারআল ওয়াররাক নামে একজন রাবী রয়েছেন। যার ব্যাপারে ইমাম নাসায়ী বলেন- لَيْسَ بِأَلْقَوِي অর্থাৎ তিনি মজবুত রাবী নন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন، كَانَ فِي حِفْظِهِ سُوءٌ অর্থাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল কম।

* ইয়াযিদ বিন আসিম-এর হাদীসের ব্যাপারে বলা যায় যে, কতক রেওয়ায়েতে ইয়াযিদের পর মায়মূনা (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কতক রেওয়ায়েতে মায়মূনা (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ না করে মুরসাল নেয়া হয়েছে। তাই ইমাম তিরমিযী ইয়াযিদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন- هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (এটা গরীব হাদীস)।

উল্লেখ্য যে, এই মাসআলাটির ব্যাপারে বড় বড় সাহাবা, ফুকাহা এবং তাবঈঈনদের পক্ষ থেকে ইখতিলাফপূর্ণ মতামত রয়েছে। ফলে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করে নির্দিধায় একথা বলা যায় না যে, উক্ত মতটিই সহীহ। তাই সকলেই নিরলসভাবে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দিকটি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন।

* হানাফীরা ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে বলেন-

(১) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি সিহাহ সিন্তার সকল ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে তিন ইমামের হাদীসটি এমন নয়। তাই সিহাহ সিন্তার কিতাবগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ইয়াযিদ ইবন আসিমের হাদীসটি বুখারী এবং নাসায়ীতে বর্ণিত হয়নি। এমনভাবে আবু রাফের (রাঃ) হাদীসটি

বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং যে হাদীসটি সিহাহ সিন্তার সকল কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই উহাই অগ্রাধিকারযোগ্য।

(২) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর এই রেওয়ায়েতটি মুতাওয়াতিহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বিশটিরও অধিক সূত্র পাওয়া যায়। (معارف السنن ج ٦ ص ٣٥٠-٣٥١)

(৩) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

(دار قطني ج ٣ ص ٢٦٣، مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٧، الفتح الباري ج ٩ ص ١٤٣)

(৪) ঐতিহাসিকগণ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ ص ٢٥٥، طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٣٢)

(৫) ইয়াযিদ ইবন আসিম-এর একটি রেওয়ায়েত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতের মত। (طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٣٣)

(৬) বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের জায়গাটির নাম ছিল সারিফ। এটি হল মক্কা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত, যা মীকাতের অন্তর্ভুক্ত।

(طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٣٢)

সুতরাং এমতাবস্থায় যদি নবী করীম (সাঃ)-কে মুহরিম না মানা হয় তাহলে তো একথাই ধরে নেয়া হবে যে, নবী করীম (সাঃ) ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করেছেন- যা জায়েয নয়।

(৭) ইবন আব্বাস (রাঃ) আবু রাফে এবং ইয়াযিদ বিন আসিম (রাঃ)-এর তুলনায় অধিক জ্ঞানী এবং অধিক সংরক্ষণকারী।

(৮) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি কিয়াসের সাথেও সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন- ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু এগুলো ক্রয় করে দেশে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে জায়েয আছে, ঠিক এমনিভাবে বিয়ে করে মহিলাকেও দেশে নিয়ে আসা জায়েয আছে। কারণ বিয়েও তো এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় (যদিও কিছু পার্থক্য রয়েছে) কিন্তু তা ব্যবহার করা তথা যৌন সম্বোগ বা যৌনকার্যে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্য করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

إِهْرَامُ ابْوَاسْتِغْنَاءِ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ : ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ -

১. যৌন সম্বোগ করা
২. অশ্লীল বাক্যালাপ করা
৩. নারীর সামনে যৌন সম্বোগ সংক্রান্ত বাক্যালাপ করা
৪. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া
৫. কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ—

অর্থাৎ, এসব মাসে যে লোক হজ্জের নিয়ত করবে, সে জ্বী সন্তোষ, পাপাচার এবং ঝগড়া-বিবাদ করবে না। (বাকারঃ ১৯৭)

৬. হুলচর কোন প্রাণী হত্যা বা শিকার করা। এমনকি মশা, মাছি, উকুন ও ছাড়পোকাও মারা নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেন- “لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ”

অর্থাৎ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। (মায়দাঃ ৯৫)

৭. শিকার করার জন্য অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. শিকারের সন্ধান দেয়া।

৯. সুগন্ধি, সাবান, তেল, আতর ও স্নো-পাউডার ব্যবহার করা। রাসূল (সাঃ) জনৈক সুগন্ধি ব্যবহারকারীকে বলেছিলেন-

أَغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخُلُوقِ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২০২ باب الرجل يحرم الخ)

অর্থাৎ, ... তুমি তোমার (শরীর ও কাপড়ের) সুগন্ধি ধুয়ে ফেল।

১০. নখ কাটা।

১১. পুরুষেরা মাথা ও মুখ ঢাকবে না। মহিলারা মাথা ঢাকবে কিন্তু পর্দা বজায় রেখে মুখ স্পর্শ করে এমন নেকাব লাগাতে পারবে না। তবে মুখ থেকে একটু দূরে থাকে এমন নেকাব দ্বারা পর্দা রক্ষা করতে হবে।

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَحْرَمَةُ لَا تَنْتَقِبُ—

(ابو داود ج ১ ص ২০২ باب ما يلبس المحرم)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম জ্বীলোকেরা যেন চেহারায় নেকাব না ঝুলায়।

১২. মাথার চুল বা দাঁড়ি খেতমী জাতীয় সুগন্ধি ঘাস দ্বারা দৌত করা।

১৩. চুল, দাড়ি বা পশম ছাঁটা বা টেনে তোলা।

১৪. সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। তবে মহিলাদের জন্য এ হুকুম নয়। ইবন উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে?

قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنَسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ ... وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ

النَّبِيُّ اخْلَعْ جُبَّتَكَ— (ابو داود ج ১ ص ২০২ باب ما يلبس المحرم)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, সে কামীজ (জামা), টুপি, পায়জামা এবং পাগড়ী পরিধান করবে না। ... অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সাহাবীকে তিনি নির্দেশ দেন, তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল।

১৫. সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরিধান করা। অবশ্য সুগন্ধি দূরীভূত হলে তা পরিধান করা জায়েয।

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ الزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ ... (ابو داود ج ١ ص ٢٥٣)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মুহরিম স্ত্রীলোকদেরকে জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

১৬. চুল বা দাড়িতে চিরুনী বা আঙ্গুল চালানো।

১৭. গোঁফ কাটা ইত্যাদি। (ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭, ২৩৭-২৩৮) (هداية ج ١ ص ٢٣٨-٢٣٩, ٨٩٩, ١ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭, ২৩৭-২৩৮)

بَابُ الْإِحْصَارِ ص ২০৭

হজ্জ বা উমরা করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে

... عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرَمَةُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ - وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَوْ مَرَضَ - (ترمذي ج ١ ص ١٨٧ باب الذي يهل بالحج الخ، نسائي ج ٢ ص ١٩ ما يفعل من حبس عن الحج الخ، ابن ماجه ص ٢٢٩)

অনুবাদঃ ... ইকরামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবন আমর আনসারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ শত্রুর কারণে বা চলনশক্তি রহিত হওয়ার কারণে (ইহরামের পর হজ্জ বা উমরা করতে) অক্ষম হয়, তবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। তবে তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। রাবী ইকরামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে আব্বাস (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে এর সত্যতা স্বীকার করেন। (উক্ত অনুচ্ছেদেই অন্য একটি হাদীসে “অথবা রোগের কারণে” কথাটি উল্লেখ রয়েছে।)

বিশ্লেষণঃ **إِحْصَار** (বাধাগ্রস্ত হওয়া) হজ্জ বা উমরার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ততা শুধুমাত্র দুশমনের সাথে সম্পৃক্ত নাকি অসুস্থ, চলনশক্তি রহিত হওয়া বা অন্য কোন কারণেও হতে পারে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক এবং লাইস (রহ.) প্রমুখের মতে, বাধাগ্রস্ত হওয়া কেবল দুশমনের সাথেই সম্পৃক্ত- অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে হবে না। (عمدة القاري ১০ ج ص ১৫০)

দলীল (১): পবিত্র কুরআনের আয়াত- **فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ**-

অর্থাৎ, অতএব হজ্জ ও উমরা করতে গিয়ে যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। (বাকারাঃ ১৯৬) যখন নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় দুশমনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। সুতরাং বুঝা গেল, অবরুদ্ধতা কেবল দুশমনের সাথেই খাস। (تفسير ابن كثير ج ১ ص ২৩১)

দলীল (২): হযরত ইবন আব্বাস এবং হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত-

— **فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ** অর্থাৎ, শত্রু ছাড়া কোন অবরুদ্ধতা নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, আতা (রহ.), আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) প্রমুখের মতে, যে জিনিসই ইহরাম কার্যকরণ বা সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী হয়, তাই **إِحْصَارٌ** (অবরুদ্ধতা)। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে দুশমন, অসুস্থতা, বন্দীদশা, খণ্ডিত, পাথের হারিয়ে ফেলা অথবা সাগরে জাহাজ আটকে যাওয়া প্রভৃতি অবরোধের কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে। (عمدة القاري ج ১ ص ১৫০)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- **فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ**-

উক্ত আয়াতে **إِحْصَارٌ** (বাধাগ্রস্ত হওয়া) শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হচ্ছে বাধাগ্রস্ত হওয়া। সুতরাং তা যে কোন উপায়েই হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ অভিধানবিদদের মতে, **إِحْصَارٌ** শব্দটি প্রকৃত অর্থে রোগের কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর আলোচ্য আয়াত সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (التفسير الكبير للرازي ج ৫ ص ১০৭-১১০)

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩): কিয়াসের চাহিদাও এই যে, যে কারণ শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তা অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। আর উভয়টিই হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং উভয়টির হুকুমও একই হওয়া উচিত।

জবাবঃ আহনাফগণ তিন ইমামের উল্লিখিত আয়াতের জবাবে বলেন, উসূলে ফিকহের নিয়ম হল- “الْعِبْرَةُ لِمَقْصُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ” অর্থাৎ, “শব্দের ব্যাপকতা অনুযায়ী হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্দিষ্ট কোন শানে নুযুলের সাথে তা সম্পৃক্ত নয়।” সুতরাং উক্ত আয়াতে احصار শব্দটি ব্যাপক। তাই ব্যাপকতার কারণে অসুস্থতা, বন্দীদশা ইত্যাদিও এতে शामिल রয়েছে।

ইবন উমর এবং ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির জবাব হল-

১. কুরআনুল কারীম ও হাদীসের মোকাবিলায় ইহা দলীলযোগ্য নয়।
২. অথবা, এ উক্তি দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, অবরুদ্ধতার পরিপূর্ণ এবং প্রকৃষ্ট রূপ হল শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়া। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইহা ছাড়া অবরুদ্ধতার আর কোন কারণ হতে পারবে না। (معارف السنن ج ٦ ص ٥٨٣، درس مشکوٰٓه ج ٢ ص ٢٥٣)

অবরোধের হুকুমঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, অবরোধের ফলে হালাল হওয়ার নিয়ম হল, কুরবানীর পশু সে স্থলেই জবাই করবে, যেখানে সে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছে। কুরবানীর পশু হেরেমে পাঠানো জরুরী নয়। অতঃপর মাথা মুড়ানো বা চুল ছাটানোর কাজ করিয়ে নিবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.), হযরত ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, অবরোধের ফলে হালাল হওয়ার নিয়ম হল, অবরুদ্ধ ব্যক্তি একটি কুরবানীর পশু হারামে পাঠাবে এবং একটি সময় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে নিবে যে, এই সময় ঐ কুরবানীর জন্ত হারামে জবাই করা হবে। যখন সে সময় এসে যাবে, তখন সে হালাল হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তির মাথা মুড়ানো বা চুল ছাটানো জরুরী নয়।

(درس ترمذي ج ٣ ص ٢١١، قرطبي ج ٢ ص ٣٨٠)

উল্লেখ্য যে, ফরয হজ্জ কারো মতেই অবরোধের কারণে বাতিল হয় না। সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর কাযা করা ওয়াজিব। (معارف السنن ج ٢ ص ٣٦٨)

بَابُ الطَّوَّافِ بَعْدَ الْعَصْرِ ص ٢٦٠

আসরের পরে তাওয়াফ করা

.. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيَصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ نَهَارٍ - (ترمذي ج ١ ص ١٧٥)

باب الصلوة بعد العصر الخ، نسائي ج ٢ ص ٣٥ اباحة الطواف في كل الاوقات، ابن ماجه ص ٩٠

অনুবাদঃ ... জুবায়ের ইবন মুতঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাউকে কোন সময় এই ঘর (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করতে এবং দিন-রাতের যে কোন সময় এখানে নামায আদায় করতে নিষেধ করো না।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা তথা সবসময়ই তাওয়াফ করা জায়েয আছে। তাওয়াফের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রশ্ন হল, তাওয়াফের পরে যে দু'রাকাত নামায পড়তে হয়, তা মাকরুহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, আতা, তাউস ও ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, তাওয়াফের পরে দু'রাকাত নামায মাকরুহ ওয়াক্তেও আদায় করা জায়েয আছে। (عمدة القاري ج ১ ص ২৭১)

দলীলঃ উপরিউক্ত হাদীস।

* ইমাম মালিক, আবু হানিফা, সাহেবাইন, সাঈদ ইবন যুবায়ের, হাসান বসরী এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, তাওয়াফের পরে দু'রাকাত নামায মাকরুহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয নয়; বরং সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের পর আদায় করতে হবে।

(عمدة القاري ج ১ ص ২৭১)

দলীল (১)ঃ

... عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا

وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ— (আবু দাউদ জ ১ ص ১৮১ باب من رخص فيهما الخ، بخاري ج ১ ص ৮২، ترمذي ج ১

ص ২২৩ باب في كراهية الصلاة الخ، نسائي ج ১ ص ৯৬)

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তবে যদি সূর্য উপরে থাকে (ভিন্ন কথা)।

দলীল (২)ঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর আছার-

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ حَتَّى

أَنَاحَ بِذِي طَوًى، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ— (اللفظ للموطأ ص ৩৮৭، بخاري ج ১ ص ২২০ باب الطواف

بعد الصبح والعصر)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল কারী বলেছেন, তিনি ফজরের নামাযের পর হযরত উমর ইবন খাতাব (রাঃ)-এর সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফ শেষে উমর (রাঃ) তাকিয়ে সূর্য দেখতে পাননি। তাই তিনি আরোহণ করে চলে

আসলেন। যীতুয়া নামক স্থানে এসে সওয়ারী বসালেন, অতঃপর দুই রাকাত নামায আদায় করলেন।

দলীল (৩): মুসনাদে আহমাদে হযরত জাবির (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে-
 ... لَمْ نَكُنْ نَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةٍ لَصُبحٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ - (فتح الباري ج ৩ ص ৩৭১، مجمع الزوائد ج ৩ ص ২৬৫)

অর্থাৎ, আমরা ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাওয়াফ করতাম না।

দলীল (৪): হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত-

أَنَّ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمَّا فَرَغَ جَلَسَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ - (عمدة القاري ج ৭ ص ২৭২)

অর্থাৎ, তিনি ফজরের পর তাওয়াফ করেছেন। যখন তা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তখন সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে ছিলেন।

জবাবঃ শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, হাদীসে বর্ণিত “أَيَّ سَاعَةٍ” (যে কোন সময়) দ্বারা “মাকরুহ সময় ব্যতীত যে কোন সময় নামায আদায় করতে নিষেধ নয়” একথা বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল বনু আবদে মানাফকে এই হিদায়েত দেয়া যে, তারা যেন আসা-যাওয়ার জন্য হারামের রাস্তা সর্বদা খোলা রাখে। কেননা, আবদে মানাফের ঘর-বাড়ি বায়তুল্লাহ এবং হারাম শরীফকে বেষ্টিত করে রেখেছিল। যখন এই দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়া হত, তখন কোন মানুষ হারাম শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। এইজন্য নবী করীম (সাঃ) এমন উক্তিটি করেছিলেন। সুতরাং এর অর্থ এই নয় যে, হারাম শরীফে নামায আদায়কারীদের জন্য কোন মাকরুহ সময় নেই। (الكوكب الدري ج ১ ص ২৮৩)

بابُ طَوَافِ الْقَارِنِ ص ২৬০ : হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلُ - (بخاري ج ১ ص ২২১ باب طواف القارن،

مسلم ج ১ ص ৬০৬ باب جواز التحلل بالاحصار الخ، ترمذي ج ১ ص ১৮৮ باب ان القارن يطوف طواف

واحدًا، نسائي ج ২ ص ৩৬ طواف القرآن)

অনুবাদঃ ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে একবারের অধিক তাওয়াফ করেননি এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম তাওয়াফ।

কিরান হজ্জ আদায়কারীর তাওয়াফ সংখ্যাঃ কিরান হজ্জ আদায়কারী মোট কয়টি তাওয়াফ করবে এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, কিরান হজ্জ পালনকারী সর্বমোট তিনটি তাওয়াফ করবে। যথা-

(১) তাওয়াফে কুদুম, (২) তাওয়াফে যিয়ারত (অর্থাৎ উমরা ও হজ্জের জন্য তাওয়াফ), (৩) তাওয়াফ আল-বিদা।

অতএব, কিরান হজ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে উমরা আলাদাভাবে আদায় করার প্রয়োজন নেই, বরং এটা তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যেই গণ্য হবে। মোটকথা, হজ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই। উভয়ের জন্য একটি তাওয়াফই যথেষ্ট। (১১১-১১০ص ৩ج المغني، ১০৩ص ১ج معارف السنن ১১১-১১০ص ৩ج)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কিরান হজ্জে উমরার জন্য আলাদাভাবে তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

... عَنْ جَابِرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ: (۱) فَطَافَ لَهَا طَوَافًا وَاحِدًا (اللفظ للترمذي)

অর্থাৎ, ... হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে আদায় করেছেন। (হজ্জে কিরান করেছেন)। অতঃপর হজ্জ ও উমরার জন্য একটি তাওয়াফ করেছেন। (পূর্বের হাদীসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

উপরোল্লিখিত রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, উমরার জন্য আলাদা তাওয়াফ করা প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহীম নাখঈ, আওয়াঈ, সুফিয়ান সাওরী, শাবী (রহ.) এবং অধিকাংশ সাহাবীদের মতে, হজ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফসহ মোট চারটি তাওয়াফ করতে হবে। (عمدة القاري ১ج ১৮৫ص)

(১) সর্বপ্রথম তাওয়াফে উমরা, যার পরে সায়াও করতে হয়। (هداية ১ج ১০৮ص)

(২) তাওয়াফে কুদুম, যা সুন্নত। (المبسوط ১ج ৩৫৫ص)

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত, যা হজ্জের রুকন।

(৪) তাওয়াফে আল-বিদা, যা ওয়াজিব। (المبسوط ১ج ৩৫৫ص)

... عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَىٰ لَهُمَا سَعْيَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا (১) দলীল
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ - (দার কুতনী ج ২ ص ২৬২)

অর্থাৎ, ... হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য দু' তাওয়াফ ও দু' সাঈ করেছেন এবং বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

দলীল (২): হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস-

قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِعُمَرَاءِ وَحَجَّجَهُ طَوَافَيْنِ وَسَعَىٰ سَعْيَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَبْنُ مَسْعُودٍ - (দার কুতনী ج ২ ص ২৬৬)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাওয়াফ করেছেন। তিনি উমরা ও হজ্জের জন্য দুটি তাওয়াফ ও দু' সাঈ করেছেন। আবু বকর, উমর, আলী ও ইবন মাসউদ (রাঃ) অনুরূপ করেছেন।

দলীল (৩): হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَىٰ سَعْيَيْنِ - (দার কুতনী ج ২ ص ২৬৬)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) দু' তাওয়াফ ও দু' সাঈ করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক হাদীস ও আছার রয়েছে, যা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের জন্য যেমন পৃথক পৃথক তাওয়াফ ও সাঈ রয়েছে, তেমনিভাবে উমরার জন্যও আলাদা তাওয়াফ ও আলাদা সাঈ রয়েছে।

(উল্লেখ্য যে, দারা কুতনী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে যদিও কতক রাবীদের যঈফ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সংশয়ের উর্ধ্বে।)

(مِيزَانُ الْإِعْتِدَالِ ج ১ ص ৫১৩-৫১৪، تهذيب الكمال ج ৬ ص ২৬৮-২৭০)

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন, হযরত জাবির ও আয়িশা (রাঃ)-এর থেকে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর আলোচ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে সকল হাদীসই বিশ্লেষণের দাবী রাখে, এবং এগুলোর বাহ্যিক অর্থ কারো নিকটই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বাহ্যিক অর্থে দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) শুধু একটি তাওয়াফ করেছেন অথচ সবাই একমত যে, তিনি (সাঃ) একাধিক তাওয়াফ করেছেন। আর এমতাবস্থায় তিন ইমাম এ সকল হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ করে থাকেন-

একটি তাওয়াফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাওয়াফে যিয়ারত, যার মধ্যে তাওয়াফে উমরাও অন্তর্ভুক্ত।

আর হানাফীগণ বলেন যে, এ সকল হাদীসে বর্ণিত একটি তাওয়াফ দ্বারা তাওয়াফে উমরা বুঝানো উদ্দেশ্য, যার মধ্যে তাওয়াফে কুদুমও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাওয়াফে কুদুম আলাদাভাবে আদায় করার প্রয়োজন নেই। আর এক্ষেত্রে হানাফীদের মতামত অগ্রাধিকারের কারণ হল, এর দ্বারা রেওয়ায়েতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন হয়।

(২) অথবা, বলা যায় যে, এক তাওয়াফ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য তিনি একটি তাওয়াফ করেছেন। এখানে এটিই উদ্দেশ্য, **تداخل** বা অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইতিপূর্বে উমরার জন্যও

তাওয়াফ করা হয়েছে। (فتح الملهم ج ৩ ص ২০১)

(৩) কাজী পানিপথী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, সহীহ হাদীসগুলো অধ্যয়ন করলে কোন কোন রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) পদব্রজে সাঈ করেছেন।

(مسلم ج ১ ص ৩৭৬, نسائي ج ২ ص ৪১)

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আরোহণ করে সাঈ করার উল্লেখ রয়েছে।

(نسائي ج ২ ص ৪১، البداية والنهاية ج ৫ ص ১০৭-১৬৫)

সুতরাং এগুলোর অবসানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হল, তিনি (সাঃ) দু'বার সাঈ করেছেন। একবার পদব্রজে, আরেকবার আরোহণ করে। অতএব, যেসব রেওয়ায়েতে এক সাঈর কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর সামগ্রিক উত্তর হল, পরস্পর বিরোধের সময় অতিরিক্ত অংশ প্রমাণকারীর বিষয়ের প্রাধান্য হয়। (مظهري ج ১ ص ২৩০)

بابُ الْحَلَقِ وَالْتَقْصِيرِ ص ২৭১ : মাথার কেশ মুণ্ডন ও কর্তন করা

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُقْصِرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقْصِرِينَ قَالَ وَالْمُقْصِرِينَ - (بخاري ج ১ ص ২৩৩ باب الحلق والتقصير عند الإحلال،

مسلم ج ১ ص ৪২০ باب تفضيل الحلق على التقصير الخ، ابن ماجه ص ২২৫)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি মাথার কেশ মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছাঁটে তাদের কি হবে? তখন তিনি বলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি মাথার কেশ মুণ্ডনকারীদের উপর রহম করুন। তখন তাঁরা (সাহাবীগণ) পুনরায় বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছাঁটে

তাদের জন্য কি? তখন তিনি বলেন, মাথার চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও রহম করুন।

বিশ্লেষণঃ হজ্জে (কুরবানীর দিন কংকর নিষ্ক্ষেপের পর) কেশ মুণ্ডন করা অথবা ছাঁটা ওয়াজিব। তবে চুল ছাঁটার চেয়ে মুণ্ডন করাই উত্তম।

প্রশ্ন হল পুরো মাথার কেশ মুণ্ডানো অথবা ছাঁটা ওয়াজিব, নাকি কতক অংশের দ্বারাই তা আদায় হয়ে যাবে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, পূর্ণ মাথা মুণ্ডানো অথবা ছাঁটা ওয়াজিব।

দলীলঃ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي

مَنَاسِكَكُمْ— (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٩٥، درس مشکوٰه ج ٢ ص ٢٤٣)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) তাঁর সমস্ত মাথা মুণ্ডন করলেন এবং বললেন, তোমরা আমার থেকে হজ্জের বিধিবিধান শিখে নাও।

* ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, মাথার কতক অংশ মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। কিন্তু মাথার সব চুল মুণ্ডানো অথবা ছাঁটা মুস্তাহাব এবং উত্তম, তবে ওয়াজিব নয়।

দলীল (১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعْلِمْتَ أَنِّي قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسلم ج ١ ص ٤٠٨ باب جواز تقصير الخ، بخاري ج ١ ص ٢٣)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুআবিয়া আমাকে বললেন, তুমি কি জান, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথার চুল ছোট্টে দিয়েছি।

হাদীসে উল্লিখিত مِنْ (মধ্য হতে, থেকে) হরফটিকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায়

حَرْفُ تَبْعِيضٍ বলা হয়। অর্থাৎ مِنْ এমন একটি হরফ যা بعض (কতক) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর মাথার কতক অংশের চুল হতে ছোট করেছেন, সবটুকু নয়।

দলীল (২) عَنْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর কেশ মোবারকের পার্শ্ব ছাঁটেন।

উক্ত হাদীসের দ্বারাও মাথার কতক অংশের চুল ছাঁটার প্রমাণ মিলে। (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٩٥)

উল্লেখ্য যে, অযুর সময় মাথা মাসেহ নিয়ে ইমামদের মাঝে যেমন মতভেদ রয়েছে, এমনিভাবে এখানেও মাথা মুণ্ডানো বা ছাঁটার পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈর মতে, তিনটি চুল মুণ্ডানো অথবা কেটে ফেলা যথেষ্ট। শাফেঈ মাযহাবের কারো কারো মতে একটি চুলই যথেষ্ট।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথার চার ভাগের এক অংশ মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। (عمدة القاري ج ١ ص ٦٣، فتح الباري ج ٣ ص ٤٥٠، شرح نووي ج ١ ص ٤٢٠)

জবাবঃ ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর জবাবে আহনাফ ও শাফেঈগণ বলেন, “পূর্ণ মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটা উত্তম, আর কতক অংশ মুণ্ডানো বা ছাঁটা ওয়াজিব। এতে উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।”

উল্লেখ্য যে, চুল ছোট করার চেয়ে মুণ্ডানো উত্তম বলার কারণ হল,

(১) নবী করীম (সাঃ) মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য পরপর দুইবার রহমতের দুআ করেছেন, আর চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপর মাত্র একবার দুআ করেছেন। হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনেও মুণ্ডনকারী শব্দটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে-

مُحْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمَقْصِرِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে মস্তক মুণ্ডিত এবং কেশকর্তিত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (ফাতহঃ ২৭)

(২) ইবন হাজর (রহ.) বলেন, ইহার আরেকটি কারণ হল, মস্তক মুণ্ডনকারী ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রবর্তী এবং এর দ্বারা আল্লাহর জন্য অধিক বিনয় প্রকাশ পায়। যার দ্বারা হাজীর নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে চুল ছাঁটার মধ্যে সৌন্দর্যের কিছু অংশ রয়েছেই যায়। (فتح الملهم ج ৩ ص ৩৩৮)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ যদি কারো মাথায় চুল না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির উচিত স্বীয় মাথার উপর ক্ষুর দিয়ে ছাঁচবে, যাতে অনুসরণের ক্ষেত্রে ওয়াজিবের হুকুম আদায় হয়ে যায়। (بدائع الصنائع ج ২ ص ১৪০)

* মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানোর হুকুম নেই, বরং মাথা মুণ্ডানো তাদের জন্যে মাকরুহ তাহরীমী। তারা এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কর্তন করবে। (بدائع الصنائع ج ২ ص ১৪১)

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ— (ابو داود ج ১ ص ২৭১ باب الحلق والتقصير، ترمذي

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, মহিলাদের জন্য মস্তক মুড়ানোর দরকার নেই; বরং তারা (এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল) কর্তন করবে।

উমরা : بَابُ الْعُمْرَةِ ص ২৭২

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْجَّ -

(بخاري ج ١ ص ٢٣٨ باب من اعتمر قبل الحج)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করেন।

‘উমরা’-এর আভিধানিক অর্থঃ عُمْرَةٌ শব্দটি فَعْلَةٌ-এর ওয়নে একবচন। বহুবচনে عُمَر

ও عُمَرَات, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. لَيْسَ الْعُمْرَةُ - মস্তকাবরণ পরিধান করা

২. আবাদ বা নির্মাণ করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি। (তাওবাহঃ ১৮)

৩. الزَّيَارَةُ-যিয়ারত করা

৪. الْقَصْدُ إِلَى مَكَانٍ هَامٍّ - গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করা। শব্দটির ব্যবহার পবিত্র

কুরআনেও পাওয়া যায়- (البقرة ১১৬) وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ - (البقرة ১১৬)

উমরা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) আল্লামা আইনী বলেন,

الْعُمْرَةُ طَوَافُ الْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مُحَرَّمًا -

অর্থাৎ, মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে পবিত্র কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করা এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দৌড়ানোকে উমরা বলা হয়।

(২) ফিকহুস সুন্নাহ-এর গ্রন্থকার বলেন-

الْعُمْرَةُ زِيَارَةُ الْكَعْبَةِ وَالطَّوَافُ حَوْلَهَا وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত ও তার চতুর্দিকে তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে উমরা বলা হয়।

(৩) শরহে বেকায়াহ-এর গ্রন্থকার বলেন-

الْعُمْرَةُ هِيَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ-

অর্থাৎ, উমরা হল নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করা।

(৪) আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে-

هِيَ قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنَّسْكِ الْمَعْرُوفِ أَيْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ-

অর্থাৎ, উমরা হল সুপ্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক ইবাদত তথা তাওয়াফ এবং সায়ীর উদ্দেশ্যে কাবার যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করা।

(৫) মুনজিদ অভিধানে আছে- هِيَ أَعْمَالٌ مَخْصُوصَةٌ تُسَمَّى بِالْحَجِّ الْأَصْغَرِ-

অর্থাৎ, এমন কিছু নির্দিষ্ট কাজ, যাকে হজ্জে আসগর (ছোট হজ্জ) বলা হয়।

مَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْءُ (উমরার রুকনসমূহ): কোন বস্তুর রুকন বলা হয়

তথা যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু দাঁড়ায়। উমরার রুকন তথা ফরয কয়টি সে সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে:

* ইমাম মালিক ও আহমদের (রহ.) মতে, উমরার রুকন তিনটি। যথা-

ক. ইহরাম বাঁধা

খ. বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা

গ. সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, চারটি। উপরোল্লিখিত তিনটিসহ চতুর্থটি হচ্ছে মাথা মুড়ানো বা চুল কাটা।

* জমহুরদের মতে, উমরার রুকন হচ্ছে দুটি। যথা-

ক. বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা,

খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে একটি। বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা।

হজ্জ ও উমরার মাঝে পার্থক্য: হজ্জ ও উমরা যদিও শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয়ে একই শ্রেণীর ইবাদত এবং উভয়ই মক্কায় সম্পাদিত হয়। তবুও এ দুই প্রকারের ইবাদতের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা-

আভিধানিক পার্থক্য: ক. হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা করা, সাফা করা, ইরাদা করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে উমরা শব্দের অর্থ হল যিয়ারত করা, আবাদ করা ইত্যাদি।

খ. হজ্জ শব্দটি মাসদার আর উমরা শব্দটি ইসমে মাসদার।

মাদ্দাহগত পার্থক্যঃ حَج শব্দটির ʿাদা হল ج - ج - ح জিনসে লাফীফ, ʿafra শব্দটির ʿada হল ر - م - ع জিনসে সহীহ।

পারিভাষিক পার্থক্যঃ হজ্জ বলা হয় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা। উমরা হল যেকোন সময় নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা।

হুকুমগত পার্থক্যঃ

ক. হজ্জ ফরয এবং উমরা সুন্নত।

খ. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু উমরার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। বরং বছরের যেকোন সময় উহা আদায় করা যায়। (তবে হজ্জের পাঁচ দিন ব্যতীত- আরাফার দিন, কুরবানীর দিন, তাশরীফের দিন অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩)

(المعدة ج ১ ص ১০৮)

গ. হজ্জে আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান করতে হয়। কিন্তু উমরায় কোন অবস্থান নেই।

ঘ. হজ্জের রুকন তিনটি আর উমরার রুকন দুইটি। (যদিও কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।)

ঙ. জামরায় কংকর নিক্ষেপ হজ্জের ওয়াজিব। পক্ষান্তরে উমরায় কংকর নিক্ষেপের বিধান নেই।

চ. হজ্জে তিনবার তাওয়াফ করতে হয়। উমরায় মাত্র একবার তাওয়াফ করতে হয়।

ছ. হজ্জ করলে কবীরা (বড়) গুনাহ মাফ হয়ে যায়। উমরার মাধ্যমে কেবল সগীরা (ছোট) গুনাহ মাফ হয়।

জ. কারো কারো মতে, সাধারণত হজ্জকে বড় হজ্জ বলা হয়, পক্ষান্তরে উমরাকে ছোট হজ্জ বলা হয়। ইত্যাদি।

উমরা সুন্নত না ওয়াজিবঃ উমরা সুন্নত না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, আবু সাওর, সুফিয়ান সাওরী, আওয়াঈ (রহ.) ও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, জীবনে একবার উমরা আদায় করা ওয়াজিব তথা ফরয। (২০২ ص ২৩ درس ترمذي)

* বাদায়িউস সানায়ি-এর গ্রন্থকার বলেন যে, আহনাফদের মাযহাবও তাই। অর্থাৎ জীবনে একবার উমরা আদায় করা (সাদাকাতুল ফিতরের ন্যায়) ওয়াজিব।

(بدائع الصنائع ج ২ ص ২২৬)

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর দলীলঃ

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

অর্থাৎ, “তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর।” (বাকারাঃ ১৯৬)

উক্ত আয়াতে উমরা শব্দটিকে ফরয হজ্জের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হুকুমের ক্ষেত্রেও উভয়টির হুকুম একই হবে। অর্থাৎ উমরাও হজ্জের মত অপরিহার্য বা ওয়াজিব। তাছাড়া, উভয়টির জন্যেই আমরা-এর হীণা ব্যবহার করা হয়েছে, যা ওয়াজিব।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ - (۲) **دلیل**
 (تنظیم الاشتات ج ۲ ص ۷۰)

অর্থাৎ, যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, হজ্জ এবং উমরা দুই ফরয।

* ইমাম মালিক, মুহাম্মদ ইবন ফযল, ইবন হুমাম এবং আবু হানিফা (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ মায়হাব হল- জীবনে একবার উমরা আদায় করা সুন্নতে মুআক্কাদা এবং একাধিকবার উমরা করা মুস্তাহাব। (৩৭০-এ ৩৮, اوجز المسالك ১০১, رد المحتار ২৮)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٍ : (٥) دَلِيلُ
هِيَ؟ قَالَ لَا وَأَنْ يَتَعَمَّرُوا هُوَ أَفْضَلُ (ترمذي ج ١ ص ١٨٦ باب في العمرة أواجبة هي أم لا)

অর্থাৎ, হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ)-কে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এটি কি ওয়াজিব? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে উমরা করা উত্তম।

عَنْ جَابِرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتِمِرَ خَيْرٌ لَكَ - (دار : (۲) دبی)

অর্থাৎ, ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! উমরা কি হজ্জের মত ফরয? উত্তরে তিনি বললেন, না। তবে উমরা করা, তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ - (ابن ماجه ص ٢٢١ باب العمرة)

অর্থাৎ, ... হযরত তালহা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, “হুজ্জা জিহাদ তল্য, আর উমরা নফল কাজের মত।”

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْحَبُّ فَرِيضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ - (تنظيم ج ۲ ص ۷۵-۷۶) : (۸) دہلی

অর্থাৎ, ... ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, হজ্জ ফরয এবং উমরা নফল কাজের মত।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উমরা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নতে মুআক্কাদা।

জবাবঃ প্রতিপক্ষের প্রথম দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(১) আয়াতে যদিও হজ্জের সাথে উমরা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা হুকুমের ক্ষেত্রেও হজ্জের সাথে সম্পৃক্ততা অপরিহার্য নয়।

(২) উক্ত আয়াতে লক্ষ্য করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, উমরা আরম্ভ করার পরে তা পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। কেননা, নফল আমল শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

(৩) তাছাড়া, শাফেঈদের দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে ৬ষ্ঠ হিজরীতে। আর এ আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয হয়নি, বরং হজ্জ ফরয করা হয়েছে-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (ال عمران آية ٩٧)

আয়াত দ্বারা, যা নাযিল হয়েছে ৯ম হিজরীতে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হাদীসটি হিশাম ইবন সীরীন থেকে এবং ইবন সীরীন যাবেদ থেকে মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি মাওকুফ হওয়ার কারণে তা দলীলযোগ্য নয়। (৭১ম ২৮)

بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ص ২৭৬

ঋতুবতী মহিলা যদি তাওয়াফুল বিদার পূর্বে তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করে

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيٍّْ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا حَاسِتُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ فَلَا إِذَا (بخاري ج ١ ص ٢٣٧ باب إذا حاضت المرأة الخ،

مسلم ج ١ ص ٤٢٧ باب بيان وجوه الاحرام الخ، ترمذي ج ١ ص ١٨٨ باب في المرأة تحيض بعد الافاضة) অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাফিয়া বিনত হুয়াই (রাঃ)-এর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাকে বলা হল, তিনি ঋতুবতী। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সম্ভবত সে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলেছে। (অর্থাৎ তিনি তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত আমরা মদীনায় ফিরতে পারব না।) তখন তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তাওয়াফে ইফাদা সম্পন্ন করেছেন। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, তবে তো এখনই (আমরা মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি এবং তার জন্য আর তাওয়াফে বিদার প্রয়োজন নেই।)

বিশ্লেষণঃ ঋতুবতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে। যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْتُ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ - (ترمذي ج ١ ص ١٨٨ باب تقضي الحائض من المناسك،

بخاري ج ١ ص ٢٢٣ باب تقضي الحائض المناسك الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি ঋতুবতী হয়ে পড়লে নবী করীম (সাঃ) আমাকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করি।

এটি একটি সাধারণ হুকুম। উল্লেখ্য যে, হজ্জে দু'ধরনের তাওয়াফ আদায় করতে হয়। যথা-

(ক) তাওয়াফে ইফাদা বা তাওয়াফে যিয়ারত। (যা হজ্জের তিনটি ফরযের মধ্যে একটি)

(খ) তাওয়াফুল বিদা বা বিদায়ী তওয়াফ। (যা হজ্জের ওয়াজিবসমূহের একটি) প্রশ্ন হল, যদি কোন মহিলার তাওয়াফে যিয়ারতের পর এবং বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে মাসিক আসতে শুরু করে, তাহলে সে কি করবে এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

* হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর মতে, ঋতুবতী মহিলা যেরূপভাবে তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য পবিত্র হওয়ার অপেক্ষা করবে (এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে), অনুরূপভাবে বিদায়ী তাওয়াফের জন্যও অপেক্ষা করবে; অর্থাৎ ঋতুবতী হওয়ার কারণে বিদায়ী তওয়াফ বাতিল হবে না।

(عمدة القاري ج ١ ص ٩٦)

... عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النُّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ابو داود ج ١

ص ২৭৫, তرمذي ج ১ ص ১৮৮)

অর্থাৎ, ... হারিস ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আওস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ১০ যিলহজ্জ (তাওয়াফে ইফাদা) সম্পন্ন করে, অতঃপর ঋতুবতী হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, তার সর্বশেষ উদ্দেশ্য যেন হয় বায়তুল্লাহ তথা তাওয়াফুল বিদা।

বর্ণনাকারী (ওয়ালীদ ইবন আব্দুর রহমান) বলেন, তখন হারিস (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অনুরূপ ফাতওয়া দিয়েছেন।

* উমর (রাঃ) ব্যতীত অন্য সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, যদি মহিলার মাসিক আসতে শুরু করে, তাহলে তার থেকে বিদায়ী তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। প্রথমদিকে যাকে ইবন সাবিত ও ইবন উমর (রাঃ)-এর অভিমত হযরত উমর (রাঃ)-এর অনুরূপই ছিল। পরবর্তীতে তাঁদের এই মত পরিবর্তন প্রমাণিত হয়েছে। (৭৭৬ ১০৮ ১০৮ ১০৮)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحَيْضَ وَرَحَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ترمذي ج ১ ص ১৮৮ باب في المرأة تحيض الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন, যে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ করবে, সে সর্বশেষে বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট যাবে। অর্থাৎ বিদায় হজ্জ করবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু ঋতুবতীরা। তাদের জন্য নবী করীম (সাঃ) অবকাশ দিয়েছেন। তাদের জন্য ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে বিদায়ী তাওয়াফের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

জবাবঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবে ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, (১) উক্ত হাদীসটি হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (৩০৭ ১০৮ ১০৮ ১০৮)

(২) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) হযরত উমর (রাঃ)-এর মতের এই প্রয়োগ ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মতে ঋতুবতী মহিলা থেকে বিদায়ী তাওয়াফ তখন বাদ পড়ে না, যখন প্রচুর সময় এবং অবকাশ থাকে। অর্থাৎ, যদি তার জন্য অবস্থান করা সম্ভব হয়, তাহলে অবস্থান করা জরুরী হবে। কিন্তু যদি সময়ের সংকীর্ণতা ও সফরের তাড়া থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় তাঁর মতেও আয়িশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা হবে। (৪২৭ ১০৮ ১০৮ ১০৮)

তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যদি কোন মহিলার মাসিক আসতে শুরু হয়, তাহলে এর হুকুমঃ

পূর্বের হুকুমঃ এমন মহিলাকে তাওয়াফে যিয়ারত হতে বিরত থেকে পবিত্রতার অপেক্ষা করতে হবে। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফে যিয়ারত আবশ্যিক হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত ইমাম একমত পোষণ করেন। (৪২৭ ১০৮ ১০৮ ১০৮)

বর্তমান হুকুমঃ বর্তমান আধুনিক যুগে যেখানে হাজীদের যাতায়াত, অবস্থানের তারিখ এবং সময় সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে এবং ভিসার সীমিত তারিখ থাকে। কোন হাজীর জন্য সেসব তারিখ ও সময় পরিবর্তনের ইচ্ছাতির থাকে না এবং আইনের দৃষ্টিতে তার জন্য অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় হায়েয ও নিফাস বিশিষ্ট মহিলা স্বীয় পবিত্রতাকালে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারলে সে কি করবে- এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবন তাইমিয়া (রহ.) সমাধান দিতে গিয়ে বলেন, এরূপ মহিলা নাপাক অবস্থায়ই তাওয়াফ করে নিবে এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী একটি দম (পশু কুরবানী) দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে।

(فتاوى ابن تيمية ج ٢٦ ص ٢٤٢-٢٤٤)

তবে, যদি পবিত্র হওয়া ও তাওয়াফ করা পর্যন্ত মহিলার জন্য মক্কাতে অবস্থান করা সম্ভব হয়, তবে তাওয়াফ তার জন্য নিঃসন্দেহে ওয়াজিব হবে। (درس ترمذي ج ٣ ص ٢١٨)

بَابُ فِي مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْئِي فِي حَجِّهِ ص ٢٧٥

হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজ আগে করে

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِمَعْنَى يُسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَفَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْئِي قَدَّمَ أَوْ آخَرَ إِلَّا قَالَ اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ—(بخاري ج ١ ص ٢٣٢)

باب الذبح قبل حلق، مسلم ج ١ ص ٤٢١ باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق الخ، ترمذي ج ١

ص ١٨٢ باب من حلق قبل ان يذبح الخ، ابن ماجه ص ٢٢٥)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনাতে অবস্থান করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতাম না, তাই কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করে ফেলেছি। (এমতাবস্থায় কি করব?) তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি এখন কুরবানী কর এবং এতে কোন ক্ষতি নেই। তখন অপর ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অবহিত ছিলাম না, তাই কংকর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কংকর নিক্ষেপ কর এবং এতে কোন দোষ নেই। আর এদিন

তাকে পূর্বে-পরে (হজ্জের কাজ) করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হয় তার জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

বিশ্লেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইয়াওমুন নহর বা যিলহজ্জের ১০ তারিখে হাজীগণ চারটি কাজ করে থাকেন। যথা-

১. কংকর নিষ্ক্ষেপ করা
২. কুরবানী করা
৩. মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করা
৪. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

(মসলম ج ১ ص ৩৭৭-৪০০، البحر الرائق ج ৩ ص ২৪، بداية المجتهد ج ১ ص ২০৭)

প্রশ্ন হল, উপরোল্লিখিত চারটি কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যিক কিনা। এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও সাহেবাইন (রহ.) সহ জমহুর ফকীহ সাহাবী ও আলিমদের মতে, এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। তাই ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হলে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে না।

(المغلي ج ৩ ص ৩৪৬-৩৪৮، الانصاف ج ৪ ص ৪২)

দলীল (১)ঃ পূর্বোল্লিখিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২৭১)

باب الحلق والتقصير، بخاري ج ১ ص ২৩৪ باب اذا رمي بعدما الخ، مسلم ج ১ ص ৪২১، ترمذي ج ১

ص ১৮২، ابن ماجة ص ২২০)

অর্থাৎ, ... জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করে, আমি কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুড়ন করেছি। (এমতাবস্থায় কি করব?) জবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী (এখন) কর। এতে কোন দোষ নেই।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে নবী করীম (সাঃ) لَا حَرَجَ তথা “এতে কোন দোষ নেই”

বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয়, নতুবা তিনি (সাঃ) দমের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। তাই এই ধারাবাহিকতা ইচ্ছাকৃত বা ভুলে অথবা না জেনে তরক করে ফেললে দম দেয়া ওয়াজিব। ইবরাহীম নাখঈর অভিমতও তাই।

(معارف السنن ج ৬ ص ৪৪৫، مبسوط للسرخسي ج ৪ ص ৪১-৪২)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ أَوْ أَحْرَهُ فَلْيَهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا - (طحاوي ج ١ ص ٣٦٠، نصب الرأية ج ٣ ص ١٢٩)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে হজ্জের কোন কাজ আগে করে ফেলেছে কিংবা পরে করে ফেলেছে, সে যেন একটি দম (পশু) জবাই করে।

জবাবঃ ১। ইমাম হুমাম (রহ.) বলেন, হাদীসদ্বয়ে لَا حَرْجَ (কোন ক্ষতি নেই) দ্বারা “দম ওয়াজিব নয়” একথা বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা গুনাহ হবে না, এবং পরকালে পাকড়াও করা হবে না বুঝানো উদ্দেশ্য।

২। অথবা, হাদীসটি রাসূল (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের সাথে খাস। কেননা ইহা সাহাবাদের প্রথম হজ্জ ছিল বিধায়, অজ্ঞতাবশতঃ তাদের ধারাবাহিকতা লংঘিত হয়েছিল। তাই রাসূল (সাঃ) উদারতা প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে এই শিথিলতা রহিত হয়ে গেছে। এর সমর্থন তাহাবীতে বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি যথেষ্ট। (طحاوي ج ١ ص ٣٦٠)

৩। ইবন আব্বাস (রাঃ) لَا حَرْجَ বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও যখন দম ওয়াজিব হওয়ার ফাতওয়া দিচ্ছেন, এতে বুঝা যায় যে, لَا حَرْجَ দ্বারা গুনাহ হবে না বুঝানোই উদ্দেশ্য, দম ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়।

(فتح الملهم ج ٣ ص ٣٤١)

২৭৭ : بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ أَسَمَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عُمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعُمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى - (بخاري ج ١ ص ٢١٧ باب اغلاق البيت وبصلي الخ،

مسلم ج ١ ص ٤٢٨ باب استحباب دخول الكعبة، نسائي ج ١ ص ١١٢ الصلوة في الكعبة)

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবন যায়িদ, উসমান ইবন তালহা আল-হাজবী (কাবার দারোয়ান) এবং বিলাল (রাঃ)। অতঃপর তিনি (ভীড়ের আশংকায়) এর দরজা বন্ধ করে দেন। পরে তিনি তন্মধ্যে অবস্থান করেন। রাবী আব্দুল্লাহ ইবন উমর বলেন, অতঃপর আমি বিলাল (রাঃ)-কে সেখান হতে বের হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে কি করেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামদিকে, দুটি স্তম্ভকে ডানদিকে এবং তিনটি স্তম্ভকে পশ্চাতে রেখে নামায আদায় করেন এবং এ সময় বায়তুল্লাহ ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিশ্লেষণঃ কাবা ঘরের ভিতরে নামায পড়া জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছেঃ

* হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, কাবা ঘরের ভিতরে কোন প্রকার নামায পড়া জায়েয নয়। কোন কোন মালিকী, তাবারী এবং আহলে যাহিরের অভিমতও তাই। (فتح الباري ج ٣ ص ٣٧٤)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ-

অর্থাৎ, অতএব, এখন আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। (বাকারাহঃ ১৪৫)

উক্ত আয়াতে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। অতএব, কেউ যদি কাবার ভিতরে নামায পড়ে, তাহলে পুরো কাবা সামনে থাকে না; বরং কাবার কতক অংশ নামাযীর পিছনে পড়ে যায়। যা আয়াতের পরিপন্থী।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْإِلَهَةُ ... قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَفِي زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ-

(ابو داود ج ١ ص ٢٧٧، بخاري ج ١ ص ٢١٨)

অর্থাৎ, ... (স্বয়ং) ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেব-দেবী বিদ্যমান ছিল। ... ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এর প্রতিটি কোণায় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) উচ্চারণ করেন এবং এর প্রতিটি রুকনেও। অতঃপর তিনি সেখানে নামায আদায় না করে বের হয়ে আসেন।

দলীল (৩): ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন-

أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ - (مسلم ১৮৭৭)

অর্থাৎ, আমাকে উসামা ইবন যায়েদ (রাঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেছেন, তখন তার সবদিকেই দুআ করেছেন। বের হওয়া পর্যন্ত তাতে নামায পড়েননি।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কাবা শরীফে নফল নামায পড়া জায়েয আছে।

কিন্তু ফরয নামায পড়া মাকরুহ। (فتح الهاري ৩৮৭৭)

কেননা, নবী করীম (সাঃ) হতে ইহাই প্রমাণিত আছে যে, তিনি কাবাগৃহে শুধু নফল নামায পড়েছেন। ফরয নামায পড়েননি।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ (রহ.) সহ জমহুরের মতে, কাবাগৃহে ফরয এবং নফল উভয় প্রকার নামায আদায় করা জায়েয আছে। (تنظيم الاشتات ১৮৭৭)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

دَلِيل (২): عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ - (ابو داود ১৮৭৭)

অর্থাৎ, আব্দুর রহমান ইবন সাফওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবার মধ্যে প্রবেশ করে কি করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

... عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ - (ترمذي ১৮৭৭ باب الصلوة في الكعبة)

অর্থাৎ, ... হযরত বিলাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) যেহেতু কাবায় নামায পড়েছেন, তাই কাবার ভিতরে যেকোন নামায আদায় করা বৈধ।

জবাবঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) আয়াত দ্বারা পুরো কাবা শরীফ নামাযীর সামনে থাকার যে যুক্তি পেশ করেছেন, এর জবাবে জমহুরগণ বলেন যে, নামায শুদ্ধ

হওয়ার জন্য পুরো কাবা সামনে থাকা শর্ত নয়; বরং কতক অংশ সামনে থাকাই যথেষ্ট। যা বেলাল (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণ মিলে যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) কাবা শরীফের ভিতরে নামায পড়েছেন। সুতরাং পুরো কাবা নবী করীম (সাঃ)-এর সামনেও ছিল না। (تَلْظِمُ الْأَشْفَاتُ ج ١ ص ٢٦١)

তাছাড়া আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, যদিও আসল কিবলা বায়তুল্লাহ তথা কাবা; কিন্তু কাবার দিকে মুখ করা সেখান থেকেই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। তাই দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে হুবহু কাবার দিকে মুখ করে বিশেষ যত্নপাতি ও যন্ত্রের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করে নামায পড়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের আয়াতে কাবার কথা উল্লেখ না করে ‘মাসজিদুল হারাম’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ إِلَى (দিক)-এর পরিবর্তে شَطْر শব্দটি ব্যবহার করায় কিবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে গেছে। شَطْر দু’ অর্থে ব্যবহৃত হয়- বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিকে। এতে বুঝা যায় যে, (দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে) বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয়। মসজিদে হারাম যেদিকে অবস্থিত সেদিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। (مَعَارِفُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةِ آيَةُ ١٤٥)

উপরোল্লিখিত আলোচনায় বুঝা গেল যে, নামায সহীহ হওয়ার জন্য পুরো কাবা সামনে থাকা জরুরী নয়; বরং কতক অংশ সামনে থাকলেই চলবে। আর কাবা শরীফে নামায পড়লে তো কাবার দিকেই মুখ ফেরানো হয়।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) কাবায় নামায পড়েননি, বরং শুধুমাত্র তাকবীর বলেছেন। পক্ষান্তরে বিলাল (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তথায় নামায আদায় করেছেন। আর বিলাল (রাঃ)-এর বাণীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জমহুরগণ বেশ কিছু যুক্তি ও বাস্তব প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. নবী করীম (সাঃ) কাবা শরীফে মোট দুইবার প্রবেশ করেন, একবার নামায আদায় করেন এবং দ্বিতীয়বার নামায আদায় করেননি। আর ইবন আব্বাস (রাঃ) দ্বিতীয় অবস্থিতির বর্ণনা করেছেন। (مَعَارِفُ السُّنَنِ ج ٦ ص ٤٠٥)

২. বিলাল (রাঃ)-এর হাদীসটি হল হাঁ-বোধক এবং ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হল না-বোধক। আর নিয়ম অনুযায়ী বিলাল (রাঃ)-এর হাঁ-বোধক হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে।

৩. অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, কাবায় প্রবেশকালে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে তিনজনের একজন হলেন বিলাল (রাঃ)। সেখানে ইবন আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন না।

* তৃতীয় দলীলের জবাবে জমহুরগণ বলেন-

(১) কাবা শরীফে প্রবেশের পর তাঁরা পৃথক হয়ে যান। আর এ সময় নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বিলাল (রাঃ) এক কোণে থাকেন। এ সময় কাবার দরজাও বন্ধ করে দেয়া হয়। বুখারীতে উল্লেখ আছে-

(بخاري ج ١ ص ٢١٧، مسلم ج ١ ص ٤٢٨) فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ - অর্থাৎ তাঁদের উপর কাবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে অধিক অন্ধকার হয়ে যায় এবং মাঝখানে স্তম্ভও প্রতিবন্ধক ছিল। তাই উসামা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে নামায পড়তে দেখতে পাননি।

(২) কেউ কেউ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (সাঃ) কাবার ভিতরের দেয়ালে অংকিত ছবি উঠিয়ে ফেলার জন্য হযরত উসামা ইবন যায়েদকে পানি আনতে পাঠান। আর এই ফাঁকে নবী করীম (সাঃ) দুই রাকাত নামায আদায় করে নেন। যার ফলে নবী করীম (সাঃ)-এর নামাযের ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন না।

(فتح الباري ج ٣ ص ٣٧٥)

(৩) সর্বোপরি বলা যায় যে, হযরত বিলাল (রাঃ) শুধু নবী করীম (সাঃ)-এর নামাযের বর্ণনাই দেননি; বরং হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নামাযের পূর্ণ অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। যা অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

* মালিকীগণ কাবায় ফরয নামায পড়ার ক্ষেত্রে যে মাকরুহ বলেছেন, এর জবাবে জমহুরগণ বলেন যে, কাবায় (যেকোন) নামায পড়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন হওয়ার মূল কারণ এই যে, এতে কাবার কিছু অংশ নামাযীর পিছনে থাকে। অথচ নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইহা নামায জায়েযের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। যখন একথা সাধারণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কাবাগৃহে নামায পড়া বৈধ, সুতরাং ফরয নামায কাবাগৃহে কেন জায়েয হবে না? এবং মাকরুহই বা হবে কেন? নাজায়েয হওয়ার জন্য তো সুনির্দিষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। অথচ এ ব্যাপারে মালিকীগণ দলীল প্রদান করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। সুতরাং ফরয এবং নফলের মধ্যে মনগড়া কোন বৈষম্য করা যাবে না। কেননা, ফরয ও নফল নামাযের হুকুম পবিত্রতা ও কিবলার ক্ষেত্রে অভিন্ন। (درس ترمذي ج ٣ ص ١٣٠)

২৭৮ : مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ : بَابُ فِي إِيْتَانِ الْمَدِينَةِ ص ২৭৮

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى - (মসলম জ ১ স ৪৭৪)
 باب فضل المساجد الثلاثة، ترمذي ج ১ ص ৭০ باب اي المساجد افضل، نسائي ج ১ ص ১১৪ ما تشد الرحال اليه من المساجد، ابن ماجة ص ১০৩)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও গমনের জন্য সফর করবে না- মাসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ (নববী) এবং মাসজিদুল আকসা।

২৭৯ : مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ : بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ص ২৭৯

... عَنْ رَيْبَعَةَ يَعْنِي ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِيدُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا حُرَّةً وَأَقِمَّ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَإِذَا قُبُورٌ بِمَجْنِبَةِ الْخ

অনুবাদঃ ... রাবীআ অর্থাৎ ইবন আল হুদায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা ইবন আব্দুল্লাহকে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে একটি হাদীস ব্যতীত আর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, সেটা কি? তখন জবাবে তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হই। অতঃপর আমরা যখন ‘হুররাতে ওয়াকিম’ নামক স্থানে উপনীত হই, তখন সেখানে অবতরণ করি, যেখানে তাদের কবর ছিল।

বিশ্লেষণঃ কবর যিয়ারত জায়েয কিনা, এ নিয়ে ফকীহগণের নিকট মতানৈক্য রয়েছেঃ

* উপরোল্লিখিত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসের আলোকে আল্লামা ইবন তাইমিয়া, শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-জাওনী, কাজী হুসাইন ও ইয়ায (রহ.)-এর মতে, হাদীসে বর্ণিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় সফরের জন্য যাওয়া জায়েয নয়। আর নিষিদ্ধতার এই ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন যে, কোন পীর, বুয়ুর্গ এমনকি নবী করীম (সাঃ)-এর কবরও যিয়ারত করা জায়েয নয়।

তবে কেউ যদি মসজিদে নববীর নিয়তে সফর করে, তাহলে নবী করীম (সাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে।

(تنظيم الاشتات ج ١ ص ٢٦٤، مجمع البحار ج ١ ص ١٥٨، درس ترمذي ج ٢ ص ١١٢)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে রওজা মুবারকের কথা উল্লেখ নেই। তাঁরা আরো বলেন যে, যেহেতু হাদীসে **حرف استثناء** (ব্যতিক্রমের

হরফ) **إِلا** (ব্যতীত) এসেছে, সুতরাং এর একটি **مستثنى منه** (যা থেকে ব্যতিক্রম

করা হয়েছে) উহা রয়েছে। আর তা হল **مَوْضِع** অর্থাৎ যে কোন স্থান, যা সাধারণ।

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَوْضِعٍ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

অর্থাৎ, তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত কোথাও গমনের জন্য সফর করবে না।

সুতরাং কারো কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয নয়। এমনকি নবী করীম (সাঃ)-এর রওজার উদ্দেশ্যেও নয়।

* ইবন হায়ম (রহ.)-এর মতে, পুরুষদের জন্য কবর জীবনে একবার হলেও যিয়ারত করা ওয়াজিব। (فتح الباري ج ٣ ص ١٤٨، تنظيم الاشتات ج ١ ص ٥٢٩)

... عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ

أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُوزُوها فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ— (ترمذي ج ١ ص ٢٠٣ باب

في الرخصة في زيارة القبور، مسلم ج ١ ص ٣١٤ فصل في الذهاب إلى زيارة القبور، نسائي

ج ١ ص ٢٨٥-٢٨٦ زيارة القبور)

অর্থাৎ, ... হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মদকে তার মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ, ইহা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উক্ত হাদীসে কবর যিয়ারত করার জন্য নির্দেশের (আমর) ছীগা ব্যবহৃত হয়েছে।

আর আমর আসে ওয়াজিবের জন্য। (نهل الاوطار ج ٤ ص ١١٧-١١٨)

* সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের ঐকমত্য রয়েছে যে, পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত মাসনূন ও মুস্তাহাব, তবে ওয়াজিব নয়। এবং নবী করীম (সাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা অনেক ফযীলতের কাজ। (شرح نووي ج ١ ص ٣١٤، فتاوي شامي ج ١ ص ٢٠٤)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي - (تنظيم الاشتات ج ١ ص ٢٦٥)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার ইন্তিকালের পর যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করতঃ আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।

... أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (تنظيم الاشتات ج ١ ص ٢٦٥)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার (রওজা) যিয়ারত করল, সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে।

দলীল (৩): নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي - (الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ١٧١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে গেল।

অন্যান্য কবর যিয়ারত বৈধতার দলীল-

(১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত রাবীআ অর্থাৎ ইবন আল-হুদায়েরের হাদীস।
(২) ইবন হাযম (রাঃ)-এর অভিমতের পক্ষে প্রদত্ত হাদীস। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ইসলামের প্রথম দিকে যখন লোকজনের আকীদা পরিপক্ব ছিল না, তখন নবী করীম (সাঃ) কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ধর্মবিশ্বাস পরিপক্ব হল, তখন কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأَحَدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ - (فتاوى شامي ج ١ ص ٢٠٤)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) শুহাদায়ে উহুদের কবরে প্রতি বছরের শুরু বা শেষে উপস্থিত হতেন।

জবাবঃ ইবন তাইমিয়াহ ও অন্যান্যদের দলীল হিসেবে পেশকৃত হাদীসের জবাবে জমহুরগণ বলেন যে, আসলে উক্ত হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের ফযীলত বর্ণনা করা। সুতরাং উক্ত হাদীসে مستننى منه কে ব্যাপকভাবে موضع শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা জায়েয নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয়। কেননা তখন এর অর্থ

দাঁড়ায়, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যেমন, ইলম অনুেষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, হালাল মাল উপার্জন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা জায়েয নয়। অথচ একথা কেউ মেনে নেবে না। বরং এগুলো করা হালাল এবং সওয়াবের কাজ।

সুতরাং **مَنْ مَسَّ مَسْجِدًا** কে এভাবে ব্যাপক না মেনে মসজিদ (مسجد) শব্দ দ্বারা খাস মানা অধিক যুক্তিযুক্ত। যা উক্ত হাদীসের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তখন মূল বাক্যটি হবে- **لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ - (درس ترمذي ج ٢ ص ١١٣) -**

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ব্যতীত তোমরা অন্য কোন মসজিদে গমনের জন্য সফর করবে না।

* তাছাড়া উপরিউক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে হাদীসেই বর্ণিত আছে-

لَا يَتَّبِعُنِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَبْتَغِي فِيهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا - (مسند احمد)

অর্থাৎ, কোন সাওয়ারীর অধিকারীর জন্য মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ তথা মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে নামাযের জন্য সফর করা সমীচীন নয়।

সুতরাং, আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) ও আউলিয়াদের কবর যিয়ারত করা জায়েয এবং সওয়াবের কাজ।

* ইবন হাযমের দলীলের জবাবে আলিমগণ বলেন যে, হাদীসে যদিও কবর যিয়ারতের জন্য আমরের সীমা ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু উসূল হল- নিষেধের পর যখন কোন আমর আনা হয়, তখন তা ওয়াজিবের জন্য আসে না; বরং তখন ইহা আসে বৈধতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ পূর্বে কবর যিয়ারত নিষেধ ছিল, পরবর্তীতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। (تنظيم الاشتات ج ١ ص ٥٢٩)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয কিনা, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছেঃ

* কতক আলেমের মতে, মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত নাজায়েয তথা মাকরুহ।

(شرح المذهب ج ٥ ص ٣٠٩)

দলীলঃ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ

الْقُبُورِ - (ابن ماجه ص ١١٤ باب في النهي عن زيارة الخ، ترمذي ج ١ ص ٢٠٣ باب زيارة القبور للنساء)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারীগীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, যদি ফেতনার আশংকা না থাকে, ধৈর্যশক্তি খুব বেশি হয় এবং কবরের পার্শ্বে কান্নাকাটি ও বিলাপ শুরু করার আশংকা না থাকে, এমন মহিলার জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে।

(المغني ২ ج ص ৫৭০، الفقه الاسلامي وادلته ج ২ ص ৫৩৭-৫৪২، مبسوط ج ২৪ ص ১০، فتاوى عالمكبرى ج ৫ ص ৩৫০)

দলীল (১): হযরত বুরাইদা (রাঃ)-এর হাদীস। (হাদীসটি উক্ত অনুচ্ছেদে ইবন হাযামের দলীল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।) তাতে নিষেধের পর **فَزُورُوا** তথা ‘তোমরা কবর যিয়ারত কর’ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা নারী-পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ মহিলারা সমস্ত আহকামে পুরুষদের অধীন হয়।

দলীল (২): হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছেন-

كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (تَعْنِي إِذَا زَارَاتِ الْقَبْرَ)

অর্থাৎ, ইয়া রাসুল্লাহ! আমি তাতে কিরূপ বলব? (অর্থাৎ, যখন মহিলারা কবর যিয়ারত করে।) উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি বল-

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَخِرِينَ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْأَحْيَوْنَ - (مسلم ج ১ ص ৩১৬)

অর্থাৎ, কবরবাসী মুমিন-মুসলমানদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকে অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী সবার প্রতি দয়া করুন। আমরাও ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব।

দলীল (৩): মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হল, আত-তামহীদে আব্দুল্লাহ ইবন আবু মুলাইকা (রহ.)-এর রেওয়ায়েত- হযরত আয়িশা (রাঃ) একদিন কবরস্থান থেকে এগিয়ে এলেন। আমি তাকে বললাম, উম্মুল মুমিনীন! আপনি কোথেকে এলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার ভাই আব্দুর রহমানের কবর থেকে। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতেন, অতঃপর কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন। (عمدة القاري ج ৮ ص ৬৭)

তাছাড়া মহিলাদের জন্য যে কবর যিয়ারত জায়েয, এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

জবাবঃ (১) অভিসম্পাতের হাদীসটি ছিল নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পূর্বকর। যখন তিনি অনুমতি দিয়েছেন, তখন এতে নারী এবং পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(২) কুরতুবী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে মূলত ঐ সকল মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে, যে খুব বেশি বেশি কবর যিয়ারত করে। কেননা, এর দ্বারা অনেকাংশে স্বামীর হক নষ্ট হয় এবং বাধাহীনভাবে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে থাকে। (تنظيم الاشتات ج ١ ص ٥٢٩)

সতর্কীকরণঃ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, অবস্থার পরিবর্তনে বর্তমানে হুকুম পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ, যদি মহিলাদের থেকে বেশি অস্থিরতা অথবা বেপর্দেগী, পুরুষের সাথে মেলামেশা অথবা বিদআতে লিপ্ত বা অন্য কোন ফিতনার আশঙ্কা হয়, তবে নিষেধই প্রাধান্য পাবে। (العرف الشدى ج ١ ص ٢٠٢)

তিনি আরো বলেন, যেহেতু ফিতনার যুগে আউলিয়াদের মাযারে গিয়ে মানুষ বহু গর্হিত, বিদআতী এবং প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথামূলক এমন এমন শিরকী কাজ করে যা কুফরীর সমপর্যায়। তাই তাদের কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা জায়েয নয়।

(فتاوى رشيدية ج ٣ ص ٣٣)

বিবাহ অধ্যায় : كِتَابُ النِّكَاحِ

بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى النِّكَاحِ ص ২৭৭

বিবাহে উৎসাহ প্রদান

... عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَتْنِي إِذَا لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَى يَا عَلْقَمَةُ فِجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا تَزُوجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ - (بخاري ج ২ ص ৭০৮ باب قول النبي صلعم من استطاع منكم الخ، مسلم ج ১ ص ৪৪৮-৪৪৯ باب استحباب النكاح لمن الخ، نسائي ج ২ ص ৬৮ الحث على النكاح)

অনুবাদঃ ... আলকামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে মিনাতে গমনকালে উসমানের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে নির্জন আলাপের জন্য অনুমতি চান। অতঃপর যখন আব্দুল্লাহ দেখতে পান যে, তাঁর (বিবাহের) কোন প্রয়োজন নাই, তিনি আমাকে বলেন, হে আলকামা! আমার নিকট এসো! আমি তার নিকট এলে উসমান তাকে বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কুমারী নারীর সাথে বিবাহ দেব না? যাতে তুমি তোমার শারীরিক শক্তি-সামর্থ ও বলবীর্য ফিরে পাও? আব্দুল্লাহ বলেন, আমি তা এজন্য বলছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে সম্বরণকারী এবং লজ্জাস্থাকে সংরক্ষণকারী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহে অসমর্থ, সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার জন্য কামম্পূহা দমনকারী।

বিশ্লেষণঃ نِكَاح-এর আভিধানিক অর্থঃ نَكَح শব্দটি مূল ধাতু হতে নির্গত, ইহা বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ/ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

১. المِلَن - মিলন

২. الْجَمْعُ - একত্রীকরণ

৩. الْوُطَى - সহবাস করা। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ-

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে (সহবাস) করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)

৪. اَلْعَقْدُ - বন্ধন। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وُثْلِكَ وَرَبِّعَ

অর্থাৎ, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। (নিসাঃ ৩)

৫. اَلرُّشْدُ - ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান। যেমন, আল্লাহর বাণী-

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ-

অর্থাৎ, আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা ভাল-মন্দ বুঝতে পারে। (নিসাঃ ৬)

মতপার্থক্যঃ ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (রহ.)-এর মাঝে নিকাহ শব্দটির حَقِيقِي (প্রকৃত) ও مَجَازِي (রূপক) অর্থ নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, نِكَاح-এর حَقِيقِي অর্থ হল عَقْد বা বন্ধন, আর مَجَازِي অর্থ হল وَطَى বা সহবাস।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, نِكَاح-এর حَقِيقِي অর্থ হল وَطَى বা সহবাস এবং مَجَازِي অর্থ হল عَقْد বা বন্ধন।

* আবার, কেউ কেউ نِكَاح শব্দটিকে যৌথ (مُشْتَرِك) অর্থবোধক বলেছেন।

(تاج العروس بتحقيق عبد السلام محمد هارون ج ٧ ص ١٩٥، البحر الرائق ج ٢ ص ٧٦، بطل المجهود ج ١٠ ص ٣-٤)

ح-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১. শরহে বেকায়া প্রণেতার ভাষায়- اَللِّكَا حُ عَقْدٌ مَوْضُوعٌ لِّلْمَلِكِ الْمُتَمَعَةِ-

অর্থাৎ, যৌনাঙ্গ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের মাঝে সংঘটিত বন্ধনকে বিবাহ বলা হয়।

২. النِّكَاحُ هُوَ عَقْدُ التَّزْوِيجِ - গ্রন্থকার বলেন-

অর্থাৎ, নিকাহ হল বিবাহ বন্ধন।

৩. هُوَ عَقْدٌ وَضَعَ لِمَلَكَ الْمُتَمَتَّةِ بِالْأَنْثَى قَصْدًا - গ্রন্থকার বলেন-

অর্থাৎ, বিবাহ হল এমন একটি বন্ধন, যা স্বেচ্ছায় মহিলার উপভোগের মালিক হওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে।

৪. আল্লামা শাওকানী বলেন-

অর্থাৎ, বিবাহ হল স্বামী-স্ত্রীর এমন এক বন্ধন, যার দ্বারা সহবাস বৈধ হয়।

৫. কতিপয় উলামা বলেন-

هُوَ عَقْدٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَسْتَحِلُّ بِهِ اسْتِمْتَاعُ الْوَاحِدِ مِنَ الْآخَرِ -

অর্থাৎ, বিবাহ হল নারী ও পুরুষের এমন বন্ধন, যার দ্বারা একজন অপরজন থেকে উপভোগ গ্রহণ করা বৈধ হয়।

حُكْمُ النِّكَاحِ: বিবাহের হুকুম নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে-

* আহলে যাওয়াহেরের মতে, বিবাহ ফরযে আইন। যে ব্যক্তি মহর ও ভরণ-পোষণ প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করবে না, সে গুনাহগার হবে।

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী - (النِّسَاءُ آيَةُ ৩) - فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -

দলীল (২): قَالَ اللَّيْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْهَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...

দলীল (৩): عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ... قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ

فَأَنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ - (ابو داود ج ১ ص ২৮০ باب في تزويج الابكار، نسائي ج ২ ص ৭০ كراهية تجويع

المقيم)

অর্থাৎ, ... মাআকাল ইবন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, “তোমরা বিয়ে করো এমন স্ত্রীলোকদের, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসদ্বয়ে امر (নির্দেশ)-এর صِيغَةً (শব্দরূপ) ব্যবহৃত হয়েছে। আর উসূলের কায়দা হচ্ছে- الْأَمْرُ لِلرُّجُوبِ-অর্থাৎ, امر :ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং বিবাহ করা নামায-রোযার ন্যায় ফরযে আইন।

(تنظيم الاشتات ২ج ص ১৬৬)

* ইমাম শাফেই (রহ.)-এর মতে, عِنْدَ الثُّوْقَانِ তথা আত্মসংযমের ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বিয়ে করার চেয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া উত্তম। তাঁর মতে, বিবাহ কোন ইবাদতের কাজ নয়; বরং ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় বিবাহ একটি মুবাহ (অনুমোদিত) বিষয়। (فتح الباري ১ج ص ১০৬)

এমতাবস্থায়- (المعني ১ج ص ৬৬৭) الثَّخْلِي بِالْعِبَادَاتِ أَفْضَلُ مِنَ الْكَيْحِ

অর্থাৎ বিবাহের চেয়ে নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকা উত্তম।

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী - وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ - অর্থাৎ, এদেরকে (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে। (নিসাঃ ২৪)

উক্ত আয়াতে বিবাহ হালাল হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে। আর হালাল এবং মুবাহ সম পর্যায়ে শব্দ।

সুতরাং ইহা ক্রয়-বিক্রয়ের মত একটি হালাল বিষয়। বলাবাহুল্য, ক্রয়-বিক্রয়ের চেয়ে নির্জনে নফল ইবাদত করা উত্তম।

দলীল (২): আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন-

-وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ-

যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। (ইমরানঃ ৩৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিয়ে না করার কারণে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন।

* বাদায়ে গ্রন্থকার বলেন, জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, যদি যৌন ক্ষুধার তীব্রতার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং স্ত্রীর মোহর ও ভরণ-পোষণ দানের ক্ষমতা থাকে, তবে বিবাহ করা ওয়াজিব। অন্যথায় সে গুনাহগার হবে। (بدائع الصنائع ২ج ص ২২৮)

* আল্লামা ইমাম কারখী-এর মতে বিবাহ করা মুস্তাহাব।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ব্যক্তির অবস্থানুসারে বিয়ের হুকুম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

(ক) যদি যৌন উত্তেজনা খুব বেশি হয় যে, বিয়ে না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা আছে এবং মহর ও ভরণ-পোষণ প্রদানে ক্ষমতাবান হয়, তাহলে বিয়ে করা ফরয। কেননা, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন- **مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ**

(অনুচ্ছেদের শুরুতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

তবে এ অবস্থায় অর্থ-সামর্থ্য না থাকলে রোযা রাখবে। যেমন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন- **... فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

(খ) যৌন পিপাসা তীব্রতর হলে এবং সংযম ক্ষমতা ক্ষীণ হলে বিবাহ করা ওয়াজিব।

(গ) যৌন ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা হারাম।

(ঘ) স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকলে এবং বিবাহের পর স্ত্রীর মহর, ভরণ-পোষণ এবং সহবাস করতে সক্ষম হলে ও স্ত্রীর উপর যুলুম-নির্যাতনের আশঙ্কা না থাকলে বিয়ে করা সুন্নত এবং নফল ইবাদতের জন্য নির্জনতার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম ও সওয়াবের কাজ।

(فتح الباري ج ٩ ص ١٠٤، عمدة القاري ج ٢٠ ص ٦٦، فتح القدير ج ٣ ص ١٠١، بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٢٨)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

অর্থাৎ, আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। (রাদঃ ৩৮)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অধিকাংশ নবী-রাসূল বিবাহের উপর আমল করেছেন। যদি বিবাহ না করাই উত্তম হত, তাহলে তারা বিবাহ করতেন না।

দলীল (২): সবচেয়ে বড় দলীল হল, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) নিজেও বিবাহ করেছেন এবং অন্যকেও বিবাহ করার জন্য ব্যাপক উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং বিয়ে যদি উত্তম না হত তাহলে তিনি আজীবন বিয়ে না করে নির্জনে ইবাদত করেই কাটিয়ে দিতেন।

দলীল (৩): হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِّن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالْتَعَطُّ

وَالسَّوَاكُ وَالتَّكَاحُ - (التلخيص الحبير ج ١ ص ١٦)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস রাসূলগণের সুন্নত বা আদর্শ। লজ্জা, আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক ও বিয়ে।

দলীল (৪): হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِسُنَّتِي (وَفِي رِوَايَةٍ بُخَارِيٍّ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي) فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ الْخ (اللفظ لابن ماجه ص ১৩৫, ابو داود ج ১ ص ২৮০ باب في

تزوج الابكار، بخاري ج ২ ص ৭০৭-৭০৮ الترغيب في النكاح، مسلم ج ১ ص ৫৫৭)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের উপর আমল করবে না, (বুখারীতে আছে, যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে) সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে কর। কারণ, আমি তোমাদের আধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব। যে সামর্থ্যবান হয়, সে যেন বিয়ে করে।

দলীল (৫): হযরত বিন আক্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ - (ابو داود ج ১ ص ২৫২ كتاب المناسك باب لا ضرورة في الاسلام)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।

এবং পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত আছে- وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি। (হাদীদঃ ২৭)

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাবঃ ১. আহলে যাহিরের দলীলগুলোর জবাবে বলা যায় যে, তারা যে-أَمْر-এর ছীপা দ্বারা অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করেছেন, তা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং সেগুলো যৌবনের চরম উত্তেজনার উপর প্রযোজ্য।

২. ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলদ্বয়ের জবাবে বলা যায় যে, খোদা বিবাহ ব্যাপারটি মুবাহ কাজ। তবে আনুষঙ্গিক কারণে তা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন খোদা ক্রয়-বিক্রয় বিষয়টি একটা মুবাহ কাজ। কিন্তু সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে কখনো কখনো তা ফরয এবং ওয়াজিব হয়ে থাকে।

৩. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বিবাহ না করা, এটি উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ)-এর জন্য দলীল হতে পারে না। কেননা, হতে পারে তাঁর শরীয়তে বিয়ে না করা উত্তম ছিল, কিন্তু আমাদের শরীয়তে الإسلام في رهبانية لا দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

৪. হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ব্যতীত স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) সহ সকল নবী বিবাহ করেছেন। সুতরাং একজন নবী বিয়ে না করা আমাদের জন্য দলীল হতে পারে না।

কোন কোন শব্দ দ্বারা বিয়ে সংঘটিত হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা বিয়ে সংঘটিত হয়-

(ক) نِكَاح যেমন, কুরআনের বাণী- فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

(খ) زَوْجَتَهُمْ بِخَوْرِ عَيْنٍ- কুরআনের বাণী- تَزْوِجَ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।

(তূরঃ ২০)

প্রণিধানযোগ্য যে, তাঁর মতে, هَبْ (প্রদান) শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। তিনি

বলেন, هَبْ শব্দ দ্বারা বিবাহ হওয়া একমাত্র রাসূলের (সাঃ) জন্য নির্দিষ্ট। যেমন,

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ-

অর্থাৎ, ইহা আপনার জন্য খাস, (অন্যান্য) মুমিনদের জন্য নয়। (আহযাবঃ ৫০)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ বিষয়ে একটি মূলনীতি পেশ করেছেন। তা হচ্ছে-

يَصِحُّ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِجٍ وَمَا وُضِعَ لِتَمْلِكِ الْعَيْنِ حَالًا-

অর্থাৎ, বিবাহ সহীহ হবে نِكَاح ও تَزْوِج শব্দ এবং এমন প্রতিটি শব্দ দ্বারা যার দ্বারা তাৎক্ষণিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, নিম্নোক্ত শব্দাবলী দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে। যেমন-

(ক) نِكَاح (খ) تَزْوِج (গ) هَبْ (ঘ) يَبِّع

(ঙ) تَمْلِكُ (চ) شَرَاءُ (ছ) صَدَقَةٌ (জ) الْعَطِيَّةُ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, هَبْ শব্দটি যেহেতু তাৎক্ষণিক মালিকানার অর্থ

দেয়, সেহেতু উহা দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন- وَأَمْرًا

مُؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

অর্থাৎ, কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল হবে। (আহযাবঃ ৫০)

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহ.) যে দলীল পেশ করেছেন, তার জবাবে আহনাফগণ বলেন যে, ইহার দ্বারা মহর ওয়াজিব না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মহর ব্যতীত বিবাহ করা রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাস। এটাই হচ্ছে-

أَمْهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ -এর মর্মার্থ। অথবা, উক্ত আয়াতটি خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ বুঝানোর জন্য নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ, হে নবী, আপনার বিবিগণ আপনার জন্য হালাল। অন্য কারো পক্ষে এদেরকে বিবাহ করা হালাল হবে না।

বিবাহের রুকনসমূহঃ

وَكُنْ (রুকন) বলা তথা مَا يَقُومُ بِهِ الشَّيْءُ তখন যে উপকরণ দ্বারা বস্তু অস্তিত্বে আসে তাকে বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে বিবাহের রুকন দুটি।

১. الْإِجَابُ বা প্রস্তাব। বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক নারী-পুরুষের মাঝে যার উক্তি আগে হয় তাকেই ইজাব বা প্রস্তাব বলা হয়।

২. الْقَبُولُ - গ্রহণ বা মেনে নেয়া। যার সম্মতিমূলক উক্তি পরে হয়, তার সম্মতিকেই কবুল বলা হয়।

তথা التَّمَوُّدُ التِّيْ هِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الشَّيْءِ الْمُؤَقَّوفِ عَلَيْهَا বিবাহের শর্তসমূহঃ নির্ভরশীল উপাদানসমূহকে শর্ত বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে বিবাহের শর্ত দুটি।

১. الشَّرْطُ الْعَامُّ (সাধারণ শর্ত)ঃ পাত্র-পাত্রী এমন হওয়া, যাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন বাধা না থাকে। যেমন, যাদেরকে বিয়ে করা হারাম (মাহরাম) এমন না হওয়া, জীব বর্তমানে তার সহোদরা বোন না হওয়া, কাফির না হওয়া ইত্যাদি। কেননা এদেরকে বিবাহ করা হারাম। এগুলো হল সাধারণ শর্ত।

২. الشَّرْطُ الْخَاصُّ (বিশেষ শর্ত)ঃ দু'জন স্বাধীন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী উপস্থিত থাকা (ইমাম আবু হানিফার মতানুযায়ী) যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

অর্থাৎ, দু'জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। (বাকারাঃ ২৮২)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন যে, এক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

* ইমাম মালিক (রহ.) বলেন যে, বিয়ের সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নেই। বিয়ের সংবাদ প্রচার করে দিলেই হবে। তিনি দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ

وَأَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ - (ترمذي ج ١ ص ٢٠٧ باب اعلان النكاح،

ابن ماجه)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, তোমরা বিবাহের ঘোষণা দিবে এবং তা মসজিদে সম্পন্ন করবে। আর এ উপলক্ষে দফ* বাজাবে।

বিবাহ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যঃ

ইমাম শাফেঈ (রহ.) সহ অনেকেই বলে থাকেন যে, বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের মতই একটি মুবাহ বিষয়। কারণ উভয়টি **إِيجَاب** (প্রস্তাব) ও **قَبُول** (কবুল) শব্দদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

কিন্তু বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি কবুল ও ইজাব শব্দদ্বয় দ্বারা সম্পাদিত হলেও উভয়ের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে-

১. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ইজাব ও কবুলের উভয় শব্দ অতীতকালীন হওয়া আবশ্যিক। যেমন, **بَعْتُ وَاشْتَرَيْتُ** অর্থাৎ একজন বলবে আমি বিক্রি করেছি এবং অপরজন বলবে আমি ক্রয় করেছি। কিন্তু বিবাহের মধ্যে একটি অতীতকাল (**فعل ماضي**) এবং অপরটি নির্দেশ (**أمر**)-এর শব্দ হলেও চলবে। যেমন- **زَوَّجْنِي** এবং **زَوَّجْتُ** অর্থাৎ একজন প্রস্তাব করবে আমাকে বিয়ে কর এবং অপরজন বলবে, আমি বিয়ে করলাম।

২. বিয়ের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবক ও গ্রহণকারী উভয়টি হতে পারে। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পারবে না।

৩. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সব ধরনের কার্যক্রম প্রয়োগ করা জায়েয। কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে শরঈ কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম প্রয়োগ করা জায়েয নয়।

৪. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে প্রত্যাভর্তন করে, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে যায় না।

৫. বিবাহের মধ্যে অভিভাবকের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অলীর ভূমিকার কোন গুরুত্ব নেই।

৬. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে **مِلْكٌ عَيْنٍ** তথা বস্তুটির উপর একচ্ছত্র মালিকানা অর্জিত হয়, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে শুধু **مِلْكٌ اسْتِغْنَاءٍ** তথা সম্ভোগের মালিকানা অর্জিত হয়।

৭. বিবাহের মধ্যে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী লাগবে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সাক্ষী শর্ত নয়।

* একপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র। আমাদের দেশে প্রচলিত তবলার ন্যায়।

৮. বিবাহের মধ্যে **كُفُو** (সমতা)-এর গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।
৯. সব লোকের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, কিন্তু বিবাহ তার বিপরীত। কারণ, সব নারীর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায় না।
১০. অমুসলিমের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। কিন্তু মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে বিবাহ জায়েয নয়।
১১. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে খুতবা পড়তে হয় না, কিন্তু বিবাহের মধ্যে খুতবা পড়তে হয়।
১২. ক্রয়-বিক্রয়ে কয়েক ধরনের **خِيَار** (পছন্দের স্বাধীনতা) থাকে। তবে বিবাহের মধ্যে কোন **خِيَار** নেই।

২৮১ : بَابُ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ ص

... عَنْ عَاشِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرِّضَاعَةِ فَقَالَ أَنْظِرْنِ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ - (بخاري ج ٢ ص ٧٦٤ باب من قال لا رضاع بعد حولين، مسلم ج ١ ص ٤٧٠ فضل رضاعة الكبير، نسائي ج ٢ ص ٨٢ القدر الذي يحرم من الرضاعة)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর নিকট এমন সময় হাজির হন, যখন তাঁর নিকট একজন পুরুষ লোক উপস্থিত ছিল। রাবী হাফস বলেন, এটা তাঁর নিকট খুবই অপছন্দনীয় মনে হয় এবং তাঁর চেহারা মোবারক (রাগের কারণে) পরিবর্তিত হয়। অতঃপর রাবী (হাফস ও মুহাম্মদ ইবন কাসীর) একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি (আয়িশা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইনি আমার দুধ ভাই। তিনি (সাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের দুধ ভাইদেরকে সুযোগ দিবে। বস্তৃত ক্ষুধা নিবারণের জন্য শিশুর দুধপানে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

رَضَاعَة-এর আভিধানিক অর্থঃ **الرِّضَاعَة** শব্দটি বাবে **ضَرَبَ يَضْرِبُ** অথবা **فَتَحَ يَفْتَحُ**-এর **شَرَبُ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِي** হাঙ্গামে। **رَضِعَ** শব্দ জিন্সে সহীহ। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে **شَرَبُ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِي** অর্থাৎ, নারীর স্তন হতে দুধ পান করা, স্তন্যদান, স্তন্যপানকাল। এভাবে

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বলা হয় رضيع এবং দুধ দানকারিণীকে বলা হয় مُرْضِعٌ বা مُرْضِعَةٌ, শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআনেও পাওয়া যায়-

”أُولَٰئِكَ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ-

অর্থাৎ, আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। (বাকারাঃ ২৩৩)

رَضَاعَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। শরীয়তের পরিভাষায় الرضاعة বলা হয়-

هُوَ مَصٌّ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ-

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট এক সময়কালে নারীর স্তন থেকে দুগ্ধ চুষে পান করাকে বলা হয়।

২। কেউ কেউ বলেন-

إِسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنٍ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ طِفْلٍ أَوْ رَضَاعَةٍ-

অর্থাৎ, রাজাআত হল শিশুর স্তন্যপানের সময়কালে কোন মহিলার দুধপান করার নাম।

* সকল ইমাম একথার উপর একমত পোষণ করেন যে, বংশের কারণে যা হারাম, তা (ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে) দুগ্ধ পানের কারণেও হারাম হয়।

যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (ابو داود ج ১ ص ২৮০ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم

من النسب، بخاري ج ২ ص ৭৬৪ باب وامهاتكم اللاتي الخ، مسلم ج ১ ص ৬৬৬ كتاب الرضاع، ترمذي ج ১

ص ২১৮ باب يحرم من الرضاع الخ، نسائي ج ২ ص ৮১ ما يحرم من الرضاع، ابن ماجه ص ১৫০)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধপানের কারণেও হারাম হয়।

প্রশ্ন হল, কোন নারী যদি বয়স্ক কোন পুরুষকে দুধ পান করায়, তবে حُرْمَتِ رَضَاعَتِ (দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হবে কিনা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

* হযরত আলী, আয়িশা (রাঃ), আতা ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে حُرْمَتِ رَضَاعَتِ সাব্যস্ত হবে। আল্লামা ইবন হুযম (রহ.)ও উক্ত মত পোষণ করে

বলেন, রাজাআতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। বয়স্ক হোক অথবা বাচ্চা থাকুক, সর্বাবস্থায় হুরমাত সাব্যস্ত হবে। (المحلّى ج ১০ ص ১৭-১৯)

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ ... كَانَ تَبْنَى سَالِمًا ... فَحَاءَتْ سَهْلَةً بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُدَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِيَ وَمَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيُرَانِي فَضَلًّا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ الخ (ابو داود ج ১ ص ২৮১ باب من حرم

৪৫, মুসলিম জ ১ ص ৬৭৯ فصل رضاعة الكبير، نسائي ج ২ ص ৮২-৮৩ باب رضاع الكبير)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) ও উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। আবু হুয়ায়ফা ... সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে লালন-পালন করেন। ... অতঃপর সাহলা বিনত সুহায়েল ইবন উমর আল-কুরায়েশী, পরে আল-আমিরী যিনি আবু হুয়ায়ফার স্ত্রী ছিলেন, আগমন করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সালেমকে পুত্র হিসেবে গণ্য করি। আর সে আমার সাথে এবং আবু হুয়ায়ফার সাথে আমাদের ঘরে (আমাদের সন্তান হিসাবে) লালিত-পালিত হয়েছে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আর আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে যা নাযিল করেছেন, তা আপনি বিশেষভাবে অবগত। এখন তার সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দেন? নবী করীম (সাঃ) তাকে বলেন, তাকে পাঁচবার তোমার দুধপান করাও তাতে তুমি তার দুধ-মাতা হিসেবে পরিগণিত হবে। অতঃপর তিনি তাকে পাঁচবার দুধ পান করান এবং তিনি তার দুধমা হিসেবে গণ্য হন।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত সাহলা সালেমকে যখন দুধ পান করিয়েছেন, তখন তিনি বালেগ এবং বয়স্ক ছিলেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) সহ জমহুর ফকীহদের অভিমত হল- বয়স্ক পুরুষকে দুধপান করানো হলে حُرِّمَتْ رَضَاعَتُ সাব্যস্ত হবে না। হুরমাত শুধুমাত্র ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে, বয়স্কদের দুধপান করানো হারাম। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৮)

দলীল (১): পবিত্র কুরআনের বাণী-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَةَ - (বقره ২৩৩)

দলীল (২): পবিত্র কুরআনের বাণী- **حَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** অর্থাৎ, তাকে (সন্তানকে) গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে সময় হল ত্রিশ মাস। (আহকাফঃ ১৫)
উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, **رَضَاعَتِ** শিশুকালেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে হাদীসে বর্ণিত আছে-

দলীল (ক): **عَنْ عَائِشَةَ .. قَالَتْ ... الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ**

(অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশ)

দলীল (খ): **... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمُ وَأَنْبَتَ**

اللَّحْمَ الْخ (ابو داود ج ১ ص ২৮১ باب في رضاعة الكبير)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুধপান করানোর অর্থই হল (পানকারীর) অস্থি মজবুত করানো এবং গোশত বৃদ্ধি করা।

দলীল (গ): হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন- **لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ** - (দার কুতী জ ৪ ص ১৭৫)

অর্থাৎ, শুধুমাত্র দু'বছরের মধ্যেই রাজ্যাত ধর্তব্য হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ (১) তাঁরা যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এর জবাবে ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, এই ঘটনাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ছিল, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। (২) অথবা, এটি আবু হুয়ায়ফা (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং সালেমের জন্য একটি খাস ঘটনা। যা তাঁদেরই প্রদত্ত দলীলের শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ... وَأَبَتْ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرُّضَاعَةِ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقَلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَذَرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَائِمٍ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ - (ابو داود ج ১ ص ২৮১ باب في من حرم به)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... কিন্তু উম্মে সালামা (রাঃ) ও নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এ (প্রাপ্ত) বয়সে দুধ পানকারীগণকে নিজেদের নিকট উপস্থিত হতে বাধা দিতেন, বরং তারা ছোটবেলায় দুধপান করাকেই প্রাধান্য দিতেন (বয়স্ক ব্যক্তির নয়)। আর আমরা আয়িশা (রাঃ) সম্পর্কে বলতাম, আল্লাহর শপথ! আমাদের জানা নাই, সম্ভবতঃ এটা (সালেমের ব্যাপারটি) নবী করীম (সাঃ)-এর তরফ হতে বিশেষভাবে অনুমোদিত ছিল, যা অন্যদের জন্য বৈধ নয়।

بَابُ هَلْ يَحْرُمُ مَا دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ ص ২৮১

পাঁচবারের কম দুধপানে হুরমাত (হারাম) প্রতিষ্ঠিত হবে কি?

عَنْ عَائِشَةَ أَكْهَا قَالَتْ كَانَ حِينَئِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسَخِنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ فَتَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ - (মসল জ ১ ৪৬৭: ফল লা তহরম মসে লা, তরম্ভি জ ১ ২১৮: বাব লা তহরম মসে লা

المصتان, নসানি জ ২ ৮১: القدر الذي يحرم من الرضاعة, ابن ماجه ص ১৪১)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে দশবার দুধ পান করা হলে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাঁচবার দুধপান করানো হুরমাতের জন্য নির্ধারিত হয় এবং পূর্বোক্ত নির্দেশে মানসূখ (রহিত) হয়। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) ইনতিকাল করেন এবং এর কিরআত (পঠন) অবশিষ্ট থাকে।

বিশ্লেষণঃ কি পরিমাণ দুধ পান করলে رَضَعَات সাব্যস্ত হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* দাউদ যাহেরী, আবু সাওর, আবু উবায়দ, ইসহাক, ইবন মুনযির (রহ.)-এর মতে, কমপক্ষে তিন চোষণ দুধপান করলে حُرِّمَتْ رَضَعَات সাব্যস্ত হবে। এক রেওয়ায়েত

অনুযায়ী ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অভিমতও অনুরূপ। (عمدة القاري ج ২ ২০ ৭৬)

... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (১) :

وَسَلَّمَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ - (ابو داود ج ১ ২৮২, মসল জ ১ ৪৬৮, তরম্ভি জ ১

২১৮: لا تحرم المصة ولا مصتان, نسائي ج ১ ৮১, ابن ماجه ص ১৪১)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, একবার বা দু'বার দুধ চোষার কারণে হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয় না।

দলীল (২)ঃ হযরত উস্মে ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন-

وَلَا تُحْرَمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ (মসল জ ১ ৪৬৭: فضل لا تحرم المصة, نسائي ج ২ ৮১)

অর্থাৎ, ... একবার অথবা দু'বার স্তন শিশুর মুখে প্রবিষ্ট করানো হারাম নয়।

দলীল (৩)ঃ উস্মে ফযল (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে যে-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرِمُ الرُّضْعَةَ وَالرُّضْعَتَانِ - (মসলম জ ১)
 (৬৬৭, ১৬১ মাজা)

অর্থাৎ, ... এক-দু'বার স্তন চোষা হারাম নয়। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেহেতু এক-দু'বার দুধ চোষার দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এর বিপরীত অর্থ হল, তিনবার চুষলে হারাম সাব্যস্ত হবে।

* ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি চুষলে حُرِّمَتْ رَضَاعَتُ সাব্যস্ত হবে। আর এই পাঁচবারও বিভিন্ন সময়ে হতে হবে।

তন্মধ্য থেকে প্রতিবার তৃপ্তিদায়ক পান জরুরী। (فتح القدير ج ৩ ص ৩০৫)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস। উক্ত হাদীসে যেহেতু বর্ণিত হয়েছে যে, পাঁচবার দুধপান করানোর দ্বারা দশবার দুধপান করানোর নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পাঁচবারের কম চোষণের দ্বারা حُرِّمَتْ رَضَاعَتُ সাব্যস্ত হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সাহেবাইন (আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ), সুফিয়ান সাওরী, আওয়াঈ, আতা, হাসান বসরী এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতসহ হযরত আলী, ইবন মাসউদ, ইবন উমর, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, দুগ্ধপানের যেকোন পরিমাণই হারাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট, কম হোক অথবা বেশি। (عمدة القاري ج ২০ ص ৯৬, تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৭)

দলীল (১)ঃ যে সমস্ত নারীদের বিয়ে করা হারাম, এর তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন- وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ - অর্থাৎ, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে। (নিসাঃ ২৩)

উক্ত আয়াতে শতহীনভাবে رَضَاعَت (দুগ্ধপান)-কে হারাম হওয়ার কারণে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কম-বেশির কোন পার্থক্য করা হয়নি। (احكام القرآن للجصاص ج ২ ص ১২৬-১২৭)

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ / مِنَ اللَّسْبِ - (ابو داود ج ১ ص ২৮০ باب يحرم

من الرضاعة الخ، بخاري ج ২ ص ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০)

من الرضاعة الخ، نسائي ج ২ ص ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধপানের কারণেও হারাম হয়। উক্ত হাদীসেও শর্তহীনভাবে দুগ্ধপানের কথা বলা হয়েছে। কম বা বেশি এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (৩): অন্য একটি মারফু হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ - (جامع المسانيد للخوارزمي ج ٢ ص ٩٧، عقود الجواهر المنفية ج ١ ص ١٥٩، نسائي ج ٢ ص ٨٢)

৮২। لقدّر الذي يحرم من الرضاعة

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুগ্ধপানের কারণেও হারাম হয়। দুধের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক।

দলীল (৪): হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

مَا كَانَ مِنَ الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ تَحْرُمُ - (موطأ امام محمد ص ২৭৬، مصنف عبد الرزاق ج ৭ ص ৬৬৬)

অর্থাৎ, দু'বছরের মধ্যে যদি একবারও দুধ চুষে তা হারাম সাব্যস্ত হবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুধ কম পান করুক বা বেশি পান করুক সর্বাবস্থায় حُرِّمَتْ رَضَاعَتُ সাব্যস্ত হবে।

যুক্তির নিরীখেও একথা প্রমাণিত হয় যে, দুধপান করানোর অর্থই হল অস্থি মজবুত করানো। আর তা তিনবার অথবা পাঁচবারে যেমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা একবার পানের দ্বারাও সম্ভব।

আহনাফদের পক্ষ থেকে জবাবঃ

(১) আহলে যাহিরের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবে আহনাফরা বলেন যে, এই ধরনের হাদীসসমূহ কুরআনের আয়াত এবং ইবন আব্বাসের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর সামনে একদা কেউ لا تحرم

"الرضعتان" হাদীসটি উল্লেখ করলে, তিনি (রাঃ) বলেন-

قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَالرُّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تَحْرُمُ - (احكام القرآن للجصاص ج ২ ص ১২৫)

অর্থাৎ, "ইহা পূর্বে ছিল। এখন একবার দুধ চুষলেও হারাম সাব্যস্ত হবে।"

(২) অথবা, বলা যায় যে, তিন বা পাঁচ বার বলার উদ্দেশ্য হল পেটের মধ্যে দুধ প্রবেশ করা। এক-দু'বার চোষার দ্বারা যেহেতু সাধারণত পেটে দুধ প্রবেশ করার সম্ভাবনা কম, তাই তিনি তিন বা পাঁচবারের কথা উল্লেখ করেছেন। নতুবা একবার

চোষার দ্বারাও যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, পেটে দুধ প্রবেশ করেছে, তাহলে এর দ্বারাও হুরমাতে রাজাআত সাব্যস্ত হবে। (১৭৮৩ ج ৩ ص ১৭)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত- **وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ** অর্থাৎ, “এবং এর কিরআত অবশিষ্ট থাকে” যে অংশটি বর্ণিত হয়েছে, তা মূলত ঐ সকল লোকদের কিরআত, যাদের নিকট ইহার রহিত হওয়ার খবর পৌঁছেনি। কেননা ইহা নবী করীম (সাঃ)-এর ইনতিকালের অল্প কয়দিন পূর্বে রহিত হয়েছিল। অতঃপর এ ব্যাপারে তাঁরা (যখন) অবগত হলেন, তখন তারা তা মেনে নেন। অন্যথায় স্পষ্ট বিষয় হল যে, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য যদি এই হত যে, এসব শব্দ মানসুখ হয়নি, বরং রয়ে গেছে, তাহলে এগুলোকে মাসহাফে (কুরআনের কপিতে) অন্তর্ভুক্ত করানোর চেষ্টা করবেন না- এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? (شرح نووي ج ১ ص ১৬৮, انوار ج ২ ص ৭)

* হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- **“الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا لِأَمْرِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ بِمُقَابِلَةِ الْقُرْآنِ”** অর্থাৎ, এ ব্যাপারে যত হাদীস রয়েছে (সবই খবরে ওয়াহেদ), সেগুলো কুরআনের মুকাবিলায় দলীল হতে পারে না। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৭)

* আহনাফরা শাফেঈদের উপর উল্টা অভিযোগ করে বলেন যে, পাঁচবার চোষণের আয়াত পবিত্র কুরআনে কোথায় রয়েছে? তা আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। কেননা উসমানী মাসহাফে **خمس رضعات** তথা “পাঁচবার চোষণ”-এর কথা কোথাও উল্লেখ নেই। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই শব্দগুলোও পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে, যা নববী যুগের একদম শেষের দিকে রহিত হওয়ার কারণে স্বয়ং আয়িশা (রাঃ) ও এ সম্পর্কে জানতে পারেননি। আর এটা কোন অযৌক্তিক বিষয় নয়।

(درس ترمذي ج ৩ ص ১১১)

দুধপানের সময়সীমাঃ শিশুকে দুধ পান করানোর সময়সীমা কতটুকু, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-সহ জমহুরের মতে, শিশুকে দুধপানের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দু'বছর।

(تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৮, فتح القدير ج ৩ ص ৩০৭)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ-

অর্থাৎ, আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। (বাকারাঃ ২৩৩)

দলীল (২)ঃ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ- (২)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, শুধুমাত্র দু'বছরের মধ্যেই রাজাআত ধর্তব্য হবে। (দার قطني ج ৬: ১৭৬)

সুতরাং কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুগ্ধপানের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দু'বছর।

* ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতে, দুগ্ধপানের সময়সীমা তিন বছর। (فتح القدير ج ৩: ৩০৭)

* দাউদ যাহেরীর মতে, দুগ্ধপান করানোর নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই।

দলীলঃ “হুযায়ফার (রাঃ) পালিত পুত্র সালেমকে পরিণত বয়সেও দুগ্ধপান করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, এখানে কোন সময়সীমা নেই।” (পুরো হাদীসটি পূর্বে অর্থসহ বর্ণিত হয়েছে।)

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি মত পাওয়া যায়, তবে প্রসিদ্ধ মত হল দু'বছর দু'মাস। (فتح القدير ج ৩: ৩০৭, فتح الهاري ج ১: ১৬৭)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দুগ্ধপান করানোর নিম্নতম সময় সীমা হচ্ছে দু'বছর তথা ২৪ মাস। আর উর্ধ্বতম সময়সীমা হচ্ছে আড়াই বছর তথা ৩০ মাস।

(فتح القدير ج ৩: ৩০৭, فتح الهاري ج ১: ১৬৭, تنظيم الاشتات ج ২: ১৭৮)

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ فَلَاكُونَ شَهْرًا

অর্থাৎ, আর তার গর্ভধারণ ও তার স্তন্য ছাড়ার সময় হল ত্রিশ মাস। (আহকাফঃ ১৫)
আয়াতটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে একথা বুঝা যায় যে, গর্ভধারণ ও দুগ্ধপান প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে ত্রিশ মাস সময় প্রয়োজন। মূলত আয়াতটির উদ্দেশ্য তা নয়। বরং উক্ত আয়াতে فَلَاكُونَ شَهْرًا-এর সাথে حَمْلُهُ (সন্তান গর্ভধারণ) সংযুক্ত নয়। আর فَصَالُهُ (মায়ের দুধ ছাড়ানো) বাক্যটি স্বতন্ত্র একটি বাক্য। কেননা, حَمْل-এর নিম্নতম সময় হল ছয়মাস এবং এর উর্ধ্বতম সময় হল দু'বছর। যেমন, হাদীসে عَنْ عَائِشَةَ لَا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَتَتَيْنِ قَدَرٍ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ- এসেছে।

(দার قطني ج ৩: ৩২২, سنن كبرى يبهني ج ৭: ৪৪৩, فتح القدير ج ৩: ৩০৮)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, গর্ভধারণকাল দু'বছরের বেশি হয় না, যদিও চরকার ছায়া পরিবর্তিত হওয়ার পরিমাণ সময়ও হোক না কেন।

সুতরাং رَضَاعَت-এর সময়কাল আড়াই বছর রয়ে গেল। নতুবা আয়াতে প্রত্যেকটির জন্য যদি ত্রিশ মাস ধরে নেয়া হয়, তাহলে এর মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কারণ উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল, একটি সন্তান গর্ভে ত্রিশ মাস থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, গর্ভধারণ এবং দুগ্ধ পান উভয়টির সময় যদি একত্রে ত্রিশ মাস ধরা হয়, তাহলেও মুশকিল। কেননা একটি সন্তান যদি দুই বছর (২৪ মাস) গর্বে থাকে, তাহলে ত্রিশ মাস পূরা করতে হলে তাকে মাত্র ছয় মাস (২৪+৬=৩০ মাস) দুগ্ধ পান করানো যাবে। যা কেউই স্বীকার করেন না।

সুতরাং এর সঠিক জবাব দিতে গিয়ে আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে حَمَلَ (গর্ভধারণ) দ্বারা الْهَبْنِ তথা পেটে গর্ভধারণ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল حَمَلَ فِي الْيَدِ তথা জন্মের পর মাতৃকোড়ে লালন-পালন বুঝানো উদ্দেশ্য। অতএব, উক্ত আয়াত দ্বারা শুধুমাত্র রাজাআতের সময় উল্লেখ করা হয়েছে। (تفسير مدارك ج ৫ ص ২৫، فيض الباري ج ১ ص ২৭৮)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম শাফেঈ ও সাহেবাইন সহ প্রমুখের দলীলের উত্তরে আহনাফগণ বলেন-

১। আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এখানে مَسْنَةَ اسْتِجَار (আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়) বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা, আয়াতে الْوَالِدَاتُ (সন্তানসমূহ) দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে-

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ অর্থাৎ, আর সন্তানদের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত (তালাকপ্রাপ্তা) নারীর খোরপোষের দায়িত্ব বহন করা। তাই বলা যায়-

فَالْحَوْلَيْنِ مَدَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ لَا مَدَّةَ الرِّضَاعَةِ - (تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৮)

“দু’বছর হলো দুধপান করানোর পারিশ্রমিকের অধিকারের সময়, দুধপান করানোর সময় নয়,” সুতরাং ঐ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বীয় সন্তানকে দুগ্ধপান করায়, তাহলে সে দু’বছরের পারিশ্রমিক পাবে, এর বেশি নয়।

আহনাফগণ আরো বলেন যে, শাফেঈদের আয়াতে حَوْلَيْنِ (দু’বছর) উল্লেখের দ্বারা ইহা অপরিহার্য নয় যে, দু’বছর পর দুধপান করানো যাবে না। কেননা, আয়াতের পরবর্তী অংশে দেখা যায়-

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا-

অর্থাৎ, ... আর যদি মাতা-পিতা ইচ্ছা করে যে, তাহলে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই।

উক্ত আয়াতে فَإِنْ-এ হরফটি تَغْنِيبُ বা পরে আসার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ দু'বছরের পরে যদি ইচ্ছা করে, তাহলে পরামর্শক্রমে আরো সময় বাড়াতে পারে (তবে ছয় মাসের উর্ধ্বে নয়)। সুতরাং বুঝা গেল, আয়াতটি মূলত দুধপানের মেয়াদের সীমা নির্ধারণের জন্য আসেনি। (فتح المدهم ج ১ ص ৫৩-৫৪)

হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ উত্তর প্রযোজ্য। অর্থাৎ দু'বছর রাজাআতের ক্ষেত্রে তালুকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পারিশ্রমিক দেয়া হবে। অথবা বলা যায় যে, হাদীসে দুধপানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সময়সীমার কথা উল্লেখ রয়েছে, সর্বাধিক সময়সীমার কথা নয়।

দাউদ যাহেরীর প্রদত্ত দলীলের উত্তরে বলা যায় যে, এ ব্যতিক্রমধর্মী নির্দেশটি শুধু সালেম (রাঃ)-এর জন্য খাস ছিল। এটা ব্যাপক নির্দেশ ছিল না। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (الانوار ج ২ ص ৮, تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৮)

২৮৩ : بَابُ فِي نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

... عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَكَّرْنَا مَتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَيْبَعَةُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ - (مسلم ج ১ ص ৫২ : باب نكاح المتعة، ابن ماجه ص ১৪২)

অনুবাদঃ ... যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইবন আব্দুল আযীযের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময় আমরা মুতআ বিবাহ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করতে থাকাকালে রাবীআ ইবন সাবুরা নামক জৈনক ব্যক্তি বলেন, আমি যখন আমার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় এরূপ (মুতআ বিবাহ) করতে নিষেধ করেন।

বিশ্লেষণঃ-এর আভিধানিক অর্থঃ الْمُتَعَةُ শব্দটি الْمُتَاع থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হল (১) অর্থাৎ, যার দ্বারা উপভোগ করা যায়।

(২) هُوَ مَا يَسْتَمْتَعُ بِهِ - যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।

(৩) স্বাদগ্রহণ

(৪) সম্ভোগ

(৫) বিনোদ, প্রমোদ ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনেও শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়-

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ-

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন প্রতারণার ভোগ্য-সামগ্রী বৈ কিছু নয়। (হাদীদঃ ২০)

مُتْعَةٍ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১. হিদায়া গ্রন্থকার বলেন-

الْمُتْعَةُ هِيَ أَنْ يَقُولَ لِمَرْأَةٍ ائْتَمَّعُ بِكَ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ - (هداية ج ২ ص ৩১২)

অর্থাৎ, মৃতআ হচ্ছে কোন নারীকে একথা বলা যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে এত সময় ধরে উপভোগ করব। (উল্লেখ্য যে, ঐ মহিলা তা কবুল করতে হবে।)

২. ইবনুল ফারাহের মতে- مَيَّ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ إِلَى أَجَلٍ بِعَوَضٍ مَخْصُوصٍ -

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছুর বিনিময়ে নারীকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিয়ে করা।

৩. আল্লামা দাকীকুল ঈদ বলেন-

نِكَاحُ الْمُتْعَةِ هِيَ تَزْوُجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ - (تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৬)

অর্থাৎ, কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করাকে মৃতআ বলে।

৪. কেউ কেউ বলেন, “যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য বিবাহ করে এরূপ বিবাহকে মৃতআ বা ভোগ বিবাহ বলে।”

৫. কতিপয় আলেম বলেন-

هِيَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى مُدَّةٍ سَوَاءَ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً-

অর্থাৎ, মৃতআ বিবাহ হল, মহিলাকে কিছু সময়ের জন্য বিয়ে করা, উক্ত সময় নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক।

মোটকথা, কোন নারীর সাথে অস্থায়ী ভিত্তিতে যৌন আচরণ করার লক্ষ্যে টাকা বা কোন সম্পদের বিনিময়ে সাময়িকভাবে চুক্তি ও শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ করার নাম হলো মৃতআ বিবাহ। এতে ‘নিকাহ’ শব্দটি উল্লেখ থাকবে না এবং দু’জন সাক্ষীরও প্রয়োজন হয় না।

মুতআর হুকুমঃ মুতআ বিবাহের হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে তা দলীলসহ উপস্থাপন করা হল-

* রাফেযী এবং শিয়াদের মতে, প্রয়োজনে মুতআ বিবাহ জায়েয। তারা বলে, কেউ যদি স্বীয় গৃহে স্ত্রীর নিকট থাকে তার জন্য মুতআ নিষিদ্ধ। তবে সে যদি দীর্ঘদিনের জন্য সফরে থাকে, তাহলে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার জন্য মুতআ বৈধ হবে। (তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে যে, কেউ যদি একবার মুতআ বিবাহ করে, তাহলে সে হযরত হুসাইন রাঃ-এর শাহাদাতের সাওয়াব পাবে এবং যদি দ্বিতীয়বার করে তাহলে হযরত আলী রাঃ-এর শাহাদাতের সওয়াব পাবে। ইত্যাদি।) (ملهج الصادقين) তারা তাদের আকীদার উপর দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন-

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً**

অর্থাৎ, অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। (নিসাঃ ২৪)

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে **اسْتِمْتَاعٌ** (ভোগ করা) শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। **نِكَاح** (বিবাহ) শব্দের উল্লেখ করা হয়নি। আর **اسْتِمْتَاعٌ**-ই হল **مُنْعَةٌ** (মুতআ) এবং আয়াতে **أَجْرٌ** (মজুরি, প্রতিদান, পারিশ্রমিক, ভাড়া) শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর ইহা মুতআর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা বিয়ের ক্ষেত্রে তো মহর প্রদান করা হয়।

(درس مشکوة ج ৩ ص ১০، تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৬)

তাছাড়া, উবাই ইবন কাব এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে উল্লেখ আছে যে- **فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ الْمُسَمَّى**

অর্থাৎ, অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করবে।

উক্ত কিরআতে স্পষ্টভাবে **اجل المسمى** বা 'নির্দিষ্ট সময়ের' কথা উল্লেখ রয়েছে। আর নির্দিষ্ট সময় তো মুতআর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং মুতআ বিবাহ জায়েয।

দলীল (২)ঃ ... **عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا فِي جَيْشٍ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى**

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا (نصب الرأية ج ৩ ص ১৭৬-১৮১)

অর্থাৎ, ... সালামা ইবন আল আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা সেনাদলে থাকাবস্থায় নবী করীম (সাঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদেরকে মুতআ বিবাহের অনুমতি দেয়া হল।

দলীল (৩): حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتَعَ فَكَانَ أَحَدُنَا يَنْكُحُ الْمَرْأَةَ بِالثُّوبِ إِلَى أَجَلٍ (نصب الراية ج ۳ ص ۱۷۶-۱۸۱)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে মুতআর অনুমতি দিলে আমাদের কোন একজন একটি মহিলাকে কাপড়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করেন।

* চার ইমামসহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে, মুতআ বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম। (فتح القدير ج ۳ ص ۱০১-১০২, تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৬)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ-

অর্থাৎ, এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। (মুমিনুনঃ ৫-৬, মাআরিজঃ ২৯-৩০)

উল্লিখিত আয়াতে বিবাহিত স্ত্রী এবং মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত অন্য যে কোন অবস্থায় সঙ্গমকে হারাম আখ্যায়িত করা হয়েছে। এবং এমন ব্যক্তিকে সীমালংঘনকারী, যালেম বলা হয়েছে। আর মুতআ না মালিকানাধীন দাসী এবং না বিবাহিত স্ত্রী। সুতরাং মুতআ যে হারাম, এই আয়াতগুলোই তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ- (ابو داود ج ১ ص ২৮৩, باب في نكاح المتعة)

অর্থাৎ, ... রাবীআ ইবন সাবুরা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুতআ বিবাহ হারাম করেছেন।

... عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (8) دَلِيلُ يَوْمَ خَيْبَرَ الْخ (بخاري ج ২ ص ৬০৬ كتاب المغازي باب غزوة خيبر/ص ৭৬৭, مسلم ج ১ ص ৬০২,

ترمذي ج ২ ص ২১৩, باب نكاح المتعة, نسائي ج ২ ص ৮৭, تحريم المتعة, ابن ماجه ص ১৬২)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) খায়বর যুদ্ধের সময় মুতআ হারাম করেছেন।

দলীল (৫): হযরত রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي
الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ الخ (مسلم ج ١ ص ٤٥٢ باب

نكاح المتعة، ابن ماجه ص ١٤٢)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বলেন, হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

... عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ - (مسلم ج ١ ص ٤٥٢، كنز العمال ج ١٦ ص ٥٢٥)

অর্থাৎ, রাবীআ ইবন সাবুরা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন মুতআ বিবাহ নিষেধ করেন।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ

أَوْطَاسٍ فِي الْمَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا - (مسلم ج ١ ص ٤٥١، ابن ماجه ص ١٤٢)

অর্থাৎ, ... সালামা ইবন আল-আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আওতাসের যুদ্ধের বছর মুতআ সম্পর্কে তিন দিন অবকাশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তা নিষেধ করে দেন।

সুতরাং কুরআন ও হাদীস দ্বারা মজবুতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে মুতআ বিবাহ হারাম।

আকলী দলীলঃ মানুষের বিবাহ শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই নয়; বরং এতে আরো অনেক উপকার নিহিত রয়েছে। কিন্তু মুতআ বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কাজেই কোন মহিলা মুতআ করতে করতে রূপ-লাবণ্য হারিয়ে বয়স্কা হয়ে গেলে তার সাথে আর কেউই মুতআ করতে চাইবে না। অতঃপর তার জীবন যে কি এক নরকপুরীতে পরিণত হবে, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। তাছাড়া মুতআর মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানের কোন বংশ পরিচয় মিলবে না। তাই সুস্থ বিবেকের দাবী হচ্ছে মুতআ বিবাহ হারাম হওয়া। সুতরাং হক্কানী সকল আলিম মুতআ বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ١٧٥)

রাফেযী ও শিয়াদের দলীলের জবাবঃ (১) আয়াতে **اِسْتَمْتَعَ** (ভোগ করা) দ্বারা **مُنْعَةً** উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল **اِسْتِمْتَاعٌ بِاللِّكَّاحِ** তথা বিবাহের মাধ্যমে ভোগ করা। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাসমূহের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। (روح المعاني ج ৩ ص ৭৮) আর উক্ত আয়াতে **اُجُورُهُنَّ** দ্বারা **اَجْرٌ** তথা মজুরি, পারিশ্রমিক, ভাড়া বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল **مُهورُهُنَّ** বা তাদের মহর আদায় করা। যেমন, অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- **فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ (اَيُّ مَهْوَرُهُنَّ)** অর্থাৎ, অতএব তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। (নিসাঃ ২৫)

উক্ত আয়াতে **اَجْر** শব্দ দ্বারা মহর বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মোহরের জন্য **اَجْر** শব্দ ব্যবহার করা কোন দোষণীয় নয়।

(২) আর উবাই ইবন কাব এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতের উত্তর হল, উক্ত আয়াতে **اَجَلَ مُسْتَى** (নির্দিষ্ট সময়) দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যু। বিয়ের মধ্যবর্তী সময় বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

(৩) হযরত সালামা (রাঃ)-এর হাদীসের ব্যাপারে বলা যায় যে, হাদীসটি হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অপরদিকে হযরত সালামা (রাঃ) নিজেই এর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর হাদীসটি বর্জনীয়। ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসের ক্ষেত্রে একথাই বলা যায় যে, হারাম সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা জায়েয সংক্রান্ত হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

প্রাধান্য লাভের কারণঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মত প্রাধান্য লাভের কারণ হল-

(১) মুতআ বিবাহ জায়েয সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অথচ মুতআ বিবাহের হারাম সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অসংখ্য। সুতরাং অসংখ্য হাদীসের উপর আমল করতে হবে।

(২) যে সকল সাহাবী জায়েয সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা পরবর্তীতে তাঁদের কথা থেকে ফিরে এসেছেন।

(৩) মুতআ বিবাহ জায়েয হওয়ার পক্ষে যে দলীল পাওয়া যায়, সেগুলোর উপর হারাম হওয়ার হাদীসসমূহ নিয়ম অনুযায়ী প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

(৪) অথবা, অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) **مَنْعُ** শব্দের দ্বারা তামাত্ত্ব হজ্জের কথা বলেছেন, কিন্তু রাবী হয়ত মনে করেছেন, এটা মুতআ বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা। তাই বর্ণনায় ভুল হয়ে গেছে।

(৫) প্রয়োজনের তাগিদে নবী করীম (সাঃ) তা জায়েয ফাতওয়া দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন তিনি নিজেই তা হারাম ঘোষণা করেছেন।

অধিকন্তু বলা যায়, শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, মুতআ বিবাহকে ইসলাম কখনো সমর্থন করেনি। বরং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহার অনুমতি দিয়েছিলেন, যাকে نِكَاحٌ مُؤَقَّتٌ (সাময়িক বিবাহ)

বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাও নিষেধ করে দেন। আর نِكَاحٌ مُؤَقَّتٌ এবং نِكَاحٌ مُتَّعٌ

এক নয়। (فتاوى عزيزية ২৮ ص ৩৭)

আল্লামা তকী উসমানীর মতে, বিভিন্ন যুদ্ধে বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে অনুমতি দেয়া হত তা رُخْصَتٌ (অনুমতি) হিসেবে দেয়া হত, حِلٌّ (বৈধতা) প্রদানের জন্য নয়। যেমন, অতি ক্ষুধার্ত অবস্থায় শূকরের গোশত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

(درس ترمذي ج ৩ ص ৪০৬، جامع الاصول ج ১১ ص ৪৪৬-৪৫১، مجمع الزوائد ج ৬ ص ২৬৬-২৬৭، كنز

العمال ج ১৬ ص ৩২৮)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, ইসলামে কখনো মুতআ বিবাহ বৈধ ছিল না। বরং জাহেলী যুগে যেমন বিভিন্ন ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল, ঠিক মুতআও এগুলোর মধ্যে একটি ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেহেতু হুকুম-আহকাম নাযিল হচ্ছিল না, তাই জাহেলিয়াতের অভ্যাস অনুযায়ী তাঁরা আমল করছিল। অতঃপর আস্তে আস্তে হুকুম নাযিল হতে লাগল এবং অন্যান্য বিবাহের ন্যায় মুতআ বিবাহকেও আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা হারাম ঘোষণা করা হয়। অবশেষে হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতের যুগে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মুতআ বিবাহ হারাম। (فيض الهاري ج ৬ ص ১৩৭-১৩৮)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ অনেকেই বলে থাকেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকেও মুতআ বিবাহ জায়েয হওয়ার উক্তি পাওয়া যায়। (شرح معاني الآثار ج ২ ص ১৫)

কিন্তু, ফিকহের কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, খায়বর এবং আওতাস যুদ্ধে (যে সময় মুতআ নিষিদ্ধ হয়) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস উপস্থিত না থাকার কারণে যৌনশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না শুধু এমন নিরুপায় ব্যক্তির জন্য মুতআ বিবাহকে জায়েয মনে করতেন। অতঃপর যখন তিনি (রাঃ) তা নিষিদ্ধ হওয়ার খবর জানতে পান, তখন তিনি নিজের মত থেকে ফিরে আসেন। (نصب الرأية ج ৩ ص ১৮১)

... إِمَّا رُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئٌ مِّنَ
الرُّخْصَةِ فِي الْمَتْنَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سَلَّمَ الخ (ترمذي ১৮৩১ باب نكاح المتعة)

অর্থাৎ, ... মুতআ বিষয়ে ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে কিছুটা অবকাশ ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত এইসব হাদীসের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তিনি স্বীয় মত প্রত্যাহার করে নেন।

সুতরাং বুঝা গেল, মুতআ বিবাহ যে হারাম, এর উপর সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাছাড়া হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে যে মুতআ বিবাহ জায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, মূলত তা সহীহ নয়। কেননা, হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকারের মতে, আসলে ইহা গ্রন্থকারের পক্ষ থেকে ভুল হয়ে গেছে। কেননা মালিকিয়াদের কোন কিতাবে মুতআ জায়েয হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া স্বয়ং ইমাম মালিক (রহ.) মুয়াত্তায় হযরত আলী (রাঃ) হতে মুতআ নিষিদ্ধের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্তায় ঐ সকল রেওয়ায়েতই উল্লেখ করতেন, যা তাঁর মায়হাবের অনুকূলে ছিল। (হদায়ে ২৮ ২১২)

মুতআ বিবাহ হারাম ঘোষণা হওয়ার সময়কালঃ উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ সহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে দেখা যায় যে, মুতআ বিবাহ হারাম হওয়ার সময়কাল নিয়ে বেশ অসামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন- (১) হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহা ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধে হারাম ঘোষিত হয়।

(২) সাবুরা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহা মক্কা বিজয়ের দিন হারাম ঘোষিত হয়।

(মسلم ২৮ ৪০১ باب نكاح المتعة، كنز العمال ১৬ ৫২০)

(৩) হযরত আলী (রাঃ)-এর অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুনাইন যুদ্ধে হারাম ঘোষিত হয়। (نسائي ৮৭ تحريم المتعة)

(৪) সালামা ইবন আকওয়া (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, আওতাস যুদ্ধে তিন দিনের জন্য হালাল ঘোষণা হওয়ার পর তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম ঘোষিত হয়। (মسلم ২৮ ৪০১)

(৫) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী, তাবুক যুদ্ধের সময় মুতআ বিবাহ হারাম করা হয়। (نصب الرامة ৩ ১৭৭)

বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানঃ (১) কাশী আযায় (রহ.) বলেন, মুতআ বিবাহ খায়বরের সময়ই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ ঘোষণা তাকীদ হিসেবে বিভিন্ন

যুদ্ধে বারবার দেয়া হয়েছিল। সুতরাং যিনি যে যুদ্ধে এই হুকুম প্রথমে শুনেছেন, তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। (شرح نوي ج ١ ص ٤٠٠)

(২) হযরত আনোয়ার শাহ কান্দাহারী (রহ.) বলেন, মক্কা বিজয়, হুনাইন এবং আওতাস যুদ্ধ যেহেতু একই সফরে হয়েছিল, এজন্য কেউ একে মক্কা বিজয়, কেউ হুনাইন যুদ্ধে আবার কেউবা আওতাস যুদ্ধের কথা বলেছেন।

(فيض الهاري ج ٤ ص ١٣٥-١٣٦)

(৩) এ ব্যাপারে অধিক নির্ভরযোগ্য মত প্রকাশ করেছেন, হযরত আল্লামা তিব্বী (রহ.)। তিনি বলেন, প্রথমত একবার খায়বর যুদ্ধের সময় (৭ম হিঃ) মুতআ বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর আওতাস যুদ্ধের সময় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দ্বিতীয়বার অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর চিরকালের জন্য এ ধরনের বিবাহ হারাম ঘোষণা দেয়া হয়। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমহুরের অভিমতও তাই।

(حاشية سنن الترمذي للشيخ أحمد على السهارنفوري ج ١ ص ١٦٦)

তাহলীল বা হালাল করা : بَابُ فِي التَّحْلِيلِ ص ২৮৩

... عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِنِّ الْمُحْلَلِّ وَالْمُحْلَلُ لَهُ-

(ترمذي ج ١ ص ২৮৩ باب المحلل والمحلل له، ابن ماجه ص ১৪০)

অনুবাদঃ ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে সে, আর যে ব্যক্তি স্বামী তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে তার জন্য হালাল করে নেয়, তারা উভয়েই অভিশপ্ত।

বিশ্লেষণঃ مُحْلَل বলা হয়, দ্বিতীয় স্বামীকে, আর مُحْلَلُ لَهُ বলা হয় প্রথম স্বামীকে।

(مرفقات ج ৬ ص ২৭৭)

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে যদি প্রথম স্বামী ফিরিয়ে আনতে চায়, আর এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামী যদি এই শর্তে ঐ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করে যে, সহবাসের পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এই বিয়ে কতটুকু কার্যকরী হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, নাখঈ, কাতাদা, লাইস (রহ.) সহ জমহুরের মতে, যদি দ্বিতীয় স্বামী এই শর্তের উপর বিবাহ করে যে, সহবাসের পর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে, অথবা কেবল প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে

বিয়ে করে থাকে, তাহলে উক্ত বিয়ে শুদ্ধ হবে না এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে না। (المغنی ج ٦ ص ٦٤٦)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে তার উপর অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ইহা যে একটি কত বড় মন্দ বিষয় তা সহজেই অনুমেয়। আর বিবাহ হালাল হওয়া একটি বিশাল নেয়ামত। সুতরাং এর কোন নির্দিষ্ট শর্ত থাকতে পারে না।

দলীল (২): হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهٗ لِأَخِيهِ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاحَ رُغْبَةٍ كُلُّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (مسندك حاكم ج ٢ ص ١٩٩)

অর্থাৎ, হযরত নাফি (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রাঃ)-এর কাছে এসে এরূপ এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অতঃপর এ মহিলাকে তার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বিয়ে করে ফেলেছে, যাতে সে এই মহিলাকে তার ভাইয়ের জন্য হালাল করে দিতে পারে। এই মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না। তবে আগ্রহের বিয়ে ব্যতিক্রম। আমরা তো এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে যিনা গণ্য করতাম।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, যে কোন শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে। তবে শর্ত হল, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সঙ্গম হতে হবে। কিন্তু এমন শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ মাকরুহ তাহরীমী।।

(البحر الرائق ج ٤ ص ٥٨)

দলীল (১): আব্দুল্লাহ তাআলার বাণী- فَانِ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ- অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাহঃ ২৩০) উক্ত আয়াতে সাধারণ বিয়ের উল্লেখ রয়েছে। হালাল করার শর্তে হোক, অথবা না হোক, এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (২): عَنْ بَنِ سَيْرِينَ قَالَ أَرْسَلْتُ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجْتُهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا

لَزَوْجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا— (مصنف عبد الرزاق ج ٦ ص ٢٦٧)

অর্থাৎ, ইবন সীরীন (রহ.) বলেন, এক মহিলা এক লোকের কাছে খবর পাঠাল, অতঃপর মহিলাটি সে পুরুষটিকে বিয়ে করে ফেলল, যাতে নিজেকে তার স্বামীর জন্য হালাল করে নিতে পারে। তখন উমর (রাঃ) সে লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন তার বিয়ে ঠিক রাখে, এ মহিলাকে তালাক না দেয় এবং তিনি তাকে শাস্তির ভয়ও দেখালেন, যদি তাকে তালাক দেয়।

উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে হালাল করার শর্তে নাজায়েয হওয়া সত্ত্বেও আকদ সম্পাদিত হয়ে যায়। তাই হযরত উমর (রাঃ) উক্ত বিয়েকে ভেঙ্গে দেননি। হযরত আবু হানিফা (রহ.) বলেন, শর্তে ফাসেদের দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না, বরং শর্ত বাতিল হয়ে যায় এবং বিবাহ সহীহ হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ হযরত ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসের জবাব দিতে গিয়ে আহনাফগণ বলেন, লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, উক্ত হাদীসে محلل এবং محلل ١ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর শব্দ দু'টি حلال (হালাল) ধাতু থেকে উৎকলিত হয়েছে। সুতরাং মূল হাদীসটিই একথার দলীল যে, এ মহিলার বিয়ে হালাল হবে এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে। নতুবা হাদীসে محلل এবং محلل ١ শব্দের উল্লেখ করা হত না; বরং অন্য শব্দ উল্লেখ করা হত। তবে একথা সত্য যে, তাদের উপর যেহেতু লানত করা হয়েছে, তাই এমন কাজ করা মাকরুহ তাহরীমী। যার প্রবক্তা আহনাফগণও। (درس مشکوٰۃ ج ٣ ص ٣٨)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর উক্তি থেকে যিনার সাথে এই আমলটির উপমা শুধু হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে, বিয়ে সম্পাদিত হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, হযরত ইবন উমর (রাঃ) এই ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছেদের কোন হুকুম দেননি।

(২) হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। আর হানাফীগণের দলীল হল কুরআন। সুতরাং কুরআনের মুকাবিলায় খবরে ওয়াহিদ দলীলযোগ্য নয়। (درس ترمذی ج ٣ ص ٤٠١)

بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِجَهَا ص ২৮৬

বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ الْخُبَأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا- (ابن ماجه ص ১৩০)

অনুবাদঃ ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন স্ত্রীলোককে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠাবে, তখন যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তবে সে যেন তার ব্যাপারে সবকিছু দেখে নেয়, যা তাকে বিবাহে উৎসাহ দেয়। রাবী বলেন, অতঃপর আমি জনৈক কুমারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেই এবং আমি গোপনে তার চেহারা দর্শন করি, যা আমাকে তার সাথে বিবাহে প্রলুব্ধ করে। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করি।

বিশ্লেষণঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখা জায়েয কিনা- এ ব্যাপারে সামান্য মতানৈক্য রয়েছেঃ

কতিপয় আহলে যাহেরের মতে, পাত্রের জন্য পাত্রীকে দেখা জায়েয নয়। কেননা, তাদের মতে, বিবাহের পূর্বে পাত্রী এবং অন্যান্য বেগানা মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও একটি অভিমত অনুরূপ।

(شرح معاني الآثار ج ২ ৭, ৯, مرقاة ج ৬ ص ১৭০)

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ- (ابو داود ج ১ ص ২৭২ باب ما يومر به من غض البصر)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, হে আলী! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাত (বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি যা অনিচ্ছাকৃত হয়েছে), তোমার দ্বিতীয় দৃষ্টি যেন তার অনুসরণ না করে। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিপাত তোমার জন্য জায়েয, আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

উক্ত হাদীসে مطلقاً (শর্তহীনভাবে) নিষেধ করা হয়েছে। বিবাহের পাত্রী হোক বা না হোক এমন কোন নির্দিষ্ট করা হয়নি।

* ইমাম মালিক (রহ.) হতে আরেকটি অভিমত পাওয়া যায় যে, পাত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে দেখা জায়েয আছে। (১৭০০ ১৮৮৮)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, হাসান বসরী, আওযাইদ, সুফিয়ান সাওরী (রহ.) প্রমুখের মতে, প্রস্তাবিত কনেকে তার অনুমতি সাপেক্ষে অথবা অনুমতি ব্যতীতই দেখা জায়েয। শুধু জায়েযই নয়; বরং দেখা মুস্তাহাব এবং উত্তম। আল্লামা নববী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতও জমহুরের অনুরূপ, অর্থাৎ কনের অনুমতি ছাড়াও দেখা জায়েয আছে।

(১৭০০ ১৮৮৮, شرح نووي ج ১ ص ৪০৬)

উল্লেখ্য যে, পাত্রীর চেহারা এবং উভয় হাতের তালুদয় দেখার অনুমতি রয়েছে। অন্য কোন অঙ্গ দেখা জায়েয নয়। যদি অন্য কোন অঙ্গের ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে কোন বিশৃঙ্খল মহিলা পাঠানো যেতে পারে। (১৭০০ ১৮৮৮)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে হযরত জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَنْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا الْخ (مسلم ج ১ ص ৪০৬) باب ندب

من اراد نكاح امرأة الخ

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে জানাল যে, সে আনসারী এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। নবী (সাঃ) লোকটিকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বলল, না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, যাও, তুমি তাকে দেখে নাও।

উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) দেখার জন্য নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

... عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا- (ترمذي ج ১ ص ২০৭) باب النظر إلى

المخطوبة، نسائي ج ২ ص ৭২ باب إباحة النظر قبل التزويج، ابن ماجه ص ১৩৫

অর্থাৎ, ... মুগীরা ইবন শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি এক রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কারণ, ইহা তোমাদের উভয়ের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য অধিক সহায়ক হবে।

দলীল (৪): মুহাম্মদ ইবন সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةً إِمْرَأَةً فَلَا بَأْسَ (وفي رواية فَلَا جُنَاحَ) أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا - (وفي روايةٍ وَأَنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ) (مسندك حاكم ج ٣، ٤٣٤، نصب الرابة ج ٤، ص ٢٤١، ابن ماجه ص ١٣٥)

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের কারো অন্তরে কোন মহিলাকে বিয়ে করার বিষয় জাগ্রত করেন, তখন তাকে দেখাতে কোন অসুবিধা নেই। (এক রেওয়ায়েতে আছে, যদিও তা কনের অজান্তে হোক না কেন)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখা নাজায়েয নয়; বরং দেখা জায়েয ও মুস্তাহাব।

জবাবঃ আহলে যাহেররা দলীল হিসেবে হযরত আলী (রাঃ)-এর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, এর জবাব হল- উক্ত হাদীসে মূলত বেগানা অপরিচিতা মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে নিষেধ করা হয়েছে, যাকে বিবাহ প্রস্তাব অথবা বিবাহ করার কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু যদি কোন নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকে, তাহলে তাকে দেখতে নিষেধ নেই। হাদীসসমূহ দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। (অন্তরের খবর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

২৮৪: بَابُ فِي الْوَلِيِّ ۝ ওলী বা অভিভাবক

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَأَحَا بِاطِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ - (ترمذي ج ١، ص ٢٠٨، باب لا نكاح الا بولي، ابن ماجه ص ١٣٦)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল হবে। আর তিনি এই উক্তিটি তিনবার উচ্চারণ করেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে পূর্ণ মহর প্রদান করতে হবে। আর উভয় পক্ষের অভিভাবকরা যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ করে তখন দেশের সরকার তার অভিভাবক হবে। কেননা, যার কোন অভিভাবক নেই, দেশের সরকারই তার অভিভাবক।

বিশ্লেষণঃ ওলী (وَلِيٍّ)-এর আভিধানিক অর্থঃ

وَلِيٍّ শব্দটি একবচন। এটি ছিফাতের সীপা। এর বহুবচন হচ্ছে اولیاء। শব্দটি اُولَیَّاءَ মাসদার থেকে উদ্ভূত। অভিধানে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

۱. فَادَا الَّذِي يَبْنُكَ وَيَبْنِي عَدَاوَةً كَأَنَّ وَلِيَّ حَمِيمٍ-বন্ধু। যেমন, আল্লাহর বাণী-الْصَّدِيقُ অর্থাৎ, তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

۲. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ-সাহায্যকারী। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে-الْمَأْمُورُ অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই।

۳. قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَخْخَذَ وَلِيًّا-প্রতিপালক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে-অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে প্রতিপালক স্থির করব? (আনআমঃ ১৪)

৪. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ-প্রেমিক। যেমন, আল্লাহর বাণী-الْعَاشِقُ অর্থাৎ, জেনে রেখো, যারা আল্লাহর প্রেমিক (আশেক), তাদের কোন ভয়ভীতি নেই। (ইউনুসঃ ৬২)

৫. মালিক হওয়া। যেমন বলা হয়-أَرْضٍ وَلِيٍّ অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি জমির মালিক। তবে ওলী শব্দের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অর্থ হল অভিভাবক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে-اللَّهُ অর্থাৎ, আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের অভিভাবক।

ওলীর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

۱. اَوَّلِيُّهُ هُوَ الَّذِي يَنْفُذُ قَوْلَهُ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى-নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে-অর্থাৎ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যার কথা অন্যের উপর কার্যকর করা হয়, তাকেই ওলী বলা হয়।

۲. هُوَ الَّذِي يَنْفُذُ قَوْلَهُ عَلَى إِنْسَانٍ رَضِيَ أَوْ أَبَى-কিতাবে বলা হয়েছে-অর্থাৎ, যার কথা মানুষের উপর বাস্তবায়িত হয়। এতে সে রাজি থাকুক বা অস্বীকার করুক।

۳. اَوَّلِيُّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ-গ্রন্থকার বলেন-অর্থাৎ, ওলী হলেন ঐ ব্যক্তি যার উপর কোন বন্ধন বা লেনদেনের বিশুদ্ধতা স্থিরকৃত হয়, ফলে তাকে ছাড়া ঐ বন্ধনটি শুদ্ধ হয় না।

৪। আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন- (تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৭) -
 অর্থাৎ, ওলী বলা হয় যিনি বোধশক্তিসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার
 যোগ্যতা রাখে।

وَلَايَةُ الْوَلَايَةِ বা ওলীর প্রকারভেদঃ বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব দু'প্রকার। যথা-

১। وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ - বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব।

২। وَلَايَةُ الْمُذْهَبِ - ধর্মীয় অভিভাবকত্ব।

উল্লেখ্য যে, وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ - বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব চারটি উপায়ে সাব্যস্ত
 হয়। যেমন-

(১) আত্মীয়তা দ্বারা (২) মালিকানা দ্বারা

(৩) প্রভুত্ব দ্বারা (৪) নেতৃত্ব দ্বারা

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতিঃ

এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, وَلَايَةُ الْإِجْبَارِ তথা বলপ্রয়োগের অভিভাবকত্ব
 কোন ধরনের নারীর উপর প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে মহিলাদের চারটি
 প্রকার রয়েছে-

(১) ثَيِّبَةٌ بِالْعَةِ তথা বালগা অকুমারী। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, বিয়ের
 ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।

(২) صَغِيرَةٌ بِأَكْرَةِ صَغِيرَةٍ তথা নাবালগা কুমারী। এ ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, বিয়ের
 ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের প্রয়োজন রয়েছে।

(৩) بِأَكْرَةِ بِالْعَةِ তথা বালগা কুমারী। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে এমন মহিলার
 অভিভাবক প্রয়োজন এবং ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে প্রয়োজন নেই।

(৪) ثَيِّبَةٌ صَغِيرَةٌ তথা নাবালগা অকুমারী। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে
 এমন মহিলার অভিভাবক প্রয়োজন এবং ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে প্রয়োজন
 নেই। (درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ১২)

উল্লেখ্য যে, এখানে কুমারী (بِكْرَةٍ) বলতে এমন মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যে নারী
 কোন দিন যেকোন উপায়ে সহবাসে লিপ্ত হয়নি এবং তার যৌনাঙ্গের এক ধরনের
 পাতলা পর্দা ক্ষুণ্ণ হয়নি। সে বালগা হোক অথবা নাবালগা হোক। আর অকুমারী
 (ثَيِّبَةٍ) বলতে এর বিপরীত দিকটি বুঝানো হয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, وَلَايَةُ الْأَجْبَارِ তথা বলপ্রয়োগের দ্বারা অভিভাবক প্রয়োজন হওয়ার মাপকাঠি হল بَكَارَت বা কুমারীত্ব। অতএব, মহিলা যদি কুমারী হয়, সে বালেগা হোক অথবা নাবালেগা হোক, অভিভাবক ইচ্ছা করলে মহিলার অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দিতে পারবে। আর যদি نُبِيَّة তথা অকুমারী হয় তাহলে মহিলার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিতে পারবে না। সে বালেগা হোক অথবা নাবালেগা।

* পক্ষান্তরে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, অভিভাবকত্বের মাপকাঠি হল صُغُر বা অল্পবয়স্কতা। অতএব মহিলা যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, সে কুমারী থাকুক বা অকুমারী থাকুক, অভিভাবক ইচ্ছা করলে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারবে। আর যদি মহিলা বয়স্ক তথা বালেগা হয়, চাই সে কুমারী থাকুক বা না থাকুক, তার উপর অভিভাবকের কোন বল প্রয়োগ চলবে না। এমন মহিলা যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলে তাহলে তা কার্যকরী হবে। (بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٤١، فتح القدير ج ٣ ص ١٦١)

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ের হুকুম (حُكْمُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيٍّ):

সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা ও দাসীর বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে না।

তবে স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, ইবন হুযম (রহ.) ও জমহুরের মতে, এ স্তরের মহিলাদের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে না। (بداية المجتهد ج ٢ ص ٧، المغني ج ٦ ص ٤٤٩، المحلى ج ٩ ص ٤٥١)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। (নূরঃ ৩২)

উক্ত আয়াতটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যেন মহিলাদেরকে বিবাহ দিয়ে দেয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজেদের কোন অধিকার নেই, বরং এর যিস্মাদার হচ্ছে অভিভাবকগণ।

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী- **فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ** অর্থাৎ, অতএব, তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর। (নিসাঃ ২৫)
উক্ত আয়াতেও বিয়ের জন্য পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদি মহিলাদের অধিকার থাকত, তাহলে তাদের কথাও উল্লেখ থাকত।

দলীল (৩): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৪): **... عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ** (ابو داود ১৮৬৫, তرمذি ১৮০৮, ابن ماجه ১৩৬)

অর্থাৎ, ... আবু মুসা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওলী ব্যতীত কোন বিবাহ হতে পারে না।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্কা ও বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ হবে। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবক হওয়া মুস্তাহাব এবং উত্তম। উল্লেখ্য যে, ইমাম আযম ও সাহেবাইনের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে কুফু (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমতা) হওয়ার ব্যাপারে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও ফিকহের কিতাবাদি অধ্যয়নের ফলে অবশেষে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, সমতা না হলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। [فتح القدير ৩/১০৭, تبیین]

الحقائق ২/১১৭, بدائع الصنائع ২/২৪৮, المبسوط للسرخسي ৫/১০

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ, অতঃপর তারা (মহিলারা) যখন ইদত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (বাকারাঃ ২৩৪)
উক্ত আয়াতে **فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ** শব্দসমূহ উল্লেখের দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ মূলত মহিলাদের কাজ এবং তাদের নিজেদের বিবাহ নিজেরাই করতে সক্ষম।

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী- **فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ** অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামী বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)
উক্ত আয়াতেও বিবাহের সম্পর্ক মহিলার দিকে করা হয়েছে। অভিভাবকের দিকে নয়।

... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (৩):
جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ...
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ-

(আবু দাউদ জ ১, ২৮৭, বাব ফি তত্বিজ এলী এলম এমেল, খারি জ ২, ৭৬৭, বাব এরু এলম এলম এলম)
এল/এল/৭৬১, মুসল জ ১, ৪৫৭, বাব এলদাক ওজাও কুনে এল, তরম্দি জ ১, ২১১, বাব এমোর এলম,
নসাই জ ২, ৮৮, বাব এলম এলম এলম, এল এলম (১৩৭)

অর্থাৎ, ... সাহল ইবন সাদ আল সাদ্দি (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে জনৈক মহিলা উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। জনৈক (আনসার) ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেন, আমি কুরআনের ঐ অংশের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, এই ঘটনায় মহিলার কোন অভিভাবক উপস্থিত ছিল না।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمُ (৪):
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَادْنُهَا صَبَاتُهَا- (আবু দাউদ জ ১)
২৮৬, বাব ফি এলম, মুসল জ ১, ৪৫৫, বাব এস্টিডান এলম ফি এলকাক, তরম্দি জ ১, ২১০, বাব
এলম এলম এলম, নসাই জ ২, ৭৬, এস্টিডান এলম ফি এলম, এল এলম (১৩৬)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সায়েবা জীলোক (নিজের বিবাহের ব্যাপারে) ওলীর চাইতে নিজেই বেশি হকদার। আর বালিগা কুমারী মেয়েদের (বিবাহের সময়) অনুমতির প্রয়োজন এবং তার অনুমতি হল চূপ করে থাকা।

উক্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনা, প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-ববেকসম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবক ব্যতীত শুদ্ধ হবে।

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ (৫):
مَعَ مُنْذِرِ بْنِ زَيْبِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ- (টহাউ জ ২, ১৬)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) স্বীয় ভাতিজি হাফসা বিনত আব্দুর রহমান ইবন আবু বকরের বিয়ে তার পিতার অবর্তমানে মুনির ইবন যুবারের (রাঃ)-এর সাথে দিয়েছিলেন।

উক্ত হাদীসেও পরিলক্ষিত হয় যে, এ বিয়েটিও হয়েছিল অভিভাবক ছাড়া।

যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ যুক্তিও বলে যে, নারী একজন স্বাধীন মানুষ। তাই তার স্বীয় সম্পদ ও ব্যক্তিত্বে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া উচিত। নতুবা তার ব্যক্তি স্বাধীনতার হক নষ্ট করা হয়।

সুতরাং কুরআনের বাণী, বিভিন্ন হাদীস ও যুক্তি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বালেগা মেয়ের বিবাহ অভিভাবক ব্যতীতও শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও ফেতনা থেকে পরহেজ করার জন্য অতি উত্তম হল অভিভাবক উপস্থিত থাকা।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

(১) **“أَيَّامِي”** - আয়াতের জবাবঃ আয়াতে বর্ণিত **“أَيَّامِي”** শব্দটি **“أَيَّامِي”**-

এর বহুবচন। এর অর্থ হল **“لَا زَوْجَ لَهُ”** অর্থাৎ, যার কোন জীবনসঙ্গী নেই। পুরুষ হোক অথবা মহিলা। সুতরাং এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হল- পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য উত্তম পন্থা হল এই যে, তারা যেন অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত অগ্রসর না হয়। কিন্তু যদি অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করে ফেলে তাহলে কি হবে, এ ব্যাপারে আয়াতে কিছুই বলা হয়নি। অতঃপর **“أَيَّامِي”** দ্বারা যেহেতু বালেগ পুরুষ-মহিলা উভয়ই শামিল। আর বালেগ পুরুষের বিবাহ যেহেতু অভিভাবকের মাধ্যম ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে, সুতরাং বালেগা মহিলার বিবাহও অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত জায়েয। আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। যদিও সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করার কারণে মেয়ে হিসেবে একটু বেশি তিরস্কৃত হবে। এটা ভিন্ন কথা। (معارف القرآن ৬: ১০৭)

(২) **“فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ”** আয়াতের জবাবঃ এই আয়াতটি মূলত স্বাধীন মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে না। বরং স্বাধীন মহিলাদের বিবাহের জন্য অন্য সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। যা হানাফীগণ প্রথম দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বরং উক্ত আয়াতটি (**فَأَنْكِحُوهُنَّ**) দ্বারা তো হানাফীগণের অভিমত প্রমাণিত হয়। কেননা, উক্ত আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, একজন মহিলা তার বাঁদীকে বিয়ে দেয়ার অধিকার রাখে। কারণ, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে **أَهْلِهِنَّ** শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর **أَهْلٌ** শব্দটি **عَام** (ব্যাপক), পুরুষ মালিক হোক অথবা মহিলা মালিক হোক। (أحكام القرآن للتهانوي ২: ২৩৭)

(৩) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের জবাবঃ

ক. উক্ত হাদীসে হযরত ছোট নাবালেগা মেয়ে অথবা দাসীর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যদি কোন ছোট মেয়ে অথবা দাসী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করে ফেলে, তাহলে সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। একথা তো আহনাফরাও বলে থাকেন।

খ. অথবা, **فَرَأَى حَبْلًا**-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী থাকবে না, বরং আন্তে আন্তে তা বাতিলের দিকে গড়াবে।

গ. অথবা, বিবাহ হয়ে যাবে সত্য, তবে এমন বিবাহ ফায়েদায়ুক্ত নয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে **رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا** অর্থাৎ, হে আমাদের রব! এসব তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করনি। (আলে ইমরানঃ ১৯১)

ঘ. আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীতও বিবাহ হয়ে যায়। যেমন, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- **فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَزَلْ**

অর্থাৎ, “আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে মহর দিতে হবে।” সুতরাং বিবাহ যদি শুদ্ধই না হয়, তাহলে মহর কেন ওয়াজিব হবে?

ঙ. অথবা, অভিভাবক দ্বারা **عام** (ব্যাপক) উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ, মহিলা নিজের সত্তার অভিভাবক। তখন হাদীসের অর্থ হবে, যদি মহিলা স্বয়ং রাজি না থাকে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না; বরং বাতিল হয়ে যাবে।

চ. তাছাড়া হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি সনদের ভিত্তিতে অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে। অথচ আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটি তাতে উল্লেখ নেই।

ছ. কোন বর্ণনাকারী যদি স্বীয় রেওয়ায়েতের বিপরীত আমল করে, এতে প্রমাণিত হয় যে, তার রেওয়ায়েত আমল করার আর যোগ্যতা রাখে না, বরং তা রহিত হওয়ার দলীল। সুতরাং স্বয়ং আয়িশা (রাঃ) যেহেতু আপন ভাতিজীকে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়েছেন, অতএব উক্ত হাদীসটি দ্বারা কোন দলীল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জ. সর্বোপরি, আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটি সনদের দিক থেকে মতানৈক্য রয়েছে। যা তিরমিযী এবং তাহাবীতে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। (ترمذي ج ١ ص ٢٠٩، طحاوي ج ٢ ص ٦)

(৪) আবু মুসা (রাঃ)-এর হাদীসের জবাবঃ

ক. উক্ত হাদীসটি মুত্তাসিল এবং মুরসাল হওয়ার ব্যাপারে বেশ মতানৈক্য রয়েছে।

সুতরাং এ হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (ترمذي ج ١ ص ٢٠٩)

খ. অথবা, "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" হাদীসটিতে لَا (না) হরফটি দ্বারা نَفْيِ كَامِل তথা অপরিপূর্ণ বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বিয়ে তো হয়ে যাবে, তবে অভিভাবকের অনুপস্থিতির কারণে তা অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেল। যেমন বলা হয় لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ "যার নিকট আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই।" এখানে মূলত পরিপূর্ণ ঈমান বুঝানো উদ্দেশ্য।

গ. আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী- উক্ত হাদীসে وَلِيٍّ (যেকোন অভিভাবক) শব্দটি نَكْرَةً (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য), যা تَحْتَ اللَّفْظِ বা না-সূচক (لَا نِكَاحَ) শব্দের অধীনে পতিত হয়ে عُمُوم (ব্যাপকতা)-এর ফায়েদা দিবে। সুতরাং এর অর্থ হবে, বিয়েতে যদি কোন প্রকার অভিভাবকই না থাকে, তাহলে বিবাহ সहीহ হবে না। অথচ স্বাধীনা, বয়স্কা ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা নিজেই নিজ সত্তার অভিভাবক। অতএব, বিয়েতে মহিলা স্বয়ং রাজি না থাকলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (تَظْمِ الْاَشْتَات ج ২ ص ১৬৭)

২৮৭ : بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ - স্বল্প পরিমাণ মহর

... عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِنَقٌ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْرٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتُهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

(بخاري ج ২ ص ৭৭৭ باب الوليمة ولو بشاة، مسلم ج ১ ص ৪০৮ باب الصداق وجواز كونه الخ، ترمذي ج ১

ص ২০৮ باب الوليمة، نسائي ج ২ ص ৮৭ التزويج على نواة من ذهب، ابن ماجة ص ১৩৮)

অনুবাদঃ ... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ)-কে একটি হলুদ রংবিশিষ্ট চাদর পরিহিত দেখেন। এরপর নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তার জন্য কি পরিমাণ মহর ধার্য করেছ? তিনি বলেন, এক নাওয়া পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বলেন, তুমি ওয়ালিমা কর, যদি একটি বকরীর দ্বারাও হয়।

মহরের আভিধানিক অর্থঃ "الْمَهْر" শব্দটি বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ বা نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার।

ইহা - ০ - মূলধাতু হতে নির্গত। বহুবচনে مهور বা مهوره। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

(১) المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন- الْمَهْرُ لَفَةٌ صَدَاقُ الْمَرْأَةِ বা মহিলার মোহরানা।

(২) القاموس الفقهي বলেন, ইহার অর্থ الْأَعْطَاء বা দান করা।

(৩) কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ الْمَنْحُ - প্রদান করা।

(৪) المنحة গ্রন্থকার বলেন, মহর শব্দের অর্থ হল العرب

(৪) ইহা প্রতিদান, বিনিময় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(৫) ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, মহর হিব্রু ভাষায় মোহর এবং সিরীয় ভাষায় মাহর। এর অর্থ হল, বিবাহে কনের প্রাপ্য উপহার।

* পবিত্র কুরআনে শব্দটি বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যথা-

ক. وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ২০) - অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে-

খ. وَاتَّوَأُ النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ (النساء: ৪) - অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে-

গ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا (النساء: ২০) - অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে-

ঘ. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَ (الأحزاب: ৫০) - অর্থে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে-

ঙ. نِكَاحٍ، عَطِيَّةٍ، প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

মহরের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। شرح وقاية-এর হাশিয়ায় উল্লেখ আছে-

هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُسَاقُ إِلَى الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ عَوَاضًا لِمَنَافِعِ بُضْعِهَا-

অর্থাৎ, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করার বিনিময়ে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যে সম্পদ দান করা হয়, তাই মহর।

২। القواعد الفقهية কিতাবে বর্ণিত আছে- الْمَهْرُ مَا يُقَابِلُ الْبُضْعَ مِنَ الْمَالِ حَلَالًا-

অর্থাৎ, যে সম্পদের বিনিময়ে মহিলার যৌনাঙ্গ হালাল হয় তাই মহর।

৩। কতিপয় আলিমের মতে, কোন মেয়ের সাথে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে বিনিময় বা প্রতিদান দেওয়া হয়, তাকে মহর বলা হয়।

৪। কেউ কেউ বলেন- مَا يُعْطَى إِلَى الزَّوْجَةِ عَوَاضًا لِمَنَافِعِ بُضْعِهَا مُعْجَلًا أَوْ مُؤَجَّلًا-

অর্থাৎ, স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগের বিনিময়ে নগদে বা বাকিতে যে সম্পদ স্ত্রীকে প্রদান করা হয়, তাই মহর।

৫। المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন- مَا يَدْفَعُهُ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ بِعَقْدِ الزَّوْاجِ-

অর্থাৎ, বিবাহ বন্ধনের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যা প্রদান করা হয় তাই মহর। মোটকথা হল, বৈবাহিক সম্পর্কের সময় স্বামী স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গ থেকে স্বাদ উপভোগ করার বিনিময়ে স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকেই মহর বলে।

মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণঃ মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে উলামাদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। তা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির উপর নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে অথবা মানুষকে দেখানোর নিয়তে প্রতিযোগিতামূলক, অহংকারবশত অথবা প্রতারণার লক্ষ্যে এত বেশি মহর ধার্য করা ঠিক হবে না, যা আদায় করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। কিন্তু মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, মহরের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নেই। তাঁদের নিকট বিবাহ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়। তাই স্বামী-স্ত্রী একত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবে। উভয়ের সন্তুষ্টির দ্বারা এর পরিমাণ কম হোক অথবা বেশি হোক এটা তাদের ব্যাপার। এমনকি তাদের নিকট প্রত্যেক ঐ সকল মাল ও সম্পদ মহর নির্ধারণ করা যাবে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। (১৮০৮৮, ১৫৮২, ১৫৮২, ১৫৮২)
উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবন হুযম (রহ.)-এর মতে, প্রায় প্রত্যেক জিনিসই মহর হতে পারে। এমনকি পানি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। এগুলো বিক্রি জায়েয হোক অথবা না হোক। (১৫৮২, ১৫৮২)

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলঃ

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবন আওফকে মহরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি (রাঃ) উত্তরে বলেন, এক নাওয়া পরিমাণ স্বর্ণ। এতে বুঝা যায় যে, মহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই।

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِي الصَّدَاقِ امْرَأَةً مَلَأَ كَفِّهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحْلَ وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَمْتَعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتَعَةِ - (ابو داود ج ১ ص ২৮৭)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ যদি কেউ তার স্ত্রীর মহর হিসেবে দুই অঞ্জলি আটা বা খেজুর প্রদান করে, তবে তাই তার জন্য যথেষ্ট। জাবির (রাঃ) অপর একটি হাদীসে

বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে বিবাহের মহর হিসেবে খাদ্যের সামান্য অংশ প্রদান করে তাকে উপভোগ করতাম।

উক্ত হাদীসেও প্রমাণিত হয় যে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত নেই।

দলীল (৩)ঃ হযরত আমের ইবন রবীআ (রাঃ)-এর হাদীস-

”إِنَّ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتَ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ يَنْعَلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ“ - (ترمذي ج ١

ص ২১১ باب ما جاء في مهر النساء، ابن ماجه ص ১৩৭ باب صدق النساء)

অর্থাৎ, “বনু ফাযারার এক মহিলা এক জোড়া স্যাভেলের বিনিময়ে বিয়ে করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, এক জোড়া স্যাভেলের বিনিময়ে তোমার ব্যক্তিগত ও মালের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (সাঃ) এর অনুমতি দিলেন।”

দলীল (৪)ঃ ... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لَا أَحَدٌ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ - (ابو داود ج ١ ص ২৮৭ باب في التزويج على

العمل يعمل، بخاري ج ২ ص ৭৬১ باب تزويج المعسر/ج ২ ص ৭৬৭، مسلم ج ১ ص ৫০৭، ترمذي ج ১

ص ২১১، نسائي ج ২ ص ৮৮ باب هبة المرأة نفسها الخ، ابن ماجه ص ১৩৭)

অর্থাৎ, ... সাহল ইবন সাদ আল সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে জনৈকা নারী উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাকে আপনার নিকট বিবাহের (উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করছি। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন, যদি তাতে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি, যার দ্বারা তুমি তার মহর আদায় করতে পার? সাহাবী (রাঃ) বলেন, আমার কাছে এই ইজার (পায়জামা) ব্যতীত দেওয়ার মত কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন তোমার নিকট ইজার ব্যতীত দেওয়ার মত আর কিছুই নেই, তখন অন্য কিছু দেওয়ার জন্য অনুসন্ধান কর। সাহাবী (রাঃ) বলেন, আমি দেওয়ার মত কিছুই পাচ্ছি না। তিনি বলেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবুও তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা কর। এরপর এর অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হন, কিছুই পাননি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমার নিকট কুরআনের কোন অংশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, কুরআনের অমুক সূরা দ্বয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বলেন, আমি কুরআনের ঐ অংশের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম। উক্ত হাদীসেও দেখা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) মহর হিসেবে লোহার আংটি এবং কুরআনের আয়াত নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং মহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, তিন দিরহাম বা এক দিনারের চারভাগের এক ভাগ। (بداية المجتهد ج ২ ص ১৪)

দলীল (১): عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنَهُ : ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ— (ابو داود ج ২ ص ৬০২ كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ১ ص ২৬৭)
باب ما جاء في كم يقطع السارق

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তিন দিরহাম পরিমাণ মূল্যের ঢাল চুরির কারণে হাত কেটে দেন।

দলীল (২): عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا— (ابو داود ج ২ ص ৬০২ باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ১ ص ২৬৭ باب كم يقطع السارق)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) হতে নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা এর অধিক মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে।

তিনি এটাকে চোরের হাত যে পরিমাণ মাল চুরির কারণে কাটা যায়, তার ন্যূনতম পরিমাণের উপর কিয়াস করেন। কারণ সেখানেও তার মতে এক চতুর্থাংশ দিনারের পরিবর্তে একটি অঙ্গ কর্তন করা হয়। আর এখানে এর বিনিময়ে একটি অঙ্গের মালিকানা অর্জিত হয়। যা স্বামী ব্যবহার ব্যবহার করে অন্যের ব্যবহারের অযোগ্য (নষ্ট) করে দেয়। তাই এই গুণ্ডাঙ্গের মূল্যও তিন দিরহাম হওয়া উচিত।

- * ইবরাহীম নাখঈর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৪০ দিরহাম।
- * আল্লামা ইবন শুবরামার মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৫ দিরহাম।
- * সাঈদ ইবন যুবায়েরের মতে, ৫০ দিরহাম।
- * কতিপয় আলিমের মতে, ২০ দিরহাম।
- * কেউ কেউ বলেন, ১ দিনার।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ১০ দিরহাম।

দলীল (১): পবিত্র কুরআনের আয়াত-“أَزْوَاجِهِمْ فِي فَرْضَنَا عَلَيْهِمْ”

অর্থাৎ, তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পুরুষদের উপর আমি (আল্লাহ) যা নির্ধারণ করেছি আমার জানা আছে। (আহযাব: ৫০)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মহর নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু আয়াতটি مُجْتَلٍ তথা সংক্ষিপ্ত। তাই নবী করীম (সাঃ) এর তাফসীরে বলেন-

... عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَهْرَ أَقْلٌ مِنْ عَشْرَةِ

دَرَاهِمَ - (دار قطني ج ৩ ص ২৫০, بهيقي ج ৭ ص ২৫০)

অর্থাৎ, ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, দশ দিরহামের কম কোন মহর নেই।

দলীল (২): বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বলা যায় যে, কুরআনে যেহেতু বলা হয়েছে মহর নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সমস্ত কুরআন ও হাদীস তালাশ করলে নিম্নবর্ণিত হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস ব্যতীত আর কোথাও এর নির্ধারিত অংশ খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদীসটি হল-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا

كُفُوءًا وَلَا يَزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ - (بهيقي ج ৭ ص ২৫০, دار

قطني ج ৩ ص ২৫০, فتح القدير ج ৩ ص ১৮৬)

অর্থাৎ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ কুফু ছাড়া মহিলাদের বিয়ে দেয়া যাবে না এবং তাদেরকে অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দেবে না। আর দশ দিরহামের কম কোন মহর নেই। যদিও কতক মুহাদ্দিস উপরোল্লিখিত হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি যঈফ নয়। যেমন, হাফিজ ইবন হাজার (রহ.) বলেন-

إِنَّهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَسَنٌ وَلَا أَقْلٌ مِنْهُ - (شرح النقاية ج ১ ص ৫৭৭, اعلاء السنن ج ১১ ص ৮০-৮১,

فتح الملهم ج ৩ ص ৫৮০)

অর্থাৎ, এটি এই সনদে হাসান-এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়।

তাছাড়া যুক্তির নিরীখেও বলা যায় যে, বিয়েতে মহরকে মূলত এই ভিত্তিতেই **مَشْرُوع** (আইনসম্মত) করা হয়েছে, যাতে মহরবাবদ মহিলার নিকট এতটুকু মাল হস্তগত হয়, যা ন্যূনতমও গুরুত্ব রাখে। আর ইহা হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীসের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, যা দশ দিরহাম। কেননা, শাফিঈর (রহ.) নিকট তো বলতে গেলে এর কোন অস্তিত্বই নেই। (যেমন, এক জোড়া জুতা, কয়েকটা খেজুর, এক দণ্ড লোহা, কুরআন শিক্ষাদান ইত্যাদি।) আর মালিকীদের মতে, তিন দিরহাম। ইহাও তো একটা মেয়ের জীবনে একেবারেই নগণ্য পরিমাণ সম্পদ। **درس ترمذي ج ৩ (১৭২০)**

জবাবঃ হযরত শাফেঈ (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) মহরের পরিমাণ **نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ**-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আভিধানিক অর্থে **نَوَاحٍ** বলা হয় খেজুরের বীচি বা আঁটিকে। হতে পারে ঐ পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য দশ দিরহামের সমান ছিল। **درس ترمذي ج ৩ (১৭২০)**

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসের রেওয়ায়েতে ইসহাক ইবন জিবরাঈল এবং মুসলিম ইবন রুমান যঈফ। সুতরাং এর দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **فتح القدير ج ৩ (২০৭)**

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদীসে আসিম ইবন উবায়দুল্লাহ নামক একজন রাবী রয়েছে। ফলে হাদীসটি যঈফ। কেননা, ইমাম আহমদ, ইবন উয়াইনা, আবু যুরআ, ইয়াহইয়া, আবু হাতেম, ইবন খুযাইমা, ইমাম দারা কুতনী ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) প্রমুখের মতে, তিনি যঈফ রাবী। তাই তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

(میزان الاعتدال ج ২ ص ২০১-২০২)

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ **وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ** তথা যদি একটি লোহার আংটিও হয়, (তবু এর দ্বারা মহর আদায় কর) এ জাতীয় হাদীসগুলো ঐ সময়ের, যখন শরীয়তে মহরের বিধান প্রবর্তিত হয়নি।

অথবা, বলা যায় যে, এ হাদীসগুলো **لَا مَهْرَ لَاقِلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ** হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

অথবা, কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় খবরে ওয়াহেদ দলীলযোগ্য নয়।

অথবা, হাদীসগুলো **مَهْرٌ مُعَجَّلٌ** বা নগদ মহরের উপর প্রযোজ্য। পূর্ণ মহরের ব্যাপারে বলা হয়নি। (درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ২৬)

কেননা, বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, আরবরা স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে **مَهْرٌ مُعَجَّلٌ** হিসেবে কিছু প্রদান করা তাদের কাছে একটা মামুলী ব্যাপার ছিল। **مَهْرٌ مُعَجَّلٌ** ছাড়া স্ত্রীর সাথে সহবাসকারীকে তারা খারাপ দৃষ্টিতে দেখত। যেমন হাদীসে এসেছে-

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْحَلِصِيُّ ... عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَعَمَ أَعْطَاهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- (ابو داود ج ১ ص ২৮৭-২৯০ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل الخ)

অর্থাৎ, কাসীর ইবন উবায়দ আল-হিলসী ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রাঃ), ফাতিমা বিনত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি নগদ কিছু দেওয়ার আগে তাঁর (ফাতিমার) সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে বাধা দান করেন এবং আলী (রাঃ)-কে কিছু নগদ মহর আদায় করতে বলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দেওয়ার মত কিছুই নেই। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি তাকে তোমার লৌহবর্মটি প্রদান কর। তখন তিনি তাঁকে তা প্রদানের পর তাঁর (ফাতিমা) সাথে সহবাস করেন।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, ফাতিমা (রাঃ)-কে যে লৌহবর্মটি দেয়া হয়েছে, তা **مَهْرٌ مُعَجَّلٌ** হিসেবে। কেননা সবাই জানে যে, তাঁর মহর ধার্য করা হয়েছিল এর চেয়ে অনেক বেশি। (فتح القدير ج ৩ ص ২০৬)

ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ চোরের হাত কাটার ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ নিয়ে হাদীসে বিভিন্নতা আছে। কেননা বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, এর পরিমাণ হল দশ দিরহাম। যেমন-

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ— (ابو داود ج ২ ص ৬০২ باب ما يقطع فيه السارق)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কেটে দেন যার মূল্য ছিল এক দীনার অথবা দশ দিরহাম।

তাছাড়া হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) মধ্যে দশ দিরহামের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও হানাফীদের অভিমতই অগ্রাধিকার পাবে। (درس مشکوٰه ج ৩ ص ২৬)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ কুরআন শিক্ষাদানকে মহর হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা- ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, "تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ" বা কুরআন শিক্ষা মহর হতে পারে। কেননা, তাঁদের নিকট মহরের জন্য মাল হওয়া শর্ত নয়। (شرح المهدب ج ১০ ص ৪৮৬)

দলীলঃ ... فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ—

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, লাইস, মাকহুল এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, "تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ" বা কুরআন শিক্ষা মহর হতে পারে না। কেননা তাঁদের নিকট মহরের জন্য সম্পদ হওয়া শর্ত। (المغني ج ৬ ص ১৮৩-১৮৪)

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- "وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ"— অর্থাৎ, এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে। শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে। (নিসাঃ ২৪)

উক্ত আয়াতে সম্পদ তলবের হুকুম দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, যা মাল নয় তা মহর হতে পারে না। আর কুরআন শিক্ষা যেহেতু মাল নয়, তাই তা মহর হতে পারে না।

জবাবঃ ১। তালীমে কুরআনকে মহর বানানো ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের হুকুম। তখন ছিল মুসলমানদের আর্থিক অসচ্ছলতা। যখন মুসলমানগণ আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করলেন, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

২। অথবা, খবরে ওয়াহেদ আয়াতের মোকাবেলায় দলীল হতে পারে না।

৩। অথবা, বলা যায় যে, হাদীসে বর্ণিত **الْقُرْآنِ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ** বাক্যে **ب** হরফটি **سَبَبٌ** বা কারণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, **عَوَضَ** বা বিনিময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি। অতএব এর অর্থ হবে- **فَدَّ زَوْجَتُكَهَا بِسَبَبِ كَوْنِ الْقُرْآنِ عِنْدَكَ**

অর্থাৎ, তোমার কাছে কুরআনের শিক্ষা থাকার কারণে তাকে বিবাহ দিলাম।

৪। অথবা, বলা যায় যে, এটি ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে ঐ সাহাবীর জন্য খাস। তাই ইহা অন্যের জন্য দলীল হতে পারে না। (المغني ১৮ ص ১৬৪)

যেমন, হাদীসে উল্লেখ আছে-

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ ... وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابو داود ج ১ ص ২৮৭ باب في التزويج على العمل بعمل)

অর্থাৎ, হারুন ইবন যায়িদ ... বর্ণনা করেছেন, ... রাবী বলেন, মাকহুল বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে এরূপ বিবাহ (মহর ব্যতীত) আর বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মহর উল্লেখ ব্যতীত বিবাহের হুকুমঃ

বিবাহের সময় মহর উল্লেখ না করলে অথবা মহর না দেয়ার শর্তে বিবাহ করলে, তাহলেও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। কেননা, বিবাহ সম্পাদনের জন্য ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল শর্ত। মহর উল্লেখ করা শর্ত নয়। যদি শর্ত হত, তাহলে মহর উল্লেখ করা ছাড়া বিবাহই সহীহ হত না। যদি বিবাহের সময় মহরের পরিমাণ উল্লেখ করে, তাহলে সেই উল্লিখিত পরিমাণ মহর দেয়া ওয়াজিব। আর উল্লেখ না করলে মহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। মহর উল্লেখ করা ব্যতীত বিবাহ সহীহ হওয়ার দলীল হচ্ছে এই-

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

অর্থাৎ, তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে অথবা কোন মহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (বাকারাঃ ২৩৬)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা মহর উল্লেখ ছাড়া যদি বিবাহই শুদ্ধ না হয়, তাহলে তালাক হয় কিভাবে?

ওয়ালিমার হুকুমঃ নবী করীম (সাঃ) বলেন- **"أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاهِدٍ"** অর্থাৎ, তুমি ওয়ালিমা

কর যদি একটি বকরীর দ্বারাও হয়। (পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।)

অভিধানবেত্তা এবং ফকীহগণ বলেন যে, ওয়ালিমা ঐ ভোজসভাকে বলা হয়, যা বাসর রাতের পর খাওয়ানো হয়। আর **وَلِيْمَةٌ** (ওয়ালিমা) শব্দটি নির্গত হয়েছে **وَلَمْ**

থেকে যার অর্থ হচ্ছে মিলন বা একত্র হওয়া। যেহেতু এই রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে, তাই একে ওয়ালিমা বলা হয়।

আবার অনেকেই বলেন, ولم শব্দের অর্থ জমা করা। অতঃপর এর প্রয়োগ সেসব খানার উপর হতে লাগল, যার জন্য লোকজনকে জমা করা হয়। পরবর্তীতে ওলীমা বলতে বৌ-ভাতকে বুঝানো হয়। (৩৭৭ ص ৩ ج ترمذي)

* ওয়ালিমা করা সুন্নত না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আহলে যাহিরের মতে, ওয়ালিমা করা ওয়াজিব এবং আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) লিখেন, যে বিয়ে করবে, কম হোক বেশি হোক, তার উপর ওয়ালিমা করা ফরয।

(المحلّى ج ১ ص ১০০)

তবে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতাবলম্বীর কেউ কেউ বলেন ওয়ালিমা ওয়াজিব, আবার কারো কারো মতে ইহা সুন্নত বা মুস্তাহাব। তবে এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে। (شرح المذهب ج ১ ص ১০৮-১০৯)

দলীল (১): হাদীসে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী- **أَوْنُمُ وَلَوْ بِشَاةٍ** উক্ত হাদীসে **أَمْرُ** (নির্দেশ)-এর সীগা আনা হয়েছে, যা দ্বারা ওয়াজিব বুঝায়।

দলীল (২): আল্লামা তিবরানী (রহ.) বর্ণনা করেন- **أَوْنُمُهُ حَقٌّ** তথা ওয়ালিমা একটি হক। উক্ত হাদীসে **حَقٌّ** শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যার দ্বারা ওয়াজিব বুঝায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ অধিকাংশ আলিমের মত হল, ওয়ালিমা করা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। (أوجز المسالك ج ১ ص ১৩৫)

দলীল: নবী করীম (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) ব্যতীত আর কাউকে ওয়ালিমার আদেশ করেননি। যদি তা ওয়াজিবই হত, তাহলে তিনি অন্যান্য সাহাবীদেরকেও ওয়ালিমা করার হুকুম দিতেন। এতে বুঝা যায় যে, তা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত।

জবাব: (১) আহনাফগণ বলেন, প্রথমোক্ত হাদীসে **أَمْرُ**-এর যে সীগা ব্যবহার করা হয়েছে তা **أَمْرٌ لِلإِسْتِحْبَابِ** তথা আমর সুন্নত ও মুস্তাহাবের উপর প্রযোজ্য হবে, ইহা ওয়াজিবের জন্য নয়।

(২) দ্বিতীয় দলীলের জবাব: ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত **حَقٌّ** (হক) শব্দটি দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি বাতিলের মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ ওয়ালিমা করা নাজায়েয বা বাতিল নয়; বরং জায়েয ও সুন্নত। সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (فتح الهاري ج ٩ ص ٢٣٠، اعلاء السنن ج ١١ ص ١٠)

ওয়ালীমার সময়সীমাঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, ওয়ালিমা সাত দিন পর্যন্ত করা জায়েয তথা মুস্তাহাব। (مرواة ج ٦ ص ٢٥٦)

... عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي سَيْرِينَ دَعَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا أَبِي بَنٍ كَعْبٍ

وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ— (مصنف ابن أبي شيبة ج ٢ ص ٣١٣، سنن كبرى يميني ج ٧ ص ٢٦١)

অর্থাৎ, ... হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার পিতা সীরীন (দ্বিতীয়) বিয়ে করেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণকে সাত দিন পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছেন। যখন আনসারীদের দিবস এল, তখন তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং দাওয়াত দিলেন উবাই ইবন কাব ও যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ)-কে।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, প্রথম দিন ওয়ালিমা করা উত্তম। দ্বিতীয় দিন করা জায়েয এবং এর পরেও করা জায়েয, তবে অপছন্দনীয়। এবং এর উপকারিতা আশা করা যায় না। (المعني ج ٧ ص ٣، اعلاء السنن ج ١١ ص ١٣)

... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سَمْعَةٌ وَرِيَاءٌ— (ابو داود ج ٢ ص ٥٢٦، كتاب الاطعمة باب في كم تستحب

الوليمة، ترمذي ج ١ ص ٢٠٨، باب ما جاء في الوليمة، ابن ماجه ص ١٣٩)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, প্রথম দিনে ওয়ালিমা যথাযথ। দ্বিতীয় দিন ভাল। আর তৃতীয় দিন লোক দেখানো, খ্যাতি ও রিয়া।

জবাবঃ এসব ঘটনা তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন দাওয়াতী মেহমান বেশি হওয়ার কারণে প্রতিদিন আলাদা দলকে দাওয়াত দেয়া হয়। (فتح الهاري ج ٩ ص ٢٤٣)

অথবা, এও হতে পারে যে, ইহা ছিল কতক সাহাবীর ইজতিহাদ, যা রেওয়াজেতের মোকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, ওয়ালিমা যে বকরী দ্বারাই হতে হবে, তা জরুরী নয়; বরং ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা করবে। তবে অতিরঞ্জিত যাতে না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

(অর্থঃ, উত্তম বিবাহ তাই, যা সহজে সম্পন্ন হয়। (ابو داود ج ١ ص ٢٨٨، باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْخ)

بَابُ فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ ص ২৮৭

কুমারী স্ত্রীর সাথে অবস্থানকাল

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا— (بخاري ج ২ ص ৭৮০ باب إذا تزوج البكر على الثيب، مسلم ج ১ ص ৪৭২ باب قد رما تستحقه البكر والثيب الخ، ترمذي ج ১ ص ২১৬ باب القسمة للبكر والثيب، ابن ماجه ص ১৩৭)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে সায়েবা (অকুমারী) মহিলার বর্তমানে বিবাহ করে, তখন তার সাথে সাত রজনী যাপন করবে। আর যখন কুমারীর বর্তমানে সায়েবাকে বিবাহ করবে, তখন তার সাথে তিনরাত যাপন করবে।

বিশ্লেষণঃ যদি কারো একাধিক স্ত্রী হয়, তাহলে তাদের সাথে রাত্রিযাপন করা, পানাহার এবং কাপড়-চোপড় ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা ওয়াজিব। তবে সহবাস ও মহব্বতের ক্ষেত্রে সমতা হওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيُعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ يَغْنِي الْقَلْبَ— (ابو داود ج ১ ص ২৭০ باب القسم بين النساء، ترمذي ج ১ ص ২১৬-২১৭ باب التسوية بين الضرائر، نسائي ج ১ ص ৭৪ ميل الرجل الى بعض نسائه، ابن ماجه ص ১৪৩)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক (সবকিছুই) বন্টন করতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করেছি। আর যার মালিক আপনি, আমি নই, অর্থাৎ অন্তর; সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

* একথার উপর সবাই একমত, যে মহিলাকে বিবাহ করবে সে হয়ত কুমারী (بكره) হবে অথবা অকুমারী (ثيبه) হবে। যদি সে নববিবাহিতা মহিলা কুমারী হয়, তাহলে তার সাথে সাত রাত অবস্থান করবে। আর যদি অকুমারী হয়, তাহলে তার সাথে তিন রাত অবস্থান করবে। যা অনুচ্ছেদের শুরুতে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। এবং এতে কারো কোন দ্বিমত নেই।

প্রশ্ন হল, ঐ সাত অথবা তিন রাত অন্য স্ত্রীর সাথে রাতযাপনের ক্ষেত্রে পালার অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি ইহা পালার বহির্ভূত থাকবে, বন্টনের মধ্যে পরিগণিত হবে না, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ও আবু সওর (রহ.) প্রমুখের মতে, উল্লিখিত সাত অথবা তিন রাত পালার মধ্যে পরিগণিত হবে না; বরং ইহা নববিবাহিতা স্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত। এরপর থেকে ভাগ শুরু হবে। (شرح نووي ج ١ ص ٤٧٢)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে এক বিধান বর্ণনা করেছেন যে, নবাগত কুমারী স্ত্রীর জন্য সাত এবং নবপরিণীত অকুমারী স্ত্রীর জন্য তিন রাত। সুতরাং বুঝা যায় যে, ইহা তাদের জন্য অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র অধিকার। অন্যরা তাতে শরীক নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, হাম্মাদ (রহ.) প্রমুখের মতে, এ দিনগুলো ভাগের দিন থেকে বাদ পড়বে না, বরং এগুলোও পালার ভিতরে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যদি নববিবাহিতা কুমারী স্ত্রীর সাথে সাত রাত যাপন করে, তাহলে পূর্বের স্ত্রীর সাথেও সাত রাত যাপন করতে হবে। আর অকুমারী নববধূর সাথে যদি তিন রাত যাপন করে, তাহলে পূর্বের স্ত্রীর সাথেও তিন রাত অতিবাহিত করতে হবে। (فتح القدير ج ٣ ص ٣٠٠)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী - فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً -

অর্থাৎ, আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। (নিসাঃ ৩)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ -

অর্থাৎ, তোমরা নারীদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখ। (নিসাঃ ১২৯)

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইনসাফভিত্তিক বন্টনকে ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা আয়াতদ্বয় مطلقاً (শর্তহীন) উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাতন বা নবাগত এমন কোন বিশ্লেষণ নেই।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ

سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّعْتَ لَكَ وَإِنْ

سَبَّعْتَ لَكَ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ - (ابو داود ج ١ ص ٢٨٩ باب في المقام عند البكر، مسلم ج ١ ص ٤٧٢)

باب قد رما تستحقه البكر الخ، ابن ماجه ص ١٣٩)

অর্থাৎ, ... উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন উম্মে সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তার নিকট তিন রাত অবস্থান করেন।

এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, এটা তোমার জন্য আমার পক্ষ হতে কম নয়, অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করি, তখন আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত অতিবাহিত করতে হবে।

দলীল (৩): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ - (ابو داود ج ১ ص ২৯০ باب القسم

بين النساء، ترمذي ج ১ ص ২১৭ باب التسوية بين الزوجات، نسائي ج ২ ص ৯৫، ابن ماجه ص ১৫৩)

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় আসবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, রাত যাপনের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মাঝে সমতা বজায় রাখা অত্যাবশ্যিক। নববধূ হোক অথবা পূর্বের স্ত্রী হোক।

জবাবঃ (১) হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে তো কুমারী নববধূর সাথে সাত রাত এবং অকুমারী নববধূর সাথে তিন রাত যাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরে কি করবে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্ত্রীর সাথে কয়দিন থাকতে হবে, এ ব্যাপারে উক্ত হাদীসে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং বলা যায়, হাদীসটি সংক্ষিপ্ত (مَجْمَل)। আর উম্মে

সালামা (রাঃ)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত (تَفْصِيلِي) বর্ণিত হয়েছে। (যা হানাফীরা নিজেদের দ্বিতীয় দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।) সুতরাং সংক্ষিপ্ত হাদীসটি থেকে বিস্তারিত হাদীসের দিকে প্রত্যাগমন করা হবে।

(২) অথবা, হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে যে কুমারী নববধূর সাথে সাত রাত এবং অকুমারী নববধূর সাথে তিন রাত যাপনের হুকুম এসেছে, এই অগ্রাধিকার প্রদান মূলত অতিরিক্ত হিসেবে নয়, বরং এই অগ্রাধিকার প্রদান মূলত শুরু করার হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যখন কুমারী বা অকুমারীকে বিবাহ করা হবে, তখন বন্টনের পদ্ধতি বদলে দিয়ে সাত অথবা তিন রাতের পালা তাদের থেকে শুরু হবে।

(اعلاء السنن ج ১১ ص ১১৫-১১৬، كتاب الحجة على اهل المدينة ج ৩ ص ২৫৯-২০৩)

সহবাস সম্পর্কীয় অন্যান্য হাদীস : بَابُ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ ص ২৭৩

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِمَّا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْإِنْتَصَارِ وَهُمْ أَهْلٌ وَتَنِّ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلٌ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ

فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِّنْ فَعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَن لَّا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فَعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يُّشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُذْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَانْكَرَ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُنُوتِي عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَلَا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى سَتَرَى أَمْرَهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَتَى سِتْنَمُ أَيُّ مُقْبِلَاتٍ وَمُذْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَغْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ-

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (আল্লাহ তাঁকে বা তাঁদেরকে মার্জনা করুন) বলেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে আনসারগণ দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত এবং ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করত। তারা (ইয়াহুদীরা) আহলে কিতাব ছিল এবং সেই জন্য তারা (ইয়াহুদীরা) আনসারদের উপর জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাত। আর তাঁরা (আনসারগণ) অনেক ব্যাপারে তাদের (ইয়াহুদীদের) অনুসরণ করত। আর আহলে কিতাবদের নিয়ম ছিল যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস করত। আর এটাই ছিল স্ত্রীদের সাথে সহবাসের নিয়ম। আর আনসারদের এই গোত্রটি তাদের নিকট হতে এই নিয়মটি গ্রহণ করে। আর কুরাইশদের এই গোত্রটি তাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় সহবাস করত, এমনকি তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সামনাসামনি, পশ্চাদদিক দিয়ে ও চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় সহবাস করত। অতঃপর তারা যখন মুহাজির অবস্থায় মদীনাতে আগমন করে, তখন তাদের কোন এক ব্যক্তি আনসারদের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করে। তখন সে তার সাথে ঐ প্রক্রিয়ায় সহবাস করতে গেলে উক্ত মহিলা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এখানকার সহবাসের একটিই নিয়ম, কাজেই তুমি সেই নিয়মে আমার সাথে সঙ্গম কর, অন্যথায় আমার নিকট হতে দূরে সরে যাও। অতঃপর তাদের এই ব্যাপারটি জটিলতর হলে এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করা হয়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন, “তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। কাজেই তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেক্ষেপে ইচ্ছা গমন কর।” তা

সম্মুখ দিয়ে হোক, পশ্চাদ দিক থেকে হোক, কিংবা চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, সহবাস করবে।

বিশ্লেষণঃ রাফেযীদের মতে, স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে (دُبُر) সহবাস করা জায়েয আছে।

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যে রূপ ইচ্ছা গমন কর। (বাকারঃ ২২৩)

রাফেযীরা এই আয়াতের বিশ্লেষণ করে বলে যে, উক্ত আয়াতে أَنَّى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর أَنَّى শব্দটি দুটি অর্থে আসে। যেমন- (১) مِنْ أَيْنَ তথা যেকোন জায়গা দিয়ে (عُمُومَ مَكَانٍ), যৌনাসঙ্গের দ্বারে হোক অথবা গুহ্যদ্বারে হোক। (২) كَيْفَ তথা যেকোন অবস্থায় (عُمُومَ حَالٍ), সম্মুখ দিয়ে, চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক কিংবা পশ্চাদদিক থেকে হোক। সুতরাং তারা উভয় অর্থ গ্রহণ করে বলে যে, স্ত্রীর সামনের রাস্তা (قُبُل) এবং পিছনের রাস্তা (دُبُر) তথা উভয় রাস্তা দিয়েই সহবাস করা জায়েয।

(درس مشكوة ج ৩ ص ২৩، تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৮২)

দলীল (২)ঃ হযরত নাফে (রাঃ) হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে একটি সংক্ষিপ্ত (مُجْمَل) রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন যে, হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন-

هَذَا حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فِي دُبُرِهَا তথা তোমরা যে রূপে চাও, অর্থাৎ মহিলার গুহ্যদ্বারে।

* চার ইমামসহ সকল ইমাম ও উম্মতের মতে, গুহ্যদ্বারে সহবাস করা সরাসরি হারাম। ইবনুল মালিক বলেন, ইহা শুধু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এ উম্মতের জন্য নয়, বরং পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মে তা হারাম ছিল।

দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত- نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় যে, স্ত্রীগণকে ক্ষেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ক্ষেতে যেমন বীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে ফসল উৎপন্ন হয়, ঠিক তদ্রূপ এক্ষেত্রে স্ত্রী হল ক্ষেত আর এর বীজ হল বীর্য এবং ফসল হল সন্তান। সুতরাং এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, ফসল তথা সন্তান পেতে হলে বীজ তথা বীর্যকে অবশ্যই ক্ষেতে বপন করতে হবে। আর ইহা হল স্ত্রীর যৌনাসঙ্গ। সুতরাং পশ্চাদদ্বারে (دُبُر) বীজ (বীর্য) ঢাললে ফসল তথা সন্তানের আশা করা যাবে না। সুতরাং আয়াতে أَنَّى দ্বারা

عَمُومٌ مَكَانَ তথা ‘যে কোন জায়গা’ (دُبُر-قِيل) বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা عَمُومٌ حَال তথা যে কোন অবস্থায় বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, স্ত্রীর সামনের রাস্তায় যেকোন অবস্থায়ই তোমরা চাও সহবাস করতে পার, সম্মুখ দিয়ে হোক, চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক অথবা পুরুষ স্ত্রীর পিছন দিক থেকে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করুক, সবই জায়েয।

(درس مشکوة ج ৩ ص ২৩، تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৮৩)

দলীল (২): পবিত্র কুরআনের আয়াত-

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ-

অর্থাৎ, তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হয়েছে অবস্থায় সহবাসের বিধান সম্পর্কে। বলে দিন এটা অশুচি (কষ্টকর বিষয়)। কাজেই তোমরা হয়েছে অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। (বাকারাহঃ ২২২)

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় যে, হয়েছে অবস্থায় সহবাস করা হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে অশুচি বা কষ্টকে (أذى)। সুতরাং এ আয়াত দ্বারাও গুহাধ্বরে সহবাস করা হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা, অশুচি বা কষ্টের কারণ এতেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ, হয়েছে অবস্থায় সহবাসে স্ত্রী যেমন কষ্ট পায়, তদ্রূপ গুহাধ্বরে সহবাস করলেও স্ত্রী কষ্ট পায়। সুতরাং উভয়টি হারাম।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ (৩) দলীল

مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا- (ابو داود ج ১ ص ২৭৬ باب في جامع النكاح)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।

সুতরাং উপরোল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীর গুহাধ্বরে সহবাস করা হারাম।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ রাফেয়ীরা اُنْثَى শব্দের দ্বারা যে ব্যাপক অর্থ নিয়েছে-

“যেকোন জায়গা দিয়ে” (عموم مكان) আসলে অত্র আয়াতে তা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

কেননা, আয়াতের পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সহবাসের জায়গা নির্দিষ্ট হতে হবে। অতঃপর সহবাসের ধরণ যাই হোক। কেননা আয়াতে শস্যক্ষেত্রে আসার কথা বলা হয়েছে। আর একথা তো স্পষ্ট যে, গুহাধ্বার কারো নিকট مَوْضِعِ حَرْث তথা শস্যক্ষেত্রে নয়। সুতরাং ইহা কোনভাবে জায়েয নয়।

* তাছাড়া আয়াতের শানে নুযুলের দ্বারাও বুঝা যায় যে, ইয়াহুদীদের আকীদা ছিল যে, স্ত্রীর সাথে পশ্চাদদিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করার ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তাদের এ আকীদাকে শোধরানোর জন্য এ আয়াত নাখিল হয়। যেমন, হাদীসে এসেছে-

... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدَّرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاءَكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرِّثَكُمْ أَنْتَى شِئْتُمْ - (ابو داود ج ১ ص ২৭৬ باب في جامع اللكاح، مسلم ج ১

ص ৬৩ جواز جماع امرأته في قبلها الخ، ابن ماجه ص ১৩৭-১৪০)

অর্থাৎ, ... মুহাম্মদ ইবন আল-মুনকাদির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহুদীরা বলত, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করে তখন যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তখন আল্লাহ তা আলা এই আয়াত নাখিল করেন, “তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। কাজেই তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপে গিয়ে ফসল উৎপাদন কর।”

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ

(১) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, হযরত ইবন উমর (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি (রাঃ) বলেন- هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ؟

অর্থাৎ, এমন কর্ম কি কোন মুসলমান করতে পারে?

সুতরাং হযরত ইবন উমর (রাঃ) নিজেই যখন ইহাকে অস্বীকার করেছেন, অতএব তা দলীল হতে পারে না।

(২) অথবা, ইবন উমর (রাঃ)-এর دُبُر দ্বারা উদ্দেশ্য হল- قَبْلِهَا

অর্থাৎ, “স্ত্রীর পশ্চাদ দিক হতে তার যৌনাঙ্গে সহবাস করা।” আর এটা তো সবার নিকটই জায়েয।

(৩) অথবা, মায়মুন বলেন, নাফে (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর সৃতিশক্তি কিছুটা কমে যাওয়ার পর এই রেওয়ায়েত করেন। তাই ইহা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(تنظيم الاثبات ج ২ ص ১৮৩، درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ২৪-২৩)

আযল সম্পর্কে : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ ص ২৯০

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ إِنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُودَةَ الصُّغْرَى قَالَ كَذَبْتَ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ

تُصْرِفَهُ— (بخاري ج ২ ص ৭৮৫ باب العزل، مسلم ج ১ ص ৬০৫ باب حكم العزل)

অনুবাদঃ ... আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটি দাসী আছে। আর আমি তার সাথে সহবাসের সময় ‘আযল’ করি। আর আমি এটা অপছন্দ করি যে, সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাই চাই যা অন্য লোকেরা চায়। আর ইয়াহুদীরা বলে যে, আযল হল ছোট শিশুহত্যা। এতদশ্রবণে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, বরং আল্লাহ তাআলা যাকে সৃষ্টি করতে চান, কেউই তার আগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

আযল (عزل)-এর আভিধানিক অর্থঃ عزل শব্দটি بِبَابِ ضَرْبٍ يَضْرِبُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল- (১) আলাদা করা, (২) অপসারণ করা, (৩) বরখাস্ত করা, (৪) দূর করা, (৫) বের করা, (৬) প্রত্যাহার করা, (৭) বিচ্ছিন্ন করা, (৮) পৃথক করা, (৯) সরিয়ে ফেলা, (১০) বিরত রাখা ইত্যাদি।

عَزَلَ (আযল)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন-

هُوَ أَنْ يُسْقَطَ الْمَنِيُّ بِأَنْ يُخْرِجَ الذَّكَرَ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ حِينَ قُرْبِ الْإِنْزَالِ وَقَدْ جُمِعَ-

অর্থাৎ, সহবাসের সময় চরম উত্তেজনার মুহূর্তে স্ত্রী যৌনাঙ্গে বীৰ্যপাত না করে বাইরে বীৰ্যপাত করাকে আযল বলে।

(২) عَوْنُ الْمَعْبُود গ্রন্থকার বলেন-

الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامَعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ— (عَوْنُ الْمَعْبُود ج ১ ص ১৭৭)

অর্থাৎ, আযল হল স্ত্রী সঙ্গম করার সময় বীৰ্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গকে যৌনী থেকে বের করে এনে বাইরে বীৰ্যপাত করা।

(৩) العزل هو اخرج ذكره من الفرج قبل ان ينزل المني (রহ.) বলেন

অর্থাৎ, সহবাসকালে বীৰ্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষের যৌনাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গ হতে বের করে নিয়ে আসা।

(৪) **فقہ الاسلامی**-এর হাশিয়ায় বলা হয়েছে-

هُوَ النَّزْعُ بَعْدَ الْإِيلَاجِ لِيَنْزِلَ الْمَاءُ خَارِجَ الْفَرْجِ-

মোটকথা, সহবাসকালে বীৰ্যপাতের সময় নারীর যৌনাঙ্গে বীৰ্যপাত না করে বাইরে নিষ্ক্ষেপ করা।

পরিবার পরিকল্পনাঃ এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। পুরো কুরআন হাদীস চষে কোথাও এর পক্ষে বা বিপক্ষে সুস্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া মুশকিল। এ বিষয়ে রচিত হয়েছে অনেক বড় বড় বই-পুস্তক এবং আজো লেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক সভা, সেমিনার ও কনফারেন্স। কিন্তু এ বিষয়ে একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি ফকীহগণ। ফলে মুসলিম উম্মাহ একটি বিভ্রান্তিতে নিপতিত। এবং এ বিষয়টি অনেকের কাছে খুব একটা স্পষ্টও নয়। কেননা পরিবার পরিকল্পনার কিছু দিক এমন রয়েছে যেগুলো জায়েয। কিন্তু এ ব্যাপারে জ্ঞান না থাকায় অনেকে গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। আবার অনেকে পতিত হচ্ছে সীমাহীন কষ্টে। তাই এ ব্যাপারে নিম্নে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ও অন্যান্য হক্কানী আলিমগণ মনে করেন যে, “জন্ম-নিয়ন্ত্রণ” শব্দটাই ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ তো মানুষের কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঘোষিত হয়েছে- **هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ**

অর্থাৎ, আল্লাহই একমাত্র জীবন ও মৃত্যু দান করেন। (ইউনুসঃ ৫৬)

সুতরাং এ শব্দটি অবশ্যই বর্জনীয়। কেননা, এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, তথাকথিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি গ্রহণ করার পরেও সন্তান জন্ম লাভ করেছে। এমন একটি উদাহরণ হাদীসেও পাওয়া যায়-

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ أَعَزَلْتُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ سَيِّئَاتِهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَيْتَ الرَّجُلُ ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ سَيِّئَاتِهَا مَا قُدِّرَ لَهَا- (ابو داود ج ١ ص ٢٩٥)

অর্থাৎ, ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, আমার একটি দাসী আছে, যার সাথে আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক আমি তা পছন্দ করি

না। তিনি বলেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করতে পার। তবে জেনে রাখ! তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে, তা হবেই। রাবী বলেন, উক্ত ব্যক্তি কিছুদিন পর পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি বলেন, আমি তো এ ব্যাপারে তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

হ্যাঁ, মানুষ যৌনকার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বটে। কিন্তু একে কোনক্রমেই সরাসরি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না। তাই তাঁরা মনে করেন, ইহার নাম সরাসরি জন্ম নিয়ন্ত্রণ না রেখে “গর্ভনিরোধ” রাখা যেতে পারে।

আল্লামা তকী উসমানী বলেন, আমাদের যুগে পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ নামে যে কর্মকাণ্ড চলছে, এর অবৈধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমত, পরিবার পরিকল্পনার অনুমতি যেসব স্থানে প্রমাণিত সেগুলোর সারকথা হল, ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা করা। কিন্তু এটিকে একটি সার্বজনীন কর্মসূচীতে পরিণত করা এবং এ কাজের জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও উৎসাহ প্রদান মোটেই জায়েয নয়। দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্যও হারাম। কারণ, এর উদ্দেশ্য হল দরিদ্রতার ভয়। আর এই কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারাও ফাসিদ। মুবাহ (জাযিয়) কাজও খারাপ নিয়তের কারণে হারাম হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ- অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। কারণ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিকের ব্যবস্থা করি। (বনী ইসরাইলঃ ৩১)

অতএব, এই কর্মকাণ্ড সৃষ্টিকর্তার রব্বীয়ত ও রায়যাকীয়ত ব্যবস্থাকে নিজের হাতে তুলে নেয়ার নামান্তর। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا- অর্থাৎ, আর পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। (হূদঃ ৬)

আর কুদরতের বিধান হল, সর্বযুগে উৎপাদনের পরিমাণ সে যুগের চাহিদা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন, অতীতে সমস্ত সফর হত ঘোড়া ইত্যাদির উপর চড়ে। সে যুগে এ ধরনের সফরে কাজে আসার মত জন্তুর সংখ্যাও হত বহুল পরিমাণে। এখন যেহেতু সফর অন্যান্য গাড়িতেও হয়, ফলে ঘোড়া ইত্যাদির বংশও কমে গেছে। পক্ষান্তরে বর্তমানে গোটা জীবনই পেট্রোল ও তেলের সাথে ঘূর্ণায়মান। অতএব, ভূমিও তার ভান্ডারগুলো অকৃপণভাবে খুলে দিচ্ছে। এই বাস্তব সত্যটিকেই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন-

وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ- অর্থাৎ, আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে, আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি। (হিজরঃ ২১)

তৃতীয়ত, তিনি আরো মনে করেন, দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনার মনোভাব গড়ে তোলা, এটি ইসলামের চির দূশমন ইহুদী ও খৃষ্টানদের একটি রাজনৈতিক প্রতারণামাত্র। এর দ্বারা তাদের মূল উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রোধ করা। মুসলমানদের বিচার-বিশ্লেষণ না করেই এর ফাঁদে পড়া উচিত নয়। কেননা, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ - (ابو داود ج ١ ص ٢٨٠ باب في تزويج الايتام، نسائي ج ٢ ص ٧٠ كراهية تزويج المقيم)

অর্থাৎ, তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর, যারা স্বামীদের অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে। কেননা, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

অধুনা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণও বলেন যে, পরিবার পরিকল্পনার এই কর্মকাণ্ড নেহায়েত ক্ষতিকর। প্রয়োজন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্যবহার ও ইনসাফভিত্তিক সুষ্ঠু বণ্টন এবং মানব সম্পদকে কাজে লাগানো। অতএব, মাথায় টুপি না লাগলে মাথা কেটে ছোট করবে নাকি টুপি বড় করতে হবে? এর জবাবে সবাই বলবে টুপি বড় করতে হবে। ঠিক তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনগণকে মারার ব্যবস্থা না করে বরং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আর এটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ সে কাজটিই আজ ব্যাহত হচ্ছে।

প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনার (জন্ম নিয়ন্ত্রণ) কিছু পদ্ধতিসমূহ এবং এর হুকুমঃ

(১) আই.ইউ.সি.ডি.ঃ বীর্ষ যাতে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করতে না পারে অথবা পারলেও নিষিক্ত ডিম্বানু (জাইগোট) যাতে জরায়ুর মধ্যে প্রতিস্থাপিত হতে না পারে এজন্য নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকল্পে একটি প্লাস্টিক কয়েল (কপার-টি) সংযোজন করে দেয়া হয়।

হুকুমঃ হক্কানী আলিমদের মতে, পরিবার পরিকল্পনার জন্য জরায়ুতে প্লাস্টিক কয়েল স্থাপন করা ঠিক নয়। কেননা, প্লাস্টিক কয়েল যেহেতু অন্যের সাহায্য ছাড়া সংযোজন করা যায় না। আর স্ত্রীলোকদের অন্যের সম্মুখে সতর খোলা হারাম। তাছাড়া কোন সময় তা সম্পূর্ণ ভিতরে ঢুকে গেলে অসুবিধার কারণে ছতর খোলা ছাড়া অপারেশন করাও সম্ভব নয়। (উল্লেখ্য যে, যদি এমন অবস্থা হয় যে, অপারেশন ছাড়া রোগীর বা সন্তানের জীবন বাঁচানোর কোন পথ না থাকে অথবা অঙ্গহানির আশংকা হয়, তাহলে অপারেশন করা যাবে।)

(২) পুরুষ বন্ধ্যাকরণ (ভ্যাসেক্টমি)ঃ পুরুষের বন্ধ্যাকরণের জন্য সহজ অস্ত্রপচার বিশেষ। এতে অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসা দুটি গুরুকীটবাহী নালিকা অংশত বা

সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয় অথবা বেঁধে দেয়া হয়, ফলে বীর্যের কার্যক্ষমতা থাকে না। তবে ভ্যাসেস্টমীর ফলে স্বাভাবিক যৌন প্রক্রিয়া এবং সঙ্গমের আনন্দ হ্রাস পায় না।

(৩) নারী বন্ধ্যাকরণ (টিউবেস্টমি): নারীর পেট অপারেশন করে ডিম্বাকোষের সাথে জরায়ুর সংযোগের যে দুটি ফেলোপিয়ান টিউব রয়েছে, তা কেটে প্রান্তে বেঁধে দেয়া। ফলে ডিম্বের সঙ্গে শুক্রকীটের মিলন হতে পারে না বলে সন্তান ধারণের কোন সম্ভাবনাও থাকে না। একে লাইগেশনও বলা হয়। এই প্রক্রিয়াতেও সহবাসের আনন্দানুভূতি ব্যাহত হয় না।

বন্ধ্যাকরণের হুকুম: শায়খ ড. সাঈদ রামাদান আল বুত্তী সহ হক্কানী ফকীহগণ বলেন, ইসলামে বন্ধ্যাকরণ হারাম। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহর প্রদত্ত আমানতের খিয়ানত করা হয় এবং আল্লাহর কুদরতে সরাসরি আঘাত হানা হয়। এটা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের সমতুল্য। কারণ, এতে পুরুষের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা এবং নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, যা ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। (বার্থ কন্ট্রোলঃ প্রিভেন্টিভ এন্ড কিওরেটিভ আসপেক্ট- প্রকাশকাল ১৯৭৬ ইং)

(৪) নিরাপদ সময়ে স্ত্রী সন্তোগ: গবেষণা করে দেখা গেছে, ঋতু আরম্ভ হওয়ার দিন হতে হিসাব করে পবিত্র হওয়ার প্রথম তিন দিন এবং ঋতু আরম্ভ হতে হিসাব করে বিশ দিন পরে আট দিন অর্থাৎ বিশতম দিবস হতে আটশতম দিবস পর্যন্ত আট দিন। প্রতি মাসে এই এগার দিন স্ত্রী সহবাসে সাধারণত সন্তান ধারণ হয় না। এটাকেই নিরাপদ সময় বলা হয়। (নিরাপদ সময়ের হিসাব যেহেতু মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে তাই এর সঠিক হিসাব অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে।)

হুকুম: পরিবার পরিকল্পনার যত পদ্ধতি রয়েছে এগুলোর মধ্যে উত্তম পদ্ধতি হল “নিরাপদ সময়ে স্ত্রী সহবাস”। একটু সংযমী হয়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে কৃত্রিম পহা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন হয় না। ফলে পাপবোধ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবং আত্মিক প্রশান্তিও অর্জিত হয়।

(৫) ডায়েফ্রাম বা পেশরী: বীর্য জরায়ুতে না পৌঁছার লক্ষ্যে স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ে ব্যবহার করার জন্য এক ধরনের খাপবিশেষ, যা ক্ষণস্থায়ী।

(৬) কনডম: এটাও বীর্য জরায়ুতে না পৌঁছার লক্ষ্যে পুংজননেন্দ্রিয়ে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের খাপ। অভিজ্ঞদের থেকে জানা গেছে, এ পদ্ধতিতে যৌন কার্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ হতে বঞ্চিত হতে হয়।

(৭) গর্ভনিরোধক ইনজেকশন, বটিকা, নরপ্ল্যান্ট বা পিল সেবন: এগুলোর দ্বারাও সাময়িকভাবে গর্ভনিরোধ করা সম্ভব। তবে অনেক চিকিৎসক মনে করেন যে,

এগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। অধিক সেবনের ফলে মহিলাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, পিণ্ডথলিতে পাথর এবং শরীরে মারাত্মক জ্বালা-পোড়া শুরু হতে পারে।

হুকুমঃ ৫ নং, ৬ নং এবং ৭ নং পদ্ধতি “আযল”-এর হুকুমের ন্যায়। অর্থাৎ, এসব পদ্ধতি আযল কার্যের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা যেতে পারে। নিম্নে আযল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

(৮) আযলঃ পরিবার পরিকল্পনা বা গর্ভনিরোধের আরেকটি পদ্ধতি হল আযল। ইসলামের প্রথম দিকে গর্ভনিরোধের ক্ষেত্রে আযলই ছিল একমাত্র পদ্ধতি।

তবে, আযল জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। যথা-

ক. বিরোধীগণের অভিমতঃ ইবনে হাজম, শায়খ মোহাম্মদ আবু জাহরা, আবুল আলা মওদুদী ও শায়খ আহমেদ শাহনুন প্রমুখ আযল অথবা গর্ভনিরোধক যে কোন প্রক্রিয়াকে শিশুহত্যা বলে অভিহিত করেন।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ**

দলীল (২)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ**

অর্থাৎ, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। (তাকভীরঃ ৮-৯)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে সন্তানকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হত্যার প্রতি নিন্দা জানানো হয়েছে। আর আযল অথবা গর্ভ নিরোধক যে কোন পদ্ধতিই হল শিশুহত্যা।

দলীল (৩)ঃ **عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغَيْلَةِ فَنظَرْتُ فِي الرُّومِ وَقَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغَيِّلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ** (مسلم)

১৮৬৭ বাব جواز الغيلة الخ، ابن ماجه ص ১৪৬

অর্থাৎ, জুদামা বিনত ওহাব আল আসাদিয়া (উক্বাছ-এর ভগ্নী) বর্ণনা করেছেন, আমি অন্যদের সহ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেছেন, “আমি আল ঘায়লা (দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার মায়ের সাথে সহবাস করা) প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি রোমান ও পারস্যবাসীদের সম্বন্ধে চিন্তা করলাম এবং জানলাম যে, তাদের গর্ভবতী মায়েরাও সন্তানদের স্তন্যদান করাতো এবং তাতে তাদের ক্ষতি হতো না।” অতঃপর সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আযল

সহক্ষে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এটা “আল ওয়াদ আল খাফী” অর্থাৎ গুপ্ত শিশুহত্যা।

উক্ত হাদীসটি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, আযল জায়েয নয়। কেননা, নবী করীম (সাঃ) এটাকে “গুপ্ত শিশুহত্যা” বলে আখ্যা দিয়েছেন।

খ. সমর্থকদের অভিমতঃ চার ইমামসহ জমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, গর্ভ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া হিসেবে আযল বৈধ। তবে তা স্ত্রীর সম্মতিক্রমে হওয়া চাই। কেননা, যোনীতে বীর্যপাতের দ্বারা স্ত্রীর আনন্দ লাভ করা, এটা তার ন্যায্য অধিকার। অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন, স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করলে তা মাকরুহ তানযীহী হবে। আর এর উপর কিয়াস করেই পরবর্তী ফকীহগণ বলেন যে, আযলের ন্যায় ডায়েহ্রাম, কনডম, গর্ভনিরোধক ইনজেকশন, বটিকা বা পিল সেবনও জায়েয আছে। তবে উদ্দেশ্য যেন খারাপ না হয়।

দলীল (১)ঃ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزُلُ— (بخاري ج ٢ ص ٧٨٤، مسلم ج ١ ص ٤٦٥، ترمذي، ابن ماجه ص ١٤٠)
অর্থাৎ, হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে আমরা (সাহাবীগণ) আযল করতাম। অথচ ঐ সময়ে কুরআন নাযিল হচ্ছিল।

দলীল (২)ঃ হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ— (مسلم ج ١ ص ٤٦٥)

অর্থাৎ, ... আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় আযল করতাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।

এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান এ হাদীসের সাথে আরো যোগ করেছেন, “এটা যদি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কুরআনে তা নিষেধ করা হতো।”

দলীল (৩)ঃ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِدُونِ إِذْنِهَا— (ابن ماجه ص ١٣٨)
অর্থাৎ, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) হতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করতে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আয়ল বৈধ।

দলীল (৪): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসেও নবী করীম (সাঃ) পরোক্ষভাবে আয়লের অনুমতি প্রদান করেছেন।

দলীল (৫): আয়লকারী বা আয়ল অনুমোদনকারী সাহাবীদের নামঃ

ক. হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ)

খ. হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাহ (রাঃ)

গ. হযরত আবু আইউব আল আনছারী (রাঃ)

ঘ. হযরত য়ায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ)

ঙ. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ)

চ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাহ (রাঃ)

ছ. হযরত আল হাসান ইবনে আলী (রাঃ)

জ. হযরত খাক্বাব (রাঃ)

ঝ. হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)

ঞ. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ (রাঃ)।

(ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ১৬১)

জবাবঃ প্রথম দুই আয়াতের জবাবঃ ফকীহগণ বলেন, যদি দারিদ্র্য ভয়ে আয়ল বা গর্ভনিরোধক যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে তা ভিন্ন কথা। নতুবা, এ দুটি আয়াত দ্বারা আয়ল নাজায়েয সাব্যস্ত করা কোনক্রমেই সঠিক নয়। শায়খ ড. মোহাম্মদ সালামা মাফকূর-এর মতে, আল-কুরআনের হত্যা সংক্রান্ত দুটি আয়াতের মধ্যে আয়ল ও গর্ভপাতকে অন্তর্ভুক্ত করা ভুল। কেননা, আয়াত দুটিতে ‘ওয়াদ’ শব্দ নয়, বরং ‘কাতাল’ (হত্যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর হত্যা তখনি সম্ভব যখন তাতে জীবন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ বিশ্বে এমন কোন ডাক্তার বা জ্ঞানী পাওয়া যাবে না, যিনি বীর্যে রূহ আছে বলে মন্তব্য করবেন।

অতএব, **إِذَا فَاَتَ الشَّرْطُ فَاَتَ الْمَشْرُوطُ** অর্থাৎ, শর্ত পাওয়া না গেলে শর্তের ফলাফল বাতিল হবে।

তাছাড়া আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, জাহেলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং তাদেরকে জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। আর এমন জীবন্ত হত্যা তো সবার নিকটই হারাম।

জুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাবঃ (১) কোন কোন আলিম এ হাদীসটিকে যঈফ মনে করেছেন। (২) কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করতে হলে ‘নস’ (কুরআন ও হাদীস)

দ্বারা বা তার উপর কিয়াস করে নিষিদ্ধ করতে হয়। এছাড়া কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করা যায় না। অথচ আযল সম্পর্কে কোন নস বা কিয়াসের কোন বিধান নেই।

(৩) ইমাম তাহাবী (রহ.)-এর মতে, সূরা মুমিনুন-এর ১২-১৪ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আযলকে গুণ্ড শিশু হত্যা মনে করা হত। কিন্তু উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আয়াতগুলো হলো-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ - فَتَبَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্ত (আলাক) রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে (মুদগাহ) পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি (ইযাম) সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত (লাহম) দ্বারা। অতঃপর উহাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। (মুমিনুনঃ ১২-১৪)

(৪) হযরত ইবন আব্বাস ও আলী (রাঃ) আযলকে শিশুহত্যা মনে করেননি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, শিশুহত্যা তখনই হতে পারে, যখন ৭ম স্তরে উন্নীত হয়। কোন কোন সাহাবায়ে কিরাম আযল করতেন। এটা যদি শিশুহত্যা হতো বা কবীরা গুনাহ হতো, পবিত্র কুরআনে তা নিষিদ্ধ হত অথবা নবী করীম (সাঃ) তা সরাসরি নিষেধ করতেন।

(৫) যারা পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে থাকেন তাঁরাও বলে থাকেন যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আযল করা যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় নীতি হিসেবে তা প্রচলন করা যায় না। এতেও বুঝা যায় যে, আযল বা গর্ভনিরোধ শিশুহত্যা নয়।

(৬) জুদামা বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে আযলকে মাকরুহ তানযীহী বলা যায়। যেমন মনে করেছেন ইমাম নববী ও ইমাম তাহাবী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন কোন ফিকহের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নিম্নবর্ণিত কারণে গর্ভধারণের ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও গর্ভনিরোধ জায়েয-

ক. যদি মহিলা গর্ভধারণের বোঝা বহন করতে অপারগ হয়।

খ. মহিলা যদি নিজ বাসস্থান থেকে এত দূরে থাকে, যেখানে তার স্থায়ীভাবে অবস্থানের ইচ্ছে নেই। আর এমন বাহনে সফর করতে হবে যার দ্বারা গন্তব্যে পৌঁছতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে।

গ. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক না থাকায় সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে।

ঘ. পূর্বের যে সন্তান মায়ের কোলে রয়েছে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা থাকলে।

ঙ. যুগের প্রতিকূল অবস্থার কারণে সন্তান অসচ্চরিত্র এবং পিতা-মাতার অপমানের কারণ হওয়ার আশংকা থাকলে।

চ. গর্ভধারণের কারণে মহিলার দুধ শুকিয়ে যাওয়া এবং কোলের সন্তানকে লালন-পালন করার মতো অন্য ব্যবস্থা না থাকা বা কঠিন হওয়া।

ছ. কোন দীনদার ডাক্তার যদি বলে যে, গর্ভধারণ করলে মহিলার প্রাণহানি কিংবা কোন অঙ্গহানি হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে।

জ. মহিলা যদি অসচ্চরিত্র হয় এবং স্বামী তার সাথে বিচ্ছেদের ইচ্ছাও রাখে।

(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড ৮, পৃ. ৩৪৭, ইন্ডিয়ান সংস্করণ, শামী খণ্ড ৩, পৃ. ১৭৬, করাচী সংস্করণ)

উপরোল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও ইমাম গায়ালী (রহ.) থেকে আরো দুটি অভিমত পাওয়া যায়-

(ক) সুখতর দাম্পত্য জীবন এবং স্বামীর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্য স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষণের উদ্দেশ্যে।

(খ) বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দৈন্যতা-ক্রেস পরিহার করার উদ্দেশ্যে। বহুসংখ্যক সন্তানের কারণে পিতা-মাতা অসৎ জীবন-যাপনে বাধ্য হতে পারে এবং জীবিকা সংগ্রহে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে।

* হানারী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, শত্রু এলাকায় জন্ম হলে সন্তানের ইসলাম বিচ্যুত হতে বাধ্য হবার সম্ভাবনা থাকলে।

৯। গর্ভপাত (এবরশন): যদি কোন মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় এবং তার কোলের বাচ্চার জন্য তা ক্ষতিকর হয়, যেমন গর্ভবতী হওয়াতে দুধ শুকিয়ে যাওয়া, দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়া, যা কোলের শিশুকে খাওয়ানো যায় না, এমতাবস্থায় গর্ভ চারমাস পূর্ণ হওয়ার আগে ওয়াশ করে বা অন্য পদ্ধতিতে গর্ভপাত করানো যেতে পারে। যদি কোলের শিশুকে বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী খণ্ড ৫, পৃ. ৩৫৬ পাকিস্তানী সংস্করণ, শামী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৬ করাচী সংস্করণ)

উল্লেখ্য যে, মালিকী মাযহাবে গর্ভসংস্কার হওয়ার পর গর্ভপাত বা জ্রণপাত বৈধ নয়। এমনকি ৪০ দিনের পূর্বেও নয়।

শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণ ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত। একদল নিষিদ্ধ মনে করেন। আরেকদল বৈধ মনে করেন।

হাম্বলী মাযহাবের মতে, ঔষধ সেবন করে ৪০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত বৈধ। তবে ৪০ দিনের পরে অবৈধ।

তবে সকল মাযহাবের সর্বসম্মত অভিমত হলো এই যে, গর্ভসঞ্চারের ১২০ দিন পর গর্ভপাত হারাম। অবশ্য যদি গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষার কারণে প্রয়োজন হয়, সেটা ভিন্ন কথা। (ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ২৬৮-২৬৯)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ - (ابو داود ج ١ ص ٧١ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة)

অর্থাৎ, ... আমার ইবন শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন (নামায না পড়লে) এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দাও।

সমকালীন ফকীহগণ উপরোল্লিখিত সন্তানদের পৃথক শয্যা ব্যবস্থা সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, প্রত্যেক পুত্র-কন্যার জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত দম্পতি সন্তান জন্মদান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। (ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ২৩৭-২৩৮)

এক্ষেত্রে তাঁদের বিপক্ষে নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী, “তোমরা এমন স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর, যারা অধিক সন্তান প্রসব করে” উপস্থাপন করলে এর উত্তরে বলেন, পূর্ণ হাদীসটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী ও সদ্ধংশীয়া রমণীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বন্ধ্যা)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। অতঃপর তৃতীয়বার সে ব্যক্তি একই কথা বললে, নবী করীম (সাঃ) উক্ত উক্তিটি করেন। (ابو داود ج ١ ص ٢٨٠، نسائي ج ٢ ص ٧٠)

অতএব, এ উক্তিটির সাথে পরিবার পরিকল্পনার কোন বিরোধ নেই। উক্ত হাদীসটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বন্ধ্যা নারীদের বিয়ে না করা; বরং প্রজনন সক্ষম নারীকেই বিয়ে করা। সুতরাং সন্তান জন্ম দেয়া যদি নিজ ও জাতির জন্য আপদ না হয়ে সম্পদে পরিণত হয়, এদের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে হারাম ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করে যথাযথ দায়িত্বের সাথে উপযুক্ত শিক্ষা, চরিত্র গঠন,

আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করা তথা প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে তা হবে অবশ্যই প্রশংসনীয়। কেননা, ইসলাম কেবল লোক বৃদ্ধির পক্ষে নয়; বরং প্রকৃত মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে। আর তাঁদেরকে নিয়েই নবী করীম (সাঃ) কিয়ামতের দিন গর্ব প্রকাশ করবেন।

তালাক অধ্যায় : كِتَابُ الطَّلَاقِ

সুমত তরীকায় তালাক : بَابُ فِي طَلَاقِ السَّنَةِ ص ২৭৬

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فِتْلَكَ الْغِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ - (بخاري ج ٢ ص ٧٩٠ كتاب الطلاق، مسلم ج ١ ص ٤٧٥-٤٧٦ باب تحريم طلاق الحائض الخ، ترمذي ج ١ ص ٢٢٢ باب طلاق السنة، نسائي ج ٢ ص ٩٨)

باب وقت الطلاق للعدة، ابن ماجة ص ١٤٦

অনুবাদঃ ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে তাঁর স্ত্রীকে হয়েয অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে বল তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে এবং হয়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখতে বল। এরপর সে (মহিলা) পুনরায় হয়েয হতে পবিত্র হলে সে তাকে চাইলে রাখতেও পারে এবং যদি চায় তালাকও দিতে পারে। এই তালাক অবশ্য তার সাথে সহবাসের পূর্বে পবিত্রাবস্থায় দিতে হবে। আর এ ইদ্দত (সময়সীমা) আল্লাহ তাআলা মহিলাদের তালাক প্রদানের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

বিশ্লেষণঃ তালাকের আভিধানিক অর্থঃ

طَلَّقَ (তালাক) শব্দটি فَعَالٌ-এর ওয়নে বাবে تَفَعَّلَ-এর মাসদার, যা تَطَلَّقَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

- (১) إِرَازَةُ الْعَيْدِ - বন্ধন মুক্ত করা
- (২) اَلتَّخْلِيَةُ - খালি করা
- (৩) اَلتَّفْرِيقُ - বিচ্ছেদ করা
- (৪) اَلرَّفْعُ الْعَيْدِ - বন্ধন উঠিয়ে ফেলা
- (৫) পরিত্যাগ বা বর্জন করা (قواعد اللغة ص ৩৭২)

শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়-

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ-

অর্থাৎ, তালাকে 'রাজ্জি' হল দু'বার পর্যন্ত, তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় উত্তম পদ্ধতিতে বর্জন করবে। (বাকারঃ ২২৯)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ- (ابو داود ج ১ ص ২৭৬ باب في كراهية الطلاق، ابن ماجه ص ১৬৭)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বস্তু হল তালাক।

তালাকের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন-

هُوَ رَفْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ-

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দ দ্বারা বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করার নামই তালাক।

(২) হেদায়া গ্রন্থের হাশিয়াতে রয়েছে-

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ يَرْفَعُ الْقَيْدَ النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ-

অর্থাৎ, তালাক হচ্ছে এমন একটি শরঈ হুকুম, যা নির্দিষ্ট শব্দসমূহের মাধ্যমে বৈবাহিক বন্ধনকে উঠিয়ে দেয়।

(৩) কেউ কেউ বলেন, هُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهُ اسْتِمْتَاعٌ

إِلَّا بِالرُّجْعَةِ أَوْ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ أَوْ بِالْحَيْلَةِ-

অর্থাৎ, তালাক হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন এক বিচ্ছেদ, যার পর হিলা, নতুন বিবাহ অথবা প্রত্যাবর্তন ব্যতীত উপভোগের সুযোগ থাকে না।

(৪) বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদকে তালাক বলে। (قواعد الفقه ص ৩৭২)

তালাকের প্রকারভেদ ও সংজ্ঞাঃ

صِفَات (গুণগত)-এর দিক দিয়ে তালাক তিন প্রকার। যথা-

(১) أَحْسَنُ الطَّلَاق (উৎকৃষ্টতম তালাক)ঃ

هُوَ أَنْ يُطْلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَقًا فِي طَهْرٍ لَمْ يُجَامِعَهَا فِيهِ وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا - (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۲۷-۳۲۸، البحر الرائق ج ۳ ص ۲۳۸)

অর্থাৎ, যে তুহুরে (মহিলাদের ঋতু মুক্তিকাল) সহবাস করা হয়নি, এমন তুহুরে স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করা এবং ইদত (সময়সীমা) পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাকে এ অবস্থায় রেখে দেয়া, (যাতে এক তালাক বায়েন হয়ে যায়।)

উল্লেখ্য যে, طَلَقٌ أَحْسَنُ কে অনেকেই তালাকে সুন্নত দ্বারা ব্যাখ্যা করে থাকেন।

* আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, তালাকে সুন্নত দ্বারা ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, এই পছন্দ্য তালাক দেয়া পছন্দনীয় এবং সওয়াবের কাজ তথা সুন্নত। বরং একে সুন্নত এই ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, যত পদ্ধতিতে তালাক দেয়া যায় তার মধ্যে এটিই উত্তম। (روح المعاني ج ২ ص ১৩৬)

(২) حَسَنُ الطَّلَاق (উত্তম তালাক): স্ত্রীর অবস্থা ভেদে এর সংজ্ঞা কয়েক রকম।

সঙ্গমকৃত স্ত্রীর ক্ষেত্রে حَسَن বা উত্তম তালাকের নিয়ম হচ্ছে-

“تَفْرِيقُ الثَّلَاثِ فِي الطَّهَارَةِ لَا وَطِيٍّ فِيهِ”-

অর্থাৎ, পৃথক পৃথকভাবে তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া, যার মধ্যে সহবাস করা হয়নি।

* غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ তথা অসঙ্গমকৃত স্ত্রীর ক্ষেত্রে হাসান তালাকের নিয়ম হচ্ছে-

طَلَقًا لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ وَلَوْ فِي حَيْضٍ -

অর্থাৎ, এক তালাক প্রদান করা যদিও তা হায়েযের মধ্যে হোক না কেন।

* صَغِيرَةٍ - حَامِلٍ তথা বৃদ্ধা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে এক তালাক দেয়াকে তালাকে হাসান বলা হয়।

(৩) بَذْعَةُ الطَّلَاق (বিদআত তালাক): একই সঙ্গে একই তুহুরে তিন বা দুই তালাক

প্রদান করা, যার মধ্যে رَجَعْتُ (স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা) হয় না। কিংবা ঐ তুহুরে তালাক

দেয়া, যাতে সহবাস করা হয়েছে। অথবা مَوْطُوءَةٍ (সঙ্গমকৃত) স্ত্রীকে হায়েযের মধ্যে

তালাক দেয়াকে বিদআত তালাক বলা হয়। মূলত বিদআত তালাক হল- وَهُوَ مَا

أَرْثَاهُ، অর্থাৎ, “সুন্নতের দুই প্রকার তথা আহসান ও হাসানের পরিপন্থী

তালাকই হল বিদআত তালাক।” (البحر الرائق ج ৩ ص ২৩৭ القواعد الفقه ص ৩৬৩)

* حُكْمًا (হুকুম) হিসেবে তালাক তিন প্রকার। যথা-

(১) الطَّلَاقُ الرَّجْعِي (রাজঈ তালাক): অর্থাৎ, যে তালাকের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। ইচ্ছা করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। যেমন এক তালাক ও দুই তালাকের পর ফিরিয়ে আনা যায়।

(২) الطَّلَاقُ الْبَائِنَةَ (বায়েন তালাক):

هُوَ مَا لَا رَجْعَةَ فِيهِ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لِكُونِهَا مُطْلَقَةً مَبْتُوتَةً

অর্থাৎ, এটা এমন তালাক, যা প্রদান করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর رجعت করার অধিকার থাকে না। তবে উভয়ের সম্মতিতে বিয়ে নবায়ন করার সুযোগ থাকে। [যেমন- كِنَايَةً (ইঙ্গিত-সূচক) শব্দ দ্বারা তালাক দিলে। আর তা এক অথবা দুই তালাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে।]

(৩) الطَّلَاقُ الْمُنْطَلِقُ (মুগাল্লাযা তালাক): তালাকে মুগাল্লাযা হচ্ছে এমন তালাক, যার পর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার এবং বিয়ে নবায়ন করার কোন অধিকার ও সুযোগ থাকে না। তবে অন্য স্বামী স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে ইন্দত পালনের পর পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য বিয়ে করা বৈধ হবে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ-

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারা: ২৩০)

* لَفْظًا (শব্দগত) তালাক দু'প্রকার। যথা-

(১) هُوَ الطَّلَاقُ بِلَفْظٍ أَسْتَعْمِلَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ (সুস্পষ্ট তালাক):

অর্থাৎ, এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেয়া, যে শব্দ তালাকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না।

বিধান: এ সমস্ত শব্দ দ্বারা এক তালাকে রাজঈ কার্যকর হবে। নিয়ত থাকুক বা না থাকুক। যেমন, أَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক)

(২) الطَّلَاقُ الْكِنَايَةُ (ইঙ্গিত-সূচক তালাক):

هُوَ الطَّلَاقُ بِلَفْظٍ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ أَوْ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ قَلِيلًا -

অর্থাৎ, এমন শব্দ দ্বারা তালাক দেয়া, যা তালাকের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না অথবা কম ব্যবহার হয়। এক কথায় বলা যায়, ইঙ্গিতার্থবোধক শব্দযোগে যে তালাক প্রদান করা হয় তাকেই كَلَامٌ طَلَاقٌ বলা হয়।

বিধানঃ এ সমস্ত শব্দের মধ্যে তালাকের নিয়ত থাকলে অথবা حَالٌ (অবস্থার নির্দেশনা) পাওয়া গেলে তালাক কার্যকর হবে। মূলতঃ তালাকে কিনায়ার ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। অথবা, অন্ততঃ পূর্বে এ সংক্রান্ত আলোচনা কিংবা অবস্থা থাকতে হবে, যা তালাকের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, কোন ব্যক্তি বলল, أَنْتِ حَرَامٌ، أَنْتِ بَاطِنٌ (তুমি হারাম, তুমি বিচ্ছিন্ন)। এক্ষেত্রে ব্যক্তির যদি তালাকের নিয়ত থাকে তাহলে তালাক পতিত হবে।

الْفَاطُ الطَّلَاقُ বা তালাকের শব্দসমূহঃ

সরীহ তালাকের শব্দ একটি। তাহলো طَلَاقٌ, অতএব এ শব্দ হতে নির্গত সকল শব্দ সরীহ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন-

(১) أَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাকপ্রাপ্তা)

(২) أَنْتِ مُطَلَّقةٌ (তুমি তালাকপ্রাপ্তা)

(৩) طَلَّقْتُكَ (তোমাকে তালাক দিলাম)

উল্লেখ্য যে, শাফেঈ ও হাম্বলীদের মতে, সরীহ শব্দ তিনটি। যেমন- طَلَاقٌ - فَرَاحٌ - سَرَاحٌ

কিনায়া তালাকের শব্দাবলী দু'প্রকার। যথা-

১। প্রথম প্রকারের শব্দগুলো হচ্ছে-

(ক) اِعْتَدِي (তুমি ইদত পালন কর)

(খ) اِسْتَبْرْنِي رَحْمَكَ (তোমার জরায়ু পবিত্র কর)

(গ) أَنْتِ وَاحِدَةٌ (তুমি নিঃসঙ্গিনী)

এগুলোর দ্বারা এক তালাকে রাজস্ট পতিত হবে, যদিও কিনায়া শব্দ হোক না কেন। কেননা, এগুলির আগে সরীহ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। আর সরীহ শব্দ দ্বারা এক তালাক রাজস্ট পতিত হয়।

যেমন- **إِعْتَدِي** -এর মূলে হল- **“طَلَّقَكَ فَاعْتَدِي”** অর্থাৎ, আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, তাই তুমি ইদ্দত পালন কর।

২। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দগুলো হচ্ছে-

(ক) **أَنْتِ بَائِنٌ** - তুমি পৃথক

(খ) **أَنْتِ حَرَامٌ** - তুমি হারাম

(গ) **أَنْتِ خَالِيَةٌ** - তুমি শূন্য

(ঘ) **إِبْتَغِي الْأَزْوَاجَ** - তুমি স্বামী খোঁজ কর

(ঙ) **أَنْتِ بَرِيَّةٌ** - তুমি দায়মুক্ত

(চ) **حَبْلِكَ عَلَى غَارِيكِ** - তোমার রশি তোমার ঘাড়ে

(ছ) **إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ** - তোমার পরিজনের সাথে মিলিত হও

(জ) **سَرَحْتُكَ** - আমি তোমাকে মুক্ত করেছি

(ঝ) **أَنْتِ حُرَّةٌ** - তুমি স্বাধীনা

(ঞ) **فَارَقْتُكَ** - আমি তোমাকে পৃথক করেছি

(ট) **أَمْرُكَ بِيَدِكَ** - তোমার সিদ্ধান্ত তোমার হাতে

(ঠ) **وَهَبْتُكَ لِأَهْلِكَ** - তোমার পরিবারের জন্য তোমাকে দান করেছি

(ড) **تَخْفِرِي** - চাদর দ্বারা তোমার মাথা ঢাক। এ ধরনের আরো অনেক শব্দ রয়েছে।

ঋতুবতী অবস্থায় তালাক প্রদানের হুকুমঃ

* আল্লামা ইবন হযম, ইবন তাইমিয়া এবং হাফেয ইবন কায়্যিম (রহ.)-এর মতে, ঋতুবতী অবস্থায় তালাক অনুষ্ঠিত হবে না।

(المحلى ج ١٠ ص ١٦١، فيض الباري ج ٤ ص ٣١٠، زاد المعاد ج ٥ ص ٢٢١)

দলীলঃ হযরত ইবন উমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু চলাকালীন অবস্থায় তালাক প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে-

... قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُ بِتِلْكَ الطَّلِيقَةِ؟ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ؟ (بخاري

ج ٢ ص ٧٩٠ باب إذا طَلقت الحائض، مسلم ج ١ ص ٤٧٧، ترمذي ج ١ ص ٢٢٢ باب طلاق السنة، نسائي

ج ٢ ص ٩٩ باب الطلاق لغير العدة، ابن ماجه ص ١٤٦)

অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, আমি বললাম, সে তালাক ধর্তব্য হবে? উত্তরে তিনি বললেন, থাম। তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় ও বোকামি করে?

ইবন তাইমিয়া (রহ.)-এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন, তুমি তালাক কার্যকর

হওয়ার যে ধারণা পোষণ করছ তা থেকে বিরত হও। আর **إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَقَّ**-এর অর্থ বর্ণনা করেন যে, শরীয়ত তার পরিবর্তন সাধনের কারণে পরিবর্তিত হবে না। যেহেতু শরীয়তের হুকুম রয়েছে যে, হয়েয অবস্থায় তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব তা কি পরিবর্তন করা এবং এক তালাক ও তার বোকামি ধর্তব্যে আনা সম্ভব? (درس ترمذي ج ৩ ص ১৬৬)

* চার ইমাম সহ জমহুর আলিমগণের মতে, ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। যদিও তা হারাম এবং অপছন্দনীয়।

(بدائع الصنائع ج ৩ ص ৭৬، المجموع شرح المذهب ج ১৬ ص ৭৮)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-কে বললেন- **مُرَهُ فَلْيَرَّاجِعْهَا** অর্থাৎ, “তুমি তাকে বল তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে।”

উক্ত বাক্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার (**رُجُوع**) হুকুম দেয়া হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, **رُجُوع** (ফিরিয়ে আনা) তখনই সম্ভব, যখন তালাক সংঘটিত হয়। নতুবা ফিরিয়ে আনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তছাড়া তালাক এমন একটা ব্যবস্থা তা যেকোন অবস্থায়, যেকোন সময়ে বলুক না কেন, তা সংঘটিত হবেই।

জবাবঃ ইমাম তাইমিয়া (রহ.)-এর দলীলের জবাবে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, কোন কোন রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, ইহা তালাক হিসেবে ধরা হয়েছিল। এজন্য হযরত সালিম ইবন আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তার এই তালাক ধর্তব্য হয়েছে। তছাড়া হযরত ইবন উমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি সেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি এবং আমি তাকে যে তালাক দিয়েছি, সে তালাক ধর্তব্যে এনেছি।

(مسلم ج ১ ص ৪৭৬ باب تحريم طلاق الحائض، فيض الباري ج ৪ ص ৩১০)

بَابُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ص ২৭৮

বিবাহের পূর্বে তালাক

... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ زَادَبُنُ الصَّبَاحَ وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ— (بخاري ج ২ ص ৭৭৩ لا طلاق قبل النكاح، ترمذي ج ১ ص ২২৩ باب لا طلاق قبل النكاح)

অনুবাদঃ ... আমরা ইবন শুআয়েব (রহ.) তাঁর পিতা হতে ও পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, স্ত্রী অধিকারী হওয়া ব্যতীত তালাক হয় না। কোন দাস-দাসীর মালিক হওয়া ব্যতীত তাদের আযাদ করা যায় না। আর কোন জিনিস-পত্রের মালিক হওয়া ছাড়া, উহা বিক্রি করা যায় না। রাবী ইবন আস সাব্বাহ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, কোন মালের মালিক হওয়া ব্যতীত উহার মানত করা যায় না।

বিশ্লেষণঃ বিবাহের পূর্বে তালাক দিলে তা কার্যকরী হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

طَلَاقٌ قَبْلَ النِّكَاحِ তথা ‘বিবাহের পূর্বে তালাক নেই’, এর দুটি অবস্থা রয়েছে।

এক, যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের পূর্বে কোন মহিলাকে তাৎক্ষণিকভাবে বলে যে, أَنْتِ

طَالِقٌ (তুমি তালাক) তাহলে এ কথার উপর সবাই একমত পোষণ করেন যে, তার

উপর তালাক প্রযোজ্য হবে না, ঐ লোক পরে ঐ মহিলাকে বিবাহ করুক বা না করুক। কেননা, যখন সে তালাক দিয়েছিল, তখন সে তার মালিক ছিল না।

দুই, কিন্তু তালাকের সম্পর্ক যদি বিবাহ বা মালিকানার দিকে করা হয়, (যেমন, কেউ বলল, اِنْ نَكَحْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ অর্থাৎ “আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি তালাক”) তাহলে এ ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায়ও তালাক হবে না। কেননা, এ ধরনের ঝুলন্ত বাক্য মূল্যহীন ও বাতিল।

দলীলঃ উপরোল্লিখিত হাদীস- “... لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ”

উক্ত বাক্যে সাধারণত স্ত্রীর মালিক না হওয়া অবস্থায় তালাক না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম মালিক, আওয়াঈ ও ইবন আবু লায়লা (রহ.)-এর মতে, যদি নির্দিষ্ট কোন মহিলা বা কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা কোন বিশেষ সময়ের উল্লেখ করে, তাহলে ঐ মহিলাকে বিবাহ করলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন- কেউ বলল-
 “إِنْ نَكَحْتُ فَلَانَةً” يَا “إِنْ نَكَحْتُ مِنْ بَلَدَةٍ كَذَا أَوْ مِنْ قَبِيلَةٍ كَذَا” يَا “إِنْ نَكَحْتُ فِي هَذَا الشَّهْرِ”-

অর্থাৎ, “আমি যদি অমুককে বিয়ে করি”, অথবা “আমি যদি ঐ শহরে বা ঐ গোত্রে বিয়ে করি” অথবা “আমি যদি এই মাসে বিয়ে করি”, তাহলে তালাক- এমতাবস্থায় তালাক সংঘটিত হবে। যেহেতু সে নির্দিষ্ট করেছে।

কিন্তু কেউ যদি ব্যাপক আকারে বলে যে, “كُلَّمَا نَكَحْتُ امْرَأَةً فِيهِ طَلَّاقٌ”

অর্থাৎ, “যখনই আমি কোন মহিলাকে বিয়ে করব, সেই তালাক”।

তাহলে তালাক পতিত হবে না। কেননা এতে তো বিবাহের দরজাই বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে তো কোন মহিলার সঙ্গেই বিয়ের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। তাই তা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। (بذل المجهود ج ১০ ص ২৭২-২৭৩)

দলীল (১): ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ব্যাপকভাবে এমন উক্তি এই জন্য জায়েয নয়, কারণ বিবাহ হল একটি হালাল বিষয়। তাই ইহা উক্ত বাক্যের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে হারাম করে দেয়ার শামিল। আর এ অধিকার কোন মানুষের নেই। তাছাড়া ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর একটি আছারও তাঁদের প্রমাণঃ

إِذَا وَقَّتْ امْرَأَةٌ أَوْ قَبِيلَةٌ جَازَ وَإِذَا عَمَّ كُلُّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ - (مصنف عبد الرزاق ج ৭)

(১২১১)

অর্থাৎ, যখন কোন মহিলা অথবা কোন গোত্রকে নির্ধারিত করে, তবে এটা জায়েয। আর যখন সব মহিলাকে ব্যাপকভাবে বলে, তবে সেটা ধর্তব্য নয়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, শর্ত ব্যাপক আকারে করুক অথবা নির্দিষ্ট কোন মহিলাকে করুক, সর্বাবস্থায় তালাক হয়ে যাবে। (درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ৩৫)

দলীলঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কোন উক্তি শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায়, যেন শর্ত বাস্তবায়নের পর উক্তিটি করা হয়েছে। তাই কেউ শর্তের সাথে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা, ধরে নেয়া হবে ইহা বিয়ের আগে তালাক নয়, যেন বিয়ের পর এইমাত্র তালাক দেয়া হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, যেমন

কেউ বলল- **إِنْ مَلَكَكَ فَأَنْتِ حُرٌّ** অর্থাৎ “আমি যদি তোমার মালিক হই তবে তুমি আযাদ”। অথবা বলল- **إِنْ اشْتَرَيْتُكَ فَأَنْتِ حُرٌّ** অর্থাৎ “আমি যদি তোমাকে ক্রয় করি তবে তুমি আযাদ”। তাহলে এরূপ শর্তায়ন জায়েয হবে। (নور الانوار ১০৭৮)

দলীল (২): **عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: (۲) كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فِيهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَهُوَ كَمَا قُلْتَ - (مصنف عبد**

الرزاق ج ১৬ ص ৪২১)

অর্থাৎ, আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল; আমি যে কোন মেয়েকে বিয়ে করব, সেই তিন তালাক। তখন উমর (রাঃ) তাকে বললেন, এটি তুমি যেমন বলেছ তেমনি। দলীল (৩): যদি কেউ মৃত্যুর পূর্বে নিজের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসীয়ত করে তাহলে এর কার্যকারিতা মৃত্যুর পরেই হবে, অসীয়তের সময় হবে না।

(تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৯৮)

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের উত্তর হল, মালিকানার দিকে সম্বন্ধযুক্ত তালাককে অমালিকানার তালাক বলা যায় না। কারণ, তালাক পতিত হবে মালিকানা অর্জনের পর। অতএব, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা হানাফীদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা ঠিক নয়। হানাফীদের মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে তাৎক্ষণিক তালাক অথবা এরূপ তালাক যা মালিকানার সাথে ঝুলন্ত। (درس ترمذي ج ৩ ص ৪৯২)

এই ব্যাখ্যার সমর্থন একটি আছর দ্বারাও হয়-

”عَنْ مُعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فِيهِ طَالِقٌ وَكُلُّ أَمَةٍ اشْتَرَيْتُهَا فِيهِ حُرَّةٌ قَالَ هُوَ كَمَا قَالَ قَالَ مُعْمَرٌ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ لَا طَلَّاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتَاقَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ قَالَ إِمَّا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَلَانَ طَالِقٌ وَعَبْدٌ فَلَانَ حُرٌّ” - (مصنف عبد الرزاق ج ১৬ ص ৪২১)

অর্থাৎ, যুহরী (রহ.) থেকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে বলেছিল, যত মহিলাকে আমি বিয়ে করব, তারা সবাই তালাক। আর যত বাঁদী আমি ক্রয় করব সবাই আযাদ। যুহরী (রহ.) বললেন, সে যা বলেছে অনুরূপই। মা’মার বলেন, আমি বললাম, কারো কারো থেকে কি বর্ণিত নেই যে, তিনি (রাসূল সঃ) বলেছেন, বিয়ের পূর্বে তালাক নেই এবং মালিকানার পূর্বে আযাদী নেই? উত্তরে তিনি বললেন, এটা তো হল তখন, যখন কোন পুরুষ বলবে, অমুকের স্ত্রী তালাক এবং অমুকের গোলাম আযাদ।

بَابُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَيْظٍ ص ২৭৮

রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

... قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَلَاقَ

وَلَا عِتَاقَ فِي غِلَاقٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلَاقُ أَظْنَهُ فِي الْغَضَبِ - (ابن ماجه ص ১৪৮)

অনুবাদঃ ... রাবী (সাফিয়া বিনত শায়বা) বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, গিলাক অবস্থায় কোন তালাক হয় না বা দাস মুক্ত করা যায় না। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, আমার ধারণা ‘গিলাক’ অর্থ হল রাগান্বিত অবস্থায় তালাক প্রদান করা।

বিশ্লেষণঃ غِلَاق (গিলাক) শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) إِكْرَاه তথা বাধ্যকরণ, বলপ্রয়োগ, বাধ্যবাধকতা, জবরদস্তি, বন্ধকরণ, তালাবদ্ধকরণ ইত্যাদি।

(২) غَضَب তথা রাগান্বিত, ক্রোধান্বিত ইত্যাদি।

প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগের (غِلَاق) মাধ্যমে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকর হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, হাসান বসরী, আতা ও মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, জবরদস্তির (إِكْرَاه) মাধ্যমে যে তালাক দেয়া হয়, তা সংঘটিত হবে না।

দলীল (১)ঃ উপরোল্লিখিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ নবী করীম (সাঃ) বলেন-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُتْبَيْي الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ - (ابن ماجه ص ১৪৮ باب طلاق المكره والناسي)

অর্থাৎ, আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কোন কাজ বাধ্য করা হলে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, জবরদস্তির মাধ্যমে প্রদত্ত তালাক সংঘটিত হবে।

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- "فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ"

অর্থাৎ, তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের ইদতের মধ্যে তালাক দাও। (তালাকঃ ১)
উক্ত আয়াতে তালাকের ক্ষেত্রে যে হুকুম প্রদান করা হয়েছে তা ব্যাপক ও শর্তহীন।
জবরদস্তি অবস্থায় হোক বা না হোক। এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (২): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ- (بخاري ج ٢ ص ٧٩٤ باب الطلاق في الغلاق الخ، ترمذي ج ١ ص ٢٢٦ باب طلاق المعتوه)

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সব তালাকই জায়েয (তথা সংঘটিত হয়)। শুধুমাত্র মাতূহ তথা পাগলের তালাক ব্যতীত।

আল্লামা ইবন হুমাম বলেন, জবরদস্তি অবস্থায় প্রদত্ত তালাক কার্যকর হবে। কেননা, জবরদস্তি অবস্থায় মুখ থেকে তালাকের যে সকল শব্দ বের হয় তা নিজের ইচ্ছায়ই (اِخْتِيَار) বের হয়। (এমন নয় যে, তার কণ্ঠনালীতে তলোয়ার বা অন্য কোন জিনিস রাখতেই তার ইচ্ছা ব্যতীত তালাকের শব্দ বের হয়ে যায়। যেমনটি আমরা দেখি খেলনা জাতীয় জিনিসপত্রে। সেখানে সুইচ বা তার সংযোগ দিলেই যন্ত্রের ইচ্ছা ব্যতীতই গান বাজতে থাকে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি নয়।) যদিও সে এতে রাজি থাকে না। আর তালাকের ক্ষেত্রে اِخْتِيَار (ইচ্ছা) শর্ত, স্বাচ্ছন্দ্য বা সন্তুষ্ট থাকা শর্ত নয়। কেননা مَكْرَه (বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি)-এর ইচ্ছা কখনো سَلْب (বিলুপ্ত) হয় না। কিন্তু نَائِم، مَجْنُون، বা غُيُومُস্ত ব্যক্তি, পাগল ও ছোট শিশুর কথা ভিন্ন।
(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢٠٠-٢٠١، درس مشکوة ج ٣ ص ٣٦)

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাবঃ ১। উল্লিখিত তিন ইমাম যে হাদীস পেশ করেছেন তা খবরে ওয়াহেদ, যা কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।
২। অথবা, উক্ত হাদীসে এই কথা বলা হয়েছে যে, তালাক প্রদান ও দাসমুক্তির ব্যাপারে যেন জবরদস্তি করা না হয়। কিন্তু যদি জবরদস্তি করা হয়, তবে এর বিধান কি হবে, তা উক্ত হাদীসে বলা হয়নি।

৩। অথবা - "لَا طَلَاقَ فِي غِلَاقٍ"-এর অর্থ হল-

لَا يُغْلَقُ التَّطْلِيقَاتُ دَفْعَةً وَاحِدَةً حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ

অর্থাৎ, “তিন তালাককে একই সাথে বন্ধ করিও না (বা দিয়ে দিও না) যে, কিছুই বাকি থাকল না।” বরং সুন্নত তরীকায় তালাক প্রদান কর। আর তা হল, তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করা। (تَظْهِيمُ الْأَشْنَاتِ ٢ ج ص ২০১, درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ৩৬)

* দ্বিতীয় দলিলে উম্মত থেকে জবরদস্তি উঠিয়ে নেয়ার কথা যে বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, اِكْرَاهًا عَلَى الْكُفْرِ অর্থাৎ কোন মুসলমানকে যদি জবরদস্তির মাধ্যমে কুফরী বা শিরকী বাক্য উচ্চারণ করানো হয়, কিন্তু তার অন্তরে যদি তাওহীদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঐ জবরদস্তিমূলক কুফরী বাক্য ধর্ভাব্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ পাগল, মাতাল, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও নেশাগ্রস্ত বেহুঁশ ব্যক্তির তালাক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْثُوبِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ۔ [পূর্বে হাদীসটির অর্থ দেয়া হয়েছে]

হাদীসে উল্লিখিত “كُلُّ طَلَاقٍ” (প্রত্যেক তালাকই)-তে সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিক। অন্যথায় যদি সীমাবদ্ধতা যৌক্তিক মেনে নেয়া হয়, তাহলে শিশুর তালাকও পতিত হওয়া আবশ্যিক হবে। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। এজন্য এখানে সীমাবদ্ধতা আপেক্ষিক সাব্যস্ত করা হবে। যেমন, জ্ঞানবান লোকের দিকে লক্ষ্য করে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। (تَرْشِيحُ الْمَسْكُوكِ ١ ج ص ৩৩০)

* আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, পাগল এবং অনভিজ্ঞ অবুঝ লোকের তালাক না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। অতঃপর তালাক না হওয়ার হুকুম ঘুমন্ত ও বেহুঁশ ব্যক্তি ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। (عمدة القاري ২০ ج ص ২০১)

* এখানে একটি ধারণা হতে পারে যে, উপরিউক্ত মাজুরগণ ও নেশাগ্রস্ত বেহুঁশের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, তাদের কারো মধ্যেই তখন হুঁশ-জ্ঞান ও অনুভব শক্তি থাকে না। সুতরাং যেকোনভাবে তাদের তালাক সংঘটিত হয় না, একরূপভাবে নেশাগ্রস্ত বেহুঁশেরও তালাক সংঘটিত না হওয়া উচিত। অথচ ইমাম আবু হানীফা, মালিক, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, আওয়াঈ, সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এ উক্তি অনুযায়ী তার তালাক হয়ে যাবে। কারণ, পাগল ও অনভিজ্ঞ অবুঝ লোকের জ্ঞান পরাভূত ও দুর্বল হওয়ার কারণ কুদরতী ও অনৈচ্ছিক। একরূপভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম যদিও বাহ্যত ঐচ্ছিক বুঝা যায়, কিন্তু বাস্তবতা হল এটাও অনৈচ্ছিক। চিন্তা-ফিকির করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। (فتح الباري ৯ ج ص ৩৭১)

পক্ষান্তরে, নেশাগ্রস্ত বেহুঁশ ব্যক্তির বিবেক যদিও পরাস্ত, কিন্তু যেহেতু তার বিবেক পরাস্ত হয়েছে নিজের ইচ্ছা ও স্বউপার্জিত। অতএব, তার তালাক কার্যকর হবে।

بَابُ بَقِيَّةِ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ ص ২৭৮

তিন তালাক প্রদানের পর, পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَ إِخْوَتَهُ أُمَ رُكَانَةَ وَ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةَ لِشَعْرَةٍ أَخَذْتُهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمِيَةً فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَ إِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِحِجْلَسَائِهِ أَ تَرَوْنَ فَلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ طَلِّقْهَا فَفَعَلَ قَالَ رَاجِعْ أَمْرَاتِكَ أُمَ رُكَانَةَ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ رَاجِعُهَا وَتَلَ- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ... أَنَّ رُكَانَةَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً-

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আবদ ইয়াযীদ, উম্মে রুকানাকে তালাক প্রদান করেন এবং মুয়ায়না গোত্রের জৈনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, সে সহবাসে অক্ষম, যেমন আমার মাথার চুল অন্যচুলের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। এতদশ্রবণে নবী করীম (সাঃ) রাগান্বিত হন এবং তিনি রুকানা ও তার ভাইদেরকে আহবান করেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত তার সাথীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আবদ ইয়াযীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মিল খাচ্ছে না? তখন তারা বলেন, হাঁ। নবী করীম (সাঃ) আবদ ইয়াযীদকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানাকে পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি, ইয়া রাসূলান্নাহ! তখন তিনি বলেন, আমি তোমার তালাক প্রদানের কথা অবগত আছি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, “হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবে।” আবু দাউদ (রহ.) বলেন, ... রুকানা তার স্ত্রীকে ‘আলবাত্তা’ (নিশ্চিত) তালাক দেয় এবং নবী করীম (সাঃ) একে এক তালাক হিসেবে গণ্য করেন।

বিশ্লেষণঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই কথা দ্বারা বা একই মজলিশে তিন তালাক দেয়, তাহলে এর হুকুম কি হবে- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

(১) শিয়ায়ে জাফরিয়াদের মতে, এভাবে তালাক দিলে কোন তালাক হবে না। (শিয়ায়ে হিন্দী এ ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন।)

(شرايع الإسلام ج ٢ ص ٥٧، فتح الملهم ج ١ ص ١٥٣)

হাজ্জাজ ইবন আরতাত, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং ইবন মুকাতিনের দিকেও এই উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত। (شرح مسلم ج ١ ص ٤٧٨)

(২) কতক আহলে যাহির, আল্লামা ইবন তাইমিয়া, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম, ইকরামা (রহ.) প্রমুখের মতে, এভাবে তিন তালাক দিলে কেবল এক তালাক কার্যকর হবে এবং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

অনেকেই বলেন যে, স্ত্রীর সাথে যদি সহবাস হয়ে থাকে, তবে তিন তালাক, আর যদি সহবাস না হয়ে থাকে, তবে এক তালাক কার্যকর হবে।

(فتح القدير ج ٣ ص ٣٢٩، المغني ج ٧ ص ١٠٤، شرح مسلم ج ١ ص ٤٧٨، زاد المعاد ج ٥ ص ٢٤٨)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত উম্মে রুকানার হাদীস বা ঘটনা।

উক্ত হাদীসে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, রুকানার পিতা রুকানার মাতাকে তিন তালাক প্রদান করা সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ) তাকে ফিরিয়ে নেয়ার হুকুম দেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তা এক তালাকে রাজস্ব হয়। নতুবা নবী করীম (সাঃ) এমন হুকুম দিতেন না।

দলীল (২)ঃ ... أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ - (ابو داؤد ج ١ ص ٢٩٩ باب بقیة نسخ المراجعة، مسلم ج ١ ص ٤٧٨ باب صلاح

الثلاث، نسائي ج ٢ ص ١٠٠ باب طلاق الثلاث المتفرقة الخ)

অর্থাৎ, ... একদা আবু সাহবা (রহ.) ইবন আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে এবং উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের তিন বছর তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হত? ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ।

* চার ইমাম এবং সকল মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের মতে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে একই কথায় বা একই মজলিশে তিন তালাক দেয়, তাহলে তা তিন তালাকে বায়েনা মুগাল্লাযা হিসেবে গণ্য হবে। যদিও সে ভীষণ গোনাহগার হবে, তবুও সে উক্ত স্ত্রীকে হিলা (حِلَّة) ব্যতীত গ্রহণ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হুকুমটি **مَذْخُولَ بِهَا** (সঙ্গমকৃত) স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু স্ত্রী যদি **غَيْرَ مَذْخُولَ بِهَا** (অসঙ্গমকৃত) হয়, তাহলে এমতাবস্থায় হানাফীদের নিকট বিশ্লেষণ হল, যদি এক সঙ্গে তিনতালাক দেয়, যেমন বলল- “**أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا**” তুমি তিন তালাক) এমতাবস্থায়ও একসাথে তিন তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু যদি পৃথক শব্দ দ্বারা তিন তালাক দেয়, যদিও তা একই মজলিশে হোক না কেন। যেমন, বলল- **أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ** (তুমি তালাক, তালাক, তালাক) তাহলে এক তালাকে বায়েন হবে, কেননা অন্য দুই তালাকের জন্য তো ক্ষেত্রই অবশিষ্ট থাকবে না।।

(هداية ج ٢ ص ٣٧١)

দলীল (১): হযরত সাহল ইবন সাদ আস-সা‘দী (রাঃ) হতে এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, উয়ামির নবী করীম (সাঃ)-কে বলেন-

... كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بخاري ج ٢ ص ٧٩١ بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ)

অর্থাৎ, “... ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি তাকে রেখে দেই, তাহলে তার প্রতি আমি মিথ্যা আরোপ করলাম। অতঃপর তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই।”

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যদি এক শব্দ দ্বারা তিন তালাক দেয়া হয়, তাহলে তা কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীস শাখের ইমাম, হযরত বুখারী (রহ.) সরাসরি জমহুরের মাযহাব অনুযায়ী এ ব্যাপারে **بَابُ مَنْ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ** নামে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেছেন।

দলীল (২): حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ أَلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ اللَّفْقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اللَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى

لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْوَجِهَا الرُّجْعَةُ - (نسائي ج ٢ ص ١٠٠ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ)

অর্থাৎ, “ফাতিমা বিনত কায়েস আমাকে (শাবী) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললাম, আমি খালিদ পরিবারের

মেয়ে। আমার স্বামী আমার নিকট আমার তালাকের সংবাদ প্রেরণ করেছেন। আমি তার পরিবারের নিকট খোরপোষের আবেদন করেছি। তারা আমাকে তা দিতে অস্বীকার করেছে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার স্বামী তার কাছে তিন তালাকের সংবাদ পাঠিয়েছেন। তখন ফাতিমা (রাঃ) বললেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, খোরপোষ ও বাসস্থান মহিলার জন্য হবে কেবল তখন, যখন তার স্বামীর জন্য তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকে।”
এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী করীম (সাঃ) তিন তালাকের অবস্থায় স্বামীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার দেননি।

দলীল (৩): তাবারানী হযরত ইবন উমর (রাঃ) কর্তৃক হয়েয অবস্থায় তালাকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার শেষাংশটুকু হল-

... فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كَانَ لِي أَنْ أَرَاَجِعَهَا قَالَ إِذَا بَأَنْتُ مِنْكَ

وَكَأَنْتُ مَعْصِيَةً- (مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٣٦ باب طلاق السنة وكيف الطلاق)

অর্থাৎ, ... অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তবে কি আমি তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখতাম? তিনি বললেন, তখন সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং এটা তোমার জন্য হত গুনাহের কাজ।

দলীল (৪): আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ-

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারঃ ২৩০)

তাফসীরে ইবন কাসীরসহ অন্যান্য তাফসীরে এই আয়াতের তাফসীর এভাবে করা হয়েছে যে, দুই তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর রয়েছে। এই দুই তালাক একসাথে প্রদান করুক অথবা পৃথক পৃথক ভাবে। পক্ষান্তরে তিন তালাকের পর (এই তিন তালাক একসাথে দিক অথবা পৃথক পৃথক ভাবে) স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর নেই। ইসলামের উম্মালগে মানুষের এ অবস্থা ছিল যে, স্ত্রীকে অসংখ্য তালাক প্রদান করত, এমনকি শত শত হাজার হাজার তালাক দিত এবং ইন্দত অতিবাহিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে তাকে ফিরিয়ে আনত। এমতাবস্থায় উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল হয় যে, তিন তালাকের পর ফিরিয়ে আনার আর অধিকার নেই। (ابن كثير ١ ص ٢٧١)

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, তিন তালাকের পর আরেকটি বিবাহ ব্যতীত স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম। একসাথে তিন তালাক দেয়া হোক অথবা পৃথকভাবে তিন তালাক দেয়া হোক এমন কোন শর্ত বা বিশ্লেষণ করা হয়নি।

যেমন, যায়েদ ইবন ওহাবের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর খেদমতে এরূপ এক ব্যক্তিকে পেশ করা হয়েছিল, যে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করলে লোকটি ওয়র পেশ করে বলল, **إِنَّمَا كُنْتُ**

”اَلْعَبَّ” অর্থাৎ, আমি কেবল ক্রীড়া-কৌতুক করেছিলাম। এরপর হযরত উমর (রাঃ) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং বলেছিলেন-

“إِنَّمَا يَكُونُكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةً” অর্থাৎ, তোমার জন্য তো তিন তালুকই যথেষ্ট ছিল।

সুতরাং, একসাথে তিন তালাক দিলে তা অবশ্যই পতিত হবে। যদিও এমনটি করা
 ভীষণ গুনাহের কাজ। (مصلف عبد الرزاق ج ٦ ص ٣٩٢)

দলীল (৫): সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তিন তালাক প্রদানের দ্বারা তিন তালাকই পতিত হবে। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ৩৩০ فتح القدير ج ৩، ৩২০ فتح الهاري ج ১، ২৭۹ شرح معاني الآثار ج ২)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ হযরত রুকানা (রাঃ)-এর তালাকের ঘটনার ব্যাপারে বিপরীতমুখী (مُخْتَلِف) রেওয়ায়েত রয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে তিন তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ... فَقَالَ اِنِّي طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

(অনুচ্ছেদের শুরুতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

আবার, অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশসহ কতক রেওয়াজেতে বর্ণিত হয়েছে-
 أَنْ رَكَاتَهُ الْإِمَامُ طَلَّقَ أَمْرَاتَهُ الْبُيُوتَةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً

সুতরাং রেওয়ায়েত ভিন্ন হওয়ার কারণে হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।

এতদ্ব্যতীত হাদীসে উল্লেখ আছে যে-

... عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرٍ ابْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبُثَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ - (ابو داود ج ١ ص ٣٠٠ باب في البتة، ترمذي ج ١ ص ٢٢٢ باب الرجل طلق امراته البتة، ابن ماجه ص ١٤٩)

অর্থাৎ, ... নাফি ইবন জুবায়ের ইবন আবদ ইয়াযীদ ইবন রুকানা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রুকানা ইবন আবদ ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে ‘আলবাত্তা’ শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করে। তখন এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করা হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর শপথ, তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? তখন জবাবে রুকানা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে স্বীয় স্ত্রী পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেন এবং তৃতীয় তালাক প্রদান করেন উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে।

আবু দাউদ (রহ.) উক্ত হাদীসটিকে দুটি কারণে অগ্রাধিকার (تَرْجِيح) দিয়েছেন-

(১) এই রেওয়ায়েতটি রুকানা (রাঃ)-এর বংশের লোক থেকে বর্ণিত। যাঁরা এ ব্যাপারে অন্যের তুলনায় অধিক জ্ঞাত।

(২) তিন তালাক বিশিষ্ট হাদীসের রেওয়ায়েতটি مُضْطَرِّب (অসঙ্গতিপূর্ণ)। কেননা কতক রেওয়ায়েতে তালাক প্রদানকারীর নাম রুকানা উল্লেখ করা হয়েছে। (مسند احمد ج ١ ص ٢٦٥)
কতক রেওয়ায়েতে আবু রুকানা উল্লেখ করা হয়েছে। (ابو داود ج ١ ص ٢٩٨)

অথচ উক্ত (الْبَتَّة)-বিশিষ্ট হাদীসটি এমন অসঙ্গতি হতে মুক্ত। বরং এখানে ঘটনার নায়ক সুনির্দিষ্ট। আর তিনি হলেন হযরত রুকানা (রাঃ)।

মূল কথা হল, রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দেননি, বরং বলেছিলেন-

أَنْتِ طَالِقُ الْبَتَّةِ অর্থাৎ, তুমি নিশ্চিত (আলবাত্তা) তালাক।

কিন্তু কতক বর্ণনাকারী এর শাব্দিক অর্থ করতে গিয়ে আলবাত্তা তালাককে তিন তালাক দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেননি যে, আলবাত্তা শব্দ দ্বারা রুকানা (রাঃ) এক তালাকের নিয়ত করেছেন। কেননা, এর দ্বারা যদি তিনি তিন তালাকের উদ্দেশ্য নিতেন, তাহলে নবী করীম (সাঃ)-এর বারবার এক তালাকের উপর কসম নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। (درس ترمذي ج ٣ ص ٤٧٩)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। আর এর রহিতকারী হল সাহাবাদের ইজমা। হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে তিনি যখন দেখলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে মানুষের মাঝে

স্বীয় স্বার্থের চেয়ে ধার্মিকতা ছিল অধিক প্রাধান্য বিস্তারকারী এবং সাধারণভাবে তখন এক তালাকেরই রেওয়াজ ছিল। তাই কোন লোক যদি তিন তালাকের শব্দ ব্যবহার করত, তাহলে তা মূলতঃ এক তালাকের তাকীদ বুঝানোর জন্য বলত এবং পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্য সত্য বলে দিত যে, সে মূলত এক তালাকেরই নিয়ত করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত উমর (রাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, মানুষ মিথ্যা বলে হারামে লিপ্ত হচ্ছে এবং তিন তালাক দিয়ে বলত যে, সে এক তালাক দিয়েছে। তাই উমর (রাঃ) মানুষকে হারাম থেকে বাঁচানোর জন্য ঘোষণা করলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার তালাকের শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে তাকীদের ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বাহ্যিক শব্দসমূহের উপরই ফায়সালা হবে এবং তা তিন তালাকে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে সাহাবাদের থেকে পরামর্শ নিয়েছেন এবং কেউ এতে কোনপ্রকার ইখতিলাফ করেননি। সুতরাং এতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন-

بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ - (ابو داود ج ١ ص ٢٩٩ باب بقية نسخ المراجعة الخ)

অর্থাৎ, হাঁ, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তিন তালাক দান করত, তাঁরা একে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে এক তালাক গণ্য করত। অতঃপর তিনি (উমর) যখন দেখেন যে, মানুষ অধিক হারে তিন তালাক দিচ্ছে তখন তিনি বললেন, এতে তাদের উপর তিন তালাক বর্তাবে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস সরাসরি জমহুরদের অনুরূপ। সুতরাং বর্ণনাকারীর স্বীয় রেওয়ায়েতের বিপরীত হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

(২) অথবা, তাঁরা দলীল হিসেবে ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর যে রেওয়ায়েতটি উপস্থাপন করেছেন তা বিরল (شاذ) যা কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীসসমূহ এবং সাহাবাদের ইজমার বিপরীত। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়।

(৩) অথবা, রেওয়ায়েতে উল্লিখিত সকল বিশেষণ بِهَا غَيْرَ مَدْخُولٍ (অসঙ্গমকৃত স্ত্রী)-এর ব্যাপারে। মূলতঃ নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে লোকেরা অসঙ্গমকৃত স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে বলত- أَنْتِ طَالِقٌ, أَنْتِ طَالِقٌ, أَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক); আর এমতাবস্থায় যেহেতু প্রথম তালাক বলাতেই

অসঙ্গমকৃত স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যেত, তাই বাকি তালাকের সুযোগই ছিল না। তাই তা এক তালাকে বায়েন হিসেবে গণ্য হত।

পক্ষান্তরে হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা অসঙ্গমকৃত স্ত্রীর তালাকের ক্ষেত্রে বলত- **أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا** (তুমি তিন তালাক)। ফলে হযরত উমর (রাঃ) তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার হুকুম দেন এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(نسائي ج ٢ ص ١٠٠ باب طلاق الثلاث المتفرقة الخ)

যিহার : **بَابُ فِي الظَّهَارِ** ص ৩০১

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَيْهَاقِيُّ قَالَ كُنْتُ أَمْرًا أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ أَمْرَاتِي شَيْئًا يُنَاقِضُ بِي حَتَّى أَصْبِحَ فظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَيَبْتَغِيَنِي هِيَ تَخْذِمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذَا تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ أَلْهَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَا وَاللَّهِ فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْتَ بِذَلِكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ أَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِي بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ حَرَّرْ رَقَبَةً قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقِيبَتِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ هَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَّامِ قَالَ فَاطْعِمِ وَسَقَا مَنْ تَمَرَ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بَتْنَا وَحَشَيْنَ مَا لَنَا مِنْ إِطْعَامٍ قَالَ فَاَنْطَلِقُ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيُدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَاطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسَقَا مَنْ تَمَرَ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بِقَبِيلَتِهَا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَحَسَنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُمْ - (ترمذي ج ١ ص ٢٧٧)

(باب كفارة الظهار، ابن ماجه ص ١٥٠)

অনুবাদঃ ... সালামা ইবন সাখার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনুল আলা আল-বায়াদী বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাসে আমি খুবই সফল ছিলাম। আর আমার মত সহবাসে সামর্থ্যবান ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। এরপর মাহে রমযান সমাগত হওয়াতে আমার আশংকা হয় যে, হয়ত আমি সকাল বেলাতেও আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারি। তখন আমি তার সাথে যিহার করি এবং এমতাবস্থায় মাহে রমযান প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু একদা রাতে সে আমার খিদমতের সময়, তার সৌন্দর্য আমার সম্মুখে উন্মোচিত হওয়ায়, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হই এবং তার সাথে সহবাস করি। এরপর সকাল বেলা আমি আমার গোত্রের লোকদের নিকট গমন করি এবং তাদের নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করি এবং তাদেরকে বলি, তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট চল। তারা বলে, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমার সাথে গমন করব না। তখন আমি একাই নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং তাকে সব খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালামা! তুমি কি এরূপ কাণ্ড করেছ? আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এরূপই করেছি এবং তা দুবার বলি। আর এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশের প্রতি ধৈর্যধারণকারী। এখন আল্লাহ যা বলেছেন, সে হিসেবে আমার উপর হুকুম জারী করুন। তিনি বলেন, তুমি একজন দাসী মুক্ত কর। আমি বলি, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এ ব্যতীত আমার আর কোন দাসী নেই এবং এই বলে আমি তার শরীর স্পর্শ করি। তিনি বলেন, তবে তুমি দু'মাস রোযা রাখ। তিনি (সালামা) বলেন, রোযার মধ্যে আমি যে মুসীবতে পড়েছি, হয়ত সেরূপ মুসীবতে আবার পড়তে পারি। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে এক ওয়াসাক খুরমা খাওয়াও। তিনি বলেন, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমরা (স্ত্রী, পরিবার) তো রাতে অনাহারে থাকি, আর আমাদের কোন খাবারই নেই। তিনি বলেন, তুমি বনী যরীক গোত্রের সদকা আদায়কারী ব্যক্তির নিকট গমন কর, সে তোমাকে খুরমা প্রদান করবে। আর তদ্বারা তুমি ষাটজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে এক ওয়াসাক খুরমা খাওয়াবে এবং তুমি ও তোমার পরিজনবর্গও বাকী অংশ খাবে। তখন আমি আমার কওমের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের নিকট সংকীর্ণতা ও দুর্ব্যবহার পেয়েছি এবং আমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উদারতা ও উত্তম পরামর্শ পেয়েছি। তিনি আমাকে তোমাদের সদকার মাল গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

ظَهَرَ (যিহার)-এর আভিধানিক অর্থঃ

ظَهَرَ শব্দটি فَعَلَ-এর ওয়নে বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। শব্দটি ظَهَرَ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হল-

(১) পিঠের সাথে তুলনা দেয়া, (২) প্রকাশ করা, (৩) পৃষ্ঠ, (৪) পিছনের দিক, পশ্চাত্তাগ, (৫) এক কাপড়ের উপর অন্য কাপড় পরা ইত্যাদি।

যিহারের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, যিহার হল মায়ের সাথে স্ত্রীর উপমা।

(المعجم الوافي ص ৫০০)

(২) ড. আ.ফ.ম. আবুবকর সিদ্দীক বলেন, যিহার হল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের (পিঠের) মত অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করাকে যিহার বলে।

(৩) **هُوَ تَشْبِيهُ زَوْجَتِهِ أَوْ مَا يُعْبَرُ بِهِ عَنْهَا أَوْ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا بِعَضْوٍ يَحْرُمُ نَظْرَةَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْضَاءِ مَحَارِمِهِ نَسَبًا أَوْ رِضَاعًا-**

অর্থাৎ, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে অথবা স্ত্রীর ঐ অঙ্গকে যা দ্বারা স্ত্রীর সম্পূর্ণ অঙ্গ বুঝায় অথবা স্ত্রীর কোন অনির্দিষ্ট অঙ্গকে স্বামীর বংশগত অথবা দুধ পান সম্পর্কিত কোন মাহরাম মহিলার এমন অঙ্গের সাথে তুলনা দেওয়া, যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার জন্য হারাম।

(৪) মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে যিহার বলা হয়। পদ্ধতিটি এইঃ স্বামী স্ত্রীকে বলবে- **أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي** অর্থাৎ, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের ন্যায়।

(معارف القرآن سورة المجادلة)

(৫) **هُوَ تَشْبِيهُ الْمُنْكَوْحَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْيِيدِ-** গ্রহকার বলেছেন

অর্থাৎ, বিবাহিতা স্ত্রীকে চিরস্থায়ী মাহরাম নারীর সাথে তুলনা দেয়া।

পবিত্র কুরআনেও শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন-

... الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نُسَائِهِمْ ... অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, ... (মুজাদালাঃ ২)

উল্লেখ্য যে, যে সকল শব্দ দ্বারা যিহার হয়, তা দু' প্রকার। যথা-

(১) **أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي** তথা স্পষ্ট শব্দে যিহার। যেমন কেউ বলল,

অর্থাৎ, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মত। এতে যিহার হয়ে যায়।

(২) **كُنَايَةً** তথা ইঙ্গিতসূচক যিহার। যেমন কেউ বলল-

يُثْبِتُ عَلَيْكَ كَأَمِّي وَمِثْلُ أُمِّي

অর্থ্যাৎ, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের মত। এমতাবস্থায় নিয়ত ধর্তব্য হবে। যদি যিহারের নিয়ত করে, তাহলে যিহার হবে। আর যদি বলে এর দ্বারা স্ত্রীকে আমার মায়ের মত সম্মানিত বুঝানো উদ্দেশ্য, তাহলে তার কথাই ধর্তব্য হবে। অর্থ্যাৎ, যিহার হবে না। (تنظيم الاثبات ج ٢ ص ٢٠٥)

যিহারের কাফফারাঃ যদি কোন মুখ্য অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়াতে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফফারা আদায় না করে স্ত্রীর নিকট গমন করা যাবে না। (معارف القرآن سورة المجادلة)

যিহারের কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نُسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا -

অর্থ্যাৎ, যারা তাদের স্ত্রীগণকে যিহার করে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। ... যার এ সামর্থ নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে। যে এতেও (রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোযা রাখতে) অক্ষম হলে সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। (মুজাদালাঃ ৩-৪)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى صَنَعْتَ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ فَأَعْتَزَلْنَاهَا حَتَّى نُكْفِرَ عَنْكَ - (ابو داود ج ١ ص ٣٠٢ باب في الظهار،

نسائي ج ٢ ص ١٠٧ باب الظهار، ابن ماجه ص ١٥٠)

অর্থ্যাৎ, ... ইকরামা হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর, কাফফারা দেওয়ার পূর্বে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-

এর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে এতদসম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করে? সে ব্যক্তি বলে, চন্দ্রলোকে তার স্ত্রীর উজ্জ্বল পায়ের গোছাছয়। তিনি বলেন, তুমি (যিহারের) কাফফারা না দেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে অবস্থান কর।

এখন প্রশ্ন হল, কেউ যদি আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে সদকা দিয়ে দেয়, তাহলে জনপ্রতি কতটুকু পরিমাণ দিতে হবে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, জনপ্রতি এক মুদ* গম দিতে হবে।

দলীলঃ ... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ فَاتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا (وَفِي رِوَايَةٍ تَرْمِذِي ... أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ

صَاعًا) - (ابو داود ج ١ ص ٣٠٢ باب في الظهار، ترمذي ج ١ ص ٢٢٧ باب ما جاء في كفارة الظهار، ابن

ماجة ص ١٤٥ باب الظهار بتغير)

অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে কিছু খেজুর এলে তিনি তা তাকে দান করেন, যার পরিমাণ ছিল পনের সা'-এর মত। তিনি বলেন, তুমি এটা সদকা করে দাও। ... [তিরমিযীর রেওয়ায়েতে ... ঐ থলেটি তাকে দিয়ে দাও। আরাক (عرق) হল এমন থলে যাতে পনের অথবা ষোল সা' জিনিস ধরে।]

উক্ত হাদীসে ১৫ সা'-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এক সা' = ৪ মুদ। সুতরাং ১৫ সা' = ১৫ x ৪ = ৬০ মুদ। অতএব, প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে এক মুদ হয়।

আল-মুগনী কিতাবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব নিম্নোল্লিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে-

لِكُلِّ مُسْكِينٍ مُّدَانٍ مِّنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ (المغني ج ٧ ص ٣٦٩-٣٧٠)

অর্থাৎ, প্রত্যেক মিসকীনের জন্য সকল প্রকার থেকে দু'মুদ দিতে হবে। খেজুর হোক বা গম হোক।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা' খেজুর বা যব অথবা অর্ধ সা গম দিতে হবে, যেমনটি সদকাতুল ফিতরে দেয়া হয়।

* মুদ- এটি ইমাম শাফেঈ ও হিজাবাসীর মতে, ইরাকী এক রতল ও এক তৃতীয়াংশ। আর ইমাম আবু হানিফা ও ইরাকবাসীর মতে, দুই রতল। (النهاية ج ٤ ص ٣٠٨)

(المغني ج ٧ ص ٣٦٩-٣٧٠)

উল্লেখ্য যে, তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওয়নে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দু'সের গম। (معارف القرآن سورة المجادلة)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস-

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْقَا مِنْ تَمَرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ...

আর এক ওয়াসাক হয় ৬০ সা'তে। এ হিসেবে প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে আসে এক সা'। (النهاية ج ৫ ص ১৮০)

জবাবঃ (১) হানাফীগণ বলেন যে, আবু দাউদের হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী আসল হুকুম তো এক ওয়াসাকই ছিল। অতঃপর লোকটি যখন ইহা প্রদানে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তখন প্রিয় নবী (সাঃ) যা কিছু মওজুদ ছিল তাকে তা দিয়ে দেন। এতে বুঝা যায় যে, পনের সা যথেষ্ট হয়ে যাওয়া, ইহা ছিল তার জন্য খাস।

(درس ترمذي ج ৩ ص ১১৮-১১৯)

(২) এটাও সম্ভব যে, নবী করীম (সাঃ) তাকে একের পর এক চারবার থলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আর এভাবে $15 \times 8 = 60$ সা' পূর্ণ হয়ে যায়। আর বর্ণনাকারীর তা না জানার কারণে ইহা উল্লেখ করেননি।

(৩) ইমাম শাফেঈ ও হাম্বলী (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলে عَرَق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটি থলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কি পরিমাণ ধরে সে সম্পর্কে রাবীদেব মতবিরোধ রয়েছে। যদিও রাবী এখানে عَرَق-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন-

"وهو مِثْلُ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا"

কিন্তু আবু দাউদের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে-

... عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ... وَالْعَرَقُ مِثْلُ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا - (ابو داود ج ১ ص ৩০২ باب في الظهار)

অর্থাৎ, ... ইবন ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। ... আরাক হল ত্রিশ সা'-এর সমান।

... عَنْ حُويلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثعلْبَةَ ... قَالَ وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا - (ابو داود ج ১ ص ৩০২ باب في الظهار)

অর্থাৎ, ... খুওয়াইলা বিনত মালিক ইবন সালাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত। .. রাবী বলেন, এক আরাক হল ষাট সা'-এর সমান।

পক্ষান্তরে, এ ব্যাপারে হানাফীগণ যে দলীল পেশ করেছেন, তাতে ওয়াসাক (وَسَقَ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর ওয়াসাকের পরিমাণ হল ৬০ সা'। সুতরাং এতে কোন এখতেলাফ না থাকার কারণে উক্ত রেওয়াজেত দলীল হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।

(৪) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, শস্যের যে পরিমাণ তখন প্রস্তুত ছিল, সেটা সাময়িকভাবে সদকা করার জন্য দিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট পরিমাণ ঋণ হিসেবে দায়িত্বে ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে। পরে অবকাশ হলে তা দিয়ে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় স্পষ্ট বিষয় হল যে, পনের সা-এর উপর সীমাবদ্ধ করা হয়নি।

(درس ترمذي ج ٣ ص ٥١٩)

খুলআ তালাক : بَابُ فِي الْخُلْعِ ص ৩০৩

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ نَعْضَهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهَمَّا بِيَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ - (ترمذي ج ١ ص ٢٢٥ باب الخلع، نسائي ج ٢ ص ١٠٧ باب في الخلع)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবা বিনত সাহল (রাঃ) সাবিত ইবন কায়েস ইবন শাম্মাসের স্ত্রী ছিল। সে তাকে মারধর করলে, তার শরীরের কোন একটি অঙ্গ ভেঙ্গে যায়, সে (হাবীবা) ফজরের নামাযের পর নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট আসে এবং সাবিতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবী করীম (সাঃ) সাবিতকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত মহরের মাল গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ কর। সে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি উত্তম হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তখন সে বলে, আমি তাকে তার মহর স্বরূপ দু'টি বাগান প্রদান করেছিলাম এবং সে এখন এগুলোর মালিক। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ কর। সে (সাবিত) এরূপই করে।

خلع (খুলআ)-এর আভিধানিক অর্থঃ خلع শব্দটি خُلِعَ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হল- খুলে ফেলা, বিচ্যুত করা, বিচ্ছিন্ন করা, তুলে ফেলা ইত্যাদি।

সুতরাং خلع-এর সাথে এ সকল অর্থগুলোর সঙ্গতি খুঁজতে গেল দেখা যায়- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীকে একজন অপর জনের পোশাক (لِبَاس) বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- “هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ”- অর্থাৎ, তারা (মহিলারা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষরা) তাদের পরিচ্ছদ। (বাকারঃ ১৮৭)

সুতরাং ‘খুলআ’-এর দ্বারা একজন অপরজন থেকে যেন তাদের পরিচ্ছদ খুলে ফেলার অনুরূপ।

خلع-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقَّعَةِ قُبُولُهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالْمُبَارَاةِ- (قواعد الفقه ص ২৮১)

অর্থাৎ, খুলআ অথবা এর সমার্থক কোন শব্দ দ্বারা বিয়ের মালিকানা দূরীভূত করা, যা মহিলা কর্তৃক গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। যেমন, মুবারাত (পারস্পরিক সম্মতিতে তালাক) শব্দ।

فِرَاقُ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَهُ عَلَى عَوَضٍ يَحْصِلُ لَهُ- (تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৩) (২)

অর্থাৎ, স্বামী থেকে স্ত্রীর প্রাপ্ত সম্পদের বিনিময়ে বিচ্ছিন্নতাই হল খুলআ।

(৩) ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক বলেন, স্বামী স্বীয় স্ত্রী থেকে নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্যুত করাকে খুলআ বলে।

(৪) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, স্ত্রীর আগ্রহে ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রদত্ত তালাকই হল খুলআ তালাক। (القاموس الوجيز ص ৩২১)

(৫) আবু দাউদ-এর পার্শ্বটিকায় খুলআর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلَى مَالٍ- (ابو داود ج ১ ص ৩০৩)

অর্থাৎ, মালের বিনিময়ে স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা।

* খুলআ فَسْخِ نِكَاحٍ (বিবাহ বিচ্ছেদ), নাকি طَلَاق (তালাক)- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আবু সাওরা (রহ.)-এর মতে, খুলআ হচ্ছে فَسْخِ نِكَاحٍ (বিবাহ বিচ্ছেদ), তালাক নয়। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমতও তাই। (درس مشكوة ج ৩ ص ৩১)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقيِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ-

অর্থাৎ, তালাক হল দু'বার ... অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময়ে দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। ... তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীকে বিয়ে না করবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারঃ ২২৯-২৩০)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা খুলআ ব্যাপারটির আলোচনা দু'তালাকের পরে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিন তালাক দিলে এর বিধান কি হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং খুলআ যদি তালাকই হয়, তাহলে তালাকের সংখ্যা হয়ে যায় চারটি, যার প্রবক্তা কেউ নয়। কেননা, তালাকের সীমা হচ্ছে তিনটি। অতএব খুলআ তালাক নয়, বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

দলীল (২): ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً- (ابو داود ج ১ ص ৩০৩ باب في الخلع، ترمذي

ج ১ ص ২২০، نسائي ج ২ ص ১১২ عدة المختلعة، ابن ماجة ص ১৪৭)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবন কায়েসের স্ত্রী তার নিকট হতে খুলআ তালাক গ্রহণ করে। নবী করীম (সাঃ) তার ইন্দতের সময় একটি হায়েয নির্ধারণ করেন।

একথা স্বীকৃত যে, তালাকের ইন্দত হচ্ছে তিন হায়েয। অথচ উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) খুলআর ইন্দত এক হায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, খুলআ আসলে তালাক নয়; বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.) সহ জমহুরের অভিমত হল, খুলআও তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ নয়। হযরত উসমান, আলী এবং ইবন মাসউদ (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (المغلي ج ৭ ص ৫৬، تنظيم الاشتات ج ২ ص ১৭৩)

দলীল (১): হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

إِنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَأَعْطَاهُ حَدِيثَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً- (بخاري ج ২ ص ৭৭৪ باب الخلع وكيف الطلاق

فيه، نسائي ج ২ ص ১০৭، ابن ماجة ص ১৪৭)

অর্থাৎ, সাবিত ইবন কায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী তার স্বামীর নিকট খুলআর দাবী করলেন এবং স্বামীকে একটি বাগান প্রদান করলেন। নবী করীম (সাঃ) সাবিত ইবন কায়েস (রাঃ)-কে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ কর, আর তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

দলীল (২): সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ)-এর মুরসাল হাদীস-

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً - (درس مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۱)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) খুলআকে বায়েন তালাক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) কুরআনের আয়াত দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, খুলআ প্রথম দু'তালাকেরই অন্তর্ভুক্ত এবং উদ্দেশ্য হল, দু' তালাক পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকে। আর প্রত্যাবর্তনের সুযোগ শেষ হয়ে যায়, যখন তালাকে মুগাল্লাযা বা তিন তালাক দেয়া হয়। আর প্রথম দু' তালাক দু'ভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যথা-

(১) সম্পদের বিনিময়ে তালাক, (২) সম্পদ ছাড়া তালাক। সুতরাং الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ (তালাক দু'প্রকার)-এর ক্ষেত্রে সম্পদ ছাড়া তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর খুলআর ক্ষেত্রে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব খুলআ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ বা দু'প্রকারের তালাকের বহির্ভূত নয়। আর فَإِنْ طَلَّقَهَا আয়াত দ্বারা তৃতীয় তালাকের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং তালাকের সংখ্যা চারটি হয়ে যায়, এমনটি বলা ঠিক নয়। (نور الانوار ص ২১-২২، معارف القرآن ج ১ ص ৫৭১-৫৭২)

হাদীস দ্বারা যে তাঁরা দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন-

(ক) হাদীসে যে حَيْضَةٌ (হায়েয) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা মূলতঃ উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে ইন্দ্রত হিসেবে তাকে হায়েয জাতীয় (جلس حيض) সময় অতিবাহিত করতে হবে। এতে এক হায়েয বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা حَيْضَةٌ শব্দটি কম অথবা বেশি উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। তাছাড়া এর দ্বারা তিন হায়েযকে নিষেধ (نفي) করা হয়নি।

তবে কেউ বলতে পারেন যে, নাসায়ী শরীফের ২য় খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠায় وَاحِدَةً حَيْضَةً তথা একটি হায়েযকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। এর জবাব হল- এখানে মূলতঃ বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপ হয়েছে। কেননা বর্ণনাকারী حَيْضَةٌ-এর মধ্যে যে "৪" রয়েছে,

তিনি উক্ত "ع" কে এককের (وحدت) জন্য মনে করেছেন। তাই তিনি স্বীয় ধারণা অনুযায়ী -حَيْضَةً وَاحِدَةً-এর দ্বারা রেওয়ায়েত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে "حَيْضَةً"-এর মধ্যে যে "৫" রয়েছে তা এককের নয়, বরং جنس (শ্রেণী বা প্রকারের বর্ণনা)-এর জন্য নেয়া হয়েছে। (بذل المجهود ج ১০ ص ৩৩২، الكوكب الدرّي ج ২ ص ২৬৭)।

(খ) তাছাড়া আরো বলা যায় যে, রেওয়ায়েতটি খবরে ওয়াহেদ, যা কুরআনের মোকাবিলায় দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে বর্ণিত আয়াতটি হল -وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। (বাকারাঃ ২২৮)

খুলআর ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণঃ

কতটুকু পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে খুলআ করা জায়েয, তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, লাইছ, নাখঈ, মুজাহিদ, ইকরামা (রহ.), ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের মতে, মহর পরিমাণ অথবা এর চেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদ নিয়েও খুলআ করা জায়েয।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ-

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ হবে না। (বাকারাঃ ২২৯)

উক্ত আয়াতে ৬ হরফটি ব্যাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; মহর পরিমাণ হোক অথবা

এর থেকে বেশি হোক সবই এতে অন্তর্ভুক্ত।

এতে বুঝা যায় যে, মহরের অতিরিক্ত পরিমাণ নেয়া জায়েয আছে।

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও আতা (রহ.)-এর মতে, মহর পরিমাণ সম্পদ নেয়া জায়েয, কিন্তু এর চেয়ে বেশি নেয়া জায়েয নয়।

দলীলঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

إِنَّ جَمِيلَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَعْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَزِيَادَةً- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا الزِّيَادَةُ فَلَا- (دارقطني)

অর্থাৎ, জামীলা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (আমার স্বামী) সাবিতের ধার্মিকতা ও চারিত্রিক দিক থেকে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি ইসলামে কুফরীকে অপছন্দ করি। নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তার বাগান তাকে ফিরিয়ে দিতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, এবং আরো অতিরিক্ত। নবী করীম (সাঃ) বললেন, অতিরিক্ত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বাগানটি যা মহর ছিল, এর থেকে বেশি প্রদানকে নবী করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন। সুতরাং খুলআর ক্ষেত্রে মহরের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া জায়েয নয়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, অপরাধ এবং দোষ যদি পুরুষের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে খুলআর জন্য মহিলার নিকট হতে কোন কিছু নেয়া জায়েয হবে না। কিন্তু অপরাধ এবং দোষ যদি মহিলার পক্ষ থেকে হয়, তাহলে মহরের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া জায়েয নয়।

দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

وَأَنْ أَرْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا-

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য পাপাচার করে গ্রহণ করবে? (নিসাঃ ২০)
উক্ত আয়াতে পুরুষের দোষের ক্ষেত্রে মহিলার পক্ষ থেকে কোন কিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

দলীলঃ মহরের অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া যে নাজায়েয, এর দলীল জামিলার (ঘটনার) হাদীস, যা ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসটি পাঠান্তে বুঝা যায় যে, অপরাধ মহিলার পক্ষ থেকে হয়েছিল।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াতের জবাব হল- উক্ত আয়াতে মহরের পরিমাণই বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতে ইতিপূর্বে মহরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব হল, উক্ত হাদীসটি বিবেচিত হবে স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যা আমরা (হানাফীগণ)ও বলে থাকি।

بَابُ فِيمَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ص ২০৬

ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক স্ত্রী থাকে

... عَنْ وَهْبِ الْأَسَدِيِّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا- (ترمذী ج ۱ ص ۲۱۴ باب الرجل يسلم وعنده عشر نساء، ابن ماجه ص ۱۴۱)

অনুবাদঃ ... ওহাব আল-আসাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম কবুল করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-কে অবহিত করলে তিনি বলেন, তুমি এদের মধ্যে চারজনকে বেছে নাও।

বিশ্লেষণঃ স্ত্রীদের সাথে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ কায়ম করতে পারলে, এমন শর্তে ইসলাম স্বামীকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। তবে একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلْثٍ وَرَبِيعٍ- فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

অর্থাৎ, তবে সেসব (হালাল) মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। (নিসাঃ ৩)

এখন প্রশ্ন হল, যে লোকের নিকট কুফরী অবস্থায় চারের অধিক স্ত্রী ছিল, ঐ লোক যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কোন্ চারজনকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, অনেক স্ত্রীর অধিকারী কাকের যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে স্বামী তাদের মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে গ্রহণ করে অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দেবে। [এই হুকুমটি তখন প্রযোজ্য হবে যখন এসব স্ত্রী স্বীয় ইন্দুকালে ইসলাম গ্রহণ করে। অথবা এসব স্ত্রী আহলে কিতাব হয়, অন্যথায় দীন আলাদা হওয়ার কারণে বিয়ে নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। (المغنى ১৮ ص ১২০)]

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে مُطْلَقًا (নিঃশর্তভাবে)

চারজনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং স্বামী যেকোন চারজনকে ইচ্ছা গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দিবে।

দলীল (২): عَنْ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرٌ (২) نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ— (ترمذی ج ۱ ص ۲۱۴ باب الرجل يسلم وعنده عشر نساء، ابن ماجه ص ۱۴۱)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, গায়লান ইবন সালামা সাকাফী (রাঃ) এমন সময় মুসলমান হয়েছেন, যখন তাঁর বিয়েতে জাহেলী যুগের ১০ জন স্ত্রী ছিল। তারাও তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁকে তাদের মধ্য হতে যে কোন চারজন স্ত্রীকে মনোনীত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

দলীল (৩): ... عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي اخْتَانٌ قَالَ طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ— (ابو داود ج ১ ص ৩০৫, باب فيمن اسلم الخ، ترمذی ج ১ ص ২১৪ الرجل يسلم وعنده اختان، ابن ماجه ص ১৪১)

অর্থাৎ, ... আল যাহাক ইবন ফায়রুয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ইসলাম কবুল করেছি এবং দুই বোন একই সঙ্গে আমার স্ত্রী হিসাবে আছে। তিনি বলেন, এদের মধ্যে যাকে খুশী তুমি তালাক প্রদান কর।

উক্ত হাদীসেও দেখা যাচ্ছে যে, স্বামীর এখতিয়ার রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, যদি একই আক্কে তাদের সকলের বিয়ে হয়ে থাকে, তবে তাদের সকলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা (تَفْرِيقٌ) ওয়াজিব। কেউ কারো উপর অগ্রাধিকার পাবে না। কিন্তু যদি বিভিন্ন আক্কে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রে প্রথম চার মহিলার বিবাহ শুদ্ধ হবে, আর অবশিষ্টগুলো নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। মনোনয়নের কোন অধিকার নেই।

(المغني ج ৬ ص ৬২০، الميسوط للشرخسي ج ৫ ص ৫৩-৫৪)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এই মাসআলার ভিত্তি হল ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-

نِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْأَوَّلِ جَازٌ وَنِكَاحُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ— (موطاء محمد ص ২৪৫)-

অর্থাৎ, প্রথম চারজনের বিবাহ জায়েয এবং তাদের ছাড়া অন্যদের বিয়ে বাতিল।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমাম দলীল হিসেবে যে সকল হাদীস পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, যে সকল হাদীসে স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোন চারজনকে এবং দুই বোনের ক্ষেত্রে যেকোন একজনকে গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেয়া হয়েছে, তা ঐ সময়ের

বিবাহসমূহের ব্যাপারে, যখন চারজনের অতিরিক্ত এবং আপন দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা জায়েয ছিল। (طحاوي ج ২ ص ১২১)

আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে বিবাহ শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও অবশিষ্ট থাকবে।

তাই নবী করীম (সাঃ) সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন- طَلَّقَ ابْنَهُمَا شَيْئًا

অর্থাৎ, দু'বোনের মধ্যে যাকে খুশী তুমি তালাক প্রদান কর।

উল্লেখ্য যে, তালাক তো পতিত হয় ঐ বিবাহে, যে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, দু'বোনের একত্রে বিবাহ শরীয়ত অবতীর্ণের পূর্বে সহীহ ছিল এবং পরেও সহীহ রয়েছে, আর তাই নবী করীম (সাঃ) তালাক দিতে বলেছেন। নতুবা বিয়ে যদি সহীহই না হত, তাহলে তালাকের প্রশ্নই ওঠে না।

সুতরাং বুঝা যায় যে, যেসব বিবাহ নিষেধ আসার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব বিবাহের ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু যেসব বিবাহ শরীয়ত আসার পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তিন ইমাম যে সকল হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, সে সকল হাদীসে বর্ণিত বিবাহসমূহ ছিল শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

লিআন : بَابُ فِي اللَّعَانِ ص ৩০৫

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ - (ابو داؤد ج ১

ص ৩০৮, بخاري ج ২ ص ৮০১ باب يلحق الولد بالملاعنة, مسلم ج ১ ص ৬৭০ كتاب اللعان, ترمذي ج ১

ص ২২৭ باب اللعان, نسائي ج ২ ص ১০৭ باب نفى الولد باللعان الخ, ابن ماجه ص ১০৫)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে লিআন করে এবং স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানের সম্পর্ক মায়ের সাথে স্থির করেন।

লিআন (لَعَان)-এর আভিধানিক অর্থঃ

لَعَان বা مُلَاعَنَة শব্দ দুটি (বাবে مُلَاعَنَة-এর ওযনে) لَاعَنَ يُلَاعِنُ-এর মাসদার। এর ক্রিয়ামূল হচ্ছে ل-ع-ن। এই শব্দটি মূলত লানত হতে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ

হচ্ছে- পরস্পর অভিসম্পাদ দেয়া, বদদোয়া করা, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, প্রতিশোধ নেয়া, অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। (القاموس الوجيز ص ১২৭)

الطَّرُدُ وَالْإِعْمَادُ - গ্রন্থে এর অর্থ করা হয়েছে- বিতাড়িত করা, অপসারিত করা, দূর করা। কেননা, লিআনের ফলে স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে আজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (تنظيم ج ২ ص ২০৭)

وَأَنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়-
অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত। (সোয়াদঃ ৭৮)

লিআনের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেয়াকে লিআন বলা হয়। (معارف القرآن سورة النور)

২। ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে এবং এর অনুকূলে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতের সামনে সূরা নূর-এ বর্ণিত বিশেষ পন্থায় পাঁচবার হলফ করতে হয়। আইনের পরিভাষায় একে লিআন বলে।

৩। শরহে বেকায়ার ভাষ্যকার বলেন-

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَهَادَاتٍ مُؤَكَّدَةٍ بِالْإِيمَانِ مَقْرُونَةٍ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَحَدِّ الزُّنَا فِي حَقِّهَا -

অর্থাৎ, লিআন হচ্ছে শপথ দ্বারা সুদৃঢ় এমন কতিপয় সাক্ষ্য যেগুলো অভিসম্পাত যুক্ত এবং স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদে শাস্তি ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে যিনার শাস্তির স্থলাভিষিক্ত হয়, তথা স্বামী হতে অপবাদে শাস্তি এবং স্ত্রী হতে যিনার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

৪। কতিপয় আলেম বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা স্ত্রী যদি স্বামীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অতঃপর তা প্রমাণ করার জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী চারজন সাক্ষীর স্থলে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, নিজে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে যেন আমার উপর আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত) নাযিল হয়, অপরজনও অনুরূপভাবে পাঁচবার শপথ করবে। এরূপে কাযীর মাধ্যমে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর নামই হল লিআন।

৫। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান অতি সংক্ষেপে এর পরিচয় দানে বলেন, শপথ সহকারে ব্যভিচারের অপবাদই হল লিআন। (المعجم الوافي ص ১৮৭)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ- وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ- وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ- وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ-

অর্থাৎ, এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লানত এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গণ্য নেমে আসবে। (নূরঃ ৬-৯)

বিশ্লেষণঃ লিআনের জন্য **أَهْلَيْتَ شَهَادَتَ** (সাক্ষ্য দানে যোগ্যতা) শর্ত কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, লিআনের জন্য **أَهْلَيْتَ شَهَادَتَ** হওয়া শর্ত নয়। বরং লিআনের জন্য **أَهْلَيْتَ يَمِينَ** (শপথের যোগ্যতা) হওয়া যথেষ্ট। কেননা, তাদের নিকট লিআন **شَهَادَتَ** (সাক্ষ্য)-এর নাম নয়, বরং লিআন হল **أَيْمَان** বা শপথসমূহের নাম। তাঁরা বলেন, লিআন হল- **الْأَيْمَانُ الْمُؤَكَّدَاتُ بِالشَّهَادَاتِ** অর্থাৎ, এরূপ কতগুলো কসম যেগুলো সাক্ষ্য দ্বারা তাকীদপূর্ণ।

এজন্য মুসলিম স্বামী ও তার কাফের স্ত্রীর মধ্যে এবং গোলাম ও তার স্ত্রীর মধ্যে লিআন হতে পারে। (هداية مع حاشية ج ٢ ص ٤١٦-٤١٧، درس مشکوة ج ٣ ص ٤٠)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, লিআনের জন্য **أَهْلَيْتَ شَهَادَتَ** হওয়া শর্ত। কেননা তাঁর নিকট লিআন হচ্ছে **شَهَادَتَ** (সাক্ষ্য)-এর নাম। **أَيْمَان** (শপথ)-এর নাম নয়। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য **أَهْلَيْتَ شَهَادَتَ** হওয়া জরুরী। সুতরাং মুসলিম স্বামী ও তার কাফের স্ত্রীর মধ্যে এবং গোলাম ও তার স্ত্রীর মধ্যে লিআন জায়েয নয়।

কেননা, তিনি বলেন, লিআন হল: بِالْإِيمَانِ اَلشَّهَادَةُ الْمُكَذَّاتُ بِالْإِيمَانِ, এরূপ কতগুলো সাক্ষ্যের নাম যেগুলো কসম দ্বারা তাকীদপূর্ণ। (هداية مع حاشية ٢ ج ٤١٦-٤١٨)

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে হানারী মতের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়-
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ -

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা লিআনকে (সাক্ষ্য) বলেছেন। সুতরাং লিআনের জন্য اهليت شهادت হওয়া শর্ত।

লিআন সম্পর্কে দ্বিতীয় আলোচনাঃ

কেবল লিআনের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন (تَفْرِيقٌ) হয়ে যাবে, নাকি বিচারকের বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও যুফার (রহ.)-এর মতে, লিআনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, বিচারকের বিচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই। (درس مشکوٰۃ ج ٣ ص ٤٠)

দলীলঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

اَلْمُتَّلَاعَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَحْتَمِعَانِ أَبَدًا- (ابو داود ج ١ ص ٣٠٦ باب في اللعان، دار قطنی ج ٣ ص ٢٧٦)
অর্থাৎ, দুই লিআনকারীর মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখন তারা আর কোনদিন একত্রিত হতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, যদি লিআনের পর বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হয়ে অবশিষ্ট থাকত, তাহলে নিশ্চিন্তে উভয়ে একত্রিত হতে পারত। অথচ হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং লিআনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচারকের বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, স্বয়ং লিআনকারী যদি মহিলাকে তালাক দেয়, তাহলে এটাই উত্তম, আর যদি তালাক না দেয়, তবে শুধু লিআনের দ্বারা উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ হবে না; বরং এক্ষেত্রে বিচারকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। (درس مشکوٰۃ ج ٣ ص ٤٠)

... عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّعْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُيُومَرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ

أَمْرَاتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلِّ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبَرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُومَيْرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ عُومَيْرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهَيْ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُومَيْرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسَطُ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَمْرَاتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ قُرْآنٌ فَادْهَبْ فَأَنْتَ بِهَا قَالِ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُومَيْرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا عُومَيْرٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— (ابو داود ج ۱ ص ۳۰۵ باب في اللعان، بخاري ج ۲ ص ۷۹۹-۸۰۰ باب يبدأ الرجل بالتلاعن، مسلم ج ۱ ص ۴۸۸، ترمذي ج ۱ ص ۲۲۸، نسائي ج ۲ ص ۹۹-۱۰۰ باب الرخصة في ذلك، ابن

ماجة ص ۱۵۰)

অর্থৎ, ... ইবন শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবন সাদ আল-সাদ্দী তাকে খবর দিয়েছেন যে, উওয়াইমের ইবন আশকার আল আজলানী আসিম ইবন আদীর নিকট আগমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! আমাকে বলুন, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে কোন অপরিচিত লোককে এক বিছানায় দেখে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর কিসাস (বদলা) হিসাবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে, নাকি করবে না? তুমি এ সম্পর্কে আমার জন্য হে আসিম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটু জিজ্ঞাসা কর। আসিম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাকে দোষারোপ করেন। এমনকি আসিম রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে যা শ্রবণ করেন তা তার জন্য খুবই ভয়ানক মনে হয়। এরপর আসিম তার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমের তাঁর নিকট গমন করে বলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে কি বলেছেন? আসিম বলেন, তুমি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়ে আগমন করনি। আমি ঐ

মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। এতদশ্রবণে উওয়াইমের বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার (মহিলার) সম্পর্কে এ প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না। উওয়াইমের এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গমন করেন, যখন তিনি মানুষের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অপরিচিত কোন মানুষ পায়, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এজন্য আপনারা কি তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করবেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নাযিল করেছেন। তুমি যাও এবং তাকে (স্ত্রী) নিয়ে এস। রাবী সাহল বলেন, তারা উভয়ে একে অপরের প্রতি শপথ করে ব্যভিচারের দোষারোপ করতে থাকে এবং আমিও তখন অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তারপর তারা যখন অভিসম্পাত ও দোষারোপ করা হতে বিরত হয়, তখন উওয়াইমের বলে, যদি এখন আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার ব্যাপারে আমি লোকদের নিকট মিথ্যুক প্রতিপন্ন হব। উওয়াইমের নবী করীম (সাঃ)-এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাকে (স্ত্রীকে) তিন তালাক প্রদান করেন।

হাদীসটির শেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যদি কেবল লিআনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) তার তালাকের উপর অস্বীকৃতি প্রদান করতেন। অথচ বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, শুধু লিআনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবে না; বরং কাযী বিচ্ছিন্ন করবে, নতুবা স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিবে।

... أَنْ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (২) দলীল
فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا-

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সম্পর্কে লিআন করলে নবী করীম (সাঃ) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

... عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلَاعَنَّا الْخ (ابو داود ج ১ ص ৩০৬ باب في اللعان)

অর্থাৎ, ... সাহল ইবন সাদ হতে বর্ণিত। রাবী মুসাদ্দাদ তার হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহল) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে দু'জন পরস্পর অভিসম্পাত ও দোষারোপকারীর ব্যাপারটা যখন উপস্থাপিত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত

ছিলাম এবং এ সময় আমার বয়স ছিল পনের বছর। এরপর তারা শপথ করে পরস্পর অভিসম্পাত ও যিনার দোষারোপ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

উক্ত হাদীসদ্বয়ে প্রতীয়মান হয় যে, লিআনের পরেও নবী করীম (সাঃ) কাযী হিসেবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছেন। শুধু লিআনের দ্বারাই যদি বিচ্ছেদ হয়ে যেত, তাহলে নবী করীম (সাঃ)-এর বিচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

১। উল্লিখিত তিন ইমাম দলীল হিসেবে যে হাদীস পেশ করেছেন তা মাওকুফ হাদীস। সুতরাং মাওকুফ হাদীস মারফু হাদীসের মোকাবেলায় দলীলযোগ্য নয়।

২। অথবা, হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল- **تَفْرِيقٌ** বা বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর একত্রিত হতে পারবে না। যাতে মারফু হাদীসের সাথে অসামঞ্জস্য না হয়। (درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ১০)

লিআন সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনাঃ

লিআনের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ হয়, তা কি চিরকালের জন্য, নাকি কোন শর্তসাপেক্ষে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আবু ইউসুফ, যুফার ও হাসান ইবন যিয়াদ (রহ.)-এর মতে- লিআনের দ্বারা যে **تَفْرِيقٌ** (বিচ্ছেদ) হয়, এতে তালাক হয় না এবং এর দ্বারা দুষ্কপোষ্য ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা (**حُرْمَتُ مُصَاهَرَةٍ**)-এর হারামের ন্যায়। আজীবনের জন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। কখনো তার জন্য বৈধ হবে না। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ২০৭)

দলীলঃ **اَلْمُتْلَاعَتَانِ اِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا** (দার কুত্বী জ ৩ ص ২৭৬, ابو داود জ ১ ص ৩০৬)
باب في اللعان

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, লিআনের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়, তা তালাকে বায়েন-এর পর্যায়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিজেদের লিআনের অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিয়ে সহীহ হবে না। কিন্তু স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তা স্বীকার করে নেয় এবং তার উপর মিথ্যা অপবাদের যে শাস্তি শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে (৮০টি বেত্রাঘাত) তা কার্যকর করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে পুনরায় বিবাহ জায়েয হবে। সুতরাং একথা বলা যাবে না যে, লিআনের দ্বারা যে বিচ্ছেদ হয়, তা আজীবনের জন্য। (فتح القدير ج ১ ص ১২০)

দলীলঃ পবিত্র কুরআনে যে সকল নারীকে বিয়ে করা চিরদিনের জন্য হারাম (مَحْرَمَات) এর তালিকা রয়েছে, তাতে লিআনকারীদের উল্লেখ নেই। অতএব তা কিভাবে চিরদিনের জন্য হারাম হবে?

তাছাড়া বিচারক যখন স্বামীর জ্বলাভিষিক্ত হয়ে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিবে, তখন তা তালাকের হুকুমে গণ্য হবে। আর স্বামীর পক্ষ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তাও তালাক হবে। অতএব, তালাকের দ্বারা যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে, এর দ্বারা চিরদিনের জন্য বিয়ে হারাম হতে পারে না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

দলীল হিসেবে তাঁদের প্রদত্ত হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই লিআন অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কখনও একত্রিত হতে পারবে না। আর একথা তো সবাই বলে থাকেন। সুতরাং হানাফীরাও উক্ত হাদীসের বিরোধী নন। অতএব, যখন মিথ্যা অপবাদে দরুণ স্বামীকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন আর লিআন থাকবে না। কেননা তখন লিআনের মূল কারণই থাকে না। আর যখন লিআনই থাকল না, তখন তো একত্রিত হওয়ার অবৈধতাও অবশিষ্ট রইল না। কারণ এটা তো দুই লিআনকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। (بدائع الصنائع ج ৩ ص ২৪০-২৪১)

কেননা متلاعنين প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীকে ঐ সময় পর্যন্ত বলা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত লিআনের কার্যক্রম চলতে থাকে। যখনই উভয়ে লিআন থেকে ফারোগ হয়ে যাবে, প্রকৃত অর্থে তখন আর متلاعنين থাকে না, বরং তালাকে পরিণত হয়ে যায়।

নিম্নে লিআনের কতিপয় বিধি-বিধান বর্ণিত হলঃ (হানাফী মাযহাব অনুসারে)

- (১) লিআন গৃহে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং লিআনের জন্য আদালত জরুরী।
- (২) লিআনের অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের রয়েছে।
- (৩) পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই লিআন করতে পারে, অন্যরা নয়।
- (৪) লিআন শুধুমাত্র স্বাধীন মুসলমান স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কাফের, গোলাম ও কাযাফের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্তের জন্য কার্যকর হবে না।
- (৫) নিছক ইশারা-ইঙ্গিত কিংবা রূপক উপমা বা সংশয়-সন্দেহ করলেই লিআন কার্যকর হবে না, বরং স্পষ্ট ভাষায় যিনার অপবাদ দিতে হবে।
- (৬) লিআনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; বরং তাকে তার মায়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। তবে সন্তানকে জারজ বলা যাবে না।
- (৭) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে লিআন কার্যকর হবে না। কেননা নারীটি এখন তার স্ত্রী নয়। অবশ্য যদি রাজসী তালাক হয়, তবে ভিন্ন কথা।

- (৮) স্বামী তার মহরের অর্থ স্ত্রীর কাছে ফেরত চাইতে পারবে না।
- (৯) স্বামী যদি যিনার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কাযাফ-এর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।
- (১০) স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক আরোপিত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে অর্থাৎ লিআনে অবতীর্ণ হতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।
- (১১) স্বামী যদি কসম খেতে ইতস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয়, তবে তাকে বন্দী করতে হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করবে বা অভিযোগটি যে মিথ্যা একথা স্বীকার করবে। এ বিধান স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
- (১২) ইদ্দতের সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে খরচ ও বাসস্থান পাবে না। কেননা সে তালাক কিংবা মৃত্যু ছাড়াই স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
- (১৩) লিআন সংঘটিত হওয়ার পর আদালত স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, যাতে কেউ কারো উপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে।

بابُ فِي الْقَافَةِ ص ৩০৭ : নিদর্শন অনুসরণবিদ্যা

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ وَأَبْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مُسْرُورًا وَقَالَ عُمَانُ تُعْرِفُ أَسَارِيرَ وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّ عَائِشَةَ أَلَمْ تَرَى إِنَّ مُجَرَّرَ الْمُدْلَجِيِّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَزَيْدٌ أَبْيَضَ - (مسلم ج ১ ص ৪৭১ باب العمل بالحق القائف الولد، نسائي ج ২ ص ১১১ باب القافة، ابن

ماجة ص ১৭১)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকট প্রবেশ করেন, রাবী মুসাদ্দাদ ও ইবন সারাহ বলেন, সন্তুষ্টচিত্তে। রাবী উসমান বলেন, তাঁর চেহারা সন্তুষ্টির আভা প্রকাশ পেয়েছিল। এরপর তিনি বলেনঃ হে আয়িশা! তুমি কি দেখনি, মুজরায মুদলাজী দেখতে পেল যে, যায়িদ ও উসামা (রাঃ) তাদের মস্তক চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছে; আর তাদের উভয়ের পা ছিল খোলা। তখন সে বলল, নিশ্চয়ই এ পাগুলি একে অপরের থেকে। (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, উসামা (রাঃ) ছিলেন কাল আর যায়িদ (রাঃ) ছিলেন ফর্সা।

বিশ্লেষণঃ قِيَاةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- চিহ্ন ধরে অনুসরণ, হাবভাব, চিহ্ন দেখে মূল বস্তু নির্ধারণ করার জ্ঞান ইত্যাদি। এর মাদ্দাহ হল ق-و-ف
আর পারিভাষিক অর্থে قَائِفٌ হল-

الذي يعرف النسب بفراسته ونظره الى أعضاء المولود- (المنجد الابددي ص ৭৭৭)
অর্থাৎ, স্বীয় দূরদর্শিতার সাহায্যে এবং শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে যে বংশ চিনতে পারে।
* দরসে মিশকাত গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, عِلْمُ الْقِيَاةِ হল এমন একটি ইলম, যা চিহ্ন ও নিদর্শনের দ্বারা একজন অপরজনের সাদৃশ্যে পৌঁছানো হয়। এবং এর দ্বারা প্রশাখা (فُرُوع- সন্তান)-কে মূল (أَصُول-পিতা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করানো হয়।

(تنظيم الاشتات ج ২ ص ২০৯, درس مشکوة ج ৩ ص ৬১)

هُوَ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْأَتَارِ وَمَعْرِفَةٌ شِبْهُ الرُّجُلِ بِأَلْحِيهِ وَآبِيهِ-
(ابو داود حاشية ج ১ ص ৩০৯ باب في القافة)

প্রশ্ন হল, قِيَاةُ শরীয়তে গ্রহণযোগ্য কিনা। এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, আওযাঈ এবং আতা (রহ.)-এর মতে শরীয়তে قِيَاةُ-এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। অতএব, বংশ প্রতিষ্ঠায় অনুমানকারীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ২০৯)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে প্রতীয়মান হয় যে, মুজরায মুদলাজী যাবেদ ও উসামা (পিতা ও সন্তান) উভয়ের পা দেখে যখন তাদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন, তখন মুনাফিকরা তাদের অপবাদ থেকে চূপ হয়ে যায় এবং নবী করীম (সাঃ)ও খুশী হয়ে আয়িশা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে খবর দেন। এতে বুঝা যায় যে, অনুমানকারীর উক্তি বংশ প্রতিষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য। নতুবা নবী করীম (সাঃ) তার উক্তিহীন খুশী হতেন না।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে- শরীয়তে قِيَاةُ-এর কোন মূল্যায়ন বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। অতএব বংশ প্রতিষ্ঠায় অনুমানকারী قَائِف-এর কোন উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ২০৯)

দলীলঃ “ইলমুল কিয়াফাহ” একটি ধারণা ও আন্দাজমূলক বিষয়। এর দ্বারা একীনী ইলম ও প্রকৃত বিষয় অর্জন হয় না। আর শরীয়তের কোন হুকুম আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ-

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। (হুজরাতঃ ১২)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ দলীল হিসেবে তাঁরা যে হাদীসটি পেশ করেছেন, এর জবাব হল এই যে, হযরত উসামা (রাঃ)-এর বংশ তো শরীয়তের হুকুম দ্বারা প্রথমেই প্রমাণিত ছিল। কেবল মুনাক্করাই সন্দেহ পোষণ করত। অতঃপর তাদের নিকট যেহেতু “ইলমুল কিয়াফাহ”-এর গ্রহণযোগ্যতা ছিল, এবং মুজরায মুদলাজীর উক্তি দ্বারা তাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, এতে হযরত উসামা (রাঃ)-এর প্রমাণিত বংশের আরো বেশি দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। আর এর ভিত্তিতেই নবী করীম (সাঃ) খুশি হয়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) قَافَةَ দ্বারা বংশ প্রমাণিত হওয়াতে খুশি হননি। কেননা, আন্দাজের দ্বারা বংশ প্রমাণিত হতে পারে না; বরং বংশ তো প্রমাণিত হবে শরীয়তের হুকুম দ্বারা। (درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ৪১) আর তাহল-

... عَنْ عَائِشَةَ ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

الْحَجَرُ- (ابو داود ج ১ ص ৩১০ باب الولد للفراش، مسلم ج ১ ص ৪৭০ باب الولد للفراش الخ، ترمذي ج ১

ص ২১৭ باب الولد للفراش، نسائي ج ২ ص ১১০ الحاق الولد بالفراش الخ، ابن ماجه ص ১৪৫)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে তার এবং যিনাকারীর জন্য প্রস্তুত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ উক্ত অনুচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে-

... عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ آتَوْا عَلَيَّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ طَبِّبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَعَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طَبِّبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَعَلَيَا فَقَالَ أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُفَرِّعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبِيهِ ثَلَاثَا الدِّيَةِ فَاقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ وَتَوَاجَدَهُ- (ابو داود ج ১

ص ৩০৭ باب من قال بالقرعة اذا تنازعا في الولد، نسائي ج ২ ص ১১১ باب القرعة في الولد الخ)

অনুবাদঃ ... যায়িদ ইবন আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন ইয়ামন হতে জৈনৈক ব্যক্তি

আগমন করে বলেন, ইয়ামনের তিন ব্যক্তি আলী (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি সন্তানের (মালিকানা) সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যারা একটি স্ত্রীলোকের সাথে একই তুহুরে উপগত হয়। তিনি (আলী রাঃ) তাদের মধ্যে দু'জনকে বলেন, এ সন্তানটি এ (তৃতীয়) ব্যক্তির। তারা উভয়ে চীৎকার করে উঠে। এরপর তিনি বলেন, বেশ তা হলে সন্তানটি তোমাদের দুজনের। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা অস্বীকৃতি জানায়। আলী (রাঃ) বলেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়াকারী, কাজেই আমি তোমাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করব। আর লটারীতে যার নাম উঠবে, সে সন্তানের পিতা হবে। আর সে ব্যক্তিকে অপর দু'ব্যক্তির জন্য দু'তৃতীয়াংশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করতে হবে। এর উপর তিনি তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে যার নাম আসে, তাকে তিনি সন্তান প্রদান করেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এত জোরে হেসে উঠেন যে, তাঁর সম্মুখের ও এর পার্শ্ববর্তী দন্ত মোবারক প্রকাশিত হয়। হাদীসটি পাঠান্তে কেউ হয়ত একথা মনে করতে পারেন যে, শরীয়তে লটারী জায়েয। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন নয়। এর ব্যাখ্যায় আহনাফরা বলেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে লটারীর হুকুম জায়েয ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়। যেমন ইসলামের সূচনালগ্নে শরাব পান জায়েয ছিল। তাঁরা আরো বলেন যে, এই লটারী **حجة مثبتة** তথা কোন হককে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নয়, বরং **حجة**

مرجحة বা প্রতিষ্ঠিত হককে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে। আর এই বৈধতা এখনো জায়েয রয়েছে। যেমন, কোন পিতা যদি দুটি ছেলে রেখে মারা যায় তবে মৃত পিতার জমি উভয়ে প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কে কোন্ অংশ নেবে, দক্ষিণ অংশ কে নেবে এবং উত্তর অংশ কে নেবে এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হককে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা জায়েয আছে। মোটকথা হল- লটারীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হক-এ অগ্রাধিকার কায়েম করা জায়েয আছে। কিন্তু লটারীর মাধ্যমে হককে প্রতিষ্ঠা করা জায়েয নয়।

জবাবঃ উল্লিখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, লটারীর মাধ্যমে হককে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর উত্তর হল এই যে, ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুআমেলা ছিল। কিন্তু পরে তা নিম্নে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে-

... عَنْ عَائِشَةَ ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ

الْحَجَرُ- (ابو داود ج ১ ص ৩১০, مسلم ج ১ ص ৪৭০, ترمذي ج ১ ص ২১৭, نسائي ج ২ ص ১১০, ابن

ماجة ص ১৪০)

অর্থাৎ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, সন্তান হল যার বিছানায় জন্ম নিয়েছে তার এবং যিনাকারীর জন্য প্রস্তুত।

৩১০ : بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ص ৩১০ সন্তানের অধিক হকদার কে?

...عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صَدَقَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادْعِيَاهُ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَطَنْتُ بِالْفَارْسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا إِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَيْرِ أَبِي عُقْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْهِمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ - (نسائي ج ٢ ص ١١٢ باب القافة)

অনুবাদঃ ... হিলাল ইবন উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মায়মুনা সালমা যিনি মদীনার কোন এক সত্যবাদী ব্যক্তির আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যখন আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে পারস্য দেশীয় জনৈক স্ত্রীলোক, তার সাথে একটি পুত্র নিয়ে আগমন করে; যাকে (পুত্র সন্তানকে) সে এবং তার স্বামী, যে তাকে তালাক দিয়েছিল সন্তান হিসাবে দাবী করতে থাকে। এরপর সে (মহিলা) ফার্সী ভাষায় বলে, হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার পুত্রকে নিয়ে যেতে চায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তোমরা উভয়ে (সন্তানের) ব্যাপারে লটারী কর। এরপর তিনি (আবু হুরায়রা) যখন তার নিকট জবাবের প্রত্যাশায় ছিলেন, তখন তার স্বামী সেখানে আগমন করে এবং বলে, আমার পুত্রের ব্যাপারে কে আমার সাথে ঝগড়া করতে চায়? আবু হুরায়রা বলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি এ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা ব্যতীত অধিক কিছু বলব না। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট থাকাকালে জনৈক মহিলাকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বামী আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে চায়। আর অবস্থা এই যে, সে (সন্তান) আমাকে আবু উকবার কূপ হতে (পানি) এনে পান করায় এবং সে আমার খিদমতও করে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, এদের উভয়ের মধ্যে সন্তানের ব্যাপারে লটারীর ব্যবস্থা কর। তখন তার স্বামী বলেন,

আমার থেকে আমার সন্তানকে কে ছিনিয়ে নিতে চায়? নবী করীম (সাঃ) সে সন্তানকে সম্বোধন করে বলেন, এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এদের মধ্যে যার খুশী হস্ত ধারণ কর। তখন সে (সন্তান) তার মাতার হস্ত ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।

বিশ্লেষণঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি কোন কারণে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তাহলে সন্তানের হকদার কে হবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে সন্তানকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দেয়া হবে। ঐ সন্তান যাকে নির্বাচন করবে, সে তার কাছেই থাকবে। (تنظيم الاثنيات ২৮ ص ২১৭)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে- ... فَخُذْ بِيَدِ آبَيْهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ ...

দলীল (২)ঃ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ- (ترمذي ج ১ ص ২০২ باب ما جاء في تخيير الغلام الخ)

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) এক সন্তানকে তার মা-বাপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেন।

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) পিতা-মাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সন্তানকে ইচ্ছা স্বাধীনতা দিয়েছেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যখন একটি সন্তান سَنَ شُعُور বা উপলব্ধির বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, যেমন নিজে নিজেই পানাহার, প্রস্রাব-পায়খানা, কাপড় পরিধান ও অযু করতে পারে, তাহলে এমতাবস্থায় পিতা বেশি হকদার হবে।

* ইমাম খাস্‌সাফ (রহ.) বলেন, উপলব্ধির বয়স হল সাত বছর। এবং এর উপরই ফাতওয়া। কেননা, এ সময় শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং এ কাজটি পিতার দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এর পূর্বে ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে নয় বছর পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে, কেননা এ সময়ের লালন-পালন পিতার দ্বারা হতে পারে না। (تنظيم الاثنيات ২৮ ص ২১৭، درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ৪৭)

দলীল (১)ঃ মালিক এবং বায়হাকী (রহ.) হতে বর্ণিত-

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ أَنَّهُ قَضَىٰ فِي عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ وَلَمْ يُخَيِّرْهُ وَكَانَ هَذَا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ-

অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রাঃ) আসেম ইবন উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে তার মায়ের অধীনে দিয়ে দেন এবং তাকে কোন ইচ্ছা স্বাধীনতা দেয়া হয়নি, আর এ ঘটনাটি সাহাবাগণের সামনেই ঘটেছিল। কিন্তু কেউ অপছন্দ করেননি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ছোট সন্তানকে ইচ্ছা স্বাধীনতা না দেয়ার ব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলীল (২): ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের ইচ্ছা স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেয়া আদৌ ঠিক নয়। কেননা, স্বল্প বুদ্ধির কারণে সে সঠিক নির্বাচন করতে পারবে না। দেখা যাবে সে এমন কোন অনুপযোগীকে নির্বাচন করে বসে আছে যার নিকট গেলে সে খেলাধুলার অধিক সুযোগ পাবে, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ কাম্য নয়।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢١٧)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব: ইমাম শাফেঈ (রহ.) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে হাদীসদ্বয় উল্লেখ করেছেন, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, এটি ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর একটি খাস ঘটনা। সুতরাং এর দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের হাদীসে পাওয়া যায়-

... عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أُمُّرَاتُهُ أَنْ تُسَلَّمَ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبِيهَةٌ وَقَالَ رَافِعُ ابْنَتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً وَأَقْعُدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَآخَذَهَا- (ابو داود

ج ١ ص ٣٠٥ باب إذا اسلم أحد الابوين الخ، نسائي ج ٢ ص ١١٢)

অর্থাৎ, ... আব্দুল হামীদ ইবন জাফর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দাদা রাফি ইবন সিনান (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর স্ত্রী ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে। তখন সে (তার স্ত্রী) নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলে, এ আমার কন্যা সন্তান। আর সে আমারই মত। অপরপক্ষে রাফি দাবী করেন, এ আমার কন্যা। নবী করীম (সাঃ) তাকে এক পার্শ্বে এবং তার স্ত্রীকে অপর পার্শ্বে বসতে বলেন এবং কন্যা সন্তানটিকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, এখন তোমরা উভয়ে তাকে আহ্বান কর। কন্যাটি তার মাতার দিকে আকৃষ্ট হলে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি একে (কন্যাকে) হেদায়েত দান কর। তখন সে তার পিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে (রাফি) তাকে গ্রহণ করেন।

মূলতঃ এটা ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য একটি বিশেষ ঘটনা। কেননা, নবী করীম (সাঃ) তার জন্য অতি মঙ্গলের (হেদায়েত) দোয়া করেছিলেন। যা কবুলও হয়েছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) ব্যতীত অন্যদের দোয়া কবুল হওয়ার কোন গ্যারান্টি নেই। তাই হতে পারে ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রাপ্ত সন্তানটি অকল্যাণের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। যা আদৌ কাম্য নয়।

দ্বিতীয় জবাবঃ অথবা, নবী করীম (সাঃ) ইচ্ছা স্বাধীনতা এজন্য দিয়েছিলেন যে, নবী করীম (সাঃ) যদি স্বাধীনতা প্রদান ব্যতীত সন্তানকে পিতার নিকট হস্তান্তর করতেন, তাহলে তাঁকে এই বলে দোষারোপ করা হত যে, নবীজী মুআমিলাতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। (تنظيم الاشتات ২ج ص ১১৭)

৩১১ : بَابُ فِي عِدَّةِ الْمَطْلَقَةِ

... عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَطْلُوقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءَ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةَ لِلْمُطَلَّقاتِ-

অনুবাদঃ ... আসমা বিনত ইয়াযীদ ইবন আস্ সাকান আল-আনসারীয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে তালাকপ্রাপ্তা হন। আর সে সময় তালাকপ্রাপ্তা রমণীর জন্য ইদত পালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর আল্লাহ তাআলা আসমার তালাকপ্রাপ্তির পর ইদত সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদত পালনের বিধান দিয়ে আয়াত নাযিল হয়।

বিশ্লেষণঃ ইদত (عِدَّة)-এর আভিধানিক অর্থঃ عِدَّة শব্দটি বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো-

১. -الْإِحْصَاءُ গণনা করা

২. -الْحِسَابُ হিসাব করা

৩. সংখ্যা, কতিপয়, কতক ইত্যাদি।

ইদত-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

هِيَ الْوَقْتُ الَّذِي يَتَرَبَّصْنَ فِيهِ النِّسَاءُ بِأَنْفُسِهِنَّ مِنَ النِّكَاحِ بَعْدَ افْتِرَاقِ الْعِدَّةِ-

অর্থাৎ, বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবার পর মহিলাগণ যে সময়টুকু নিজেদেরকে বিবাহ হতে বিরত রাখে তাকে ইদত বলা হয়।

* তানযীমুল আশাতাত প্রণেতা বলেন, ইদত বলা হয় ঐ সময়কালকে, যা স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাক প্রদানের পর সন্তান প্রসবের মাধ্যমে অথবা হয়েয কিংবা মাসসমূহের মাধ্যমে গণনা করে থাকে। (تَنْظِيمُ الْأَشْهُاتِ ج ২ ص ২১০)

সংক্ষেপে বলা যায়- তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের শরীয়ত নির্ধারিত অতিবাহিত সময়কালকে ইদত বলা হয়।

ইদতের প্রকারভেদঃ ইদত দু'ভাগে বিভক্ত-

১। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ইদতঃ তালাক বা খুলআর কারণে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইদত পালন করা।

২। স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদতঃ স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে স্ত্রীর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইদত পালন করা।

তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলার ইদতের পার্থক্যঃ

১। তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদতঃ যদি অপ্রাণ্ড বয়স্কা ও বৃদ্ধা (যার হয়েয বন্ধ হয়ে গেছে এমন মহিলা) হয়, তবে তালাকের অবস্থায় তিন মাস ইদত পালন করতে হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالَّتِي يَتَسَنَّنَ مِنَ الْمَحِيضِ ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, ... তাদের ইদত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদতকাল হবে। (তালাকঃ ৪)

আর যে নারীর হয়েয আসে এমন প্রাণ্ড বয়স্কা নারী তালাকপ্রাপ্তা হলে, সে ইদত হিসেবে তিন হয়েয পালন করবে, নাকি তিন তুহুর পালন করবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ-

অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন কুরু (হায়েয) পর্যন্ত। (বাকারাহঃ ২২৮)

উক্ত আয়াতে তিন قُرُوءٍ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আর অভিধানে قُرُوءٍ শব্দটি হয়েয এবং তুহুর (পবিত্রতা) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.), আয়িশা ও যায়িদ ইবন সাবেত (রাঃ) **قُرْوُ** এর অর্থ তুহুর (পবিত্রকাল) গ্রহণ করে বলেন, এমন মহিলাকে ইদত হিসেবে তিন তুহুর সময় অতিবাহিত করতে হবে। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর একটি মতও তাই।

দলীলঃ (مشكوة) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ... فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ (অর্থঃ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ... ইদত হল সেই সময়, যখন আল্লাহ মহিলার তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উক্ত হাদীসে যে তুহুরে মহিলাকে তালাক দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, একেই ইদত বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তুহুর দ্বারা ইদত বুঝানো হবে। আর পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত তিন **قُرْوُ** দ্বারা তিন পবিত্রকাল উদ্দেশ্য।

(تنظيم الاشتات ২ ج ১৭৬, درس مشكوة ৩ ج ৩৪)

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, আওযাইঈ, নাখঈ, মুজাহিদ, আতা (রহ.) চার খলিফা (রাঃ) এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে ইদত হিসেবে তিন হায়েয সময় অতিবাহিত করতে হবে। কেননা, তাঁরা বলেন, পবিত্র কুরআনে তিন কুরু দ্বারা তিন হায়েয বুঝানো উদ্দেশ্য।

(تنظيم الاشتات ২ ج ১৭৬, درس مشكوة ৩ ج ৩৪)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالَّتِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ-

অর্থঃ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদত হবে তিন মাস। (তালাকঃ ৪)

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল- যদি কোন মহিলার হায়েয না আসে, এমনাবস্থায় তার জন্য তিন মাসকে ইদত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর ইহাই হায়েযের স্থলাভিষিক্ত। এতে বুঝা যায় যে, হায়েযসম্পন্ন মহিলার ইদত হায়েয দ্বারাই হওয়া উচিত। কেননা, মূল ইদত তো হায়েয। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالَّتِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- অর্থঃ, যদি তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র

মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (নিসাঃ ৪৩)

উক্ত আয়াতে মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। মূল হল পানি। পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয নয়। (تنظيم الاشتات ২ ج ১৭৬)

দলীল (২)ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِضٌ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَتِهَا- (মশকো)

অর্থাৎ, আওতাসের বন্দীদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতীর সাথে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ঋতুবতীর সাথে সহবাস করবে না।

উক্ত হাদীসে إِسْتَبْرَاءُ (জরায়ুর পবিত্রতা)-কে হায়েযের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর ইদতের উদ্দেশ্যই হল জরায়ু পবিত্রতা। সুতরাং বুঝা গেল যে, ইদত হায়েযের দ্বারা হবে, তুহুর দ্বারা নয়।

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ (৩) দলীল

تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ- (ابو داود ج ١ ص ٢٩٨ باب في سنة طلاق العبد، ترمذي ج ١ ص ٢٢٤ باب ان طلاق الامة لطليقتان، ابن ماجه ص ١٥٩)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর জন্য তালাক হল দু'টি এবং তার ইদতের সময় হল দু'হায়েয পর্যন্ত।

উক্ত হাদীসে দ্বারাও প্রমাণিত হল যে, ইদত হায়েয দ্বারাই পালন করতে হবে।

তাছাড়া আয়াতে কারীমায় قُرْء শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। যদিও قُرْء শব্দটি হায়েয ও তুহুর উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হায়েযের অর্থটি গ্রহণ করাই উত্তম। হেদায়া গ্রন্থকার তাই বলেন। কেননা, قُرْء শব্দটি قُرْء-এর বহুবচন। যা কমপক্ষে

তিনের উপর প্রয়োগ হয়। ঠিক তেমনিভাবে আয়াতে বর্ণিত ثلاث (তিন) শব্দটিও নির্দিষ্ট। সুতরাং তিনের চেয়ে কম অথবা বেশি আমল করা ঠিক হবে না। অতএব, যে তুহুরে তালাক প্রদান করা হয়েছে, ইহাকে যদি ইদতের মধ্যে গণ্য না করে ইহা ব্যতীত পরবর্তী তিন তুহুর আদায় করা হয়, তাহলে ফল দাঁড়ায় এই যে, তিন তুহুর এবং যে তুহুরে তালাক দিয়েছে এর কিছু অংশ তুহুর আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে, যে তুহুরে তালাক প্রদান করা হয়েছে, তা যদি ইদতের মধ্যে গণ্য করে আরো দু'তুহুর ইদত পালন করা হয়, তাহলেও তা পুরোপুরি তিন তুহুর আদায় হচ্ছে না। বরং তিনের থেকে কিছু না কিছু কম হবেই। অর্থাৎ, قُرْء দ্বারা তুহুর উদ্দেশ্য হলে কোনক্রমেই পুরোপুরি তিন তুহুর আদায় করা সম্ভব নয়। অল্পক্ষণের জন্য হলেও কম-বেশি হবেই। সুতরাং قُرْء দ্বারা হায়েয অর্থ নিলে তিন সংখ্যাটির উপর পুরোপুরি আমল করা সম্ভব। আর ইহাই যুক্তিসঙ্গত। (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ١٩٧، التوضيح ص ٩٠)

জবাবঃ হাদীসে উল্লিখিত ইদত দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এতে তালাকের সময় বুঝানো উদ্দেশ্য।

আর একথার ইঙ্গিত (قَرِينَةً) হল এই যে, এই কথার সম্বোধিত (مُخَاطَبٌ) ব্যক্তি হলেন হযরত উমর (রাঃ)। আর তাঁর নিকট ইদত হয়েয দ্বারা পালন করতে হবে, তুহুর দ্বারা নয়। সুতরাং قَرُوهُ-এর অর্থ তুহুর নয় বরং হয়েয। অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা এক্ষেত্রে দলীল উপস্থাপন করা সহীহ নয়। (درس مشکوة ج ২ ص ১৭৭، درس مشکوة ج ২ ص ২০)

বিধবা মহিলার ইদতঃ

ক. গর্ভবতী নয় এমন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদত হলো চার মাস দশ দিন।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا-

অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেদের চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। (বাকারঃ ২৩৪)

দলীল (২)ঃ ... عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ

حِينَ تُوْفِي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ سَفْرَةٌ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الخ

(আবু দাউদ জ ১ ص ৩১৪ باب احداد المتوفى عنها زوجها، بخاري ج ২ ص ৮০৩ باب تحد المتوفى عنها

اربعة اشهر وعشرا / ج ১ ص ১৭০ باب احداد المرأة على غير زوجها، مسلم ج ১ ص ৪৮৬ باب وجوب

الاحداد في عدة الوفاة الخ، ترمذي ج ১ ص ২২৭ باب عدة المتوفى عنها زوجها، نسائي ج ২ ص ১১৭ ترك

الزينة للحاددة الخ)

অর্থাৎ, ... যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। যায়নাব (রাঃ) বলেন, একদা আমি উম্মে হাবীবার নিকট গমন করি। আর এই সময় তার পিতা আবু সুফিয়ান (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ সময় তিনি হলুদ রংবিশিষ্ট সুগন্ধি তৈল অথবা অন্য কিছুর জন্য আহবান করেন। তদ্বারা একজন দাসী তাঁর কেশে তৈল

মেখে দেয়। এরপর তিনি চেহারায় তৈল মর্দন করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন নেই; তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ইরশাদ করতে শুনেছিঃ যে সমস্ত মহিলা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনরাতের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। তবে স্বামীদের জন্য চারমাস দশদিন শোক প্রকাশ করবে।

খ. গর্ভবতী মহিলার তালাকের ইদত হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, যতদিনই লাগুক না কেন।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**

অর্থাৎ, আর গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (সূরা তালাকঃ ৪)

গ. গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদত কী হবে, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতের চাহিদা অনুযায়ী তার ইদত চারমাস দশদিন হওয়া উচিত, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, তার ইদত সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত হোক।

* হযরত আলী (রাঃ)-এর মতে, এমন মহিলার জন্য সন্তান প্রসব এবং চারমাস দশদিন উভয় ইদতই পূর্ণ করা জরুরী। তাঁর অভিমতকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয় যে, এমন মহিলার ইদত হল দুটি সময়ের মধ্য থেকে অধিকতর দূরবর্তী সময় (أبعد الأجلين)। যেমন কারো সন্তান প্রসব স্বামীর মৃত্যুর ছয়মাস পরে হবে, এমতাবস্থায় চারমাস দশদিনকে ইদত না ধরে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ধরতে হবে। আবার কারো সন্তান প্রসব স্বামীর মৃত্যুর এক দু'মাস পরে হয়, এমতাবস্থায় সন্তান প্রসবকে ইদত না ধরে চারমাস দশদিন ধরতে হবে। কেননা এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রথমদিকে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমতও এটাই ছিল।

* অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ও চার ইমামের মতে, এমন মহিলার নির্ধারিত ইদত হল, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, তা যত কম বা বেশি সময়ই হোক না কেন।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٥١٠)

দলীলঃ সুবাইয়াহ (রাঃ) যখন সন্তান প্রসবের পর বিবাহের পয়গাম প্রেরণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন আবু সানাবিল ইবন বাকা এসে তাকে লক্ষ্য করে বললেন-

... مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمْ قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ نِيَابِي حِينَ

أَمْسَيْتُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَافْتَانِي بِأَنْ قَدْ حَلَلْتُ حَيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِجِ إِنْ بَدَأَنِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَيْنَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمَهِا غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا زَوْجَهَا حَتَّى تَطْهَرَ- (ابو داود ج ۱ ص ۳۱۵ باب في عدة الحامل، بخاري ج ۲ ص ۸۰۲ باب واولات الاحمال اجلهن الخ، مسلم ج ۱ ص ۴۸۶ باب انقضاء العدة المتوفي عنها الخ، ترمذي ج ۱ ص ۲۲۶ باب في الحامل المتوفي عنها الخ، نسائي ج ۲ ص ۱۱۳ باب عدة الحامل المتوفي عنها زوجها، ابن ماجه ص ۱۴۷)

অর্থাৎ, ... আমি তোমাকে সাজ-গোজ করতে দেখছি, মনে হয় তুমি পুনঃবিবাহ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর শপথ! তুমি ততক্ষণ পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার (মৃত স্বামীর) ইদতকাল চারমাস দশদিন পূর্ণ না কর। সুবাইয়াহ বলেন, তার এরূপ উক্তি শ্রবণের পর, আমি রাতে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এরূপ ফাতওয়া দেন যে, আমি তখনই হালাল হয়েছি, যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। এরপর তিনি আমাকে প্রয়োজনে বিবাহ করার নির্দেশ দেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, যদি সে এখন বিবাহ করে, তবে আমি এতে দোষের কিছু দেখছি না; যখন সে তার সন্তান প্রসব করেছে। আর এখনও যদি তার নিফাসের রক্ত থাকে, এতেও বিবাহ বন্ধনে কোন আপত্তি নেই। অবশ্য সে তা হতে পবিত্রতা হাসিলের পর তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে।

উক্ত হাদীসের দ্বারা জমহুরের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) উক্ত রেওয়ায়েত শোনার পর জমহুরের মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ মূল ব্যাপার হল এই যে, দ্বিতীয় আয়াত (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) -এর জন্য পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্রে নাসেখ। আর যে সকল ফুকাহা أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ (দুটি সময়ের মধ্যে অধিকতর দূরবর্তী সময়)-এর উক্তিকে গ্রহণ করেছেন, এর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁদের নিকট সুবাইয়াহ আসলামী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতটি পৌঁছেনি, ফলে তা গ্রহণ করা ছিল অধিক সতর্কতামূলক।

দ্বিতীয় কারণ ছিল যে, কোন আয়াতটি প্রথমে নাযিল হয়ে মানসূখ হয়েছে এবং কোন আয়াতটি পরে নাযিল হয়ে নাসেখ হয়েছে, তা তাঁদের জানা ছিল না।

এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন-

مَنْ شَاءَ بِأَهْلِهِ أَنْ سُوْرَةَ النَّسَاءِ الْقُصْرَى (سورة الطلاق) نَزَلَتْ بِعَدِّ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ—

অর্থাৎ, কেউ ইচ্ছা করলে আমি তার সাথে এই অর্থে মুবাহালা করব যে, মহিলাদের ছোট সূরা তথা সূরা তালাক সূরা বাকারার আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

তাছাড়া, হযরত উমর (রাঃ) বলেন—

لَوْ وَضَعْتَ وَ زَوْجَهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَيَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ—

অর্থাৎ, যদি স্বামী খাটিয়ার উপর থাকা অবস্থায়ও স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তবুও তার জন্য ইদত শেষ হয়ে যাবে। এবং তার জন্য অন্যত্র বিয়ে বসা জায়েয হবে।

(فتح القدير ج ٤ ص ١٤٢، البحر الرائق ج ٤ ص ١٣٣-١٣٤، الكوكب الدرّي ج ٢ ص ٢٧٠-٢٧١)

بَابُ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ ص ٣١١

তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরপোষ

... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبُتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ تِلْكَ أَمْرًا يُغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ وَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذْنِيْنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا وَأَعْتَبْتُ— (مسلم ج ١ ص ٤٨٣-٤٨٤ باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ترمذي ج ١ ص ٢٢٣ باب المطلقة ثلاثا الخ، نسائي ج ٢ ص ١١٩ باب الرخصة في خروج المبتوتة الخ)

অনুবাদঃ ... ফাতিমা বিন্ত কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আবু আমর ইবন হাফস তাকে তিন তালাক বায়েন প্রদান করেন, এমতাবস্থায় যে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এরপর তার উকিল মারফত তার (ফাতিমার) নিকট কিছু আটা প্রেরণ করেন, যার ফলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এর অধিক কিছুই আমার নিকট তোমার পাওনা নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদ্মতে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ তার নিকট

তোমার খোরপোষ পাওনা নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মে শুরায়কের ঘরে অবস্থানপূর্বক তার ইদ্দত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এ স্ত্রীলোকটি তার অধিক খরচের দ্বারা আমার সাহাবীকে ঢেকে ফেলেছে। তুমি উম্মে মাকতুমের ঘরে অবস্থান কর, আর সে হল একজন অন্ধ লোক, কাজেই (তুমি তোমার কাপড় খুলে রাখলেও) সে তোমাকে দেখবে না। এরপর তুমি যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে এ সম্পর্কে খবর দেবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার ইদ্দত পূর্ণ করে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি এবং বলি যে, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান ও আবু জাহাম উভয়ে আমার নিকট আমাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আবু জাহাম তো তার কাঁধ হতে তার লাঠি সরায় না, (অর্থাৎ অধিক মারধরকারী)। আর মুআবিয়া, সে তো ফকীর এবং তার কোন মাল নেই। তুমি বরং উসামা ইবন যায়িদকে বিবাহ কর। তিনি বলেন, তা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি উসামা ইবন যায়িদকে বিবাহ কর। এরপর আমি তাকে বিবাহ করি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এতে এত মঙ্গল প্রদান করেন, যার ফলে আমি অন্যের জন্য ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হই।

বিশ্লেষণঃ ফুকাহায়ে কিরামগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, রাজস্ব তালাকপ্রাপ্তা এবং নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ইদ্দত পালনকালে স্বামীর পক্ষ থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। এতে কোন মতানৈক্য নেই।

(درس ترمذي ج ۳ ص ۴۸، درس مشکوٰۃ ج ۳ ص ۴۲)

যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَأَنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - (سورة الطلاق آية ৬)

অর্থাৎ, যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। (তালাকঃ ৬)

প্রশ্ন হল, গর্ভবতী নয়, এমন মহিলাকে যদি নিশ্চিত তালাক প্রদান করা হয়, তাহলে ইদ্দত পালনের দিনগুলোতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, এমন মহিলাকে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব, খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব নয়।

(احكام القرآن للجصاص ج ৩ ص ৪৫৭، عمدة القاري ج ২ ص ৩০৭)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন- **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ**

অর্থাৎ, তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। (তালাকঃ ৬)

উক্ত আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বাসস্থান দেয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাই তাকে বাসস্থান দিতে হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَأَنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ-

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, খোরপোষ ও প্রদান করা ওয়াজিব। তবে খোরপোষের ওয়াজিব হওয়াটা গর্ভবতী মহিলার সাথে শর্তারোপ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হল যে, গর্ভবতী নয় এমন মহিলার ক্ষেত্রে খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় তাদের প্রমাণ হবে, **مفهوم مخالف** তথা বিপরীত অর্থ দ্বারা। নতুবা আয়াতে গর্ভবতী

মহিলাকে নির্দিষ্ট করার কোন সার্থকতা থাকে না। (فتح الهاري ৭৮ ص ১৮০)

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) বলেন-

وَأَنْفِقُوا عَلَى نِسَائِكُمْ مَا كَفَى لَكُمْ مِنْهُنَّ نَفَقَةً উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদত পালনকালে খোরপোষ পাবে না।

* ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক, আহলে যাহের, শাবী, হাসান বসরী, তাউস ও আতা (রহ.)-এর মতে, এমন মহিলার খোরপোষ এবং বাসস্থান কোনটিই নেই।

(ابو داود حاشية ج ১ ص ৩১২، تنظيم الاشتات ج ২ ص ২১০)

... عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثُلُثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سَكْنَى - (ابو داود ج ১ ص ৩১২ باب في نفقة المبتوتة، مسلم ج ১)

৪৮০ ص، ترمذي ج ১ ص ২২৩، نسائي ج ২ ص ১১৭ باب نفقة الباتنة، ابن ماجه ص ১৪৮)

অর্থাৎ, ... ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে। তখন নবী করীম (সাঃ) তার থাকার ও খোরপোষের জন্য কিছুই নির্ধারিত করেননি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, অন্তঃসত্ত্বাহীন বায়েন তালাক অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তা খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উল্লিখিত মহিলা ইদতের সময়ে খোরপোষ ও বাসস্থান উভয়টিই পাবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইবন শুবরামা, ইবন আবী লায়লা (রহ.) এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ও আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখের মাযহাব এটাই।

(عمدة القاري ج ২ ص ৩০৮-৩০৭، احكام القرآن للجصاص ج ৩ ص ৪০৭)

দলীল (১): পবিত্র কুরআনের আয়াত- **وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। (বাকারাঃ ২৪১)

উক্ত আয়াতে **مَتَاعٌ** দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে খোরপোষ এবং বাসস্থান উভয়টি উদ্দেশ্য।

আয়াতের যোগসূত্র পর্যালোচনা করলে তাই বুঝা যায়। কেননা, আয়াতে **مُطَلَّاتٌ** শব্দটি ব্যাপক, যা রাজস্ট্র তালাক ও তিন তালাক বা বায়েন তালাক উভয়টিকেই শামিল করে।

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী- **أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ**

উক্ত আয়াতটি দ্বারা বাসস্থান প্রদানের কথা প্রমাণিত হয়।

এবং ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর এক কিরআতে উল্লেখ আছে-

(روح المعاني ج ২৮ ص ১৩৭)

অর্থাৎ, এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের জন্য ব্যয় কর।

উক্ত কিরআতটি দ্বারা খোরপোষের কথাও প্রমাণিত হয়। আর বিরল (شاذ) কিরআত খবরে ওয়াহিদের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের নয়। (فتح الملهم ج ১ ص ২০৬)

দলীল (৩): তাহাবীতে হযরত ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) এ ব্যাপারে বলেন-

... **سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ** - (مسلم ج ১

ص ৪৮৫، شرح معاني الآثار ج ২ ص ৩৫)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, এ মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ রয়েছে।

দলীল (৪): ... **عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَطَّلَةُ ثَلَاثًا لَهَا**

السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ - (دار قطني ج ৪ ص ২১)

অর্থাৎ, ... জাবির (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য খোরপোষ এবং বাসস্থান রয়েছে।

দলীল (৫): ইজমা দ্বারাও হানাফীদের অভিমত প্রমাণিত হয়। নিম্নোক্ত হাদীসটিই এর প্রমাণ-

... عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَنْتُ فَاطِمَةَ
بِنْتُ قَيْسِ عُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدْعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ
بَنِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَذَرِي أَمْ لَا- وَفِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ
لَا نَذَرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالثَّقَّةُ- (ابو দাউদ জ ১৮৩ বাব মন

انكر ذلك على فاطمة، مسلم ج ১ ص ৪৮৫، ترمذي ج ১ ص ২২৩)

অর্থাৎ, ... আবু ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (কুফার) জামে মসজিদে আস্ওয়াদের সাথে (উপবিষ্ট) ছিলাম। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়েস উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) ও আমাদের রাসুলের সুন্নতকে একজন মহিলার বক্তব্য অনুসারে পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই যে, সে সঠিকভাবে উহা (হাদীস) হিফাযত করেছে কিনা।

হযরত উমর (রাঃ)-এর উক্ত বাণীকে কোন সাহাবী প্রত্যাখ্যান করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলীল (৬): কিয়াসের দ্বারাও হানাফীদের অভিমত প্রমাণিত হয়। কেননা, ইন্দত পালনকারী নারী ইন্দতের সময়ে (স্বামীর অধীনে) উপার্জনের দিক থেকে বন্দী। আর যার অধীনে বন্দী, খোরপোষ তার উপরই বর্তাবে। সুতরাং খোরপোষ ও বাসস্থান স্বামীর উপরই বর্তাবে।

তাছাড়া ইমাম জাসসাস (রহ.) নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্বারা তিনভাবে হানাফীদের অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

أَسْكِنُواهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ-

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোন গৃহে বসবাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। (তালাকঃ ৬)

(ক) যেকোনভাবে বাসস্থান একটি আর্থিক অধিকার তেমনিভাবে খোরপোষও অর্থনৈতিক অধিকার হওয়ার কারণে তা ওয়াজিব।

(খ) দ্বারা তালাকপ্রাপ্তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর ক্ষতি যেভাবে বাসস্থান না দিলে হয়, অনুরূপভাবে খোরপোষ না দিলেও হয়ে থাকে।

(গ) আয়াতে উল্লেখ আছে لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ অস্বচ্ছলতা এবং সংকীর্ণতা যেকোনভাবে বাসস্থান না দেয়ার কারণে হয়ে থাকে, তদ্রূপ খোরপোষ না দিলেও হয়।

সুতরাং তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোষ ও বাসস্থান উভয়টিই পাবে।

জবাবঃ ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.) দলীল হিসেবে যে আয়াত পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, উল্লিখিত প্রথম আয়াত দ্বারা তো তাদের কথামতই বাসস্থানের প্রমাণ মিলে। আর দ্বিতীয় আয়াতের ক্ষেত্রে তাঁরা যে **مَنْهُم**

مُخَالِف বা বিপরীত অর্থ নিয়েছেন, আহনাফগণ তা গ্রহণ করেন না। কেননা, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা যেখানে খোরপোষ ও বাসস্থান ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে বিপরীত অর্থ নেয়া কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য ও দলীলযোগ্য হতে পারে না।

তবে, আয়াতে স্বতন্ত্রভাবে গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার কথা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা হল এই যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত অধিকাংশ সময় দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় স্বামীর পক্ষে খোরপোষের তার বহনে অনীহা চলে আসার সম্ভাবনা আছে বিধায় তাকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, খোরপোষ সন্তান জন্মের পূর্ব পর্যন্ত দেয়া ওয়াজিব, চাই যত সময়ই অতিবাহিত হোক না কেন।

(احكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٤٥٩-٤٦٠، فتح العلم ج ١ ص ٢٠٢-٢٠٣)

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর প্রদত্ত হাদীসসমূহের (একত্রে) জবাব হলঃ

(১) হযরত ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ)-এর হাদীসটিকে হযরত উমর (রাঃ) সাহাবায়ে কিরামের সামনে খণ্ডন করে দিয়েছেন, সুতরাং তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) ফাতিমা বিনত কায়েস স্বীয় স্বামী ও ঘরওয়ালাদের সাথে ঝগড়া করতো। এজন্য নবী করীম (সাঃ) তাকে ঘর হতে বহিষ্কার করেছেন। সুতরাং এ হুকুম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

... عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَفَعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ أَمْرَأَةٌ فَتَنَّتِ النَّاسَ إِنَّهَا كَانَتْ لِسَنَةٍ فَوَضِعَتْ عَلَى يَدَيَّ أَمْ مَكْتُومُ الْأَعْمَى - (ابو داود ج ١ ص ٣١٣)
باب من انكر ذلك على فاطمة

অর্থাৎ, ... মায়মুন ইবন মাহরান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রিক্কা হতে) মদীনা' আগমন করি এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ফাতিমা বিনত কায়েসকে তালাক দেওয়া হয়েছে এবং তাকে তার ঘর হতে বহিষ্কার

করা হয়েছে। সাঈদ বলেন, সে মহিলা তো মানুষকে বিপদে ফেলেছে, আর সে তো মুখোরা রমণী। এরপর তাকে অন্ধ ইবন মাকতূমের হস্তে সোপর্দ করা হয়েছে।

(৩) হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, ফাতিমা বিনত কায়েস স্বীয় স্বামীর ঘরে একাকীত্বের কারণে নিঃসঙ্গতা অনুভব করত। তাই নবী করীম (সাঃ) তাঁকে অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালন করার অনুমতি দেন। তাই এটা ছিল তাঁর জন্য খাস।

... قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ

أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بخاري ج ٢ ص ٨٠٢ باب المطلقة إذا خشي عليها

الخ، ابن ماجه ١٤٧)

অর্থাৎ, ... হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা স্বীয় স্বামীর ঘরে একাকী হওয়ার কারণে ভয় অনুভব করতেন। এজন্য প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে আব্দুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালনের অনুমতি দিয়েছেন।

(৪) কতক আহনাফ জবাব দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর স্বামী উকিল মারফত তাঁর জন্য খোরপোষ বাবদ কিছু আটা (তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী দশ সা') প্রেরণ করলে তিনি তা কম মনে করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এবং এর চেয়ে অতিরিক্ত পাওয়ার নিমিত্তে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে, তিনি (সাঃ) বলেন-

أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (এর অতিরিক্ত) তোমাকে খোরপোষ দেয়া হবে না।

সুতরাং উক্ত বাক্য দ্বারা নবী করীম (সাঃ) সাধারণ খোরপোষ প্রদানকে নিষেধ করেননি; বরং এর দ্বারা তাঁর কাংক্ষিত অতিরিক্ত খোরপোষকে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্নের কিতাবসমূহের হাদীস দ্রষ্টব্য।

(ابو داود ج ١ ص ٣١١ باب في نفقتي المبتوتة، مسلم ج ١ ص ٤٨٣ باب المطلقة البائنة الخ)

(৫) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, হাদীসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ফাতেমা বিনত কায়েস ছিলেন একজন অবাধ্য ও কলহপ্রিয় স্ত্রীলোক। আর এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের হুকুম হল-

لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ-

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়।

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল, فَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ (সুস্পষ্ট নির্লজ্জ) শব্দটিকে হুকুম হতে ব্যতিক্রম (استثناء) হিসেবে আনা হয়েছে। আর কটুভাষা ও কলহপ্রিয়তাও فَاحِشَةٍ

مُبَيَّنَةً (সুস্পষ্ট নির্লজ্জ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এর ভিত্তিতেই ফাতেমা বিনত কায়েস নিজের অপরাধের কারণে বাসস্থান হতে বঞ্চিত হয়েছেন।

(شرح معالي الآثار ج ٢ ص ٣٦-٣٧، احكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٤٦٢)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَتْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ-
(ابو داود ج ١ ص ٣١٣ باب من انكر ذلك على فاطمة)

অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার হতে ফাতিমার বহিষ্কৃত হওয়ার হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তার এ বহিষ্কার ছিল তার বদ অভ্যাসের পরিণতি স্বরূপ। আলোচনার শেষ প্রান্তে বলা যায় যে, সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্তা মহিলাই স্বামীর পক্ষ থেকে ইন্দতের সময়ে বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে। আর এ ব্যাপারে হযরত ফাতিমা বিনত কায়েসের হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করা সহীহ নয় এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

بَابُ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ ص ٣١٣

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইন্দতকালীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَحْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا أَخْرِجِي فَجَدِّي نَحْلَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تُصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا- (مسلم ج ١ ص ٤٨٦ باب جواز خروج المعتدة البائن الخ، نسائي ج ٢ ص ١١٩ باب خروج المتوفى عنها بالنهار)

অনুবাদঃ ... জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক (বায়েন) প্রদান করা হয়। এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়, যিনি তাকে (ইন্দতকালীন সময়ে) ঘর হতে বের হতে নিষেধ করেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর। যেন তুমি তা হতে কিছু সদকা কর অথবা ভাল কাজ কর।

বিশ্লেষণঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইন্দতের সময় যে ঘরের মধ্যে থাকে, সে ঘর থেকে যদি বের হতে বাধ্য হয়, যেমন ঘর ভেঙ্গে যায় অথবা নিজ সত্তা ও সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা হয় অথবা গৃহকর্তা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, এমতাবস্থায় উক্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ঘর থেকে বের হতে পারবে। এতে কোন মতানৈক্য নেই।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢١١)

প্রশ্ন হল, উপরোল্লিখিত কারণ ছাড়া তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদত চলাকালীন সময়ে ঘর হতে বের হতে পারবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও লাইস (রহ.)-এর মতে, দিনের বেলায় নিঃশর্তে বের হতে পারবে, কোন প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক এবং রাতের বেলায় খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতীত বের হওয়ার অনুমতি নেই। (درس مشکوٰۃ ج ৩ ص ৫৩)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। فَقَالَ لَهَا اُخْرِجِي فَجَذِي نَخْلِكَ

অর্থাৎ, তিনি (সাঃ) তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর।

উক্ত হাদীসে খুব বেশি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ নেই। বরং শুধু খেজুর কর্তনের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই সাধারণ কাজেও দিনে বের হতে পারবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দিনে ও রাত্রে কোন সময়ই খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ-

অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (তালাকঃ ১)

আল্লামা নাখঈ (রহ.) আয়াতে বর্ণিত فَاحِشَةٍ (নির্লজ্জ) শব্দের অর্থ করেছেন نفس

تنظيم الاثنيات ج ২ ص ২১১) তথা প্রয়োজন ব্যতীত নিজ থেকেই বের হয়ে আসা। (الخروج)

দলীল (২)ঃ আর প্রয়োজনে যে বাইরে বের হতে পারবে, এর দলীল অনুচ্ছেদের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ... لَعَلَّكَ أَنْ تُصَدِّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا-

অর্থাৎ, ... যেন তুমি তা হতে কিছু সদকা কর অথবা ভাল কাজ কর।

উক্ত বাক্যাংশে সদকা ও ভাল কাজকে বের হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করায় একথা বুঝা যায় যে, কোন দীনী ও দুনিয়াবী প্রয়োজনের জন্য বের হওয়া জায়েয। নতুবা জায়েয নয়।

জবাবঃ হানাফীগণ বলেন, উপরোল্লিখিত দলীলের মাধ্যমে জবাবও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যেখানে কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাধাহীনভাবে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া আদৌ সমীচীন নয়। (تنظيم الاثنيات ج ২ ص ২১২)

بَابُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُنْقَلُ ص ৩১৬

যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

... عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفَرِيعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خَذْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي فَدَعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهِ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَتْبَعَهُ فَقَضَى بِهِ - (ترمذي ج ۱ ص ۲۲۹ باب اين تعدد المتوفى الخ، نسائي ج ۲ ص ۱۱۶)

(عدة المتوفى عنها الخ)

অনুবাদঃ ... সাদ ইবন ইসহাক ইবন কাব ইবন উজরা তার ফুফু যায়নাব বিনত কাব উজরা হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফারীআ বিনত মালিক ইবন সিনান, যিনি আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)-এর ভগ্নি ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার গোত্র বনী খিদরাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কেননা, তাঁর স্বামী পলায়নপর গোলামদের অনুসন্ধানে বের হলে, তিনি তাদেরকে কুদুম নামক স্থানে দেখতে পান। এরপর তারা (গোলামেরা) তাকে হত্যা করে। কেননা, সে তার ঘরে আমার জন্য খোরপোষের কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ হাঁ। রাবী বলেন, এরপর আমি তাঁর দরবার হতে নির্গত হয়ে, হুজরা অথবা (রাবীর সন্দেহ) মসজিদের মধ্যেই ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে ডাকেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) ডাকার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বলেছিলে? আমি পুনরায় তাঁর নিকট আমার স্বামীর ব্যাপারটি বর্ণনা করি। রাবী বলেন, এতদ্বশ্রবণে তিনি বলেনঃ তোমার ইদ্দত শেষ না

হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। রাবী বলেন, এরপর আমি সেখানে চার মাস দশদিন অতিবাহিত করি। রাবী বলেন, উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে, তিনি এ হাদীসটি আমার নিকট হতে শ্রবণের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করি। আর তিনি (উসমান রাঃ) এর অনুসরণ করেন এবং ঐ অনুসারে ফয়সালাও দিতেন।

বিশ্লেষণঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কোথায় ইদ্দত পালন করবে- এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* হযরত আলী, ইবন আব্বাস এবং আয়িশা (রাঃ)-এর মতে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর গৃহে ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর জন্য জরুরী নয়; বরং সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইদ্দত পালন করতে পারবে এবং স্বীয় স্বামীর বাড়ি থেকেও স্থানান্তরিত হতে পারবে। এই মতের স্বপক্ষে ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর একটি উক্তি রয়েছে।

(تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢١٢ ، درس مشکوة ج ٣ ص ٤٣)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস-

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ-

এতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর গৃহে ইদ্দত পালন করা জরুরী নয়। কেননা, বর্ণিত হাদীসের প্রথমার্শে স্ত্রীকে পরিবারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদিও হাদীসের শেষার্শে ইরশাদ হচ্ছে- اَمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ- “তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে।” আর এটি হচ্ছে একটি মুত্তাহাব হুকুম।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ ইবন হাম্বল ও আওযাই (রহ.) সহ জমহুর সাহাবী ও তাবঈগণের মতে, স্বামীর মৃত্যুর ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়; বরং তাতেই ইদ্দত পালন করা জরুরী। হাঁ, ঘর যদি অঁৎস বা ভেঙ্গে যায় অথবা উত্তরসূরীরা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে স্থানান্তরিত হতে পারবে। ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতও তাই। (تنظيم الاشتات ج ٢ ص ٢١٣ ، درس مشکوة ج ٣ ص ٤٣)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস- ... فَقَالَ اَمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ ...

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরে অবস্থান করবে। উক্ত বাক্যাংশে নির্দেশের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। যা ওয়াজিব। বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) ফারিয়াকে প্রথমে তার পরিবারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতঃপর তৎক্ষণাৎ স্বামীর গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেন। সুতরাং স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করা জায়েয নয়।

জবাবঃ তাঁরা নবী করীম (সাঃ)-এর হাঁ সূচক (نَعَمْ) উক্তি দ্বারা যে দলীল পেশ করেন, এর জবাবে চার ইমাম বলেন যে, তিনি (সাঃ) প্রথমে তো হাঁ বলে অনুমতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই اُمْكِي فِي بَيْتِكَ বলে ঐ হুকুমকে রহিত করে দেন। অর্থাৎ শেষের বাক্যাংশ দ্বারা প্রথম বাক্যাংশ রহিত হয়ে গেছে। আর তাঁরা নির্দেশকে যে মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, এর উপর কোন ইঙ্গিত নেই, বরং প্রথমে হাঁ (نَعَمْ) বলে অনুমতি দিয়ে পরবর্তীতে اُمْكِي فِي بَيْتِكَ বলার দ্বারা একথা প্রমাণ করে যে, পূর্বের হাঁ-সূচক উক্তিটি রহিত হয়ে গেছে।

* উল্লেখ্য যে, বিধবা মহিলা যেহেতু ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় খোরপোষ পাবে না, তাই জীবিকা অন্বেষণের প্রয়োজনে দিনে এবং রাতের কিছু অংশে বাইরে বের হওয়া জায়েয আছে। তবে অনর্থক ঘোরাফেরা ও নিছক আনন্দের জন্য বের হওয়া জায়েয নয়। (تنظيم الاشتات ج ২ ص ২১৩)

بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ص ৩১৬

তালাকে বায়েন (তিন তালাক) প্রাপ্তা রমণী ততক্ষণ তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْني ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لَزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخِرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا - (بخاري ج ২ ص ৮০১ باب اذا طلقها ثلاثا الخ، مسلم ج ১ ص ৬১৩ باب لا تحل المطلقة لثلاثا الخ، ترمذي ج ১ ص ২১৩ باب ما يطلق امرأته ثلاثا الخ، نسائي ج ২ ص ৭৭৭ النكاح الذي تحل به الخ، ابن ماجه ص ১৬০)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। এরপর সে (মহিলা) অপর একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার সাথে নির্জন বাসও করে। এরপর তার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক

প্রদান করে। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়িশা) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুনর্ব্বার গ্রহণ করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখভোগ করে এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে।

বিশ্লেষণঃ (১) প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস শর্ত কিনা- এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ)-এর মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ বা হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শর্ত, সহবাস শর্ত নয়।

দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ-

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীকে বিয়ে না করবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাহঃ ২৩০)

উক্ত আয়াতে সহবাস (وطى)-এর কোন উল্লেখ নেই। যদি সহবাসের শর্ত হত, তাহলে আয়াতে তা উল্লেখ থাকত।

* চার ইমামসহ জমহুর উম্মতের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করা শর্ত। শুধু عقد বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে পুনর্ব্বার হালাল হওয়ার জন্য ذُوْئِ عُسَيْلَةَ-কে শর্ত করা হয়েছে। আর ذُوْئِ عُسَيْلَةَ বলা হয় সঙ্গম সুখ ভোগ করাকে। সুতরাং শুধু আকদ যথেষ্ট নয়; বরং সহবাস করা শর্ত।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

(১) আয়াতে যদিও সহবাসের কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু حَدِيثُ عُسَيْلَةَ (সঙ্গম সুখ হাদীসটি) মশহুর, সুতরাং এর দ্বারা শর্তযুক্ত করা জায়েয।

(২) অথবা, আয়াতে উল্লিখিত تَوَطَّيَ (বিবাহ করা) শব্দটি আসলে (সহবাস করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সহবাসের শর্ত খোদ কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। কেননা, আয়াতের দ্বারা যদি শুধু দ্বিতীয় বিবাহই উদ্দেশ্য হত, তাহলে তো

تَنْكِحَ (দ্বিতীয় স্বামী) শব্দটি উল্লেখ করার দ্বারাই উদ্দেশ্য হাসিল হত।
শব্দটির উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সহবাস জরুরী।

(৩) অথবা, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ)-এর নিকট হযরত حَدِيثُ عُسَيْلَةَ
পৌঁছেনি। এবং আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, পরবর্তীতে হযরত সাঈদ (রাঃ)
জমহুরের অভিমতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অতএব, বিষয়টি নিয়ে কোন
মতানৈক্যই নেই। (درس مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۷-۳۸)

كِتَابُ الصَّيَامِ : রোযা অধ্যায়

بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ص ৩১৭

“যারা রোযার সামর্থ্য রাখে অথচ রোযা রাখে না তারা ফিদ্যা দিবে” আল্লাহ তাআলার এ বাণী মানসূখ (রহিত) হওয়া

... عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَتَسَخَّرَهَا— (بخاري ج ١ ص ٢٦١ باب وعلى الذين يطيقونه الخ، مسلم ج ١ ص ٣٦١ باب نسخ قول الله وعلى الذين الخ، ترمذي ج ١ ص ١٦٤ باب على الذين يطيقونه، نسائي ج ١ ص ٣١٨ تاويل قول الله وعلى الذين يطيقونه)

অনুবাদঃ ... সালামা ইবন আল-আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়, “যারা সামর্থ্যবান (অথচ রোযা রাখে না বা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না) তারা মিসকীনদের ফিদ্যা দিবে”- আমাদের মধ্যে যারা রোযা না রেখে ফিদ্যা দেওয়ার ইচ্ছা করত, তারা তা করত। এরপর পরবর্তী আয়াত (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) নাযিল হওয়ায় পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়।

صوم বা রোযার আভিধানিক অর্থঃ শব্দগত দিক থেকে صَوْمٌ এবং صِيَامٌ উভয়টিই বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-الْإِمْسَاكُ الْمَطْلُوقُ عَنْ أَيٍّ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-عَنْ أَيٍّ، যেকোন কাজ থেকে বিরত থাকার নাম صوم বা রোযা। এজন্য সফর থেকে বিরত ঘোড়াকে আরবরা صَائِم বলে থাকে এবং যে কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তাকেও صَائِم বলা হয়। (الفقه على المذاهب الاربعة ج ١ ص ٥٤١)।
পবিত্র কুরআনে এ শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়-

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا

অর্থঃ, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (মারইয়ামঃ ২৬)

الْإِمْسَاكُ عَنْ أَيٍّ فِعْلٌ أَوْ قَوْلٌ كَانَ (المعجم الوسيط ص ৫২৭) - (المعجم الوسيط) গ্রন্থে উল্লেখ আছে-
অর্থঃ, যেকোন কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকা।

* কেউ কেউ বলেন- صَوْم শব্দটি صَوْمًا থেকে বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, রোযা রাখা, উপবাস থাকা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, صَوْم তথা রোযাকে رَمَضَانَ (রামাযান)ও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, رَمَضَانَ শব্দটি رَمَضَ يَرْمَضُ رَمَضًا থেকে বাবে سَمِع হতে নিম্পন্ন। আর رَمَض শব্দের অর্থ হচ্ছে- অধিক গরম, ভীষণ তাপ, অধিক তৃষ্ণা। আর যে বছর এই মাসের নামকরণ করা হয়, ঐ বছর এই মাসটি অধিক গরম ছিল বিধায় এর নাম رَمَضَانَ (রামাযান) রাখা হয়।

* আবার অনেকেই বলেন, رَمَض শব্দের অর্থ দক্ষ হওয়া, পুড়ে যাওয়া, উত্তপ্ত হওয়া, জ্বলে যাওয়া। সুতরাং রোযা রাখার কারণে গোনাহসমূহ যেহেতু জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এজন্য একে رَمَضَانَ বলে।

* আবার কেউ কেউ বলেন, رَمَضَانَ আল্লাহ তাআলার সুমহান নামসমূহের একটি। সুতরাং "شَهْرُ رَمَضَانَ" এর অর্থ হল "شَهْرُ اللَّهِ" অর্থাৎ আল্লাহর মাস।

(فتح الباري ج ১ ص ৭৬، عمدة القاري ج ১০ ص ২৬০)

কিন্তু আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ (فتح الملهم ج ৩ ص ১০৬)

অর্থাৎ রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন।

(বাকারাঃ ১৮৫)

* কাশশাফ গ্রন্থকার লেখেন, রমযানের আসল অর্থ হল, প্রচণ্ড গরমে জ্বালা করা এবং কষ্ট বরদাশত করা। এই নামকরণের কারণ হল, এই মাসে রোযা রাখতে হয় এবং ক্ষুধার গরম বরদাশত করতে হয়। যা ছিল একটি পুরানো ইবাদত।

(قاموس القرآن ص ২০০)

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১. আল্লামা জুরযানী (রহ.) সাওমের সংজ্ঞায় বলেন-

هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الْمَغْرِبِ مَعَ النَّيَّةِ

অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে সুবহে সাদিক হতে মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকাকে সাওম বলা হয়।

২. আল্লামা আবুল হাসান সহ জমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন-

الصَّوْمُ إِمْسَاكٌ مَخْصُوصٌ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

৩. হো অমসাক এন মফতরাত মিন তলুও ফজর -
إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ النَّيَّةِ (الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ ص ৩৭৭)

অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে ফজর উদয় থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

৪. হিদায়া গ্রন্থকার বলেন-

الصَّوْمُ إِمْسَاكٌ عَنِ الْجِمَاعِ وَعَنْ إِدْخَالِ شَيْءٍ بَطْنًا لَهُ مِنْ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ عَنْ نِيَّةٍ
অর্থাৎ, ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সহবাস ও উদরে কোন বস্তু প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকার নাম হল সাওম।

الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمَفْطَرَاتِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهَا
(اللباب ج ১ ص ১৬২ و الجوهرة ر ج ১ ص ১৬৬)

অর্থাৎ, নিয়তের যোগ্য ব্যক্তির নিয়ত সহকারে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকৃত অথবা হুকমী রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা।

৬. الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمَفْطَرَاتِ يَوْمًا كَامِلًا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى غُرُوبِ
الشَّمْسِ بِالشَّرْطِ - (الفقه على مذاهب الأربعة ج ১ ص ৫১১)

রোযা ফরয হওয়ার সময়কালঃ রমযানের রোযা ফরয হয়েছিল হিজরতের দেড় বছর পর শাবান মাসের দশ তারিখে। (الهداية والنهاية ج ২ ص ২৫৫-২৫৭)

যেমন আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-

"فَرْضَ الصَّوْمِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَصَامَ النَّبِيُّ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ" (فتح الهاري ج ৪ ص ৮৭)
অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। রাসূল (সাঃ) মোট নয়টি রমযানে রোযা রেখেছেন।

* আল্লামা ইবন কাসীর প্রমুখ বলেন, দ্বিতীয় বছরে রোযার পূর্বে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। এই বছরেই সাদকায়ে ফিতর ও সদকার (যাকাতের) পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। (معارف السنن ج ১ ص ১০)

এখানে উল্লেখ্য যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম আশুরা (দশই মহররম) ও أَيَّامُ الْبَيْضِ (চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫)- এর রোযা রাখতেন।

অতঃপর এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এই রোযা তখন ফরয ছিল কিনা।

* শাফেঈদের অভিমত হল, রমযানের রোযার পূর্বে কোন রোযা ফরয ছিল না। বরং আশুরা ইত্যাদির রোযা প্রথমেও সুন্নত ছিল এখনও সুন্নত।

* হানাফীরা বলেন যে, রমযানের রোযার পূর্বে আশুরা ইত্যাদির রোযা ফরয ছিল। অতঃপর যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন তা মানসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি হল- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যে রূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (বাকারঃ ১৮৩)

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ فَاتِمُوا بِقِيَّةِ يَوْمِكُمْ وَأَقْضُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ— (ابو داود ج ১ ص ৩৩২ باب في فضل صومه، البخاري ج ১)

ص ২৬৮-২৬৯ باب صيام يوم عاشوراء، مسلم ج ১ ص ৩৬০ باب صوم يوم عاشوراء)

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন মাসলামা তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা (১০ই মুহাররম তারিখে) আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এদিন (আশুরার) রোযা রেখেছ? তারা বললেন, না। এতদশ্রবণে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমরা অবশিষ্ট দিন আর কিছু না খেয়ে পূর্ণ কর। আর এটা কাযা করে নাও।

আবু দাউদ (রহ.) বলেছেন, অর্থাৎ আশুরার দিন।

উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) আশুরার রোযা কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বক্তৃতঃ কাযা হয় ফরয অথবা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে।

দলীল (২): তাছাড়া মুআয ইবন জাবাল (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে-

... قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ كِتَابَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الخ (ابو داود ج ١ ص ٧٥ كتاب الصلوة باب كيف الاذان، مسند احمد ج ٥ ص ٢٤٦)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি মাসে তিন দিন করে এবং আশুরার রোযা রাখতেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়, “তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা খোদাভীরু হও।” (বাকারাঃ ১৮৫)

এসব হাদীস রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরা ও **أَيَّامٍ بِيضٍ**-এর রোযা ফরয হওয়া প্রমাণ করে।

যেহেতু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযা ফরয না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, সেহেতু এখন আর উপরিউক্ত ইখতিলাফের কোন গুরুত্ব নেই।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٥١٢-٥١٣)

রোযার প্রকারভেদ ও হুকুমঃ রোযা সাধারণত ৬ প্রকার-

(১) **صَوْمُ مَفْرُوضٍ** - ফরয রোযা। রমযানের এক মাস রোযা রাখা ফরয। যে রমযানের রোযা ফরয হওয়া অস্বীকার করবে, সে কাকফের বলে গণ্য হবে। তাছাড়া রমযানের কাযা রোযাও ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (বাকারাঃ ১৮৩-১৮৫)

(২) **صَوْمُ وَاجِبٍ** - ওয়াজিব রোযা। যেমন- মাস্ততের রোযা, কাফফারার রোযা।

(৩) **صَوْمُ مُسْتَنُونٍ** - সুন্নত রোযা। ফরয কিংবা ওয়াজিব রোযা নয়, কিন্তু যে রোযা নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং রেখেছেন এবং উম্মতকে রাখতে বলেছেন, তা সুন্নত। এ ধরনের রোযা রাখলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। তবে না রাখলে গোনাহ হবে না। যেমন- আশুরার রোযা (মহররম মাসের ৯ এবং ১০ তারিখের দুটি রোযা), আরাফাতের দিনের রোযা (যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের রোযা), আইয়ামে বীযের রোযা (প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখের রোযা)

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ - (ابو داود ج ۱ ص ۳۳۱ باب في صوم يوم عاشوراء، بخاري ج ۱ ص ۲۶۸ باب صيام يوم عاشوراء/ ۲۵৬, مسلم ج ১ ص ৩০৮-৩০৭ باب صوم يوم عاشوراء، ترمذي ج ১ ص ১০৬ باب الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশগণ জাহেলিয়াতের যুগে আশুরার (১০ই মুহাররামের দিন) রোযা পালন করত। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও জাহেলিয়াতের যুগে (মদীনায হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায অবস্থানকালে) ঐদিন রোযা রাখতেন। তিনি মদীনাতে আগমনের পর ঐদিন নিজে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরকেও রোযা রাখতে নির্দেশ দেন। অতঃপর রমযানের রোযা ফরয করা হলে আশুরার রোযার আবশ্যিকতা পরিত্যক্ত হয়। ইচ্ছা করলে কেউ তা রাখতে পারে এবং নাও রাখতে পারে।

(৪) صَوْمُ نَفْلِ - নফল বা মুস্তাহাব রোযা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত বাদে সব রোযা সুন্নত বা মুস্তাহাব। যেমন- নিষিদ্ধ ৫ দিন (দু'ঈদের দিন এবং কুরবানী ঈদের পর আরো তিন দিন) ব্যতীত যে কোন দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা।

(৫) صَوْمُ مَكْرُوه - মাকরুহ রোযা। যেমন- يَوْمُ الشُّكِّ বা সন্দেহের দিনে রোযা রাখা। (এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে।)

(৬) صَوْمُ حَرَام - বা হারাম রোযা। বছরে পাঁচ দিন রোযা রাখা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যেমন দু'ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন (কুরবানীর ঈদের পরের তিন দিন) রোযা রাখা। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

... عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيُفْطِرُكُمْ مَنْ صِيَامَكُمْ - (ابو داود ج ১ ص ৩২৮ باب في صوم العيدين، بخاري ج ১ ص ২৬৭ باب صوم يوم الفطر، مسلم ج ১ ص ৩৬০ باب تحريم صوم يوم العيدين، ترمذي ج ১ ص ১৬০ باب كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر، ابن ماجه ص ১২৬)

অর্থাৎ, ... আবু উবায়দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরের (রাঃ) সাথে ঈদের নামায আদায় করি। এরপর তিনি খুতবার পূর্বে নামায আদায় করেন। পরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন আর ঈদুল

আযহার দিন, তোমরা যে দিন কুরবানী করে থাক তার গোশত তোমরা ভক্ষণ করে থাক। আর ঈদুল ফিতরের দিন, তা তোমাদের রোযার ইফতারের দিন।

... عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٍو كُلْ فَهَذِهِ الْيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ - (ابو داود ج ১ ص ৩২৮ باب صيام ايام التشريق)

অর্থাৎ, ... উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবু মুররা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আমরের সাথে তাঁর পিতা আমর ইবনুল আসের (রাঃ) নিকট গমন করেন। তিনি উভয়ের সম্মুখে কিছু খাদ্যদ্রব্য রেখে বলেন, খাও। আব্দুল্লাহ ইবন আমর বলেন, আমি তো রোযাদার। আমর (রাঃ) বলেন, তুমি খাদ্য গ্রহণ কর, কেননা এই দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ইফতার করতে নির্দেশ দিতেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করতেন। রাবী মালিক বলেন, তা ছিল তাশরীকের দিনসমূহ।

বর্তমানেও কি সক্ষম ব্যক্তি রোযা না রেখে ফিদয়া দিতে পারবে?

পবিত্র কুরআনের আয়াত- وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থাৎ, আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম, তারা এর পরিবর্তে ফিদয়া (একজন মিসকীনকে খাদ্য) প্রদান করবে। (বাকারাঃ ১৮৪)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রোগজনিত কিংবা সফরের কারণে নয়, বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মনে না চাইলে অথবা অতি সাধারণ কোন সমস্যার কারণে রোযা না রেখে ঐ রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। প্রশ্ন হল, বর্তমানেও কি কোন সক্ষম ব্যক্তি রোযা না রেখে ফিদয়া দিতে পারবে?

প্রকৃত কথা হল- এ নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল লোকজনকে ধীরে ধীরে রোযা রাখতে অভ্যস্ত করে তোলা। অতঃপর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অর্থাৎ অতএব তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোযা রাখবে- উক্ত আয়াত দ্বারা প্রাথমিক নির্দেশটি সুস্থ সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। এখন রোযা রাখাই ফরয, ফিদয়া দেয়া চলবে না। হযরত সালামা ইবন আল আকওয়া (রাঃ)-এর হাদীসে তাই বলা হয়েছে।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, তবে যে সব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুণ

অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেঈগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। (معارف القرآن ج ١ ص ٤٤٥)

* এ ব্যাপারে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) العرف الشدي গ্রন্থে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, “রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করা প্রকৃতপক্ষে ইহা রমযানের রোযার ক্ষেত্রে বলা হয়নি। বরং প্রাথমিক অবস্থায় যখন كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصَّيَامُ (তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে) আয়াত নাযিল হয়, তখন উক্ত আয়াত দ্বারা আসুরা এবং ايام بيض তথা প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখা ফরয করা হয়েছিল। আর এ সকল রোযার ক্ষেত্রে وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (আয়াতের দ্বারা ফিদয়া দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন مِنْ شَهْدٍ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায় এবং রমযানের রোযা ফরয করে দেয়া হয়।” (معارف السنن ج ٦ ص ٢٠٦-٢٠٧)

* আর একদল উলামা বলেন, হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কিরআতে وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ-এর স্থলে وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ উল্লেখ রয়েছে, যদি উক্ত আয়াতটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে রহিতেরও প্রয়োজন হয় না, বরং আয়াতটি মুহকাম (محکم) মানতে হবে। তখন উক্ত আয়াতে যারা রোযা রাখতে একেবারেই অক্ষম কেবল তাদেরকেই ফিদয়া দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (روح المعاني ج ٢ ص ৫৭)

যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ الخ (ابو داود ج ١ ص ٣١٧ باب من قال هي مشقة الشيخ والحبلى)

অর্থঃ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণীঃ (অর্থ) “যারা সামর্থ্যবান তারা মিসকীনদের ফিদয়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আয়াতটি অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা লোকের জন্য ঐচ্ছিক ব্যবস্থা স্বরূপ।

ফিদইয়ার পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক মাসআলাঃ একটি রোযার ফিদয়া অর্ধ সা (صاع) গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলা সের হিসাবে অর্ধ সা

সমান এক সের সাড়ে বার ছটাক। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার ফিদয়া আদায় হয়ে যাবে। ফিদয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের খিদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নয়। (معارف القرآن ج ۱ ص ৪৪০)

উল্লেখ্য যে, এক রোযার ফিদয়া দুই ব্যক্তিকে বণ্টন করে দেয়া অথবা কয়েক রোযার ফিদয়া একই ব্যক্তিকে একই তারিখে প্রদান করা জায়েয নয়। এবং যদি কোন ব্যক্তি ফিদয়া প্রদানের সামর্থ্য না রাখে, তাহলে সে কেবল এস্তেগফার পড়বে এবং মনে মনে এ নিয়ত করবে যে, যখন সম্ভব হবে আদায় করে দিব।

(معارف القرآن ج ১ ص ৪৪০)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী সম্পর্কে সবাই একমত যে, তাদের জীবনের ব্যাপারে কোন প্রকার আশংকা হলে তাদের জন্য রোযা না রাখা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় তারা পরবর্তীতে রোযা কাযা হিসেবে আদায় করে নেবে। নিজের জীবনের উপর আশংকারী রোগীর ন্যায় তাদেরকে ফিদয়া দিতে হবে না। এতটুকু পর্যন্ত ঐকমত্য রয়েছে। যদি রোযা রাখার ফলে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার পেটের বাচ্চার এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলার স্তন্য দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার ব্যাপারে কোনপ্রকার আশংকা হয় এমতাবস্থায়ও তাদের জন্য রোযা না রাখা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। তবে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য হল-

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায় তারা উভয়ে কাযাও করবে এবং ফিদয়াও দিবে। হযরত ইবন উমর (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহ.) থেকে ইহাই বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও এক রেওয়ায়েত তাই।

তবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ও লাইছ (রহ.)-এর মাযহাব হল, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা কাযা করবে, কিন্তু তার দায়িত্বে ফিদয়া নেই। তবে দুগ্ধদানকারিণীর দায়িত্বে কাযা এবং ফিদয়া উভয়ই আছে।

* ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর মতে, তাদের দায়িত্বে ফিদয়া আছে কিন্তু কাযা নেই। হযরত ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রাঃ) এবং ইবন যুবাইর (রাঃ) থেকেও এটিই বর্ণিত আছে।

* ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তার সাথীদের মতে, এমতাবস্থায় তাদের দায়িত্বে শুধু কাযা আবশ্যিক হবে। ইমাম আওয়াঈ, সুফিয়ান, আবু উবায়দা, আবু সাওর, নাখঈ, যাহ্হাক এবং সাঈদ ইবন যুবাইর (রহ.)-এর মাযহাবও তাই।

(معارف السنن ج ১ ص ১০)

... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةُ بَن قَشِيرٍ : قَالَ أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لَّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ اجْلِسْ فَاصْبُ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ اجْلِسْ أَحَدْتُكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصَّيَامِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْضِعِ أَوْ الْحَبْلَى

الخ (ابو داود ج ۱ ص ۳۲۷ باب من اختار الفطر، ترمذي ج ۱ ص ۱۵۲ باب الرخصة في الافطار للحبلى

والمرضع، نسائي ج ۱ ص ৳ৱৱৱ وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، ابن ماجة ص ৱৱৱৱ) অর্থৱৱ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। কুশায়ের গোত্রজিত বনী আব্দুল্লাহ ইবন কাব সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমাদের কওমের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অশ্বারোহী বাহিনী শেষ রাতে হামলা করলে আমি তাঁর নিকট গমন করি, অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আহার করতে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি বস এবং আমাদের সাথে এই খাদ্য ভক্ষণ কর। আমি বলি, আমি রোযাদার। এরপর তিনি বলেন, তুমি বস, আমি তোমার নিকট নামায ও রোযা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফিরের জন্য নামাযের অর্ধেক উঠিয়ে দিয়েছেন এবং দুগ্ধদানকারিণী মাতা ও গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের উপর হতে রোযা সরিয়ে দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ ص ৳ৱৱৱ

যদি রমযানের ঊনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করবে

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْدُمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَاتِمُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ— (بخاري ج ৱ ص ৲৵৶ باب قول النبي صلعم اذا رأيتم الهلال الخ، مسلم ج ৱ ص ৳ৱৱৱ-৳ৱৱৱ باب وجوب صوم رمضان الخ، ترمذي ج ৱ ص ৱৱৱৱ باب لا تتقدموا الشهر بصوم، نسائي ج ৱ ص ৳ৱৱৱ اكمال شعبان ثلثين الخ، ابن ماجة ص ৱৱৱৱ)

অনুবাদঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমযানের মাস আগমনের এক বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না, অবশ্য যদি কেউ এরূপ রোযা রাখায় অভ্যস্ত থাকে, তবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর রমযানের চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোযা রাখবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত রমযানের রোযা রাখবে। আর যদি এর মধ্যে মেঘাচ্ছন্নতা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরে ইফতার করবে। আর চন্দ্রমাস উনত্রিশ দিনেও হয়।

চাঁদ দেখার হুকুমঃ নতুন চাঁদ দেখা মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য কাজ। কারণ চাঁদ দেখার উপর ইসলামের অনেক আহকাম নির্ভর করে। অনেকের মতে, চাঁদ দেখা 'ওয়াজিবে কিফায়'। অর্থাৎ সমাজের সবার উপরই চাঁদ দেখার দায়িত্ব। যদি একজনও এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সবাই গোনাহগার হবে।

চাঁদের অস্তিত্ব গণ্য হবে, নাকি দর্শন?

সকল উলামা ও ফুকাহা এ মাসআলায় একমত পোষণ করেন যে, চাঁদের দর্শন গণ্য হবে, এর অস্তিত্ব গণ্য হবে না। কেননা চাঁদের দর্শন অনুযায়ী রোযা রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোযা রাখবে। (বাকারাহঃ ১৮৫)

وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ

(পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে)

অপর এক হাদীসে এসেছে,

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ-

(بخاري ج ١ ص ٢٥٦، مسلم ج ١ ص ٣٠١، ابن ماجه ص ١٢)

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) রমযানের কথা আলোচনা করে বললেন, তোমরা চাঁদ দেখার পূর্বে রোযা রেখ না। আর চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ঈদের জন্য রোযা ভেঙ্গ না এবং যদি তোমাদের নিকট চাঁদ গোপন থাকে তাহলে হিসাব করে নাও।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে হাদীসে رؤيت শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রসিদ্ধ। যার অর্থ হল, কোন জিনিসকে চোখে দেখা। এছাড়া অন্য কোন অর্থে যদি ব্যবহার করা হয়, তবে তা প্রকৃত অর্থ নয়, বরং রূপক অর্থ হবে। অতএব, ইরশাদে নববীর সারনির্ঘাস

হল এই যে, সমস্ত শরঈ বিধি বিধান যেগুলো চাঁদ উঠা না উঠার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোতে চাঁদ উঠার অর্থ হল, সাধারণ চোখে পরিদৃষ্ট হওয়া। এতে বুঝা গেল আহকামের নির্ভরশীলতা দিগন্তে চাঁদের অস্তিত্বের উপর নয়, বরং দেখার উপর। যদি দিগন্তে চাঁদ বিদ্যমান থাকে কিন্তু কোন কারণে দর্শনযোগ্য না হয়, তাহলে শরঈ আহকামে এই অস্তিত্ব ধর্তব্য হবে না।

হাদীসের এই অর্থটিকে এই হাদীসের শেষ বাক্যটি আরো বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। যাতে ইরশাদ হয়েছে, যদি চাঁদ তোমাদের থেকে গোপন থাকে অর্থাৎ, তোমাদের চোখগুলো তা দেখতে না পায় তাহলে তোমাদের উপর এই দায়িত্ব চাপানো হয়নি যে, অংকের হিসাব লাগিয়ে চাঁদের অস্তিত্ব ও জন্ম জেনে নাও এবং এর উপর আমল কর। অথবা দূরবীনের মাধ্যমে সূর্য রশ্মি থেকে অথবা উড়োজাহাজে উড্ডয়ন করে মেঘের উপর যেয়ে চাঁদের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ কর। বরং তিনি বলেছেন, “যদি তোমাদের কাছে চাঁদ গোপন থাকে তবে ৩০ দিন পূর্ণ করে মাস শেষ মনে কর।”

এখানে غَمُّ শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ আরবী বাগধারায় কামুস ও শরহে কামুস সূত্রে এই-

غَمٌّ، غَمُّ الْهَيْلَالِ عَلَى النَّاسِ غَمًّا إِذَا حَالَ دُونَ الْهَيْلَالِ غَيْمٌ رَقِيقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَمْ يَرِ الْهَيْلَالُ عَلَى النَّاسِ - (تاج العروس شرح قاموس)

অর্থাৎ, غم তখন বলা হয়, যখন নতুন চাঁদের উপর মেঘ অথবা অন্য কোন বস্তু প্রতিবন্ধক হয়, আর চাঁদ দেখা না যায়। যদ্বারা বোঝা গেল, চাঁদের অস্তিত্ব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীকার করে এই হুকুম দিয়েছেন। কারণ, গোপন হওয়ার জন্য মওজুদ থাকা আবশ্যিক। যে জিনিস অস্তিত্ববানই নয়, সেটাকে বলা হয় অস্তিত্বহীন।

(رؤية هلال ص ১০-৩০)

তিরমিযীতে বর্ণিত আছে-

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ

غَيْبَةً فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا - (ترمذي ج ১ ص ১৪৮ باب الصوم لرؤية الهلال والافطار له)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, ... যদি চাঁদের সামনে মেঘখণ্ড প্রতিবন্ধক হয় তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ কর।

যদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা তখনকার বিবরণ যখন চাঁদ দিগন্তে মওজুদ থাকে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি দৃষ্টিগোচর না হয়- এমতাবস্থায়ও ত্রিশ দিন পূর্ণ করার

হুকুম দেয়া হয়েছে। (درس ترمذي ج ২ ص ৫২১)

অংকের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু রায়হান আল-বেরুনী স্বীয় গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, প্রথম তারিখের চাঁদ সম্পর্কে অকাট্য হিসাব করা সম্ভব নয়। কারণ হিসাবের পদ্ধতি যতই উন্নত হোক তা সত্ত্বেও এগুলোতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান।

(الانوار الباقية ص ১৭৮)

সুতরাং কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র দিন পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার হিসাব করে চাঁদ আকাশে হওয়া বা না হওয়ার ফয়সালা করে মাস প্রমাণিত হতে পারে না।

بَابُ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرَيْنِ بِلَيْلَةٍ ص ৩১৭

যদি কোন অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়।

... عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي بَنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكُنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نَكْمَلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مسلم ج ১ ص ৩৪৮ باب بيان ان كل بلد رؤية الخ، ترمذي ج ১ ص ১৪৮ باب لكل

اهل بلد رؤيتهم، نسائي ج ১ ص ৩০০ اختلاف اهل الافاق في الرؤية)

অনুবাদঃ ... কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে ফাযল বিনত আল-হারিস তাঁকে মুআবিয়ার নিকট শাম (সিরিয়া) দেশে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে তার প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমি সিরিয়া থাকাবস্থায় রমযানের চাঁদ উঠে এবং আমরা উহা জুমুআর রাত্রিতে অবলোকন করি। এরপর আমি রমযানের শেষের দিকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি। ইবন আব্বাস (রাঃ) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা রমযানের চাঁদ কখন দেখেছিলে? আমি বলি, আমি তা জুমুআর রাতে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে? আমি বলি, হ্যাঁ এবং লোকেরাও দেখে এবং তারা রোযা রাখে, এমনকি মুআবিয়াও রোযা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তো তা শনিবারে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত

রোযা রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখে যাব। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুআবিয়ার দর্শন ও রোযা রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্লেষণঃ اِخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ তথা চন্দ্রের উদয়স্থলের যে ভিন্নতা রয়েছে এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। দেশসমূহের দূরত্বের পার্থক্যের কারণেই এ ভিন্নতা ঘটে থাকে। যেমন কোন দেশে দেখা যায়, যে চাঁদ এক রাতে উদয় হয়েছে অন্য দেশে পরের রাতে উদয় হয়েছে, এমনভাবে একই চাঁদ এক জায়গায় উদয় হচ্ছে, অন্য দেশে অস্ত যাচ্ছে। কোথাও রাত হচ্ছে, আবার কোথাও দিন হচ্ছে। অতএব, চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে এক দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসীদের জন্য এটি ধর্তব্য হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর মতে, উদয়স্থলের বিভিন্নতার কারণে এক দেশে চাঁদ দেখা অন্য দেশের অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক অঞ্চলের লোক নিজস্ব চাঁদ দেখার আলাদা হিসাব করবে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) কুরায়েব থেকে বর্ণিত শামবাসীদের চাঁদ দেখা এবং মুআবিয়া (রাঃ)-এর রোযা রাখার কথাটিকে গ্রহণ করেননি।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ (২) ... فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ الخ (بخاري ج ১ ص ২০৬)

مسلم ج ১ ص ২৪৭، نسائي ج ১ ص ৩০১

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, তোমরা চাঁদ না দেখে সওম পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না।

দলীল (৩)ঃ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا (البخاري ج ১ ص ২০০، مسلم ج ১ ص ২৪৮، نسائي ج ১ ص ৩০১)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমরা চাঁদ দেখে সওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে।

উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ দেখেই যেহেতু রোযা রাখা বা ভঙ্গ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চলবাসীকেই পৃথকভাবে চাঁদ দেখতে হবে।

* ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। অতএব যদি কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা নাও যায়, তাহলে অন্য অঞ্চলের লোক তদনুযায়ী রমযান অথবা ঈদ পালন করতে পারবে। তবে শর্ত হল, ঐ অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখার প্রমাণ শরঈ পদ্ধতিতে হতে হবে। অর্থাৎ, দ্রাঘিমা সীমার যে কোন প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলেই যথেষ্ট। এই ভিত্তিতে যদি পাশ্চাত্যের লোকেরা চাঁদ দেখে তবে প্রাচ্যবাসীর উপর তা আবশ্যিক হবে।

(فتح الملهم ج ৩ ص ১১৩)

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ (১) : دَلِيلٌ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ... (بخاري ج ১ ص ২০৬,

مسلم ج ১ ص ৩৪৭, نسائي ج ১ ص ৩০১)

(ইতিপূর্বে হাদীসটি উক্ত অনুচ্ছেদে ইমামএয়ের দ্বিতীয় দলীল হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।)

دَلِيلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ (২) : فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا (بخاري ج ১ ص ২০৬, مسلم ج ১ ص ৩৪৮, نسائي ج ১ ص ৩০১)

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (৩) : دَلِيلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ ... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّعَ يَا بِلَالُ أَذْنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا— (ابو داود ج ১ ص ৩২০ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، نسائي ج ১ ص ৩০০ باب

قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، ابن ماجة ص ১২০)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জৈনিক বেদুঈন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি।... নবী করীম (সাঃ) বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।

অতএব, উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে ۞ الْهَيْلَالَ বা চাঁদ দেখা বিষয়টি শর্তহীনভাবে (مطلقاً) বলা হয়েছে। অর্থাৎ হাদীস সমূহে কোন জায়গা থেকে চাঁদ দেখতে হবে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদেরকে পৃথক পৃথকভাবে চাঁদ দেখতে হবে কিনা, এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং যে কোন জায়গা থেকে চাঁদ দেখা গেলেই এর উপর আমল করতে হবে।

* অবশ্য পরবর্তী আহনাফদের মধ্য থেকে হাফিয বায়লাঈ (রহ.) মৃত্যুঃ ৭৪৩ হিঃ।
 كُنْز-এর ব্যাখ্যামূলক কিতাব "تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ" গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৩২১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে,
 দূরবর্তী দেশগুলোতে উদয়স্থলের পার্থক্য আমাদের (আহনাফদের) নিকটও
 গ্রহণযোগ্য। সুতরাং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর চাঁদ দেখা যথেষ্ট নয়। পরবর্তী আহনাফগণ
 ইহার উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। (بدائع الصنائع ج ২ ص ৮৩, رُؤْيُ هِلَال ص ৫৮)

কিন্তু দূরবর্তী দেশ ও নিকটবর্তী দেশের পার্থক্য বুঝানোর মাপকাঠি কি? এ ব্যাপারে
 আল্লামা শিবির আহমদ উসমানী (রহ.) লিখেন- যেসব অঞ্চল এতটুকু দূরবর্তী হয়
 যে, এর উদয়স্থলের পার্থক্য গণ্য না করলে দু'দিনের ব্যবধান হয়ে যাবে, সেসব
 উদয়স্থলের ব্যবধান গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ, তখন এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য
 দেশের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা যদি এমন দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের
 পার্থক্য গণ্য করা না হয়, তাহলে মাস ২৮ অথবা ৩১ দিনে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা
 থেকে যায়, যা শরীয়তে অনুমোদিত নয়। (فتح اللهم ج ৩ ص ১১৩)

যেমন, হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا
 حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ - (ابو داود ج ১ ص ৩১৭ باب الشهر يكون تسعا وعشرين,
 مسلم ج ১ ص ৩৪৭)

অর্থাৎ, ... ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ
 করেছেন; রোযার মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। কাজেই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা
 রাখবে না এবং চাঁদ না দেখে রোযা ভাঙ্গবে না।

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ
 وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ إِصْبَعَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْني
 تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ - (ابو داود ج ১ ص ৩১৭ باب الشهر يكون تسعا وعشرين, بخاري ج ১
 ص ২৫৬ باب قول النبي صلعم لا نكتب ولا نحسب, مسلم ج ১ ص ৩৪৭)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ
 করেছেন: আমরা উম্মী জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমরা লিখতে জানি না এবং মাসের
 হিসাবও করতে পারি না। এরপর তিনি এরূপ, এরূপ ও এরূপ বলে (তিনবার)
 নিজের (দশ) অঙ্গুলি প্রসারিত করেন। রাবী সুলায়মান তৃতীয়বারে তাঁর একটি
 আঙ্গুল সংকুচিত করেন, অর্থাৎ রোযার মাস উনত্রিশ ও ত্রিশ দিনে হয় (এর প্রতি
 ইশারা করেন)

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মাস ২৮ বা ৩১ দিনে হয় না।

* কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর ব্যবধানের মানদণ্ড কি হবে এর বিশদ বিবরণ ইসলামী আইনের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ নেই। তবে-

* কেউ কেউ বলেন, কোন অঞ্চলকে দূরবর্তী এবং কোনটিকে নিকটবর্তী বলা হবে, তা عرف বা ঐ সময়ের প্রচলনের উপর নির্ভর করবে।

* কারো মতে, একজন শাসকের শাসনাধীন একটি দেশের যেকোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে ঐ দেশের অধিবাসীদের সকলের উপর রোযা ফরয হবে।

* কেউ কেউ বলেন, এক মাসের দূরত্বকে দূরবর্তী অঞ্চল এবং এর চেয়ে কম দূরত্বকে নিকটবর্তী অঞ্চল বলা হবে। ইহা ঐ সময়ের হিসাব, যখন যাতায়াতের যানবাহন ছিল উট এবং ঘোড়া।

* বিশুদ্ধতম কথা হল এই যে, চাঁদের مطلع যদি এমন দূরত্ব হয় যে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব নয় অর্থাৎ তারিখ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা দূরবর্তী অঞ্চল, আর যদি তারিখ পরিবর্তন না হয়, তাহলে তা নিকটবর্তী অঞ্চল।

(১৭৮০ ২৮ مـ) (درس مشکوٰۃ ج ২) যেমন- সৌদী আরবে যে দিন চাঁদ দেখা যায়- বাংলাদেশে সেদিন চাঁদ দেখা আদৌ সম্ভব নয়; চাঁদের مطلع তথা উদয়াচলের দূরত্ব বেশি হওয়াতে বাংলাদেশে সেই চাঁদ এক দিন পরে দেখা যাবে। কাজেই সৌদী আরবের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অধিবাসীদের রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা যাবে না।

* কতিপয় আলিম বলেন- আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে চাঁদের উদয়াচল নির্ণীত হওয়ায় এ দূরত্ব নির্ণয় করা সহজ হয়ে গেছে। ফলে পৃথিবীর যতটুকু অংশ জুড়ে একই সময়ে চাঁদ দেখা সম্ভব, এমন অংশের কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে ঐ অংশের সকলের উপর রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা আবশ্যিক হবে। এক্ষেত্রে দূরত্বের পরিমাণ যাই হোক।

* আল্লামা উসমানী (রহ.) দূরত্বের মাপকাঠি নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, যেসব শহর এতটুকু দূরবর্তী যে, এগুলোর উদয়াচলের বিভিন্নতা ধর্তব্যে না আনলে দু'দিনের পার্থক্য হয়ে যায় সেখানে উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে। (فتح المـ ৩ ج ১১৩) জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমাম কুরায়েব-এর বর্ণিত হাদীসে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর ফায়সালার উপর ভিত্তি করে বলেন- প্রত্যেক অঞ্চল ও দেশবাসীকেই চাঁদ দেখতে হবে, এর জবাবে আহনাফরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা ব বলেন যে-

(১) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) শাম এবং মদীনাকে بلاد بعيدة তথা দূরবর্তী দেশের মধ্যে গণ্য করেছেন। এজন্যই তাঁর (কুরায়েব) কথাকে গ্রহণ করেননি। আর অঞ্চল নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়া একটি ইজতিহাদী বিষয়। আহনাফরাও একথা বলেন যে, দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক চাঁদ দেখতে হবে। সুতরাং কোন মতানৈক্য নেই। (فتح الملهم ২ ج ص ১১৩)

(২) অথবা, খবরদাতা শুধু একা কুরায়েব ছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সাক্ষীর সংখ্যা (তথা কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী হওয়া) পূরা হচ্ছে না। আর এ কারণেই ইবন আব্বাস (রাঃ) তাঁর একথা গ্রহণ করেননি। (المعارف للهري ১ ج ص ৩১)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ যদিও হাদীসদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং ভঙ্গ কর; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশবাসীকে চাঁদ দেখতে হবে। যদি একথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো একথাও মানতে হবে যে, কেবল ঐ ব্যক্তিই রোযা রাখতে বা ভাঙতে পারবে, যে কেবল নিজ চোখেই চাঁদ দেখবে। অন্যের চাঁদ দেখা তার জন্য যথেষ্ট নয়। আর এমনটি কখনো সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রোযা রাখা বা ঈদ পালনার্থে রোযা ভাঙ্গার জন্য প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশবাসীকে চাঁদ দেখা জরুরী নয়; বরং যে অঞ্চল বা দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান একেবারেই নগণ্য রয়েছে (যেমন, এক দুই ঘন্টা) এক্ষেত্রে এসব দেশ বা অঞ্চল একে অপরের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে রোযা রাখতে বা ভাঙতে পারবে। আর যদি ব্যবধান বেশি হয়, তাহলে পারবে না। মোট কথা, দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে পরবর্তী হানাফীগণের অভিমত হল, এমতাবস্থায় উদয়াচলের বিভিন্নতা ধর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, আমার ধারণা ইমাম আবু হানীফা এবং অন্যান্য ইমাম যাঁরা উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য সাব্যস্ত করেন না, তার আরেকটি কারণ এটিও ছিল যে, যেসব অঞ্চলে মাশরিক-মাগরিবের (পূর্ব-পশ্চিমের) ব্যবধান আছে, সেখানে এক জায়গার সাক্ষ্য অপর জায়গায় পৌঁছা তাদের জন্য শুধু একটি কাল্পনিক ও মেনে নেয়ার বিষয় ছিল। শুধু কল্পনা ছাড়া এর অতিরিক্ত কোন মর্যাদা ছিল না। এরূপ মেনে নেয়া কাল্পনিক বিষয় দ্বারা বিধি-বিধানের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। আর নগণ্যকে অস্তিত্বহীনের পর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করা ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে প্রসিদ্ধ। এজন্য উদয়াস্থলের বিভিন্নতা ব্যাপক আকারে ধর্তব্য নয় বলেছেন।

কিন্তু বর্তমানে উড়োজাহাজ, টেলিফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি যোগাযোগ মাধ্যম গোটা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমকে এক করে ফেলেছে। এক জায়গার সাক্ষ্য অপর

জায়গায় পৌঁছা এখন আর শুধু কাল্পনিক ব্যাপার নয়, বরং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে যদি পূর্বের সাক্ষ্য পশ্চিমে আর পশ্চিমের সাক্ষ্য পূর্বে প্রমাণ মেনে নেয়া হয়, তাহলে কোন জায়গায় মাস ২৮ দিনে আর কোন জায়গায় ৩১ দিনে হওয়া আবশ্যিক হবে। এজন্য এরূপ দূরবর্তী এলাকায় যেখানে মাসের দিনগুলোতে বেশকমের সম্ভাবনা থাকবে সেখানে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্যে আনা আবশ্যিক হয়ে পড়বে এবং হানাফী মাযহাবের হুবহু অনুকূল হবে। (রুইত হালাল ص ১০-১১)

بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشُّكِّ ص ৩১৭

সন্দেহজনক দিবসে রোযা রাখা মাকরুহ

... عَنْ صَلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَاتِي بِشَاةٍ فَتَنَحَّى
بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - (بخاري ج ১ ص ২০৬ باب قول النبي صلعم اذا رأيتم الهلال الخ، ترمذي ج ১ ص ১৪৭-১৪৮)

باب كراهية صوم يوم الشك، نسائي ج ১ ص ৩০৬ صيام يوم الشك، ابن ماجه ص ১২০)

অনুবাদঃ ... সিল্লা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা সন্দেহজনক দিবসে আশ্মার (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। সেখানে একটি ভুনা বকরী পেশ করা হলে সেখানকার কিছু লোক (রোযা থাকার কারণে) তা খাওয়া হতে বিরত থাকে। আশ্মার (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিবসে) যে রোযা রেখেছে, সে তো আবুল কাসিম (নবী করীম (সাঃ))-এর নাফরমানি করেছে।

বিশ্লেষণঃ يَوْمُ الشُّكِّ-এর পরিচয় এবং এ দিনে রোযা রাখার বিধানঃ

আভিধানিক অর্থঃ يَوْمُ শব্দের অর্থ দিন এবং الشُّكُّ শব্দের অর্থ সন্দেহ-সংশয়।

অতএব, يَوْمُ الشُّكِّ-এর অর্থ হল “সন্দেহের দিন”।

পারিভাষিক অর্থঃ ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায়-

يَوْمُ الشُّكِّ هُوَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَرَى
الْهَلَالَ بِسَبَبِ غَيْمٍ بَعْدَ غُرُوبِ يَوْمِ الثَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ، فَوَقَعَ الشُّكُّ فِي
الْيَوْمِ الثَّالِي لَهُ هَلْ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ - (الفقه على مذهب الاربعة ج ১ ص ৫০৩)

অর্থাৎ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে শাবান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত রাতে সন্দেশ দিবে না গেলে পরের দিনকে **يَوْمُ الشُّكِّ** বা সন্দেহের দিন বলা হয়। কেননা, ঐ অন্ধকার মধ্যে এ সংশয় রয়েছে যে, ইহা কি শাবানের শেষ তারিখ, নাকি রমযানের প্রথম তারিখ?

يَوْمُ الشُّكِّ هُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ شَعْبَانَ الَّذِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ شَعْبَانَ أَوْ أَوَّلُ رَمَضَانَ - (عنابة بهامش فتح القدير ج ٢ ص ٥٣)

অর্থাৎ, সন্দেহের দিন হল, শাবানের শেষ দিন, যাতে শাবানের শেষ অথবা রমযানের শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* **يَوْمُ الشُّكِّ** বা সন্দেহের দিনে রোযা রাখার হুকুম নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে:

* কেউ কেউ বলেন, সন্দেহের দিনে রোযা রাখা ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধানের রায়ের উপর নির্ভর করবে।

* কেউ কেউ বলেন, রমযানের নিয়তে ঐ দিন রোযা রাখা ওয়াজিব।

* ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, রমযানের নিয়তে রোযা রাখা জায়েয নয়। ইহা ব্যতীত সবই জায়েয আছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, এ দিনে ফরয কিংবা নফল কোন রোযাই জায়েয নয়। (درس مشكوة ج ٢ ص ١٩٧)

দলীল: অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হযরত আশ্মার ইবন ইয়াসিরের (রাঃ) হাদীস। উক্ত হাদীসে **شَرْتِئِينَ (مطلقاً)** ভাবে রোযা রাখাকে নবী করীম (সাঃ)-এর নাফরমানীর কথা বলা হয়েছে।

* এইদিনে কেউ যদি এই মনে করে রোযা রাখে যে, হতে পারে এটা রমযানের দিন, আমরা হয়ত চাঁদ দেখিনি। তবে এই নিয়তে রোযা রাখা সমস্ত ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে মাকরুহ তাহরীমী। (درس ترمذي ج ٢ ص ٥١٧)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমন-

(১) এ দিনে রমযানের রোযার নিয়তে রোযা রাখা মাকরুহ।

(২) রমযান ব্যতীত অন্য কোন ফরয বা ওয়াজিবের নিয়তে রোযা রাখা (যেমন রমযানের কাযা, মাল্লত অথবা কাফ্ফারার রোযা) এটাও মাকরুহ। তবে এটা মাকরুহ তানযীহী।

(৩) কেউ এরূপ নিয়ত করল যে, যদি আগামীকাল রমযান হয় তবে তা রমযানের রোযা, আর যদি রমযান না হয় তাহলে রোযা রাখবে না। এমতাবস্থায় তার রোযা হবে না। কেননা, কোন ইবাদত দোদুল্যমান (تردد) অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(عمدة القاري ج ১০ ص ২৪০)

* আর একটি অভিমত হল- যদি কেউ কোন বিশেষ দিনে নফল রোযা রাখায় অভ্যস্ত হয় আর সে দিনটি ঘটনাচক্রে সংশয়ের দিন হয় তবে তার জন্য নফলের নিয়তে রোযা রাখা সর্বসম্মতক্রমে জায়েয।

দলীল: ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْدُمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ

بِیَوْمٍ وَلَا یَوْمَیْنِ إِلَّا أَنْ یُکُونُ صَوْمٌ یُصُومُهُ رَجُلٌ فَلِیَصُمَ ذَلِكَ الصَّوْمُ - (ابو داود ج ১

ص ৩১৭) باب فی من یصل شعبان برمضان، بخاری ج ১ ص ২০৬) باب قول النبي صلعم لا نكتب

ولا نحسب، مسلم ج ১ ص ৩৪৮، ترمذی ج ১ ص ১৪৭) باب لا تقدموا الشهر بصوم، نسائي ج ১ ص ৩০৭

باب التسهيل في صيام يوم الشك، ابن ماجة ص ১২০)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমযান আগমনের পূর্বে তার রোযাকে একদিন বা দু'দিন এগিয়ে নিও না। অবশ্য যদি কেউ ঐ দিন (শাবানের শেষ তারিখে) রোযা রাখতে অভ্যস্ত থাকে তবে সে যেন ঐ রোযা রাখে।

আর যদি অভ্যাস ছাড়া কোন ব্যক্তি এই সন্দেহের দিনে নফলের নিয়তে রোযা রাখতে চায় তবে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে এটি সাধারণতঃ নাজায়েয।

হানাফীদের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য নাজায়েয, কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য জাযিয।

তিন ইমামের দলীল: উপরোল্লিখিত হাদীসে অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া নিঃশর্ত ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। عام و خاص-এর কোন পার্থক্য নেই।

হানাফীদের দলীল: এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, রমযানের সন্দেহ। এ কারণেই যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই কোন বিশেষ দিনে রোযা রাখায় অভ্যস্ত আর সে দিনটি সন্দেহের দিনে এসে যায়, তার জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ, সেখানে রমযানের সন্দেহের কোন সম্ভাবনা নেই। এর উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও কিয়াস করা হবে। যারা স্বীয় ইলম ও ফিকহের ভিত্তিতে সন্দেহ সংশয় ও ওয়াসওয়াসায় পড়বেন না। বরং খালেস নিয়তে রোযা রাখবেন। অবশ্য সাধারণ

জনগণ যেহেতু এসব ওয়াসওয়াসা দূর করতে সক্ষম হয় না, সেহেতু তাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করা হবে। (عمدة القاري ج ١٠ ص ٢٨٠ درس مشکوٰه ج ٢ ص ١٩٨)

* মুহীত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সাধারণ মানুষ সূর্য হেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তথা খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, অতঃপর যদি রমযান স্পষ্ট হয় তাহলে রোযার নিয়ত করবে। অন্যথায় ভেঙ্গে ফেলবে। (عمدة القاري ج ١٠ ص ٢٨٠)

بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ ص ٣١٩

শাওয়ালের চাঁদ দর্শনে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যদান

... عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ جَدِيلَةَ قَيْسٍ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهْدَ الْيَتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُنْسَكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ تَرَ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدَلَ نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا الخ (نسائي ج ١ ص ٣٠٠-٣٠١ باب قبول شهادة الرجل الخ)

অনুবাদঃ ... হুসায়েল ইবন আল-হারিস আল জাদলী থেকে বর্ণিত যে, একদা মক্কার আমীর খুতবা প্রদানের সময় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমরা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসেবে গুরুত্ব দেই। আর আমরা স্বচক্ষে যদি তা না দেখি তবে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রদান করলে তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি।

বিশ্লেষণঃ একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যে রোযা রাখা বা রোযা ভাঙ্গা যাবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রোযা রাখা এবং ভঙ্গ করা যাবে না। বরং দু'জন বিশুদ্ধ পুরুষের চাঁদ দেখা শর্ত।

وَأَنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا—ইরশাদ ফরমান

অর্থাৎ, যদি দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তোমরা রোযা রাখ এবং ভঙ্গ কর।

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল ও ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখ আলিমের মতে, চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। রমজানের চাঁদ হোক অথবা শাওয়ালের চাঁদ হোক। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকুক কিংবা পরিষ্কার থাকুক।

... عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلَالٍ رَمَضَانَ مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا دَلِيلًا: يَصُومُوا فَجَاءَ إِغْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَاتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَمَرَ بِلَالٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا— (ابو داود ج ١ ص ٣٢٠ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان)

অর্থাৎ, ... ইকরামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবীগণ রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সন্দিহান হন। তাঁরা তারাবীর নামায আদায় না করার এবং (পরদিন) রোযা না রাখার ইরাদা করেন। এমতাবস্থায় হুররা নামক স্থান হতে জনৈক বেদুঈন আগমন করে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে আনা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলে, হ্যাঁ এবং আরও সাক্ষ্য দেয় যে, সে নতুন চাঁদ দেখেছে। তিনি বিলালকে নির্দেশ দেন, সে যেন লোকদের জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তারাবীহ নামায আদায় করে এবং পরদিন রোযা রাখে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যদি আকাশ পরিষ্কার না হয় অর্থাৎ কোন মেঘ ধুলোবালি অথবা ধোঁয়া থাকে, তাহলে রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন বিশুদ্ধ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখা যথেষ্ট হবে। কিন্তু আকাশ যদি পরিষ্কার হয়, তাহলে একটি বড় দলের সাক্ষ্য আবশ্যিক হবে।

পক্ষান্তরে, শাওয়াল বা ঈদের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে দু'জন বিশুদ্ধ পুরুষ কিংবা একজন বিশুদ্ধ পুরুষ ও দু'জন বিশুদ্ধ মহিলার সাক্ষ্য প্রদান জরুরী। তবে শর্ত হল সাক্ষীর গুণাবলী তার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। আর আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে এমন একটি বড় দলের সাক্ষ্য আবশ্যিক, যা আধিক্যের কারণে এটা যুক্তিগতভাবে বিশ্বাস করা যায় না যে, এই বিরাট দলটি মিথ্যা বলতে পারে। (درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ١٩٥)

উল্লেখ্য যে, এই দলের সংখ্যা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ ৫০ জনের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হল, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা শরঈভাবে নির্ধারিত নয়। যতটুকু সংখ্যা দ্বারা ইয়াকীন হয়ে যাবে যে সবাই মিলে মিথ্যা বলতে পারে না সে সংখ্যাই যথেষ্ট। ৫০ জন হোক বা এর চেয়ে কম হোক।

(درس ترمذي ج ٢ ص ٥٢٦)

ইমাম আবু হানিফার দলীলঃ

... عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّنْ رَّمْضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلِلِهِ لَا هَلَالَ الْهَلَالِ أَمْسَ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلْفَ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْ يُغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ—

(আবু দাউদ জ ১৮৩৭ বাব শহাদু রজলিন এলী রূযী হলাল শ্বাল)

অর্থাৎ, ... রিবঈ ইবন হিরাশ নবী করীম (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা লোকেরা রমযানের শেষে শাওয়ালের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করেন। তখন দু'জন বেদুঈন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদেরকে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। রাবী খালফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন আগামীকাল ঈদের নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহে গমন করে।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (২) فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ تَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذُنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا— (আবু দাউদ জ ১৮৩৭ বাব ফী শহাদে الواহদ এলী রূযী হলাল রমضان,

ترمذي ج ١ ص ١٤٨ باب في الصوم بالشهادة، نسائي ج ١ ص ٣٠٠، ابن ماجه ص ١٢٠)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি। রাবী হাসান তাঁর হাদীসে বলেন, অর্থাৎ রমযানের চাঁদ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই? সে বলে, হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? সে বলে, হ্যাঁ। তিনি (সাঃ) বিলালকে বলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের জানিয়ে দাও, যেন তারা আগামী দিন রোযা রাখে।

অবশ্য রমযান ও দুই ঈদের নতুন চাঁদ ছাড়া অবশিষ্ট নয় মাসের চাঁদের ব্যাপারে মেঘ থাকুক অথবা উদয়স্থল পরিষ্কার হোক, দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও

দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কারণ এসব মাসের চাঁদ দেখার প্রতি সাধারণত গুরুত্বারোপ করা হয় না। (শামী ১০৭: ১৮)

রেডিও ও টেলিভিশনের খবর দ্বারা রোযা রাখা ও না রাখার বিধানঃ আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি রেডিও বা টেলিভিশন অফিসে এসে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে রেডিও ও টেলিভিশনের খবর পেয়ে রোযা রাখতে হবে। যদি তা সঠিকভাবে প্রচার করা হয়। এই মাসআলাকে حَدِيثُ إِغْرَابِي তথা বেদুঈন হাদীসের উপর কিয়াস করা হয়েছে। কেননা, নবী করীম (সাঃ) জনৈক বেদুঈনের চাঁদ দেখার সংবাদ বিশ্বাস করে হযরত বিলাল (রাঃ)-কে বলেছেন— اَذْنُ فِي النَّاسِ أَنْ يُصُومُوا غَدًا— (ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

আর আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাওয়ালের চাঁদের ক্ষেত্রে রেডিও বা টেলিভিশন অফিসে দু'জন সাক্ষ্য দিতে হবে। জনগণের সম্মুখে দু'জন সাক্ষীর পরিচয় তুলে ধরতে হবে। অন্যথায় প্রচার মাধ্যমের সংবাদ শুনে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। আকাশ পরিষ্কার থাকলে রেডিও ও টিভির সংবাদ গ্রহণীয় হবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, “বাংলাদেশে আল-হেলাল কমিটি আছে এবং তার মধ্যে কতক আলিম-উলামাও আছেন। তাদের লিখিত ঘোষণাটি হুবহু রেডিও ও টিভিতে প্রচার করা উচিত। তাহলে সে সংবাদ গ্রহণ করে বাংলাদেশের সকল মুসলমানের জন্য রোযা, ঈদ করা জরুরী হবে। কিন্তু দুঃখজনক যে, রেডিও-টিভিতে সঠিক নিয়ম মত প্রচার করা হয় না। গোজামিল ধরনের খবর প্রচার হয়। যেমন বলা হয়- বাংলাদেশের আকাশে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেছে। কে দেখলো? চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার খবরটি কাদের সিদ্ধান্ত? এসব বিষয়ের উপর কোনরকম আলোকপাত করা হয় না। হাত-পা বিহীন একটা খবর দায়সারাভাবে শুনিয়ে দেয়া হয় মাত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ গোলমালে ঘোষণা গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে রোযা বা ঈদ করা জরুরী নয়। বরং এরূপ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক এলাকার লোক নিজেদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা, ঈদ করতে পারে।” (ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৪৪)

بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ ص ৩২১

(সাহরীর) খাবার গ্রহণরত অবস্থায় আযান শুনে পোলে

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ—

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন আযান শ্রবণ করে, আর এ সময় তার হাতে খাদ্যের পাত্র থাকে সে যেন তা রেখে না দেয়, যতক্ষণ না সে তদ্বারা স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে নেয়।

বিশ্লেষণঃ উপরোল্লিখিত হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে আবুল আলা মওদুদীসহ কেউ কেউ বলেন যে, ফজর আবির্ভাবের (طُلُوعُ فَجْرٍ) পরে তথা সুবহে সাদিকের পরও খাওয়া-পান করা জায়েয আছে।

* চার ইমামসহ জমহুর উম্মতের মতে, طُلُوعُ فَجْرٍ বা ফজর আবির্ভাবের পরে পানাহার করা জায়েয নয়। ইচ্ছাকৃত খাওয়ার দ্বারা কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়টিই অত্যাবশ্যক হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী-

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থাৎ, তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ রেখা পরিস্কার দেখা যায়। (বাকারঃ ১৮৭)

উপরোল্লিখিত আয়াতে আহার ও পান করার শেষ সীমা طُلُوعُ فَجْرٍ (ফজর উদয়) পর্যন্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া উপরোল্লিখিত হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, ফজর উদয় হওয়া মূলতঃ ইয়াকীনের উপর নির্ভর করে। মুআয্বিনের আযানের উপর নির্ভর করে না। কেননা তার ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মুআয্বিন যদি আযান দিয়েও দেয়, কিন্তু নিজের কাছে যদি ফজর উদয় হয়নি বলে দৃঢ়ভাবে মনে হয়, তাহলে পানাহার বন্ধ করবে না।

ইবনুল মালিক এবং আল্লামা খাত্তাবী বলেন, উক্ত আযানের দ্বারা ফযরের আযান উদ্দেশ্য নয়, বরং তাহাজ্জুদের আযান উদ্দেশ্য। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে-

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُنْ أَحَدَكُمْ أَذَانٌ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّهُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْيَى بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابِقَيْنِ - (ابو داود ج ১ ص ৩২০ باب وقت السحور، بخاري ج ১ ص ২০৭ باب

قول النبي صلعم لا يمنعكم، مسلم ج ১ ص ৩৫০ باب بيان ان الدخول في الصوم الخ، نسائي ج ১ ص ৩০৫
كيف الفجر، ابن ماجة ص ১২৩)

অর্থাৎ, ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে, কেননা সে আযান দেয় অথবা (রাবীর সন্দেহ) আহবান করে তাদের যারা তাহাজ্জুদ নামাযে রত থাকে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিদ্রিত থাকে তাদের জাগাবার জন্য। আর ততক্ষণ ফজর হয় না, যতক্ষণ না এরূপ হয়, এ বলে ইয়াহইয়া তাঁর হাতের তালুকে মুষ্টিবদ্ধ করে প্রসারিত করেন, পরে তাঁর হাতের অঙ্গুলি প্রসারিত করে দেন।

* আবার কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা মাগরিবের আযান উদ্দেশ্য। এবং উদ্দেশ্য হল এই যে, যদি খাদ্যের পাত্র তোমাদের হাতে থাকে অথবা অন্য কোন কাজে মশগুল থাক এবং মাগরিবের আযান হয়ে যায়, তাহলে জলদি ইফতার করে নাও, দেরী করো না। কেননা ইফতারে তাড়াতাড়ি করা সুন্নত। সুতরাং হাদীস দ্বারা ইফতার জলদি করার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। (২০১) (درس مشكوة ج ২ ص ২০১)

যেমন হাদীসে এসেছে-

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لَأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ- (ابو দাউদ জ ১ ص ৩২১) باب ما

يستحب من تعجيل الفطر، ترمذي ج ১ ص ১৫০ باب تعجيل الافطار، ابن ماجة ص ১২৩)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, দীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা জলদি ইফতার করবে। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারারা ইফতার অধিক বিলম্ব করে।

৩২২ : بَابُ فِي الْوَصَالِ ص

... عَنْ بَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ كَهَيْئَتِكُمْ أَنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى-

(البخاري ج ১ ص ২৬৩ باب الوصال، مسلم ج ১ ص ৩৫১ باب النبي عن الوصال، ترمذي ج ১ ص ১৬৩) باب

كراهية الوصال في الصيام)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আপনি তো ক্রমাগত রোযা রেখে থাকেন। তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মত নই। তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে।

সাওমে বিসাল এর পরিচয়ঃ صَوْم শব্দের অর্থ রোযা, আর وَصَالَ শব্দটি فَعَالَ-এর ওয়নে বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে وَاللَّيْحَاتُ তথা مِلْتِجُ الشَّيْئَيْنِ بِلَا انْقِطَاعٍ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে দু'টি বস্তুর পারস্পরিক ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা, মিলন, মেলামেশা, সংসর্গ, সংযোগ, যোগাযোগ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সাওমে বিসালের শাব্দিক অর্থ হল- নিরবচ্ছিন্নভাবে রোযা রাখা।

পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। بِذَلِ الْمَجْهُودِ গ্রহে বলা হয়েছে-

هُوَ تَتَابُعُ الصَّيَامِ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ - (بذل المجهود ج ১১ ص ১৬৩)
অর্থাৎ, দুই বা ততোধিক দিন মাঝখানে রাতে পানাহার না করে একাধারে রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।

২। মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- هُوَ تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ -
অর্থাৎ, রাতে পানাহার না করে লাগাতার রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।
৩। আল্লামা আইনী বলেন-

مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُفْطِرْ لَيْلَتَهُمَا فَهُوَ مُوَاصِلٌ (عمدة القاري ج ১১ ص ৯০)
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুই অথবা ততোধিক দিন রোযা রাখে, রাতে ইফতার করে না, সে সাওমে বিসাল পালনকারী।

৪। فَهَهُ السَّنَةِ-এর পাদটীকায় বলা হয়েছে-

وَصَلُّ الصَّوْمِ مُتَابِعَةً بَعْضُهُ بَعْضًا دُونَ فِطْرِ أَوْ سُحُورٍ - (فهه السنة ج ১ ص ৩৭৭, معارف السنن ج ৬ ص ১৭০)

অর্থাৎ, ইফতার অথবা সেহেরী না খেয়ে এক রোযার সাথে আরেক রোযা মিলানোকে সাওমে বিসাল বলে।

৫। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) বলেন- هُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ لَا فِطْرَ بَيْنَهُمَا -
অর্থাৎ, মাঝখানে কিছু না খেয়ে লাগাতার দুই দিন রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।

* রোযা পালনের ক্ষেত্রে وَصَال (লাগাতার) করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছেঃ

১। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সাওমে বিসাল না রাখাই উত্তম। তবে কেউ যদি রাখে, তাহলে তা জায়েয। (১৭৭৭ ২৮ مَشْكُوهٗ ج ১ ص ১৭৭)

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمُ الْخ (بخاري ج ১ ص ২৭৩)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে করুণাস্বরূপ রোযায় বিসাল করতে নিষেধ করেছেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই নিষেধ স্নেহপরবশ হিসেবে, আবশ্যিক হিসেবে নয়। সুতরাং রোযা রাখা জায়েয। (১৭৭৭ ২৮ مَشْكُوهٗ ج ১ ص ১৭৭)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি মতানুযায়ী সাওমে বিসাল হারাম। মালিকীদের মধ্য হতে ইবন আরাবী এবং আহলে যাহিরও এরই প্রবক্তা। অপর মতানুযায়ী সাওমে বিসাল মাকরুহ। (১৭৭৭ ২৮ مَشْكُوهٗ ج ১ ص ১৭৭)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করীম (সাঃ) উক্ত হাদীসে نَهَى (নিষেধসূচক) ছিগাহ (শব্দরূপ) দ্বারা সাওমে বিসাল নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, (তোমরা ক্রমাগত রাতে না খেয়ে রোযা রাখবে না।) আর নাহীর (نَهَى) উর্ধ্বতম সীমা হচ্ছে হারাম হওয়া এবং নিম্নতম সীমা হচ্ছে মাকরুহ হওয়া।

* ইবন খুযাইমা ও ইবনুল মুনযির (রহ.) শেষ রাত পর্যন্ত وَصَال জায়েয বলেছেন।

... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ الْخ (ابو داود ج ১ ص ৩২২ باب في الوصال، بخاري ج ১ ص ২৭৩)

অর্থাৎ, ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ক্রমাগত না খেয়ে রোযা রাখবে না। অবশ্য তোমাদের কেউ যদি ক্রমাগত রোযা রাখতে চায়, সে যেন সাহরী পর্যন্ত এরূপ করে।

* কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি সাওমে বিসালের ক্ষমতা রাখে তার জন্য এটা জায়েয। নতুবা হারাম। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ এবং মালিকীদের মধ্য থেকে ইমাম ওয়াযযাহ (রহ.)-এরই প্রবক্তা। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকেও এ মাহযাবটি বর্ণিত আছে।

(العمدة ج ১ ص ৭১-৭২، الفتح للحافظ ج ৪ ص ১৭৭-১৭৮، المغني ج ৩ ص ১৭১-১৭২)

* ইমাম আবু হানিফা ও জমহুর উলামা বলেন, সাওমে বিসাল জায়েয নয়, বরং মাকরুহ। কারণ এটা শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাস হতে পারে, অন্য কারো জন্য নয়। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতেও উল্লেখ আছে যে, সাওমে বিসাল মাকরুহ।

(فتاوى عالمگیری ج ١ ص ٢٠١، بدائع الصنائع ج ٢ ص ٧٩)

দলীল (১): ইবন উমর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَصَالِ ...

(পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।) উক্ত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় সাওমে বিসাল নিষেধ করা হয়েছে। আর *نَهَى* দ্বারা মাকরুহ প্রমাণিত হয়। (درس مشکوٰۃ ج ٢ ص ١٩٩)

... عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (২) :

إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهْنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهْنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ - (ابو داود ج ١

ص ٣٢١ باب وقت فطر الصائم، بخاري ج ١ ص ٢٦٢ باب متى يحل فطر الصائم)

অর্থাৎ, ... আসিম ইবন উমর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন পূর্বাকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হয়, তখন যেন রোযাদার ইফতার করে।

উক্ত হাদীসে রোযাদারের ইফতারের সময় হিসেবে রাতকে (সন্ধ্যা) নির্ধারিত করা হয়েছে। আর সাওমে বিসালের অবস্থায় রাত্রেও রোযা রাখতে হবে। যা হাদীসের বিপরীত আমল।

দলীল (৩): আল্লাহ তাআলার বাণী- لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا -

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না। (বাকারঃ ২৮৬)

জবাবঃ হযরত ইমাম আহমদ (রহ.) দলীল হিসেবে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর যে হাদীস পেশ করেছেন, এর উত্তরে আহনাফগণ বলেন যে, উক্ত হাদীস আমাদের বিপরীত নয়, বরং আমাদের সমর্থক। কেননা, নবী (সাঃ) উম্মতের রহমত ও কল্যাণের জন্যই তা নিষেধ করেছেন।

* শাফেঈ (রহ.) হাদীস দ্বারা সাওমে বিসালকে যে হারাম সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন এর জবাবে হানাফীগণ বলেন-

“আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাওমে বিসাল নিষেধ করেছেন। ... অতঃপর তারা যখন সওমে বিসাল থেকে ক্ষান্ত হল না, তখন তাদের সাথে তিনি একদিন সওমে বিসাল করলেন। পরের দিন আবার বিসাল করলেন। অতঃপর লোকজন (প্রথম তারিখের) চাঁদ দেখল। ফলে নবী করীম (সাঃ) বললেন, যদি চাঁদ

আরো দেরিতে উঠত, তাহলে (তোমাদের সাথে রোযা) আমি আরো বেশি রাখতাম, যেন তারা বিরত হতে না চাওয়ার কারণে তাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ হয়।”

(بخاري ج ١ ص ٢٦٣ باب التكميل لمن اكثر الوصال)

আল্লাহা হাফিয় (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) নিষেধাজ্ঞার পরেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে বিসাল করেছেন। অতএব, যদি নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য হতো, তবে তাঁদেরকে এ কাজের উপর স্থির রাখতেন না। (فتح الباري ج ٤ ص ١٧٧)

* “إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقِي” (নিশ্চয়ই আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে)-এর মর্মার্থঃ মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ উক্তিটির ব্যাখ্যা নিয়ে অসংখ্য অভিমতগুলো পেশ করেছেন-

(১) গ্রন্থকার বলেন, রাসূল (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা রাত্রিকালে অদৃশ্য উপায়ে পানাহার করিয়ে থাকেন, কিন্তু এর স্বরূপ আমাদের অজানা।

(২) আল্লাহ তাআলা তাঁকে স্বপ্নে পানাহার করাতেন, এতেই তিনি শক্তি পেতেন।

(৩) তাঁর পানাহারের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কারণ, তাঁদের উভয়ের মাঝে যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে, তা অন্যের ক্ষেত্রে নেই। তাই এটা রাসূল (সাঃ)-এর জন্য খাস।

(৪) তাঁকে পানাহারের পরিবর্তে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি দান করতেন, যাতে তাঁর এ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়ে যেত।

(৫) এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর মহত্ত্বের সুরণ তাঁকে পানাহার হতে নিবৃত্ত রাখে।

(৬) ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এর স্বরূপ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। (المغني ج ٣ ص ١٧١)

(৭) হাফিয় ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) উক্ত উক্তি দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আমার এবং আল্লাহ তাআলার ইশক ও মহব্বত এমন পর্যায়ে যে, তাঁর মহত্ত্ব ও নূরের দর্শন হাসিল হয়। যার ফলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এটা আমার রুহানী খাবার।

(৮) বাস্তবেই তাকে জাহ্নাত থেকে খাবার দেয়া হত, যার ফলে তাঁর ক্ষুধা এবং পিপাসা লাগত না। (درس مشكوة ج ٢ ص ١٩٩)

بَابُ السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ ص ৩২২

রোযাদার ব্যক্তির মিসওয়াক করা

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ— (بخاري ج ১ ص ২০৭ باب السواك الرطب الخ، ترمذي ج ১ ص ১০৫ باب السواك للصائم)

অনুবাদঃ ... আবদুল্লাহ ইবন আমের ইবন রাবীআ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে রোযা রাখা অবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি।

বিশ্লেষণঃ মিসওয়াক করা সুন্নাত। কিন্তু রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয কিনা, কিংবা কোন্ সময় মিসওয়াক করা উত্তম- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে মোট ৭টি মত আছে-

১। ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, রোযা রেখে দুপুরের আগে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। কিন্তু দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরুহ। মিসওয়াক শুকনা হোক অথবা কাঁচা হোক। (عمدة للعيني ج ১১ ص ১৫)

দলীলঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ— (بخاري ج ১ ص ২০৫ باب فضل الصوم، مسلم ج ১ ص ৩৬৩ باب فضل الصيام، ترمذي ج ১ ص ১০৭ باب فضل الصوم، نسائي ج ১ ص ৩০৭ فضل الصيام، ابن ماجه ص ১১৭)

অর্থাৎ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়ে সুগন্ধময়।

তাঁরা বলেন যে, রোযাদারের পেট খালি হবার কারণে মুখে দুর্গন্ধ আসে। আর ঐ গন্ধ দুপুরের পরে শুরু হয়। মিসওয়াক করলে আল্লাহর প্রিয় ঐ গন্ধ দূর হয়ে যায়। তাই দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরুহ।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও কতিপয় আলিম বলেন- আসরের পর মিসওয়াক করা মাকরুহ।

দলীলঃ “রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়ে বেশি প্রিয়।” এ হাদীস তাঁদেরও দলীল। তাঁর বলেন মুখের গন্ধ আসে আসরের পর।

(عمدة الفاري ج ১১ ص ১৫)

৩। ইমাম মালিক, শাযী, যিয়াদ ও আবু মায়সারা-এর মতে, রোযা রাখা অবস্থায় কাঁচা কলু দিয়ে মিসওয়াক করা মাকরুহ। তবে শুকনো কলু দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে।

দলীলঃ (ক) রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট প্রিয়। কাঁচা বস্ত্র ঐ গন্ধ দ্রুত দূর করে দেয়।

(খ) কাঁচা বস্ত্রের রস পেটে যেতে পারে, পেটে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

৪। কতিপয় মনীষী বলেন, ফরয রোযার ক্ষেত্রে দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরুহ। আর নফলের ক্ষেত্রে মাকরুহ নয়।

দলীলঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মুখের গন্ধ সংগ্রহস্থ হাদীস। তারা ঐ হাদীস ফরয রোযার সাথে সীমাবদ্ধ করেন।

৫। ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন, রোযার দিনে কাঁচা বস্ত্র দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে না। আর দুপুরের পর শুকনো বস্ত্র দিয়েও মিসওয়াক করা যাবে না।

দলীলঃ (ক) কাঁচা বস্ত্রের রস পেটে যেতে পারে।

(খ) দুপুরের পর মুখে গন্ধ হয়। তাই দুপুরের পর মিসওয়াকই করা যাবে না।

৬। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন- পানি দ্বারা সিক্ত কোন বস্ত্র দিয়ে মিসওয়াক করা যাবে না।

দলীলঃ পানি দ্বারা সিক্ত বস্ত্র দিয়ে মিসওয়াক করলে অকারণে মুখে পানি প্রবেশ করানো হয়। আর রোযার সময় বিনা কারণে মুখে পানি প্রবেশ করানো নিষেধ।

৭। আলী (রাঃ), ইবন উমর (রাঃ), ইমাম আবু হানিফা, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবন সীরীন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম আওয়াঈ (রহ.)-সহ জমহুর উলামাদের মতে, রোযাদারের জন্য মিসওয়াক করা জায়েয। সকালে, দুপুরে বা বিকেলে হোক, সব সময়ই মিসওয়াক করা জায়েয। ভেজা অথবা শুকনো মিসওয়াক হোক, কোন ক্ষতি নেই। (عمدة القاري ج ١١ ص ١٤)

দলীল (১)ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমের (রাঃ)-এর হাদীস।

... رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

দলীল (২)ঃ আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস-

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْخِلَالِ خِلَالُ الصَّائِمِ بِالسَّوَاكِ

অর্থাৎ, মিসওয়াক করাই রোযাদারের সর্বোত্তম খিলাল।

উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সতর্কতার সাথে রমযানের দিন রোযাদারের মিসওয়াক করা কোন দৃশ্যীয় কাজ নয়, বরং সুন্নত ও সওয়াবের বিষয়।

জবাবঃ উপরোল্লিখিত অধিকাংশ মতেই দেখা যায় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মুখের গন্ধ সংক্রান্ত হাদীসকে দলীল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর কারণ হল, মিসওয়াক করলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, যা হাদীসের উদ্দেশ্যের খেলাফ। এর জবাবে আহনাফগণ বলেন, বাস্তবতা হল, হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই দুর্গন্ধ বাকি রাখার ও তা সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। এখানে মুখের ঐ দুর্গন্ধের কথা বলা হয়েছে, যা পানাহার না করার কারণে আঁত থেকে সৃষ্টি হয়। মিসওয়াক করলেও এই দুর্গন্ধ দূর হবে না। আর স্বাভাবিকভাবে মুখে যে গন্ধ হয় তা দূর করার জন্য মিসওয়াক করতে হয়। (ফাযায়েলে আমল, রোযা অধ্যায়)

২। অথবা, মিসওয়াক করা স্বতন্ত্রভাবে একটি সুন্নাত। এখানে **حُلُوفُ النِّم** তথা মুখের গন্ধের সাথে মিসওয়াকের কোন সম্পর্ক নেই। তাই রাসূল (সাঃ) রমযান মাসে মিসওয়াকের অনুমতি দিয়েছেন। আর সূর্য ঢলার পর মিসওয়াক করা মাকরুহ, এ জাতীয় কথা শুধু ব্যক্তিগত অভিমত। সহীহ হাদীস দ্বারা এর কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আল্লামা নববী (রহ.) বলেন-

”وَلَمْ يَدُلْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى كَرَاهَتِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ“ (معارف السنن ج ٦ ص ٧٧)

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ص ٣٢٢

রোযাদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো

... عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْخ

(ترمذي ج ١ ص ١٦٠ باب كراهية الحجامه للصائم، ابن ماجة)

অনুবাদঃ ... সাওবান (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যার উপর লাগায় তাদের উভয়ের রোযা ভঙ্গ হয়।

বিশ্লেষণঃ রোযাদার শিংগা লাগালে রোযা ভেঙ্গে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে, শিংগা লাগালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এতে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

* আতা (রহ.) বলেন, রমযান মাসে শিংগা লাগালে কাযা এবং কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে। (المختصر للمندري ج ٣ ص ٢٤٢)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* ইমাম আওযাঈ, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবন সীরীন এবং মাসরুক (রহ.)-এর মতে, শিংগা লাগানো মাকরুহ, তবে এতে রোযা ভঙ্গ হয় না।

(المختصر للمندري ج ٣ ص ٢٤٢، عمدة القاري ج ١١ ص ٣٩)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিঈ ও জমহুর আলিমগণ বলেন, রমযানে শিংগা লাগানো বৈধ। শিংগা লাগালে রোযা ভঙ্গ হবে না। এ কাজটি মাকরুহও নয়।

(عيني ج ١١ ص ٣٩)

[তবে ইমাম মালিক, শাফিঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে একটি মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো মাকরুহ।]

(بداية المجتهد ج ١ ص ٢١٢، اوجز المسالك ج ٣ ص ٤٥)

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ (১) দলীল

صَائِمٌ— (ابو داود ج ١ ص ٣٢٣ باب في الرخصة، بخاري ج ١ ص ٢٦٠ باب الحجامه الخ، ترمذي ج ١ ص ١٦٢ باب الرخصة في ذلك، ابن ماجه ص ٢٢٩/١٢٢)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা থাকা অবস্থায় (স্বীয় দেহে) শিংগা লাগিয়েছেন।

... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ (২) দলীল
صَائِمٌ مُحْرِمٌ—

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহরামের মধ্যে রোযা থাকাবস্থায় শিংগা লাগান। (সূত্রঃ ঐ)

... عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنْ احْتَلَمَ وَلَا مَنْ احْتَجَمَ— (ابو داود باب ج ١ ص ٣٢٣ باب في الصائم يحتمل نهرا في رمضان)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী* হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বমি করে (অনিচ্ছাকৃত), যার স্বপ্নদোষ হয় এবং যে শিংগা লাগায়, তার রোযা ভঙ্গ হয় না।

* عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم عن ابيه

(আবু দাউদ, পাদটীকা) عن عطاء عن ابي سعيد الخدري

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোযা অবস্থায় শিংগা লাগালে রোযা নষ্ট হবে না।

জবাবঃ “أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ”-এর জবাব দিতে গিয়ে আহনাফগণ বলেন,

(১) أَفْطَرَ-এর অর্থ হচ্ছে “كَادَ أَنْ يُفْطِرَ” অর্থাৎ এই আমল রোযাদারকে রোযা ভঙ্গের নিকটবর্তী করে দেয়। حَاجِمُ (শিংগা লাগানো ব্যক্তি)-কে এজন্য বলা হয়েছে যে, সে রক্ত চুষার কারণে তার কণ্ঠনালীতে রক্ত ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর مَحْجُومُ (যার উপর শিংগা লাগানো হয়)-কে এজন্য বলা হয়েছে যে, সে শিংগা লাগানোর দরুণ খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে।

(عمدة القاري ج ١١ ص ٣٩، معارف السنن ج ٦ ص ١٦٤)

যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ مَا كُنَّا نَدْعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهَةً الْجُهْدِ - (ابو داود

ج ١ ص ٣٢٣ باب في الرخصة، بخاري ج ١ ص ٢٦٠)

অর্থাৎ, সাবিত (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ) বলেছেন, রোযাদার ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যাবে বিবেচনা করে আমরা তাকে শিংগা লাগাতে দিতাম না।

(২) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী, “أَفْطَرَ الْحَاجِمُ”

“وَالْمَحْجُومُ” একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। একদা নবী করীম (সাঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে দু’জন রোযাদার ব্যক্তিকে দেখতে পান, যারা শিংগা লাগানো অবস্থায় কারো গীবত করছে। তখন নবী করীম (সাঃ) উক্ত দু’ব্যক্তির ব্যাপারে বললেন যে, তাদের উভয়ের রোযা ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং এখানে افطار (রোযা ভঙ্গের) দ্বারা প্রকৃত রোযা ভঙ্গ নয়, বরং গীবতের কারণে রোযার সওয়াব বিলুপ্তি বুঝানো হয়েছে। (طحاوي ج ١ ص ٢٩٥-٢٩٦)

(৩) ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা সাওবান ও শাদ্দাদের হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা, সাওবান ও শাদ্দাদ ইবন আওস (রাঃ)-এর হাদীসসমূহ মক্কা বিজয়কালীন। আর ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস মহানবী (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জকালীন। (كتاب الأم ج ٢ ص ١٠٨، أو جز المسالك ج ٣ ص ٤٦)

(৪) أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ মূলতঃ এটি একটি পরামর্শ। যেন রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো না হয়। কারণ, এর ফলে মানুষের মধ্যে নেহায়েত দুর্বলতা এসে যায়,

রোযাতে স্বতঃস্ফূর্ততা অবশিষ্ট থাকে না। (درس ترمذي ج ۲ ص ۱۱۶) এটা ঠিক তেমনই, যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে-

... عَنْ أَبِي ذَرٍّ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ- (مسلم ج ۱ ص ۱۹۷ كتاب الصلوة ، باب ستره المصلى الخ)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত। ... নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মহিলা, গাধা ও কুকুর নামায ভেঙ্গে দেয়।

অথচ এগুলো নামাযের সামনে দিয়ে গেলে নামায ভাঙবে না। তবে এমনটি যেন না হয়, সে পরামর্শই উক্ত হাদীসে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাখ্যার সমর্থন সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতেও পাওয়া যায়।

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ- (بخاري ج ۱ ص ۶۱۰)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিঙ্গা লাগানো মাকরুহ মনে করেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। শুধুমাত্র দুর্বলতার কারণেই আমরা তা মনে করি।

পরিশেষে বলা যায়, রোযা রেখে শিঙ্গা লাগানো জায়েয। এতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না এবং সওয়াবেরও কোন কমতি হবে না। কিন্তু তাকওয়াবশতঃ কেউ যদি শিঙ্গা না লাগায় তাহলে ভিন্ন কথা।

রোযা অবহ্য় ইনজেকশন নেয়ার হুকুমঃ রোযাদার ব্যক্তি ইনজেকশন নিতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইমামদের মধ্যে এক জটিল ও দীর্ঘ এখতেলাফ রয়েছে।

তবে জমহুর উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল-

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি বের করেছেন যে, রোযা অবহ্য় পেটে বা মস্তিষ্কে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ কান, নাক, গলা বা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ইচ্ছাপূর্বক কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এটাই শরীয়তের বিধান। ইনজেকশন দ্বারা যেহেতু স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পেটে বা মস্তিষ্কে কিছু পৌঁছে না। সুতরাং, এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। আর শুধু শরীরে কোন কিছু প্রবেশ করলে বা করালেই রোযা ভঙ্গ হয় না। যেমন, অযু বা গোসল করলে, শরীরে তৈল মালিশ করলে, অথবা কুলি করলে পানি ও তৈল শরীরের লোমকূপ দিয়ে কিছু কিছু ভিতরে প্রবেশ করে। যার ফলে গরমের সময় গোসল করলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অনেক সময় ক্ষুধাও নিবারণ হয়ে যায়। এমনকি নবী করীম (সাঃ) নিজেও অধিক গরমের সময় রোযা অবহ্য় শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য ভিজা কাপড় মাথায় দিয়ে রেখেছেন।

মাথার শিরার সাথে যেহেতু শরীরের সমস্ত শিরার সম্পর্ক রয়েছে, তাই মাথা ঠান্ডা হওয়ার কারণে সমস্ত শরীরও ঠান্ডা হয়ে যায়। কিন্তু এগুলো যেহেতু মস্তিষ্কে বা পেটে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পৌঁছে না, তাই এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।

(آلات جديدة ص ١٥٣-١٥٧، بدائع الصنائع ج ٢ ص ٩٣، شامي ج ٢ ص ١٠٣)

بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِي عَامِدًا ص ٣٢٤

রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْئٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ - (ترمذي ج ١ ص ١٥٣ باب من استقاء عمداً، ابن

ماجة ص ١٢٢)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রোযা থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তার জন্য রোযা আদায় করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে সে যেন কাযা করে।

বিশ্লেষণঃ চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এলে রোযা ভঙ্গ হয় না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে রোযা ভঙ্গ হবে।

(معارف السنن ج ٦ ص ٦٤)

দলীলঃ উপরোল্লিখিত হাদীস।

* তবে হানাফীদের মতে, এখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। আল্লামা ইবন নুজাইম (রহ.) বমির বারটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

বমি হয়ত নিজে নিজে আসবে অথবা ইচ্ছাকৃত বমি করা হবে। উভয় অবস্থায় মুখ ভর্তি বমি হবে বা হবে না। অতঃপর এগুলো থেকে প্রত্যেকটির অবস্থায় হয়ত বমি বের হবে, কিংবা নিজে নিজে ভিতরে চলে যাবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে নেয়া হবে। এই মোট বারটি অবস্থা হল। এই অবস্থাগুলোর মধ্যে শুধু দুই অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে-

১. মুখ ভর্তি বমি হলে এবং রোযাদার বমির অংশ ইচ্ছাকৃত পেটে নিলে।

২. ইচ্ছাকৃত মুখ ভর্তি বমি করলে।

অন্য কোন অবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না। (البحر الرائق ج ٢ ص ٢٧٤)

৩২৪ : بَابُ الْقَبْلَةِ لِلصَّائِمِ : রোযাদার ব্যক্তির চুশন করা

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا

صَائِمَةٌ - (بخاري ج ١ ص ٢٥٨ باب القبلة للصائم، مسلم ج ١ ص ٣٥٢ باب بيان ان القبلة في الصوم الخ،

ترمذي ج ١ ص ١٥٤ باب القبلة للصائم، ابن ماجه ص ١٢٢)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযাবস্থায় আমাকে চুশন করতেন এবং আমিও রোযাবস্থায় থাকতাম।

বিশ্লেষণঃ রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রীকে চুশন করার ক্ষেত্রে ফুকাহাদের পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়ঃ

১। ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল, রোযাদার ব্যক্তির স্ত্রীকে চুশন করা নিঃশর্তে (مطلقاً) মাকরুহ।

২। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে নিঃশর্তে জায়েয।

৩। কেউ কেউ বলেন, নফল রোযায় চুশন করা জায়েয এবং ফরয রোযায় নিষেধ।

৪। কতক তাবিস্গণের মতে, রোযায় চুশন করা নিঃশর্তে নিষেধ।

৫। ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম আওযাঈ (রহ.)-এর মতে, রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রীকে চুশন করা দূষণীয় নয়, জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, রোযাদার ব্যক্তিকে নিজের নফসের উপর অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতে হবে, চুশন যাতে সঙ্গম পর্যায়ে না পৌঁছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইমাম খাতাবী (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতও তাই।

(معارف السنن ج ٦ ص ٨٠، عمدة القاري ج ١١ ص ٩)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২)ঃ ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ وَهُوَ

صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِأَرْبِهِ - (ابو داود ج ١ ص ٣٢٤، بخاري ج ١

ص ২৫৮ باب المباشرة للصائم، مسلم ج ১ ص ৩৫২، ترمذي ج ১ ص ১৫৪ باب مباشرة الصائم، ابن ماجه

(১২২)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা থাকাবস্থায় তাঁকে চুশন করতেন এবং তিনি রোযাবস্থায় তাঁর সাথে সহাবস্থান করতেন। তবে তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী।

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ (৩) দলীল
الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَحَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرَ فَنَهَاةً فَإِذَا الَّذِي رَحَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي
نَهَاةً شَابٌ— (ابو داود ج ১ ص ৩২৪ باب كراهة للشاب، ابن ماجه ص ১২২)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম
(সাঃ)-এর নিকট রোযা থাকাবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
করলে, তিনি তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে
অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে নিষেধ করেন। আর ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে
অনুমতি প্রদান করেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক।

... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبِلْتُ وَأَنَا
صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبِلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ
مَضْمَضْتُ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ
لَا بَأْسَ قَالَ فَهَ— (ابو داود ج ১ ص ৩২৪ باب القبله للصائم)

অর্থাৎ, ... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উমর ইবনুল
খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদা রোযা থাকাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুটি
করাকালে তাকে চুম্বন করি। এরপর আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমি একটি
গুরুতর কাজ করে ফেলেছি, রোযাবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তিনি
বলেন, তুমি কি রোযা থাকা অবস্থায় পানি দ্বারা কুলি কর না? ঈসা ইবন হাম্মাদ
তার হাদীসে বলেন, আমি বলি এতে তো কোন দোষ নেই।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুম্বন করলে সহবাসে লিপ্ত
হবে না, এমন ব্যক্তির জন্য চুম্বন করা জায়েয। তবে যে রোযাকে নিরাপদ রাখতে
চায় সে চুম্বন থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ص ৩২৪

রমযান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

... عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَدْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ فِي
رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ— (بخاري ج ১ ص ২০৮ باب الصائم يصح جنباً، مسلم

ج ١ ص ٣٥٤ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، ترمذي ج ١ ص ١٦٣ باب الجنب يدركه الفجر الخ

অনুবাদঃ ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যেত। রাবী আবদুল্লাহ আল-আযরামী তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, রমযানের মাসে রাতে স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে তিনি সকালে নাপাক অবস্থায় থেকে রোযা রাখতেন।

বিশ্লেষণঃ রোযার দিনে নাপাকী অবস্থায় ভোর হলে রোযা সহীহ হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা আঈনী (রহ.) এ ব্যাপারে সাতটি অভিমত উল্লেখ করেছেন-

(১) হযরত আবু হুরায়রা, ফযল ইবন আক্বাস ও উসামা ইবন যায়েদ (রাঃ)-এর মতে, “لَا يَصِحُّ صَوْمٌ مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا” অর্থাৎ, “নাপাকী অবস্থায় প্রভাত করলে তার রোযা সহীহ হবে না।” অবশ্য হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) অবশেষে এ মত পরিত্যাগ করেছেন।

(২) তাউস ও উরওয়াহ (রহ.)-এর মতে, যদি ইচ্ছে করে গোসল করতে দেরি করে তাহলে রোযা সহীহ হবে না। আর অজ্ঞতাবশতঃ গোসল করতে বিলম্ব করলে রোযা শুদ্ধ হবে।

(৩) ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে ফরয রোযা সহীহ হবে না। কিন্তু নফল রোযা সহীহ হবে।

(৪) ইবন হাযম (রহ.) বলেন, নিদ্রা থেকে উঠার পর সূর্যোদয়ের আগে গোসল করে নামায পড়তে পারলে রোযা সহীহ হবে। যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করে নামায পড়তে না পারে, তবে রোযা বাতিল হয়ে যাবে।

(৫) হাসান ইবন সালেহ (রহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায় ফরয রোযা কাযা করা মুস্তাহাব।

(৬) সালিম ইবন আবদুল্লাহ, হাসান বসরী ও আতা ইবন আবী রাবাহ (রহ.)-এর মতে, “عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَيَقْضِي” অর্থাৎ, রোযা অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরে এর কাযা করতে হবে।

দলীলঃ উপরোল্লিখিত ফকীহগণ দলীল হিসেবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উক্তি পেশ করেন- (طحاوي) مَنْ أَصْبَحَ جُنْبًا وَيُرِيدُ الصَّوْمَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ بَلْ يُفْطِرُ

অর্থাৎ, যে নাপাক ব্যক্তির উপর ফজরের সময় হয়ে যায় অথচ সে রোযা রাখতে চায় সে যেন রোযা না রেখে ইফতার করে।

(৭) জমহুর সাহাবা (রাঃ), ফুকাহা এবং চার ইমাম-এর মতে, এমন ব্যক্তির রোযা বিনা শর্তে জায়েয। ফরয রোযা হোক বা নফল রোযা হোক। ফজর আবির্ভাবের পর তাড়াতাড়ি গোসল করুক অথবা দেরিতে। দেরি ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে অথবা ঘুমের কারণে হোক, সর্বাবস্থায় তার রোযা সহীহ হবে। (العدة للعيني ج ১১ ص ৭৬)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَالَّذِينَ بَشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيُّضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ-

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (বাকারাঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাপাক ব্যক্তি যদি ফজর আবির্ভাবের (طُلُوعِ فَجْرِ) পর গোসল করে তাহলে তার রোযা সহীহ হয়ে যাবে, কেননা উক্ত আয়াতে পানাহার এবং সহবাস করার অনুমতি فَجْرٍ طُلُوعٍ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি একেবারে রাত্রের শেষভাগে স্ত্রী সহবাস করবে, তাকে তো স্বাভাবিকভাবেই সুবেহ সাদিকের পর গোসল করতে হবে। অতএব যদি রোযার কোন ক্ষতি হত তাহলে এর পূর্বেই এ সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার হুকুম দেয়া হত।

দলীল (২): হযরত আয়িশা ও উম্মে সালামা (রাঃ)-এর হাদীস-

جُنُبًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّعَ يُصْبِحُ جُنُبًا (পূর্ণ হাদীসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে।)

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَقِفَ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّيَّامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّيَّامَ فَاعْتَسِلْ وَأَصُومْ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُم بِمَا اتَّبِعَ-

(ابو داود ج ১ ص ৩২৬)

অর্থাৎ, ... নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জৈনিক ব্যক্তি দরজায় দণ্ডায়মান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়ে যায় এবং আমি রোযা রাখার ইচ্ছা করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমারও নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যায় এবং রোযা রাখার ইচ্ছা করি। আর আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি। সে ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো আমাদের মত নন, আল্লাহ তাআলা তো আপনার জীবনের পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাগান্বিত হন এবং বলেন, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের চাইতে অধিক আল্লাহভীরু ও তাঁর অধিক বন্দেগী করতে সংকল্প রাখি।

সুতরাং উপরোল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাপাক অবস্থায় ভোর হলে রোযা সহীহ হবে।

জবাবঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যে দলীল পেশ করা হয়েছে, এর জবাবে চার ইমাম বলেন যে, ইহা ঐ যুগে ছিল, যখন রাতে শোয়ার পর পানাহার এবং সহবাস করা নিষেধ ছিল। অতঃপর পবিত্র কুরআনের **كُلُوا وَاشْرَبُوا** অর্থাৎ “তোমারা খাও এবং পান কর।” আয়াতের দ্বারা এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন প্রভাতের পর নাপাকী থাকার অনুমতি রয়েছে। তবে একথা সত্য যে, সুবেহ সাদিকের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যাওয়া অধিক উত্তম।

* কেউ কেউ জবাব দেন যে, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ফজর উদয়ের পরেও সহবাসে লিপ্ত থাকে। আর একথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, এমন ব্যক্তির রোযা সহীহ হবে না, যে সুবেহ সাদিকের পরেও সহবাসে লিপ্ত থাকে।

* প্রথম দিকে যদিও এ ব্যাপারে ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে চার মাযহাবের প্রদত্ত মতের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা নববী (রহ.) ও ইমাম দাকীকুল ইদ তাই বলেন। (شرح نبوي على مسلم ج ١ ص ٣٥٤، معارف السنن ج ٦ ص ١٧٩-١٨٠)

كَفَّارَةٌ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ص ٣٢٥

যে ব্যক্তি রমযানের দিনে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার কাফফারা

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا

অর্থাৎ, ... উম্মে হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি (রাবী) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে বিজয়ের পর ফাতিমা (রাঃ) আগমন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বামদিকে উপবেশন করেন এবং উম্মে হানী (রাঃ) বসেন ডান দিকে। তিনি (রাবী) বলেন, এ সময় জনৈকা দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেশ করলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি এর অবশিষ্ট অংশ উম্মে হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো ইফতার করলাম, কিন্তু আমি যে রোযা ছিলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন কাযা রোযা আদায় করছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, যদি তা নফল রোযা হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি হবে না।

* ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর অভিমতও ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত। তবে তিনি বলেন, নফল রোযার নিয়ত দ্বিপ্রহরের পূর্বে করতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবরাহীম নাখঈ (রহ.)-এর মতে, রমযানের রোযা নির্দিষ্ট মাস্নতের রোযা এবং নফল রোযার নিয়ত দ্বিপ্রহরের পূর্বে করলেই চলবে। সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা জরুরী নয়। (যদিও রাতেই নিয়ত করা উত্তম) হাঁ, রমযানের কাযা রোযা, কাফফারা ও সাধারণ মাস্নতের রোযার ক্ষেত্রে ফযরের পূর্বেই নিয়ত করা ওয়াজিব।

(معارف للهنود ج ٦ ص ٨٢-٨٣ ، المغني ج ٣ ص ٩١)

দলীল (১): عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ يَكُونَ فِي الْيَوْمِ عَاشُورَاءَ (ابو داود ج ১ ص ৩৩২ باب في فضل صومه، بخاري ج ১ ص ২৬৮-২৬৯)

২৬৯ باب صيام يوم عاشوراء، مسلم ج ১ ص ২৫৯ باب صوم عاشوراء، نسائي ج ১ ص ৩১৭) অর্থাৎ, সালামা ইবন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দাও, যে খানা খেয়েছে সে যেন দিনের অবশিষ্ট অংশে রোযা রাখে। আর যে খায়নি সে যেন রোযা রাখে। কারণ, এ দিনটি হল আশুরা দিবস।

উক্ত হাদীসে ফরয রোযার নিয়ত দিনে করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

(উল্লেখ্য যে, এটি ঐ সময়ের ঘটনা যখন আশুরার রোযা ফরয ছিল।)

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী-

তারা বলেন, পানাহার সহবাসের মত, এমন কিয়াস করা যাবে না। তাই তাঁরা বলেন- (الهداية ج ১ ص ২১৭) - **فَتَنْحَصِرُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ إِلَى غَيْرِهِ** - অর্থাৎ, কাফফারা সহবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য দিকে (পানাহার) অতিক্রম করবে না।

দলীল (২): যদি কেউ ইচ্ছা করে পানাহার করে, তাহলে এর জন্য সে তওবা করবে। হাদীসে এসেছে- **"لَلثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ"** -

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে তওবাকারী এমন, যেন তার কোন গোনাহই না।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক, ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে, কাফফারা কেবল সহবাসের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং ইচ্ছাকৃত পানাহারকারীর উপরেও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

(حاشية الكوكب ج ১ ص ২৫৩, الأوجز ج ৩ ص ৩০৫)

দলীল (১): **... جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ رَقَبَةً الْخ** (دارقطني ج ২ ص ২০৭)

অর্থাৎ, ... এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, রমযান মাসের কোন একদিন আমি ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙ্গেছি। তা শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি একটি গোলাম আযাদ কর।

দলীল (২): **... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ**

مِسْكِينًا الْخ (ابو داود ج ১ ص ৩২০, بخاري ج ১ ص ১০৭, مسلم ج ১ ص ৩০০)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রমযানের মধ্যে রোযা ভঙ্গ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দাস-দাসী আযাদ করতে, অথবা ক্রমাগত দুইমাস রোযা রাখতে বা ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে নির্দেশ দেন।

দলীল (৩): **عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ** -

অর্থাৎ, হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই কাফফারা আদায় করতে হবে, পানাহার এবং সহবাসের কারণে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সহবাসের কারণে যেমন কাফফারা ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ পানাহারের দ্বারাও তা ওয়াজিব হবে।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ ও আহমদের দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-

(১) পানাহারের ক্ষেত্রে কাফফারার হুকুম আমরা কিয়াসের দ্বারা প্রমাণ করি না; বরং অনুচ্ছেদের হাদীসের **دَلَالَةُ النَّصِّ*** দ্বারা প্রমাণ করি। কেননা, অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীসে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হল রোযা ভঙ্গ করা। পানাহারের দ্বারা হোক অথবা সহবাসের কারণে হোক। সুতরাং ইহা কিয়াস নয়;

বরং **دَلَالَةُ النَّصِّ** (فتح القدیر ২ ج ص ৭১)

(২) কাফফারা কিয়াসের পরিপন্থী নয় বরং কিয়াসের অনুকূল। কেননা, অন্যায়ের দণ্ড বিধান বিবেকসম্মত।

(৩) দ্বিতীয় দলীলের জবাবে বলা যায়, কাফফারা এবং শরঈ সাজা তওবা দ্বারা ক্ষমা হয় না।

সাওমের কাফফারার পরিমাণঃ

রোযার কাফফারার পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ ও মালিকের মতে, প্রত্যেক মিসকীনকে **رُبْعُ صَاعٍ** তথা এক সা'-এর চারভাগের একভাগ দিতে হবে। এ হিসেবে ৬০ জন মিসকীনকে মোট ১৫ সা' দিতে হবে। যার বর্তমান ওজন এক মণ সাড়ে বার সের গম।

দলীলঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস-

... فَاتِيَّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدَرُ خُمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا ... (ابو داود ج ১ ص ৩২০ باب كفارة من اتى اهله في رمضان)

অর্থাৎ, অতঃপর তাকে এমন একটি খুরমা ভর্তি থলে প্রদান করা হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ খেজুর ছিল।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সাওমের কাফফারার পরিমাণ হল, **ظَهَار** (মায়ের সাথে স্ত্রীর উপমা)-এর কাফফারার অনুরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ

* দাসালাতুন নস (**دَلَالَةُ النَّصِّ**) বলা হয়- এরূপ শব্দকে যা একথা প্রমাণ করে যে, আলোচিত

বিষয়ের হুকুম অনালোচিত বিষয়ের জন্য প্রমাণিত। এই হুকুমটির কারণ শুধু অভিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে বোঝা যায়। (تسهيل الوصول الى علم الاصول ص ১০২)

সা গম দিতে হবে অথবা এক সা' খেজুর। অতএব, এ হিসেবে ৬০ জন মিসকীনকে ৩০ সা' গম দিতে হবে। যার বর্তমান পরিমাণ ২ মণ ২৫ সের গম। (العدة ১১ ج ص ৩৭)

দলীলঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

... فَأَمَرَهُ أَنْ يُجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ- (مسلم ج ১ ص ৩০০)

অর্থাৎ, ... তখন তিনি তাকে বসার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর খাদ্যভর্তি দুটি থলে এল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) তাকে তা সদকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এক আরাকে* ১৫ সা হলে দুই আরাকে ৩০ সা হবে। আর এগুলো যেহেতু ষাট মিসকীনকে দিবে, তাই প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে পড়বে অর্ধ সা। (عمدة القاري ج ১১ ص ২৭، اوجز المسالك ج ৩ ص ৪২)

জবাবঃ ইমাম মালিক এবং শাফেঈ (রহ.)-এর দলিলের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে- (১) ঐ লোকটি যেহেতু দরিদ্র ছিল, তাই তাকে প্রাথমিকভাবে এক عَرَق সদকা করার জন্য বলা হয়েছিল, পরে যখন সামর্থ্যবান হয়, তখন তাকে দ্বিতীয় عَرَق সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) ইমাম যুহরী বলেন, আসলে এই হাদীসটি উক্ত ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। সুতরাং ১৫ সা-এর হাদীসটি কাফফারা আদায়ের ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না।

(৩) বাস্তব কথা হচ্ছে, ঐ লোকটিকে কাফফারা হিসেবে আদায় করার জন্য তা দেয়া হয়নি। বরং তার পরিবারের খরচের জন্য দেয়া হয়েছে। যেমন, আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীস-

... وَقَالَ فِيهِ كُلُّهُ أَنْتَ وَاهْلُ بَيْتِكَ وَصَمَّ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرَ اللَّهَ- (ابو داود ج ১ ص ৩২০)

অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, এরপর নবী করীম (সাঃ) তাকে বলেন, তুমি তা তোমার পরিবারের লোকদের সাথে ভক্ষণ কর এবং একদিন রোযা রাখ, আল্লাহর নিকট গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

* দারা কুতনীতে বর্ণিত আছে-

* আরাক হল এরূপ থলে অথবা টুকরী যা খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী করা হয়। তাছাড়া বুননকৃত

সবকিছুকেই আরাক বলে। (مجمع بحار الانوار ج ৩ ص ৫৭৪)

... قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلَ يَبْتَ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ فَانْطَلِقْ فَكُنْهُ
أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ (দারুতলী ২ জ ২০৮)

অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, যে সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, মদীনাতে আমাদের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী কোন পরিবার নেই। তখন প্রিয় নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, যাও, তুমি ও তোমার পরিবার মিলে যাও। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমার কাফফারা আদায় করে দিয়েছেন।

সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বলা যায় যে, মালিকী ও শাফিঈদের দলীল হিসেবে ১৫ সা-এর হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল (৪)ঃ সর্বোপরি বলা যায়, উক্ত ব্যক্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হাদীস থেকে যদি সাওমের কাফফারার পরিমাণ নির্ধারণ করতেই হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আবু হানিফার অভিমতই অগ্রগণ্য। কেননা, হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বায়হাকীতে বর্ণিত আছে-

فَاتِي بِعَرَقٍ مِنْ تَمَرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا (ابو داود ج ১ ص ৩২৬)

অর্থাৎ, ... অতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট খেজুরের একটি থলে আনা হল, তাতে ছিল ২০ সা'।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আবু দাউদে বর্ণিত আছে-

... بَعَرَقَ فِيهِ تَمَرٌ قَدْرُ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا الْخ

(উক্ত অনুচ্ছেদে হাদীসটি অর্থসহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)

এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

مَا بَيْنَ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ - (المعدة ج ১১ ص ২৭)

অর্থাৎ, ... ১৫ সা' থেকে ২০ সা' পর্যন্ত।

* আর সহীহ মুসলিমে হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

... "فَأَمَرَهُ أَنْ يُجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ" (مسلم ج ১ ص ৩০০)

(উক্ত হাদীসটি ইতিপূর্বে অর্থসহ আবু হানিফার দলীল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।)

সুতরাং বলা যায় যে, সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত অন্যান্য রেওয়ায়েতসমূহ থেকে প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক।

রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতাঃ রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী নয়, বরং তার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত গোলাম আযাদ করা অথবা ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখা অথবা ষাট জন মিসকীন খাওয়ানো, এর যে কোন একটি আদায় করলেই চলবে। ইবন জুরাইজ, ফুলাইহ ইবন সুলায়মান এবং আমর ইবন উসমান আল মাখযুমীও ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত পোষণ করেন। (৩৫৮ ১১ ج، عمدة القاري ج ১، ১৫০ ص ৬، فتح الباري ج ১، ৭৩ ص ৬، معارف السنن ج ৬، ৭৩ ص ৬)

দলীল (১): তাঁরা রোযার কাফফারাকে শপথের কাফফারার উপর কিয়াস করেন। আর শপথের কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ-

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা দৃঢ়ভাবে কর। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে, অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি (এসবের) সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোযা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন শপথ করবে। তোমরা শপথসমূহ রক্ষা কর। (সূরা মায়দা: ৮৯)

উক্ত আয়াতে মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা তাদেরকে কাপড় দেয়া অথবা গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং রোযার কাফফারাকে তিনি কসমের কাফফারার উপরই কিয়াস করেন। (المغني ج ৩ ص ১২৭)

দলীল (২): হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

... أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا الْخ (প্রাণ্ডক্ত)

সুতরাং লক্ষণীয় বিষয় হল, উক্ত হাদীসে وَ (অথবা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে স্বাধীনতার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম যুহরী (রহ.) ও জমহুর উলামাদের মতে, রোযার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী। সুতরাং ক্রমাগত দুই মাস রোযা তখনই

রাখাবে, যখন গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য না থাকবে এবং ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর অনুমতি তখনই পাবে, যখন ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখার সামর্থ্য না রাখে। (فتح الهاري ج ٤ ص ١٤٥، عمدة القاري ج ١١ ص ٣٤)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস, যা نص হিসেবে প্রমাণিত।

দলীল (২): তাঁরা রোযার কাফফারাকে ظَهَرَ (যিহার)-এর কাফফারার উপর কিয়াস করেন। ظَهَرَ-এর কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نُسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ط ذَلِكَمْ تَوَعُّظُونَ بِهِ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ط فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطَاعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا-

অর্থাৎ, যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এইঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে। (মুজাদালাঃ ৩-৪)

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, যিহারের তিন অবস্থায় কোথাও স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। বরং ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং রোযার কাফফারাতেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উচিত।

দলীল (৩): অনুচ্ছেদের শুরুতে হাদীসে বর্ণিত আছে-

... فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطِيعَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا الْخ

উক্ত ইবারতে تَمَنَّى হরফ ব্যবহৃত হয়েছে, যা পিছনে আসা, অনুসরণ করা (تَمَنَّى) অর্থে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমটি আদায়ে অপারগ হলে পরেরটি অনুসরণ করতে হবে।

দলীল (৪): আল্লামা আইনী (রহ.) বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা অগ্রাধিকারের আরেকটি কারণ হল, এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবে উল্লিখিত তিন ইমাম বলেন, প্রথম দলীলের জবাব-

(১) যেখানে এ ব্যাপারে শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস স্পষ্ট হাদীস (نص) রয়েছে, সেক্ষেত্রে কiyাসের কোন মূল্য নেই। সুতরাং إِشَارَةُ النَّصِّ* কiyাসের উপর অগ্রগণ্য লাভ করবে।

(২) তাছাড়া কiyাস যদি করতেই হয়, তাহলে ظَهَار-এর কাফফারার উপর কiyাস করা উচিত। কেননা উভয় কাফফারার মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু শপথের কাফফারার সাথে (গোলাম আযাদ ব্যতীত) কোন মিল নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হাদীসে او (অথবা) শব্দ দ্বারা স্বাধীনতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা শ্রেণীবিন্যাস (تَنْوِيع) বুঝানো উদ্দেশ্য। (اعلاء السنن ج ১ ص ১২৩)

কাফফারা স্বীয় পরিবারবর্গে প্রদানের হুকুমঃ সকল উলামা ও ফুকাহা এ মাসআলায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি কাফফারার সম্পদ আপন পরিবার-পরিজনকে খাওয়াতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি কাফফারার বস্তু আপন পরিবারকে খাওয়ানো জায়েয না হয়, তাহলে রাসূল (সাঃ) ঐ লোকটিকে কিভাবে বললেন- أَطْعِمُوا أَهْلَكُمْ অর্থাৎ, তোমার পরিবারের লোকদেরকে খেতে দাও। এর জবাবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন-

(১) ইমাম শাফেঈ ও যুহরী (রহ.) বলেন,

"إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ الْمَذْكُورِ" অর্থাৎ, এই হাদীসটি উক্ত ব্যক্তির জন্যই খাস

(২) কেউ কেউ বলেন, এ হুকুমটি পূর্বে কার্যকর ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

(৩) কেউ কেউ বলেন, হাদীসে আহল (اهل) বলতে নিজের পরিবার পরিজন বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজন।

(৪) আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, ইহা মূলত কাফফারার জন্য ছিল না, বরং সদকা স্বরূপ ছিল। পরবর্তীতে ক্ষমতা হলে কাফফারা আদায় করতে হবে।

মোটকথা, আপন পরিবারের লোকদেরকে কাফফারার বস্তু খাওয়ানো জায়েয নয়।

* إِشَارَةُ النَّصِّ হল এরূপ শব্দ যা এরূপ কোন অর্থ বুঝায় যার জন্য শব্দটিকে নেয়া হয়নি। কোন রকম চিন্তা-ফিকির ছাড়া প্রথম শ্রবণের সাথেই বাক্য দ্বারা তা বোঝা যায় না। (التسهيل ص ১০১)

অথবা, এর অর্থ এই ছিল যে, তাৎক্ষণিক তা দিয়ে নিজের পরিবারের লোকজনের খোরপোষের কাজ চালাও। কারণ, যখন পরিবারের লোকজন ক্ষুধার্ত থাকবে তখন মানুষের প্রথম ফরয ও প্রথম কাজ হয় তাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা। অতএব, এসব খেজুর প্রথমে নিজে ব্যবহার কর। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দিবেন তখন কাফফারা আদায় করে দিও। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসে বিশেষত্ব আরোপ নিস্প্রয়োজন। এজন্য এ ব্যাখ্যাটিই উত্তম। ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমতও তাই। অর্থাৎ, পরিবারের লোকদেরকে কাফফারার বস্তু খাওয়ানো জায়েয নয়। (درس ترمذي ج ٢ ص ٥٦٧)

রমযানে সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব কিনাঃ

* দাউদ যাহেরীর মতে, রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে, স্ত্রীর ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়।

* তবে সকল ফুকাহা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে যেভাবে স্বামীর উপর কাফফারা আদায় করা আবশ্যিক, অনুরূপ স্ত্রীর উপরও কাফফারা আবশ্যিক হবে, যদি সহবাসে স্ত্রীর ইচ্ছা থাকে। হ্যাঁ, স্ত্রীকে যদি সহবাসে বাধ্য করা হয় এবং ইচ্ছা না থাকে, তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে না; বরং কাযা আদায় করলেই চলবে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লামা খাত্তাবী বলেছেন-
“وَإِنْ أُكْرِهَتْ فَلَعَلَّهَا الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَيْهَا” অর্থাৎ, যদি তাকে সহবাসে বাধ্য করা হয়, তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব নয়।

بَابُ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ص ٣٢٦

যে ব্যক্তি রোযার কাযা বাকি থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (بخاري ج ١ ص ٢٦٢ باب من مات وعليه صوم، مسلم ج ١ ص ٣٦٢ باب قضاء الصوم عن الميت)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করছেনঃ যে ব্যক্তি তার উপর কাযা রোযা থাকাবস্থায় মারা যায় তার উত্তরাধিকারীগণ তার পক্ষ হতে তা আদায় করবে।

বিশ্লেষণঃ কোন ব্যক্তি রোযা অনাদায়ী রেখে মারা গেলে ওয়ারিশগণ সে রোযার কাযা আদায় করবে, নাকি ফিদয়া প্রদান করবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পক্ষ হতে রোযা রাখা জায়েয। (মعارف ج ১ ص ২৮৭)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২): একদা এক মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল-

... يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ فَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومِي عَنْهَا- (মসলম ج ১ ص ৩৬২, তرمذي ج ১ ص ১৬৬ باب المتصدقة يرث صدقة، ابن ماجه ص ১২৭)

অর্থাৎ, ... হে আল্লাহর রাসূল! আমার (মৃত) মায়ের উপর এক মাসের রোযার দায়িত্ব ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখব? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রাখ।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) প্রথমে ভিন্নমত পোষণ করলেও পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফার অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন।

* আর ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কোন প্রকার রোযার ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ততা (نِبَايَت) নেই। অতএব, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা আদায় করা জায়েয নয়। বরং প্রতিটি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীনকে দু'বেলা খাদ্য খাওয়াবে। (شرح مسلم ج ১ ص ৩৬২)

দলীল (১): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصِحْ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ (ابو داود ج ১ ص ২২৬ باب فيمن مات وعليه صيام)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোগাক্রান্ত হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুস্থ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদয়া প্রদান করত) মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। এবং তার উপর এর কাযা থাকবে না।

দলীল (২): عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْتُ لِعَائِشَةَ إِنَّ أُمِّي تُوَفِّيْتُ وَعَلَيْهَا صِيَامُ رَمَضَانَ أَ يَصْلَحُ أَنْ أَقْضَى عَنْهَا قَالَتْ لَا وَلَكِنْ تُصَدِّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِكِ- (عمدة القاري ج ১১ ص ৬০)

অর্থাৎ, আমরা বিনত আব্দুর রহমান বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ)-কে বললাম, আমার আত্মা ইন্তেকাল করেছে। তাঁর উপর রমযানের রোযার দায়িত্ব ছিল। আমি তার

পক্ষ থেকে কাযা করে দিলে তা শুদ্ধ হবে কি? তিনি বললেন, না। তবে তুমি তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের জন্য কোন একজন মিসকীনকে সদকা কর। এটা তোমার রোযা অপেক্ষা উত্তম।

দলীল (৩): ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (بيهقي ج ٤ ص ٢٥٧، طحاوي ج ٢ ص ١٤١)
অর্থাৎ, কেউ কারো পক্ষ থেকে নামায পড়বে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না।

দলীল (৪): হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত-

لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ - (موطاء امام مالك ص ٢٤٥)
অর্থাৎ, কেউ কারো পক্ষ থেকে রোযাও রাখবে না এবং নামাযও পড়বে না।
কোন সাহাবী থেকেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাঁরা একজনের বদলে অন্যজন রোযা রেখেছেন বা নামায আদায় করেছেন। বরং তাঁরা এ ধরনের ইবাদতে প্রত্যেকেই নিজে নিজে আমল করেছেন। (نصب الرأية ج ٢ ص ٤٦٣)
তাহাড়া রোযা হচ্ছে নামাযের ন্যায় একটি শারীরিক ইবাদত। আর নিছক শারীরিক ইবাদতের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জায়েয নয়।
সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিত হোক অথবা মৃত হোক একজনের রোযা আরেকজন রাখা জায়েয নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ ও ইসহাকের দলীল দুটোর জবাবে আহনাফগণ বলেন যে-

(১) প্রথম হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়িশা (রাঃ) নিজেই তার বিপরীত উক্তি করেছেন। (আমরা যেমন এর পূর্বে বর্ণনা করেছি।) তাই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথবা তারা হাদীসের যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা ঠিক নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, অভিভাবক তার যিস্মা থেকে রোযার যিস্মাদারী হতে নিষ্কৃতি পেল। আর তাহল মিসকীনকে খানা খাওয়ানো।

(২) আল্লামা তিব্বী (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন-

مَعْنَاهُ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَيْتَهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الصَّوْمِ وَهُوَ الْإِطْعَامُ -

অর্থাৎ, ওলী এমন কাজ করবে যা রোযার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর তা হচ্ছে খাদ্য প্রদান। যা অন্য হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়।

যেমন, নবী করীম (সাঃ) তায়াম্মুমকে অযু দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন-

"الْثَّرَابُ وَضُؤُ الْمُسْلِمِ" অর্থাৎ, মাটি মুসলমানের ওয়ু।

মূলত উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির যিস্মা থেকে রোযার যিস্মাদারী উঠিয়ে নিবে।
এ ব্যাখ্যানুপাতে হযরত আয়িশার হাদীসটি আমাদের (আহনাফদের) দলীল।
আপনাদের দলীল নয়।

(৩) অথবা হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

(عمدة القاري ج ١١ ص ٥٧-٦٤)

(৪) হযরত আনোয়ার শাহ কাশিরী (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসের “صُومِي عَنْهَا” (তুমি তার পক্ষে রোযা রাখ) উক্তি আদেশ বাধ্যবাধকতা অর্থে নয়। বরং সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে মুত্তাহাব ও ইহসান হিসেবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ সুদৃঢ় (محكمة) রেওয়ায়েতের মোকাবেলায় সম্ভাব্য (محتمل) রেওয়ায়েতের দ্বারা দলীল সহীহ নয়। মোটকথা, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে ওলী রোযা না রেখে ফিদিয়া আদায় করবে। (درس مشكوة ج ٢ ص ٢٠٥)

بابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ص ٣٢٦ : সফরে রোযা রাখা

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَفْظَةَ الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ (بخاري ج ١ ص ٢٦٠ باب الصوم في السفر والافطار، مسلم ج ١ ص ٣٥٧ باب جواز الصوم والافطار في شهر رمضان للمسافر الخ، ترمذي ج ١ ص ١٥٢ باب الرخصة في الصوم في السفر، نسائي ج ١ ص ٣٢٤ سرد الصيام، ابن ماجة ص ١٢١)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হামযা আল আসলামী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রায়ই রোযা রাখি। কাজেই আমি কি সফরকালে রোযা (রমযানের) রাখব? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পার, কিংবা ইফতারও করতে পার।

সফর অবস্থায় রোযা রাখার হুকুমঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছেঃ

* কতিপয় আহলে যাহিরের মতে, সফর অবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নয়। বরং রোযা রাখলে তা পুনরায় মুকীম অবস্থায় কাযা করতে হবে। (فتح الهاري ج ٤ ص ١٥٩)

দলীল (১)ঃ আল্লাহর বাণী- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

উক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, সফরের কারণে যেহেতু অন্যদিন রোযা রাখার সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সুতরাং রমযানে রাখলে তা অসময়ে পালন করা হবে, যা উচিত নয়। অতএব পুনরায় রোযা রাখতে হবে।

كراهية الصوم في السفر

সুতরাং উক্ত হাদীসের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, রোযা রাখাকে সওয়াবের পরিবর্তে রোযাদারদেরকে গোনাহগার বা অবাধ্য বলা হয়েছে। সুতরাং রোযা রাখা কিভাবে শুদ্ধ হবে?

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী- **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** অর্থাৎ, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (বাকারঃ ১৮৫)

* ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আওয়াসি (রহ.)-এর মতে, সফর অবস্থায় সাধারণত রোযা না রাখাই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এরও একটি রেওয়ায়েত অনুরূপ।

(فتح الهاري ج ٤ ص ١٦٠)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُظَلِّلُ (٥) دَلِيلًا عَلَيْهِ وَالرَّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ. (ابو داود ج ١ ص ٣٢٧ باب من اختار الفطر، بخاري ج ١ ص ٢٦١ باب قول النبي صلعم لمن ظلل عليه فاشد الحر الخ، مسلم ج ١ ص ٣٥٦،

ترمذي ج ١ ص ١٥٢، نسائي ج ١ ص ٣١٤ ما يكره من الصيام في السفر، ابن ماجه ص ١٢١)

অর্থাৎ, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম (সাঃ) দেখলেন, জনৈক ব্যক্তিকে (রোযা থাকার কারণে) ছায়া দেয়া হয়েছে এবং তার নিকট লোকের ভীড় জমেছে। এরপর তিনি বললেনঃ সফরে রোযা রাখাতে কোন পুণ্য নেই।

দলীল (২)ঃ সফরে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সুযোগ এবং নিয়ামত। সুতরাং এ নিয়ামত গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

* কতিপয় আলিম বলেন, সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং না রাখা উভয়ের স্বাধীনতা আছে। যার জন্য যেটা সহজ সেটাই উত্তম।

দলীল (১)ঃ আল্লাহর বাণী- **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না। (বাকারাঃ ১৮৫)

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ **عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يُعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.**

(ابو داود ج ١ ص ٣٢٧ باب الصوم في السفر، بخاري ج ١ ص ٢٦١ باب لم يعيب اصحاب النبي الخ،

مسلم ج ١ ص ٣٥٦، ترمذي ج ١ ص ١٥٢)

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রমযান মাসে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফর করি। তখন আমাদের কেউ কেউ রোযা রাখে এবং কেউ কেউ ইফতার করে। কিন্তু ঐ সময় কোন রোযাদার ইফতারকারীকে এবং ইফতারকারী রোযাদারকে দোষারোপ করেননি।

* সুফিয়ান সাওরী ও আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, যদি শক্তি পায় আর রোযা রাখে তবে ভাল। এটা উত্তম। আর যদি রোযা না রাখে তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেঈ (রহ.) সহ জমহুর উলামার মতে, যদি ভীষণ কষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম।

(عمدة القاري ج ١١ ص ٤٣)

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলা অসুস্থ এবং সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি (رُخْصَةً) প্রদানের পর উল্লেখ করেছেন- **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ**

অর্থাৎ, “আর যদি তোমরা (সফরে) রোযা রাখ তবে উত্তম।” (বাকারাঃ ১৮৪)

দলীল (২): عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي (২) بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ بْنُ رَوَاحَةَ. (আবু দাউদ জ ১ ص ৩২৭ باب في من اختار الصيام، بخاري ج ১ ص ২৬১ باب اذا صام ايام

من رمضان ثم سافر، مسلم ج ১ ص ৩৫৭، ابن ماجه ص ১২১)

অর্থাৎ, আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে প্রচণ্ড গরমের দিনে কোন এক যুদ্ধের জন্য বের হই। এ সময় অসহ্য গরমের কারণে আমাদের কেউ কেউ মাথায় হাত রাখছিল অথবা হাতের তালু রেখেছিল। আর এসময় আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

দলীল (৩): عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهَذَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إِلَى شَبْعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ. (আবু দাউদ জ ১ ص ৩২৭ باب في من اختار الصيام)

অর্থাৎ, সিনান ইবন সালামা ইবনে মুহাব্বাক আল হুযাল্লী (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির আরোহনের জন্য কোন বাহন থাকবে, যা তাকে নিরাপদ গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে, সে ব্যক্তির উচিত রমযানের রোযা (কাযা না করে) আদায় করা, যেখানেই তা পাবে। (অর্থাৎ সফরের মধ্যে যেখানেই রমযান মাস এসে পড়ে সেখানেই সক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম, যদিও কাযা করা জায়েয।)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন সমস্যা না থাকলে সক্ষম ব্যক্তির জন্য সফরে রোযা রাখাই উত্তম।

জবাবঃ আহলে যাহিরের প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) তাঁরা আয়াতের খণ্ডাংশের ভিত্তিতে রোযা রাখা অবৈধ বলেছেন। অথচ এর পরেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- اِنَّ

كُلَّكُمْ لَيَرَمَضَانُ حَيْثُ اَدْرَكَهُ (আর যদি তোমরা রোযা রাখ তবে উত্তম)। যেখানে আল্লাহ তাআলা উত্তম বলেছেন, সেক্ষেত্রে অবৈধ বলা মোটেই ঠিক নয়।

(২) তাছাড়া ঐ আয়াতে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল, রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়নি।

(৩) আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে একটি শব্দ উহা (مَحْذُوف) রয়েছে। যেমন, আয়াতটি হবে-

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ (فَافْطَر) فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

অর্থাৎ, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকা অবস্থায় “রোযা ভঙ্গ করেছে” তার পক্ষে অন্য সময়ে সেই রোযা পূরণ করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ নবী করীম (সাঃ)-এর الْعَصَاة (তারাবাদ্য) বলার কারণ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশকে কোন পাত্তা না দিয়েই রোযা রাখা শুরু করে অথবা যে রোযা রাখার দ্বারা তার ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) এই উক্তিটি করেছেন। নতুবা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) রোযা রাখতেন না। তাছাড়া যারা রোযা রাখতেন তাদেরকেও তিনি কোনদিন তিরস্কার করেননি। যেমন-

... عَنْ قَزَعَةَ سَأَلَتْهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي)

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَتَصُومُ الْخ (ابو داود ج ١ ص ٣٢٧ باب الصوم في السفر، مسلم ج ١

ص ٣٥٦)

অর্থাৎ ... কাযাআ (রহ.) হতে বর্ণিত আমি তাঁকে (আবু সাঈদ আল-খুদরী রাঃ-কে) সফরের মধ্যে রমযানের রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রমযান মাসে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে বের হই। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রাখলে আমরাও রোযা রাখি।

* আল্লামা তাবারী প্রদত্ত দলীলের জবাবে বলা যায় যে, যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আয়াতে স্পষ্টভাবে অবকাশ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে এমন কঠোরতা করা আদৌ ঠিক নয়।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ الْيُسْرَ مِنَ الْيُسْرِ الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ অর্থাৎ

“সফরে রোযা রাখা পূণ্যের কাজ নয়”। আসলে এ উক্তিটি নবী করীম (সাঃ) কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন সেদিকে একটু নয়র দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বুঝে আসে। অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমের কারণে সে লোকটি যখন অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি

পৌঁছে গিয়েছিল, তখন নবী করীম (সাঃ) বলেন- الْيُسْرَ مِنَ الْيُسْرِ الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ

আহনাফরা বলেন যে, সফর অবস্থায় অসহনীয় কষ্টের সময় ইফতার করা যে উত্তম, সে কথা তো আমরাও বলি। (درس ترمذي ج ٢ ص ٥٥٣)

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ যদিও সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান একটি বিশেষ সুযোগ ও নেয়ামত। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল- এই সহজ বিষয়টা গ্রহণ করাকে মর্যাদার প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়নি। বরং উত্তম বা মর্যাদার প্রতীক হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলেন- **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ**

* কতিপয় আলিমের প্রদত্ত অভিমতের জবাবে বলা যায়-

যদিও সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে, তবে এ কথা সত্য যে সফর অবস্থায় রোযা রাখাই উত্তম এবং যুক্তিযুক্ত। কেননা, সফরে রোযা রাখা কষ্টকর। আর যে বেশি কষ্ট করে ইবাদত পালন করে তার সওয়াব বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া রোযা রাখা যে উত্তম তার স্বপক্ষে কুরআনের نص (দলীল) রয়েছে- وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

৩৩৩ : بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ

... عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَّامَ لَهُ- (ترمذي ج ١ ص ١٥٤ باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، نسائي ج ١ ص ٣٢٠ اللغة في الصيام، ابن ماجه ص ١٢٣)

অনুবাদঃ নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত করবে না, তার রোযা হবে না।

বিপ্লেষণঃ নিয়ত বা দৃঢ় সংকল্প করা সকল ফরয কাজের জন্য অপরিহার্য শর্ত।
 রোযার জন্যও নিয়ত করা ফরয। নিয়ত ব্যতীত রোযা সহীহ হবে না। (الفلي ۳۲ ص ۹۱)
 যেমন, নামাযের নিয়ত ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। তবে রোযার নিয়তের সময় কখন
 এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও ইবন আব্বি যিব (রহ.)-এর মতে, সব ধরনের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করা ফরয। রমযানের ফরয রোযা হোক কিংবা কাফফারার রোযা হোক অথবা মান্নতের রোযা বা নফল রোযা হোক অথবা ওয়াজিব রোযা হোক। সবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে রোযা হবে না।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে কোন রোযাকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি।

কিয়াসী দলীলঃ রোযা সুবহে সাদিকের পর থেকে শুরু হয়। যেকোন কাজের নিয়ত তা শুরু হবার আগেই করতে হয়। যেমনঃ নামাযের নিয়ত নামায শুরুর পূর্বেই করতে হয়। সুতরাং রোযার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বে হতে হবে। এটাই স্বাভাবিক।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা ছাড়া ফরয এবং ওয়াজিব রোযা শুদ্ধ হবে না। তবে নফল রোযার ক্ষেত্রে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পরেও নিয়ত করা যাবে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসটি ফরয ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) বলেন, যেকোন নফল ইবাদত ভঙ্গ করলে, কাযা ওয়াজিব হয় না। রোযার বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর কাযা করা ওয়াজিব নয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে রাত থেকেই নিয়ত করা আবশ্যিক নয়। (المغني ج ৩ ص ১০২)

.... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاولَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوُّعُ آمِنُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (نسائي ج ۱ ص ۳۱۹)

ص ৩১৯ النية في الصوم ، ترمذي ج ১ ص ১০০ باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর (উম্মেহানীর) নিকট প্রবেশ করে পানীয় আনালেন। অতঃপর তা পান করলেন। তারপর তা তাকে দান করলেন। ফলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো রোযাদার ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, নফল রোযাদার নিজের নফসের আমানতদার। সে ইচ্ছে করলে রোযা রাখতে পারে, আর ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারে।

... عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ هَانِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ فَجَاءَ تِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاولَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاولَهُ أُمُّ هَانِيٍّ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا كُنْتُ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا (ابو داود ج ১ ص ৩৩৩ باب الرخصة فيه ، ترمذي

قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَآتَى النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْنَ أَقْفَرٍ مِنَّا قَالَ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَتَائِهَا قَالَ فَاطْعِمُهُ إِيَّاهُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ

فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْيَابُهُ— (بخاري ج ١ ص ٢٥٩-٢٦٠ باب اذا جامع في رمضان الخ، مسلم ج ١ ص ٣٥٤ باب تغليظ تحريم الجماع الخ، ترمذي ج ١ ص ١٥٤ باب كفارة الفطر في رمضان، ابن ماجه ص ١٢١)

(১২১)

অনুবাদঃ ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করে, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আযাদ করার মত কোন দাস-দাসী আছে কি? সে বলে, না। তিনি বলেন, তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি বস। এ সময়ে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এক 'ইরক' (থলে ভর্তি) খেজুর এল। এরপর নবী করীম (সাঃ) তাকে খুরমা ভর্তি একটি থলে প্রদান করে বলেন, তুমি তা দ্বারা সদকা কর। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনার উভয় পার্শ্বে আমাদের চাইতে অভাবগ্রস্ত আর কোন পরিবার নেই। রাবী বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমনভাবে হেসে উঠেন যে, তাঁর সম্মুখের দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তোমরাই তা ভক্ষণ কর। রাবী মুসাদ্দাদ অন্য বর্ণনায় বলেন, তাঁর দন্তরাজি বের হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণঃ রোযার কাফফারা কেবল সহবাসের সাথেই নির্দিষ্ট, নাকি সহবাস ও পানাহার সবকটির কারণেই কাফফারা দিতে হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, কাফফারা শুধু ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে, যে সহবাসের দরুণ রোযা ভঙ্গ করে অর্থাৎ কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট। তাই ইচ্ছা করে কেউ পানাহার করলেও তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (কেবল কাযা ওয়াজিব হবে।)

দলীল (১)ঃ পানাহারের ক্ষেত্রে কাফফারা আরোপ করা কiyাসের পরিপন্থী। কেননা পানাহারের দ্বারা কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কথা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই।

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (বাকারঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর রোযার হুকুম শুরু হবে। সুতরাং একথাতে স্পষ্ট যে, রাতে নিয়ত করার কোন সুযোগই থাকল না। অতএব নিঃসন্দেহে দিনে নিয়ত করতে হচ্ছে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট ফরয রোযার ক্ষেত্রে রাতে নিয়ত করা আবশ্যিক নয়।

দলীল (৩)ঃ ফরয রোযার ক্ষেত্রে আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীল-

যে সব ফরয রোযা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, সে রোযার সময়ে অন্য কোন রোযার নিয়ত করলেও তা আদায় হবে না। কারণ ঐ সময়টুকু ঐ রোযার জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, রমযান মাস রমযানের ফরয রোযার জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং, এ সময় অন্য কোন রোযা রাখা যাবে না। এই বাধ্যবাধকতা অনেকটা নিয়তের কাছাকাছি। তাই এসব ক্ষেত্রে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রোযার নিয়ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

দলীল (৪)ঃ নফল রোযার ক্ষেত্রে আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীল-

... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ زَادَ وَكَيْفَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسَ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ فَقَالَ أُذْنِيهِ فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَافْطَرَ - (ابو داود ج ١ ص ٣٣٣ باب الرخصة فيه، ترمذي ج ١ ص ١٥٥، نسائي ج ١ ص ٣١٩ التلوة في

الصيام)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমার নিকট আগমন করলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে? আমরা না বললে, তিনি (সাঃ) বলতেন, আমি রোযা রাখলাম। রাবী ওয়াকী অতিরিক্ত বর্ণনায় বলেন, এরপর একদিন তিনি আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা বলি, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাদের জন্য হয়েস (ঘি ও আটা মিশ্রিত খেজুরের তৈরী এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য) হাদিয়া এসেছে। আর আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) বলেন, তা আমার কাছে নিয়ে আস। এরপর তিনি (সাঃ) সকাল হতে রাখা রোযা ভেঙ্গে ইফতার করেন।

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবী করীম (সাঃ) নফল রোযার নিয়ত ফযরের পরেও করেছেন।

দলীল (৫): রমযানের কাযা, কাফফারা এবং সাধারণ মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে যেহেতু বিশেষ কোন দিন নির্দিষ্ট নেই, সেহেতু পুরো দিন ঐ রোযার সাথে নির্দিষ্ট করার জন্য রাত্র থেকেই নিয়ত করা আবশ্যিক। সুতরাং হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি উল্লিখিত তিন ইমামের দলীল নয়, বরং হানাফীদের দলীল। কেননা হাদীসটি নির্দিষ্ট কোন রোযার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং ব্যাপক।

তাই আহনাফগণ বলেন, হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি মূলতঃ রমযানের কাযা, কাফফারা ও সাধারণ মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা ফরয, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ফজরের পরে যে নিয়ত করা যাবে তা ইতিপূর্বে দলীলসহ প্রমাণিত হয়েছে।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন-

(১) হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি মারফু নাকি মাওকুফ, এ নিয়ে এখতিলাফ রয়েছে।

যেমন, হাদীসটির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে- **هُوَ خَطَأٌ فِيهِ إِضْطِرَابٌ**

সুতরাং উক্ত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) কেউ কেউ বলেন, হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ যার মোকাবেলায় কুরআনের আয়াত **كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ** এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতই প্রাধান্য পাবে।

(৩) হাফসা (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত **فَبَلَّ الْفَجْرَ الصَّيَّامَ قَبْلَ الْفَجْرِ** দ্বারা সেহেরী ফালায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সেহেরী খায়নি।

(তার রোযা আদায় হবে না) দ্বারা **فَبَلَّ الْفَجْرَ** তথা রোযা পরিপূর্ণ না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেহেরী গ্রহণ না করলে রোযার পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

(৪) অথবা হাফসা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব সময়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাতে নিয়ত করা মুস্তাহাব, তবে দিনেও নিয়ত করা জায়েয আছে।

(৫) সর্বোপরি বলা যায়, হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীসের দ্বারা হযরত হাফসা (রাঃ)-এর হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর অভিमत, “নফল রোযার (ও নামাযের) কাযা ওয়াজিব নয়”-এর জবাবঃ

যদিও ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর মতে, নফল রোযা ভাঙ্গার দরুণ কাযা ওয়াজিব নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, নফল রোযা ভাঙ্গার দরুণ কাযা করা ওয়াজিব। (المغلي ج ৩ ص ১০৩، معارف السنن ج ১ ص ৮০، الدونة ج ১ ص ১৮৩)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- **وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ** অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (মুহাম্মাদঃ ৩৩)

নফল রোযাও (এবং নফল নামায) একটি আমল। সুতরাং তা ভেঙ্গে ফেললে অবশ্যই কাযা করতে হবে।

দলীল (২): **... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْكُمَا صَوْمٌ مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ** (ابو داود ج ১ ص ৩৩৩ باب من رأى عليه القضاء، ترمذي ج ১ ص ১০০ باب إيجاب

القضاء عليه، نسائي ج ১ ص ৩২০)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার ও হাফসার (রাঃ) জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে। এ সময় আমরা উভয়ে রোযাদার ছিলাম। (কিন্তু খাবার পাওয়াতে) আমরা রোযা ভেঙ্গে তা খেয়ে ফেলি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাজির হলে, আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য কিছু খাবার হাদিয়া স্বরূপ আসে, আর আমাদের তা খেতে ইচ্ছা হওয়াতে আমরা রোযা ভেঙ্গে খেয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ক্ষতি নেই। তোমাদের উভয়ের জন্য অন্য কোনদিন রোযা কাযা করতে হবে।

উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এটি ছিল নফল রোযা। নতুবা ফরয রোযা তাঁরা এভাবে ভেঙ্গে ফেলতেন না। আর নফল রোযা ভাঙ্গার দরুণ অন্যদিন কাযা করার কথা বলা হয়েছে।

জবাব (১): উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধারণ ওয়রের কারণেও নফল রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। আর তাই তো বলা হয়েছে- **إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ** কিন্তু অপর হাদীসে কাযা করার হুকুমও দেয়া হয়েছে।

(২) তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শাফিঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) রোযার কাযার হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। আর কোন বিষয় উল্লেখ না করা, তা আবশ্যিক হওয়াকে নিষেধ করে না।

(৩) অথবা, প্রাথমিক অবস্থায় নফল রোযা রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল। কেউ রাখতেও পারে, নাও রাখতে পারে। কিন্তু রেখে ভেঙ্গে দিলে কাযা করতে হবে। কিন্তু, শাফেঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, রোযা রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করতে হবে না।

* উম্মে হানী (রাঃ)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায়-

(১) উম্মে হানীর হাদীসটি আল্লামা আইনী ও তিরমিযীর (রহ.) মতে অসঙ্গতিপূর্ণ আর অসঙ্গতিপূর্ণ হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

(২) উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় যে, ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের দিন। আর মক্কা বিজয় হয়েছিল রমযান মাসে, আর রমযান মাসে যে নফল রোযা রাখা জায়েয নয়, একথা তো সর্বজনবিদিত। অথচ হাদীসে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি কোনক্রমেই দলীলযোগ্য নয়।

بابُ الْإِعْتِكَافِ ص ৩৩৬ ইতিকাফ

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ ثُمَّ إِعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (بخاري ج ১ ص ২৭১ باب الاعتكاف في العشر الاواخر، مسلم ج ১ ص ৩৭১ كتاب الاعتكاف، ترمذي ج ১ ص ১৬৫ باب الاعتكاف اذا خرج منه، ابن ماجه ص ১২৭)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন, যতদিন না আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নেন। এরপর তাঁর স্ত্রীগণও (স্ব-স্ব গৃহে) ইতিকাফ করেন।

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থঃ اِعْتَكَفَ শব্দটি বাবে اِفْتَعَالَ-এর মাসদার। এর মূল ধাতু হচ্ছে عَكَف এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

۱। اَلْاِقَامَةُ عَلَى الشَّيْءِ وَزَوْجِهِ - কোন জিনিসের নিকট অবস্থান করা এবং সেটাকে আঁকড়ে ধরা। যেমন কুরআনে এসেছে-

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ

অর্থাৎ, বন্তুত আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী ইসরাইলদেরকে। তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছালো, যারা তাদের মূর্তি পূজাকে আঁকড়ে ধরেছিল। (আরাফঃ ১৩৮)

২। حَبَسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ - কোন জিনিসের উপর নিজেকে আটকিয়ে রাখা।

(درس ترمذي ج ২ ص ১৩০)

যেমন কুরআনে এসেছে- مَا هَذِهِ التَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عُكُفُونَ

অর্থাৎ, এই মূর্তিগুলো কী, যাদের সাথে তোমরা নিজেদেরকে আটকিয়ে রেখেছ?
[অর্থাৎ এদের পূজারী হয়েছ] (আম্বিয়াঃ ৫২)

৩। নিজেকে বন্দী করা।

৪। নির্দিষ্ট পরিগণিতে বাস করা।

৫। মসজিদে অবস্থান করা।

ইতিকাফের পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

هُوَ الْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَاللَّبْتُ فِيهِ مَعَ الصَّوْمِ وَالنِّيَّةِ (تبيين الحقائق ج ১ ص ৩৬৭)

অর্থাৎ, ইতিকাফ হল, রোযা ও নিয়ত সহকারে মসজিদে অবস্থান করা।

(২) আল্লামা ইমাম কুদুরী (রহ.) বলেন- هُوَ اللَّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْأَعْتِكَافِ -
অর্থাৎ ইতিকাফের নিয়তে রোযা সহকারে মসজিদে অবস্থান করার নামই ইতিকাফ।

(৩) আল্লামা জুরজানী বলেন, هُوَ لَبْتُ الصَّائِمِ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ بِنِيَّةٍ

অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে রোযাদারের জামে মসজিদে অবস্থানকে ইতিকাফ বলা হয়।

(৪) কেউ কেউ বলেন,

هُوَ الْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سَاعَةً فَمَا فَوْقَهَا-

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের নিয়তে অল্প বা বেশি সময় মসজিদে অবস্থান করার নামই হল ইতিকাফ।

(৫) কেউ কেউ বলেন, الْأَعْتِكَافُ اللَّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ،
مَخْصُوصَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

অর্থাৎ, ইতিকাফ হল বিশেষ নিয়তে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান।

ইতিকাফের প্রকারভেদঃ ইসলামী শরীয়াতে ইতিকাফ তিন প্রকার। যথা-

(১) সুন্নত ইতিকাফঃ সুন্নত ইতিকাফ হল- যে ইতিকাফ শুধু পবিত্র রমযানের শেষ দশকে একুশ তারিখের রাত (তথা বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব) থেকে নিয়ে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে থাকা হয়।

(معارف السنن ج ৬ ص ১৭৬ ، المغني ج ৩ ص ১১০)

যেহেতু নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক বছর এই দিনসমূহে ইতিকার্য করতেন, এজন্য একে সুন্নত ইতিকার্য বলা হয়। [যদিও বিশেষ কারণে নবী করীম (সাঃ) থেকে রমযানে দুইবার ইতিকার্য ছুটে গিয়েছিল।]

আল্লামা চলপী (রহ.) লিখেন- **لَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاطَّعَ عَلَيْهِ فِي**

الْعِشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (حاشية جليلي على التبيين ج ١ ص ٣٤٧)

অর্থাৎ, কারণ নবী করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশকে সর্বদা এই ইতিকার্য করতেন।

ইহা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়া। অর্থাৎ একটি মহল্লা বা জনপদে কোন একজনও যদি ইতিকার্য করে তাহলে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে এর সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু পুরো মহল্লা থেকে যদি একজনও ইতিকার্য না করে, তাহলে সমস্ত মহল্লাবাসীর উপর সুন্নত ছাড়ার গুনাহ হবে। (احكام اعتكاف ص ৩০-৩১)

উল্লেখ্য যে, রমযানে যে ইতিকার্য মাসনুন তা দশদিনের কম হলে সুন্নত আদায় হবে না। (التبيين الحقائق ج ١ ص ৩৪৮)

(২) ওয়াজিব ইতিকার্যঃ ওয়াজিব ইতিকার্য হল, যা মাম্মতের দ্বারা ওয়াজিব হয়ে থাকে অথবা কোন সুন্নত ইতিকার্য বিনষ্ট করার ফলে এর কাযা ওয়াজিব হয়ে থাকে।

(৩) নফল ইতিকার্যঃ ইহা হচ্ছে উপরোল্লিখিত দু'প্রকার ইতিকার্য ছাড়া অন্যান্য ইতিকার্য। আর নফল ইতিকার্য যে কোন সময় আদায় করা যায়।

(التبيين الحقائق ج ١ ص ৩৪৮, معارف السنن ج ٦ ص ১৯১-১৯২)

উল্লেখ্য যে, মহিলারাও স্বীয় গৃহে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করে তথায় ইতিকার্য করতে পারবে, তবে এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি নেয়া আবশ্যিক। তাছাড়া ইহাও অত্যাৱশ্যক যে, তাকে হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হতে হবে।

(بدائع الصنائع ج ٢ ص ১০৮-১০৯, احكام اعتكاف ص ২৭)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ওয়াজিব এবং সুন্নত ইতিকার্যে সর্বসম্মতক্রমে রোযা রাখা শর্ত। কিন্তু নফল ইতিকার্যে রোযা রাখতে হবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের মতে, নফল ইতিকার্যে রোযা রাখা আবশ্যিক নয়। কেননা, ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মদ ও আহমদ (রহ.)-এর নিকট নফল ইতিকার্যের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে- এক মুহূর্ত। তথা নফল ইতিকার্যের জন্য সময়ের কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। আর আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট দিনের অধিকাংশ সময়। (عمدة القاري ج ١١ ص ১৪০)

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي (১) দলীল
الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَكَفْ
وَصُمْ - (ابو داود ج ১ ص ৩৩০ باب المعتكف بعود المريض، بخاري ج ১ ص ২৭৪ باب من لم يرى على

المعتكف صوما/ ২৭২، ابن ماجه ص ১২৮)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ) জাহেলিয়াতে
একদিন অথবা একরাত মাসজিদুল হারামে ইতিকাকের মান্নত করেন। তিনি এ
সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ইতিকাক কর এবং
রোযা রাখ।

এবং অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- “اعْتَكَفْ لَيْلَةً” অর্থাৎ, “তুমি রাতে ইতিকাক কর।”

এখানে একরাত ইতিকাকের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, রাতে
রোযা রাখার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। এবং নবী করীম (সাঃ) তাঁকে ইতিকাক পূর্ণ
করারও হুকুম দিয়েছেন। এতে নিশ্চিত বুঝা যাচ্ছে যে, রোযা ব্যতীত (নফল)
ইতিকাক বিশুদ্ধ হবে।

দলীল (২)ঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ

অর্থাৎ, ইতিকাককারীর রোযা প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, নফল ইতিকাকের জন্য রোযা
রাখা আবশ্যিক। কেননা, তাঁদের নিকট নফল ইতিকাকের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে
একদিন। (عدة الفاري ج ১১ ص ১৪০)

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي (১) দলীল
الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتَكَفْ

وَصُمْ - (ابو داود ج ১ ص ৩৩০، بخاري ج ১ ص ১৭২، ابن ماجه ص ১২৮)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ) জাহেলিয়াতে
একদিন অথবা একরাত মাসজিদুল হারামে ইতিকাকের মান্নত করেন। তিনি এ
সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ইতিকাক কর এবং
রোযা রাখ।

দলীল (২)ঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-

(۳۳۰) لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ (ابو داود ج ১ ص ৩৩০) অর্থাৎ, রোযা ব্যতীত ইতিকাক নেই।

দলীল (৩): ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন-

(الْمُعْتَكِفُ يَصُومُ) অর্থাৎ, ইতিকাফকারী রোযা রাখবে।

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহে ইতিকাফকারীকে রোযা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর রোযা একদিনের কম হয় না। আর হাদীসে রোযাকে সাধারণ (مطلق) রাখা হয়েছে। ফরয কিংবা ওয়াজিবের সাথে শর্তযুক্ত (مقيد) করা হয়নি। সুতরাং নফরের ক্ষেত্রেও রোযা রাখতে হবে।

দলীল (৪): আল্লাহ তাআলার বাণী-

ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ - وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ-

অর্থাৎ, অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। (বাকারঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইতিকাফের জন্য রোযা জরুরী। কেননা আয়াতে রোযার সাথে ইতিকাফের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

আহনাফদের পক্ষ থেকে জবাবঃ উমর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রদত্ত দলীলের জবাব হল এই- সহীহ মুসলিমে উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে, তথায় لَيْلَةً (রাত)-এর জায়গায় يَوْمًا (দিন)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং আবু দাউদ ও নাসায়ীতে يَوْمًا (দিন এবং রাত) উভয়ই উল্লেখ আছে। এ থেকে বুঝা যায় যে সকল রেওয়াজেতে শুধু রাত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে, এর দ্বারা لَيْلَةً مَعَ يَوْمًا (সেই দিনসহ রাত) বুঝানো উদ্দেশ্য। আর দিন হল রোযার আধার (ظرف)। সুতরাং রোযা রাখা আবশ্যিক। (درس)

(مشکوٰۃ ২ ج ص ২১১)

দলীল (২): অথবা বলা যায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর এই হুকুম ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতকৃত ইতিকাফ আদায় প্রসঙ্গে। আর এই হুকুম ছিল, হযরত উমর (রাঃ)-কে মানসিক প্রশান্তি দান প্রসঙ্গে। এটা আদায় করা বা না করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এতে রোযারও প্রয়োজন নেই। কেননা, হানাফী মাযহাবে জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতই সহীহ নয়। আর অন্যদের মতে যেহেতু জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতকৃত ইতিকাফ আদায় করা ওয়াজিব, সুতরাং নফলের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করা আদৌ ঠিক নয়। (درس مشکوٰۃ ২ ج ص ২১১-২১০)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকেই এর বিপরীত রেওয়াজে পাওয়া যায়-(الْمُعْتَكِفُ يَصُومُ) অর্থাৎ, ইতিকাফকারী রোযা রাখবে।

সুতরাং নিয়ম হল-وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا- অর্থাৎ, যখন দুটি বিষয় পরস্পরবিরোধী হয়, তখন উভয়টি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

উক্ত আলোচনায় যদিও হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তথাপি নির্ভরযোগ্য মত এই যে, নফল ইতিকারের জন্য বিশেষ কোন সময় নির্ধারিত নেই; বরং যতটুকু সময়ই ইতিকারের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করবে, তাই নফল ইতিকার হিসেবে গণ্য হবে। আর এর জন্য রোযা রাখাও শর্ত নয়। (৩৫৮ জ ১৮ তলবীন)

بَابُ آيِنَ يَكُونُ الْإِعْتِكَافُ ص ৩৩৫

ইতিকার কোথায় করতে হয়?

... عَنْ ابْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرًا لِأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ- (মসল জ ১৮৩৭১ কনবুল ইعتকাক, ইবন মাজে ১২৮৮)

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকার করতেন। নাকে বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) মসজিদের ঐ স্থানটি দেখান, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইতিকার করতেন।

বিশ্লেষণঃ জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকার শুদ্ধ হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* হযরত ইবন মাসউদ, আলী (রাঃ), আতা হাসান বসরী, ইমাম যুহরী এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইতিকার সহীহ হওয়ার জন্য জামে মসজিদ আবশ্যিক। সুতরাং জামে মসজিদ ছাড়া ইতিকার শুদ্ধ হবে না।

দলীল (১)ঃ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

... لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ- (আবু দাউদ জ ১৮৩৩৫ বাকবুল ইعتকাক ইবুদুর রিয়ুস,

তরম্ভি জ ১৮১৬৬ বাকবুল ইعتকাক ইখরাজ লাহাজত আম লা)

অর্থাৎ, জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকার শুদ্ধ নয়।

দলীল (২)ঃ তাঁরা দলীল হিসেবে কিয়াস উপস্থাপন করে বলেন যে, জুমুআর নামায আদায় করা ফরয। আর এজন্য ইতিকারকারীকে জুমুআর জন্য বের হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং জামে মসজিদে ইতিকার করলে বের হওয়া লাগবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, শাবী, আবু সালমা, নাখঈ এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ জমহুর উলামার মতে, ইতিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামে মসজিদ হওয়া আবশ্যিক নয়; বরং প্রত্যেক মজজিদেই ইতিকাফ সহীহ হবে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতে আদায় করা হয়।

দলীল: পবিত্র কুরআনের আয়াত- **وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عُكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ**

অর্থাৎ, আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। (বাকারাঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াতে ইতিকাফের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জামে মসজিদকে শর্তযুক্ত করা হয়নি। সুতরাং যেকোন মসজিদে ইতিকাফ করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

প্রত্যুত্তরঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাবঃ আবু দাউদ (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা করার পর নিজেই বলেন-

... غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ لَا يَقُولُ فِيهِ قَالَتِ السُّنَّةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ-

অর্থাৎ, ... আব্দুর রহমান ইবন ইসহাক ব্যতীত কেউ বলেন না যে তা সুন্নত। আবু দাউদ (রহ.) বলেন, এ হলো আয়িশা (রাঃ)-এর বক্তব্য।

সুতরাং তা কুরআনের মোকাবেলায় দলীলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ কুরআনের আয়াতের মোকাবেলায় কিয়াস করে জামে মসজিদকে শর্তযুক্ত করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

উল্লেখ্য যে, সর্বোত্তম ইতিকাফ হল যা মসজিদে হারামে (কাবা শরীফে) আদায় করা হয়, অতঃপর মসজিদে ননবী (সাঃ), অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাসে, অতঃপর জামে মসজিদে, অতঃপর ঐ সব মসজিদে যেখানে মুসল্লী সংখ্যা বেশি হয়।

(العمدة للمبني ج ١١ ص ١٤١-١٤٢)

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ ص ٣٣٤

প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ - (بخاري ج ١ ص ٢٧٢ باب

المعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة، ترمذي ج ١ ص ١٦٥ باب المعتكف يخرج لحاجة ام لا، ابن ماجة ص ١٢٨)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইতিকাফ করতেন, তখন তিনি স্বীয় মাথা মুবারক আমার নিকটবর্তী করতেন, আমি তাতে চিরুণী করে দিতাম। আর তিনি মানবিক (প্রস্রাব-পায়খানার) প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করতেন না।

বিশ্লেষণঃ ইতিকাফ শব্দের অর্থই হল নিজেকে আটকিয়ে বা বন্দী করে রাখা। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে নিম্নে আলোচনা উপস্থাপন করা হল-

এ ব্যাপারে আল্লামা নববী (রহ.) লিখেন-

لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَعْتَكِفِهِ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ أَوْ طَبَعِيَّةٍ (معارف ج ٦ ص ٢١٧)

অর্থাৎ, ইতিকাফকারী ইতিকাফের অবস্থান হতে শরঈ অথবা স্বভাবগত প্রয়োজন ব্যতীত বের হতে পারবে না।

حَاجَتِ طَبَعِيَّةٍ বা স্বভাবগত প্রয়োজনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দূররে মুখতার-এর গ্রন্থকার বলেন, “তাহল প্রস্রাব-পায়খানা এবং স্বপ্নদোষের কারণে ফরয গোসল। এবং حَاجَتِ شَرْعِيَّةٍ বা শরঈ প্রয়োজন হল- ঈদ বা জুমুআর নামায এবং আযান দেয়া, অজু করা ইত্যাদি। (در مختار ج ٢ ص ١٤٤)

হানাফীরা হাদীসে বর্ণিত “إِلَّا لِحَاجَةٍ الْإِنْسَانِ” এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

“الطَّهَارَةُ وَمُقَدَّمَاتُهَا” অর্থাৎ, পবিত্রতা ও এর পূর্বের কাজগুলো।

অতএব, এতে ইস্তিজ্জা, অযু ও ফরয গোসলও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এটাই ব্যাপকতর ব্যাখ্যা। (مجمع ج ١ ص ٢٥٦، شامي ج ٢ ص ١٣٢، احكام اعتكاف ص ٦٣)

আর তাই অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদের বাইরে যাওয়া, যেমন জুমুআর দিন গোসল করতে বা একটু ঠাণ্ডার জন্য গোসল করতে অথবা এক অজু থাকা সত্ত্বেও নতুন অজু করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নয়। কেননা, এগুলো حَاجَتِ لَا زَمَةَ বা অপরিহার্য প্রয়োজন নয়। (احكام اعتكاف ص ٦٣)

হাঁ, এমন যদি হয় যে, গোসল না করার কারণে শরীরে খুব বেশি দুর্গন্ধ এসে যায় বা ইবাদতে মন না বসে অথবা ভীষণ অসুখ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

তবে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), হযরত জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) এবং মাখদুম মোহাম্মদ হাশিম (রহ.) জুমুআর গোসলকেও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর মধ্যে গণ্য করে এজন্য ইতিকাফকারীর বের হওয়াকে জায়েয মনে করেন। (اشعة اللمعات ২ ج ص ১২০، احكام القرآن ১ ج ص ১৭০، احكام اعتكاف ص ৬১-৬০)

কিন্তু ফকীহগণ কেবল নাপাকীর কারণে গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাছাড়া জুমআ সহ অন্য কোন গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেন না। দলীল হিসেবে বলেন, নবী করীম (সাঃ) প্রায় প্রতি বছরই ইতিকাফ করতেন, এবং প্রত্যেক ইতিকাকে অবশ্যই জুমআ অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কোথাও একথা বর্ণনা নেই যে, নবী করীম (সাঃ) জুমআর গোসলের জন্য বের হতেন। অথচ স্বয়ং আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, “... নবী করীম (সাঃ) স্বীয় মাথা মোবারক আমার নিকটবর্তী করতেন, আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম।” কিন্তু জুমআর গোসলের জন্য বের হয়েছেন এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়নি। যদি তিনি কখনো বের হতেন, তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করা হতো। (احكام اعتكاف ص ৬১-৬০)

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ ص ৩৩৫

ইতিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يَعْرِجُ يَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عِيْسَى قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ—

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী আন-নুফায়েলী বলেনঃ তিনি (আয়িশা) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) ইতিকাকে থাকা অবস্থায় রোগীর নিকট গমন করতেন। এরপর তিনি যে অবস্থায় থাকতেন, সে অবস্থায় গমন করতেন এবং তার (রোগীর) নিকট দণ্ডায়মান না হয়ে, তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। ইবন ইসা বলেন, তিনি (আয়িশা) বলেছেন, যদি নবী করীম (সাঃ) ইতিকাফ অবস্থায় কোন রোগীর পরিচর্যা করে থাকেন (তবে তিনি প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন)।

বিশ্লেষণঃ একথার উপর সকলেই একমত যে, রোগীর সেবা করা এবং জানাযায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ইতিকাফকারীকে মসজিদ থেকে বের হওয়া নাজায়েয।

কিন্তু حَاجَةٌ বা প্রয়োজনীয় কার্যাবলী (যেমন প্রস্রাব-পায়খানা, অজু ইত্যাদি) সারতে যাওয়া বা আসার সময় পথিমধ্যে অন্য কোন কাজ, যেমন রোগীর সেবা করা বা জানাযায় শরীক হওয়া জায়েয আছে। কিন্তু মোল্লা আলী কারী বলেন যে-এমতাবস্থায়ও ইতিকাকফারীকে দণ্ডায়মান না হয়ে চলতে চলতে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। (৩৩০: ১৮৮)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উল্লেখ্য যে, জানাযার নামাযে যেহেতু দণ্ডায়মান থাকা ব্যতীত শরীক হওয়াই সম্ভব নয়, এজন্য তাতে দণ্ডায়মান হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু মূল রাস্তা থেকে সরতে পারবে না এবং নামায শেষ হতেই তৎক্ষণাত মসজিদে ফিরে আসা ওয়াজিব।

(بدائع الصنائع ج ২ ص ১১৪، احكام اعتكاف ص ৪২-৪৩)

যদিও সুফিয়ান সাওরী এবং আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, ইতিকাকফে বসার সময় যদি কেউ এ শর্ত করে যে, ইতিকাকফ চলাকালীন অবস্থায় রোগীর সেবা করব, ইলমের মজলিশে বসব অথবা জানাযার নামাযে চলে যাব, তাহলে তার জন্য বের হওয়া জায়েয হবে। (الدر المختار مع رد المختار ج ২ ص ১৪৬، فتاوى المالکيري ج ১ ص ২১২) কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হল এই যে, কেবল মান্নত অথবা নফল ইতিকাকফের ক্ষেত্রেই এরকম অনুমতি দেয়া যায়। সুন্নত ইতিকাকফের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং সুন্নত ইতিকাকফের ক্ষেত্রে যদি কেউ এ ধরনের নিয়ত করে, তাহলে তা সুন্নত ইতিকাকফ থাকবে না; বরং তা নফল ইতিকাকফে পরিগণিত হবে। অতএব এক্ষেত্রে কাযা ওয়াজিব না হলেও সুন্নত ইতিকাকফের ফযিলত হাসিল হবে না। (احكام اعتكاف ص ৬৬-৬৭)

প্রণিধানযোগ্য যে, ইবন মাজায় হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,
... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَكِفُ يُتَّبِعُ الْجَنَائِزَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ

(ابن ماجه ص ১২৮ باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، ترمذي ج ১ ص ১৬৬)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, ইতিকাকফকারী জানাযার পিছনে যাবে এবং রোগীর সেবা করবে।

কিন্তু এ রেওয়াজেতেটি দুর্বল। তাছাড়া ইহা হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর সহীহ রেওয়াজেতের বিরোধী।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ (ابو داود ج ১ ص ৩৩৫ باب المعتكف يعود المريض)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইতিকাকারীর জন্য সুন্নত এই যে, সে যেন কোন রোগীর পরিচর্যার জন্য গমন না করে, জানাযার নামাযে শরীক না হয়, ঈদকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ হতে বের না হয়। রোযা ব্যতীত ইতিকাক নাহি এবং জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাক শুদ্ধ নয়।

অতএব, এক্ষেত্রে আয়িশার (রাঃ) হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। কেননা, অন্যান্য হাদীসের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে এবং আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের তুলনায় এটি অধিক বিশ্বস্ত।